সুভাষচন্দ্র বসু

সমগ্র রচনাবলী

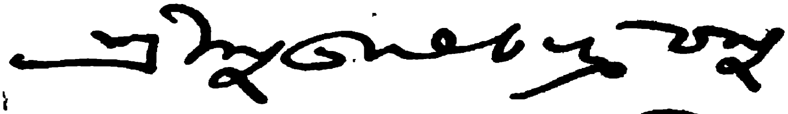

সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা, ১৯৬২

প্রকাশক
ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীও. সি. গাঙ্গুলী

মুদ্রক
শক্তি রঞ্জন মিশ্র
ইউনাইটেড প্রিণ্টার্স
৩০২/২/এইচ/৫, এ. পি. সি. রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

নিবেদন

স্বাধীনতা অর্জনের তেত্রিশ বছর পরেও ভারতবর্ষের তথা এই উপমহাদেশের জনগণ তাঁদের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পথ খুঁজে পাননি। তাঁরা পদে পদে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। ভারত উপমহাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসু দিয়েছিলেন এক অনন্য নেতৃত্ব। অনেকক্ষেত্রে তাঁর দেশবাসী তাঁকে বোঝেনি এবং তাঁর পথ অনুসরণ করেনি। উপরন্তু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে আমাদের ইতিহাসের এক পরম সঙ্কটময় মুহূর্তে আমরা নেতাজীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ত শেষ হয়নি। আমরা আজও নূতনের সন্ধানে চলেছি। সুভাষচন্দ্রের চিরসংগ্রামী ও বিপ্লবী জীবনের বাণী নূতন করে উপলব্ধি করার সময় এসেছে। তাঁর রচনা সমগ্রের বহুল প্রচার ও চর্চা এই উপলব্ধির প্রধান সোপান। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো বিশ্বাস করে যে এই দায়িত্বভার পালন করা তার ঐতিহাসিক কর্তব্য।

ষাট দশকের গোড়ায় নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর প্রথম বই সুভাষচন্দ্রের রচনা-সম্ভার Crossroads প্রকাশিত হয়। তার পর থেকে একের পর এক নেতাজীর বিভিন্ন রচনা সংগ্রহ আমরা ইংরাজী, বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করেছি। সুভাষচন্দ্রের জীবনের বাণী দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রধান মাধ্যম তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলীর প্রকাশ ও প্রচার। তাই প্রায় পনের বছর আগেই আমরা স্থির করেছিলাম যে তাঁর সকল ও বিবিধ রচনা সংগ্রহ করে সুসংবদ্ধভাবে খণ্ডে খণ্ডে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করব। কাজটি অবশ্যই ছিল সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য, বিশেষ করে নেতাজীর মত এক যুগান্তকারী বিপ্লবী নায়কের ক্ষেত্রে। দীর্ঘকাল ধরে ব্যুরোর কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তারই ফলশ্রুতি নেতাজী রচনা সমগ্রের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর গবেষণা ও প্রকাশন বিভাগ পূর্ণ উদ্যমে তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশবাসীর সমর্থন, সহযোগিতা ও আশীর্বাদ পাথেয় করে আমরা সুভাষচন্দ্রের রচনা সমগ্র নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করে যাব। আমাদের সংগ্রহশালায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিত্যনূতন সংযোজন হচ্ছে। ফলে আমাদের কাজ যেমন দিন দিন কঠিন হচ্ছে, তেমনি আমাদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চারিত হচ্ছে।

প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। সুভাষচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ভারত পথিক' ১৯৩৭ সালে লেখেন। কিন্তু আমরা মনে করি যে এক্ষেত্রে কালানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে এই রচনাটি দিয়েই তাঁর রচনা সমগ্রের সুরু হওয়া উচিত। কারণ সুভাষচন্দ্রকে বুঝতে হলে তাঁর জীবনের সুরু, শৈশব, কৈশোর ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময়কার তাঁর বহু চিঠিপত্র সংগ্রহ করা গেছে। আত্মজীবনী ও সমকালীন চিঠিগুলি এক সাথে পাওয়া সুভাষচন্দ্রের জীবন ও বাণী বুঝবার পক্ষে এক অপূর্ব সুযোগ। ১৯২১ সালে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করার পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ হয় ১৯২৭ সালের প্রথমে, যখন তিনি বর্মায় সুদীর্ঘ নির্বাসন থেকে ঘরে ফেরেন। প্রস্তুতি ও নেতৃত্বের প্রথম পদক্ষেপকে যুক্ত করে ১৯২৭ সালের মে মাস পর্যন্ত লেখা চিঠিপত্র ও বিবিধ প্রবন্ধ এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীর নয়টি পরিচ্ছেদ ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌গাস্টাইন্‌ স্বাস্থ্যনিবাসে দশ দিনের অবসরে লিখেছিলেন। ১৯৩৮ সালের প্রথমেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কাজের চাপে ও সময়াভাবে তিনি তার পর আত্মজীবনী সম্পূর্ণ করার সুযোগ পাননি। তবে সম্পূর্ণ একটি আত্মজীবনী রচনার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা যে তাঁর ছিল সেটা তাঁর মূল ইংরাজী পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের খসড়া থেকে বোঝা যায়। খসড়াটি এইরকম:

১। জন্ম—বংশ পরিচয়—পারিবারিক ইতিহাস

২। স্কুল জীবন (ক) পি ই স্কুল

(খ) আর পি স্কুল

৩। কলেজ ১৯১৩-১৬—১৯১৬-১৭—১৯১৭-১৯
৪। ১৯১৯-২১ কেম্ব্রিজ
৫। ১৯২১-১৯২৩
৬। ১৯২৩-২৪
৭। ১৯২৪-২৭ বর্মা ইত্যাদি
৮। ১৯২৭-১৯২৯
৯। ১৯২৯-১৯৩১
১০। ১৯৩২-১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী
১১। ১৯৩৩-১৯৩৬ মার্চ
১২। ১৯৩৬-১৯৩৭ মার্চ
১৩। ১৯৩৭-মার্চ—ডিসেম্বর

পরিকল্পিত তেরোটি অধ্যায়ের মধ্যে চারটি তিনি নয়টি পরিচ্ছেদে লিখেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনে উপরোক্ত অধ্যায়গুলির তাৎপর্য যে কোন আগ্রহী পাঠকের কাছে সহজেই প্রতীয়মান হবে।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯১২-১৩ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মে মাস পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের দু'শ আটটি চিঠির একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯১২-১৩ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত লেখা চিঠিগুলি আত্মজীবনীর পরিপূরক। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত লেখা চিঠিপত্র সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অধ্যায় ও বর্মার বন্দীজীবনের সাধনা, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার জীবন্ত দলিল। এই দু'শ আটটি চিঠির মধ্যে তরুণ সুভাষ-চন্দ্রের মানসলোকের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন প্রতিফলিত। উপরন্তু ভারতের জাতীয় সংগ্রাম ও সমাজ-চেতনার সমকালীন ধারার একটি প্রতিচ্ছবি চিঠিগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। চিঠি-গুলিতে কোন বিষয়ই বাদ পড়েনি—ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নানা প্রশ্ন, সামাজিক সমস্যা, শিক্ষা বিষয়ক ও কৃষ্টিগত আলোচনা, মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা, পৌর-সমস্যাগুলি সমাধানের উপায়, নীতিবোধ ও আদর্শবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া রাজনৈতিক সমস্যাগুলি ত আছেই। ভাবপ্রবণ ও আদর্শবাদী একটি বালক কিভাবে ভারতের বিপ্লবী তারুণ্যের প্রতীক ও প্রতিভূ হয়ে উঠলেন এই চিঠিগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারব।

এই সংগ্রহের অধিকাংশ চিঠিই মেজদাদা শরৎচন্দ্রকে লেখা। তাছাড়া বেশ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি মা প্রভাবতী, মেজবৌদিদি বিভাবতী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তী দেবী-কে লেখা। বন্ধুস্থানীয় হেমন্তকুমার সরকার, দিলীপকুমার রায় ও চারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লেখা চিঠিগুলিও গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে হবে। সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে সহকর্মীদের লেখা চিঠিগুলি নানা দিক দিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। ব্যক্তিগত চিঠি ছাড়াও বর্মার বন্দীশালা থেকে ইংরেজ সরকারকে লেখা কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ চিঠিও সংগ্রহের মধ্যে আছে।

বহু চিঠি ইংরাজী থেকে অনুবাদ করতে হয়েছে। যথাস্থানে এর উল্লেখ আছে।

প্রভাবতী, শরৎচন্দ্র ও বিভাবতীকে লেখা চিঠিগুলি বিভাবতী তাঁর মৃত্যুর পূর্বে নেতাজীর জীবনী রচনা ও ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য দান করে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিন দশক ধরে সযত্নে ও সস্নেহে রক্ষিত বিভাবতী বসুর বিবিধ ও বিচিত্র সংগ্রহ নিয়েই নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর যাত্রা সুরু। বাসন্তী দেবী তাঁর কাছে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠিগুলি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর মাধ্যমে দেশবাসীকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। আরও অনেকে যাঁরা দেশের স্বার্থে তাঁদের কাছে লেখা নেতাজীর চিঠি আমাদের সংগ্রহশালায় দান করেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা আর ইহলোকে নেই তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই, যাঁরা আছেন তাঁদের প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অন্তত কয়েকটি নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। যথা—সন্তোষকুমার বসু, দিলীপকুমার রায়, সুধীরা সরকার, চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী, পদ্মাবতী মিত্র ও আরতি দত্ত।

তৃতীয় অধ্যায়ে যে কয়টি রচনা প্রকাশিত হল, সেগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আশা করি আজকের যুবসমাজ বার বার সুভাষচন্দ্রের 'দেশের ডাক' ও 'তরুণের স্বপ্ন' পড়বেন এবং নতুন ভারতবর্ষ গড়ার কাজে নতুন করে উদ্বুদ্ধ হবেন। 'আমরা কি চাই' এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে দ্বিতীয় দশকের প্রথমেই সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

পরিশিষ্টে বসু ও দত্ত পরিবারের বংশধারা ছাড়া আমরা দুটি মূল্যবান রচনা প্রকাশ করলাম। 'জানকীনাথ বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত' সুভাষচন্দ্র অগ্রজ শরৎচন্দ্রের অনুরোধে ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পিতৃবিয়োগের পরেই লিখেছিলেন। মূল পাণ্ডুলিপিটি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালায় আছে। অন্যটি নগেন্দ্রনাথ বসুর লেখা "পুরন্দর খাঁ ও মাহীনগর সমাজ" সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন এবং পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য তিনি এই রচনা থেকে নিয়েছিলেন। ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকেরা এই প্রবন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য খুঁজে পাবেন। ১৩৩৫ সালের "কায়স্থ পত্রিকা"র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়।

নেতাজীর স্ত্রী ও কন্যা অনীতা সুভাষচন্দ্রের যাবতীয় রচনার স্বত্ব নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে দান করেছেন। দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীমান সুমন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান সুগত বসু ইংরাজী থেকে অনুবাদের ভার নিয়েছিলেন এবং সম্পূর্ণ নতুন ভাবে স্বচ্ছ বাঙ্গলায় তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন।

আনন্দ পাবলিশার্স সংস্থার ঐকান্তিক উৎসাহ ও নিপুণতা আমাদের কাজ সহজ করেছে। তাঁদের আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি এই গ্রন্থ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হবে এবং দেশে এক নবযুগ সূচনায় সহায় হবে।

জয় হিন্দ্
শিশিরকুমার বসু

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো
নেতাজী ভবন
৩২/২ লালা লাজপত রায় সরণি
কলিকাতা ৭০০০২০

অনুবাদ প্রসঙ্গে

"I did not quite like the translation"– মান্দালয় জেল থেকে প্রেরিত দেশবন্ধু-জায়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত তাঁর একটি চিঠির অনুবাদ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র এই মন্তব্য করেছিলেন। অর্থাৎ, যেন তেন প্রকারেণ তাঁর রচনার অনুবাদ সুভাষচন্দ্রের কখনই কাম্য ছিল না। তাঁর রচনা অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদকদের এই মন্তব্য সর্বদাই স্মরণে রাখতে হয়েছে।

'নেতাজী রচনা-সমগ্র'-এর প্রথম খণ্ডে মোটামুটি তিন ধরণের রচনা সংকলিত হয়েছে (১) তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২) ১৯২৭ সাল অবধি লেখা, অদ্যাবধি প্রাপ্ত তাঁর যাবতীয় চিঠি (৩) সমকালীন সাময়িক ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর নিজস্ব রচনা।

সংবাদপত্র ও সমসাময়িক পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তাঁর রচনার প্রায় সব কয়টিই বাংলায় লেখা, অতএব অনুবাদের প্রয়োজন হয়নি। চিঠিপত্রের মধ্যে অনেক চিঠিই তিনি বাংলাতে লিখেছেন, সেগুলিতেও তাই হাত পড়েনি। অনূদিত হয়েছে কেবলমাত্র তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী আর ইংরেজীতে লেখা পত্রাবলী।

কটকে শৈশবকাল থেকে মান্দালয়ে কারাবাস পর্যন্ত, সুভাষচন্দ্র বাংলা লেখায় কখনোই একধরণের ভাষা ব্যবহার করেননি; কখনও লিখেছেন সাধু বাংলায়, কখনও চলিতে, কখনও একেবারে গুরুচণ্ডালিতে। কেবলমাত্র ১৯১২-১৩ সালে মা'কে লেখা চিঠির সব ক'টিই সাধু বাংলায়; সেই সময়ে মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে ইংরেজীতে লেখা চিঠিগুলি সাধু বাংলায় অনুবাদ করা সঙ্গত মনে হয়েছে। কিন্তু আত্মজীবনী ও পরবর্তীকালের চিঠি অনুবাদের ক্ষেত্রে কতকটা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে সহজ, স্বচ্ছ, চলিত বাংলা যা সাধারণ মানুষের নায়ক সুভাষচন্দ্রের রচনাকে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তুলবে। রচনা-প্রকাশে বোধকরি সেটাই হবে তাঁর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন।

'ভারত-পথিক' সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনীতে যেমন, তাঁর চিঠিপত্রেও তেমনি ঘটনা বা বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও ভাষার পরিবর্তন লক্ষণীয়। তত্ত্ব বা তথ্য-নির্ভর বিষয় বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনায় তাঁর কলম-নিঃসৃত শব্দগুলির বাঁধুনি যেমন আঁটো-সাঁটো, ভাবগম্ভীর, তেমনি শৈশবের পাগলামি বা প্রকৃতির খেয়ালীপনার বর্ণনায় তিনি যেন একটু ঢিলেঢালা। ব্যক্তিগত জীবনের মতন কলম চালনায়ও তিনি একাধারে রসিক সুভাষ, দার্শনিক সুভাষ, দেশপ্রেমিক সুভাষ, কতকটা আবার কবি-সুভাষও বটেন। গাম্ভীর্য ও রসমাধুর্যের সুপরিমিত মিশ্রণই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখার আন্তরিক চেষ্টা করা হয়েছে।

সুমন চট্টোপাধ্যায়
সুগত বসু

সূচী

নিবেদন

অনুবাদ প্রসঙ্গে

১. ভারত পথিক—একটি অসমাপ্ত আত্মজীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ
জন্ম, বংশ পরিচয় ও শৈশব পরিবেশ . ১- ৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
পারিবারিক ইতিহাস .. ৩- ৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আমার জন্মের আগে ... ৭-১১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ইস্কুলে (১) ... ১১-১৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ইস্কুলে (২) ... ১৫-২৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
প্রেসিডেন্সি কলেজ (১) ... ২৮-৩৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ
প্রেসিডেন্সি কলেজ (২) ... ৩৯-৪৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ
শিক্ষার পুনরারম্ভ ... ৪৪-৫২

নবম পরিচ্ছেদ
কেম্ব্রিজে ... ৫২-৬৪

২. পত্রাবলী ১৯১৩—১৯২৭

পত্র	১- ৯	প্রভাবতী বসুকে লিখিত	...	৬৫- ৭৭
	১০- ১৩	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	৭৭- ৮১
	১৪- ৪৭	হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত	...	৮১-১০২
	৪৮	ভোলানাথ রায়কে লিখিত	...	১০২-১০৩
	৪৯- ৫০	হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত	...	১০৩-১০৪
	৫১	ভোলানাথ রায়কে লিখিত	...	১০৪
	৫২- ৫৩	হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত	...	১০৫
	৫৪	যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রকে লিখিত	...	১০৫-১০৬
	৫৫	হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত	...	১০৬-১০৭
	৫৬	যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রকে লিখিত	...	১০৭
	৫৭- ৬২	হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত	...	১০৭-১১২
	৬৩	চারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত	...	১১২-১১৩
	৬৪- ৬৬	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১১৩-১১৭
	৬৭	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত	...	১১৭-১১৯

পত্র	৬৮	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১১৯-১২১
	৬৯	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত	...	১২১-১২২
	৭০	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১২২-১২৫
	৭১	রাইট অনারেবল ই. এস. মন্টেগু, ভারত সচিবকে লিখিত	...	১২৫-১২৬
	৭২	চারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত	...	১২৬
	৭৩- ৮৪	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১২৬-১৩৯
	৮৫	দিলীপকুমার রায়কে লিখিত	...	১৩৯-১৪২
	৮৬- ৯১	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১৪২-১৪৬
	৯২	দিলীপকুমার রায়কে লিখিত	...	১৪৬-১৪৮
	৯৩- ৯৪	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১৪৮-১৫০
	৯৫	হরিচরণ বাগচীকে লিখিত	...	১৫০-১৫১
	৯৬- ৯৭	বাসন্তী দেবীকে লিখিত	...	১৫২-১৫৪
	৯৮-১০০	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১৫৪-১৫৬
	১০১	বিভাবতী বসুকে লিখিত	...	১৫৬-১৫৮
	১০২-১০৪	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১৫৮-১৬১
	১০৫	এন. সি. কেলকারকে লিখিত	...	১৬১-১৬৩
	১০৬	বিভাবতী বসুকে লিখিত	...	১৬৩-১৬৬
	১০৭	দিলীপকুমার রায়কে লিখিত	...	১৬৬-১৬৮
	১০৮	বাসন্তী দেবীকে লিখিত	...	১৬৮
	১০৯	দিলীপকুমার রায়কে লিখিত	...	১৬৯-১৭১
	১১০	সন্তোষকুমার বসুকে লিখিত	...	১৭১-১৭৩
	১১১-১১৩	অনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে লিখিত	...	১৭৩-১৭৬
	১১৪	সন্তোষকুমার বসুকে লিখিত	...	১৭৬-১৭৯
	১১৫	বিভাবতী বসুকে লিখিত	...	১৭৯-১৮২
	১১৬	গোপবন্ধু দাসকে লিখিত	...	১৮২-১৮৩
	১১৭-১১৯	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১৮৩-১৮৪
	১২০	বাসন্তী দেবীকে লিখিত	...	১৮৫
	১২১-১২৩	হরিচরণ বাগচীকে লিখিত	...	১৮৬-১৯০
	১২৪-১২৫	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১৯০-১৯১
	১২৬	বিভাবতী বসুকে লিখিত	...	১৯১-১৯৩
	১২৭-১২৯	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১৯৩-১৯৪
	১৩০	জানকীনাথ বসুকে লিখিত	...	১৯৪-১৯৫
	১৩১-১৩৫	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	১৯৫-২০৩
	১৩৬	গোপবন্ধু দাসকে লিখিত	...	২০৩-২০৪
	১৩৭	বিভাবতী বসুকে লিখিত	...	২০৪-২০৫
	১৩৮	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২০৫
	১৩৯	বাসন্তী দেবীকে লিখিত	...	২০৬
	১৪০	সন্তোষকুমার বসুকে লিখিত	...	২০৬-২০৯
	১৪১-১৪৬	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২১০-২১৭
	১৪৭	কেম্ব্রিজের ফিট্‌স্‌ উইলিয়াম হলের বারসারকে লিখিত	...	২১৭-২১৮
	১৪৮	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২১৮
	১৪৯	অমূল্যচরণ উকিলকে লিখিত	...	২১৮-২২০
	১৫০-১৫১	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২২০-২২৩
	১৫২	বাসন্তী দেবীকে লিখিত	...	২২৩-২২৪
	১৫৩	গোপবন্ধু দাসকে লিখিত	...	২২৪
	১৫৪-১৫৫	বিভাবতী বসুকে লিখিত	...	২২৫-২২৬
	১৫৬	ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত	...	২২৬-২২৮
	১৫৭-১৭৩	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২২৯-২৫৩

পত্র ১৭৪	অনাথবন্ধু দত্তকে লিখিত	...	২৫৩-২৫৫
১৭৫-১৭৭	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২৫৫-২৫৬
১৭৮	বাসন্তী দেবীকে লিখিত	...	২৫৭-২৫৮
১৭৯-১৮৭	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২৫৮-২৬৬
১৮৮	সন্তোষকুমার বসুকে লিখিত		২৬৬-২৬৭
১৮৯	বিভাবতী বসুকে লিখিত	...	২৬৮
১৯০-১৯১	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২৬৯-২৭০
১৯২-১৯৩	বর্মার তদানীন্তন গভর্নরকে লিখিত	...	২৭০-২৭৩
১৯৪	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২৭৩-২৭৪
১৯৫	মতিলাল নেহেরুকে লিখিত	...	২৭৪-২৭৫
১৯৬	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত	...	২৭৫
১৯৭-১৯৮	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২৭৫-২৮০
১৯৯	গোপাললাল সান্যালকে লিখিত	...	২৮০-২৮১
২০০	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২৮১
২০১	সুনীলচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২৮২-২৮৩
২০২	বর্মার তদানীন্তন আই. জি. অফ প্রিজন্সকে লিখিত	...	২৮৩-২৮৪
২০৩	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২৮৪
২০৪	জানকীনাথ বসুকে লিখিত	...	২৮৫
২০৫-২০৮	শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত	...	২৮৫-২৮৮

৩. বিবিধ প্রবন্ধ

তরুণের স্বপ্ন	...	২৯১-২৯২
বাঙ্গালীর অধঃপতন	...	২৯৩-২৯৪
মান্দালয় থেকে বার্তা	...	২৯৫
দেশের ডাক	...	২৯৬-২৯৭
দেশবন্ধু স্মৃতি	...	২৯৮-৩০৭
উত্তর কলিকাতা অধিবাসীগণের নিকট আবেদন	...	৩০৮-৩০৯
আমরা কি চাই	...	৩১০-৩১১
প্রেসিডেন্সি কলেজ সমস্যা—একটি সত্য বিবরণী	...	৩১২

৪. পরিশিষ্ট

জানকীনাথ বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত	...	৩১৫-৩১৬
পুরন্দর খাঁ ও মাহীনগর সমাজ	...	৩১৭-৩২০
মাহীনগর বসুদিগের বংশধারা	...	৩২২-৩২৩
হাটখোলার দত্তদিগের বংশধারা	...	৩২৪

ব্যক্তি পরিচয়	...	৩২৫-৩২৯
বর্ণানুক্রমিক সূচী	...	৩৩১-৩৩৭

ভারত পথিক

ভারতপথিক লিখবার সময় বাদগাষ্টাইনে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম, বংশ পরিচয় ও শৈশবপরিবেশ

আমার বাবা, জানকীনাথ বসু, গত শতাব্দীর নবম দশকে উড়িষ্যায় চলে যান এবং ওকালতিসূত্রে কটকে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী শনিবার আমার জন্ম হয়। আমার বাবা মাহীনগরের বসু বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; আর মা প্রভাবতী হাটখোলার দত্ত পরিবারের কন্যা। আমি আমার বাবা-মা'র ষষ্ঠ পুত্র ও নবম সন্তান।

আজকালকার এই দ্রুতগতি যানবাহনের যুগে, কলকাতা থেকে রেলে চড়ে পূর্ব উপকূল বরাবর দক্ষিণাভিমুখী গেলে এক রাত্রেই কটকে পৌঁছান যায়; এবং এই ভ্রমণে না আছে কোনও দুঃসাহসিকতা, না কোন রোমাঞ্চ। কিন্তু ষাট বছর পূর্বে অবস্থা ঠিক এরকম ছিল না। গরুর গাড়ী করে যেতে হত এবং পথে চোরডাকাতের উপদ্রব ছিল; আর সমুদ্রপথে গেলে বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশির সম্মুখীন হতে হত। যেহেতু মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা অনেক নিরাপদ, সেজন্য সাধারণত সকলে নৌকাযোগেই যাতায়াত করত। সমুদ্রগামী নৌকা যাত্রীদের নিয়ে চাঁদবালী পর্যন্ত যেত; সেখান থেকে স্টীমারে চড়ে অনেক নদী ও খাল অতিক্রম করে কটকে পৌঁছুতে হত। এই জলপথে যাত্রাকালে যেরকম গড়াগড়ি খেতে ও ঝাঁকুনি সহ্য করতে করতে যেতে হত এবং আনুষঙ্গিক আরও যে সব কষ্ট ভোগ করতে হত তার যে বিবরণ শিশুকাল থেকে মা'র কাছে শুনে এসেছি, তার ফলে এ ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের কোনও ইচ্ছাই আমার হত না। যখন দূরত্ব বেশী ছিল এবং যাতায়াত ব্যবস্থা কোনও প্রকারেই নিরাপদ ছিল না তখন ভাগ্যান্বেষণে দেশত্যাগ করে দূরবর্তী স্থানে যাওয়া অবশ্যই আমার বাবার বিপুল সাহসের পরিচয়। সামাজিক জীবনেও সাহসী ব্যক্তিদের প্রতিই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হন; আমার যখন জন্ম হয় তখন এই নূতন স্থানে ইতিমধ্যেই আমার বাবা নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন, এবং সেই সঙ্গে প্রায় অগ্রগণ্য এক আইনব্যবসায়ীরূপে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

কুড়ি হাজারের কাছাকাছি অধ্যুষিত কটক[১] অপেক্ষাকৃত ছোট শহর হলেও নানা কারণে এর নিজস্ব একটা গুরুত্ব ছিল। কলিঙ্গের প্রাচীন হিন্দু রাজাদের আমল থেকেই কটক নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের অধিকারী। কার্যত, এটি উড়িষ্যার রাজধানী ছিল, যে উড়িষ্যা পুরীর (অথবা জগন্নাথ) মত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং কোনারক, ভুবনেশ্বর ও উদয়গিরির মত গৌরবময় শিল্প নিদর্শনের জন্য গর্ব করতে পারে। কটক যে শুধু ব্রিটিশ শাসনকালেই উড়িষ্যার সদর দপ্তর ছিল তা নয়; অন্যান্য অনেক রাজার রাজত্বকালেও এটি ঐ প্রদেশের রাজধানী ছিল। সব দিক বিবেচনা করে দেখলে, শিশুর ক্রমবিকাশের পক্ষে কটকের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর ছিল এবং শহর ও গ্রাম্য জীবন উভয়েরই কিছু কিছু সুবিধা এখানে ভোগ করা যেত।

আমাদের পরিবার ধনী ছিল না, তবে সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার বলা যেতে পারে। স্বভাবতই, অভাব ও দারিদ্র্য বলতে যা বোঝায় সে সম্বন্ধে আমার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না এবং দারিদ্র্যের মধ্যে শৈশব অতিবাহিত হওয়ার দরুণ কখন কখন অনাকাঙ্ক্ষিত ফলস্বরূপ স্বার্থপরতা, লোভ ইত্যাদি যে সব দোষ গড়ে ওঠে, আমার বেলায় তার কোন

---

[১] ১৯৩৫-এর গভর্নমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী কটক নবগঠিত উড়িষ্যা প্রদেশের রাজধানী। পূর্বে, ১৯০৫ সাল পর্যন্ত, বিহার সহ এটি বঙ্গ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বঙ্গদেশ যখন বিভক্ত হয় তখন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে একটি প্রদেশ গঠিত হয়, আর পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠন করা হয় ভিন্ন একটি প্রদেশ। ১৯১১ সালের পর এবং অল্প কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে একটি প্রদেশ ছিল। ১৯১১ সাল থেকে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ পুনর্যুক্ত হয়েছে, আর আসাম এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বঙ্গভাষাভাষী জেলাগুলি নিয়ে ভিন্ন একটি প্রদেশ গঠিত হয়েছে।

সুযোগ ঘটেনি। অথচ আমাদের পরিবারে সে জাতীয় বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতা ছিল না, যার প্রভাবে বহু সম্ভাবনাময় তরুণ জীবন অতিরিক্ত প্রশ্রয়দানের ফলে নষ্ট হয়ে গেছে বা যা তাদের মধ্যে এক উদ্ধত, উন্নাসিক মনোভাব গড়ে তুলেছে। বাস্তবিক পক্ষে, আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও আমার বাবা-মা ছেলেমেয়েদের—আমার মনে হয় সঙ্গতভাবেই —সাদাসিধেভাবে মানুষ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

একেবারে শৈশবের যে কথা আমার মনে পড়ে তা হল এই যে, নিজেকে নিতান্ত তুচ্ছ এক জীব বলে বোধ হত। আমি আমার পিতামাতাকে বেশ সমীহ করতাম। সাধারণত আমার বাবার চারদিকে এক গাম্ভীর্যের আড়াল থাকত এবং তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতেন। আইন ব্যবসার চাপে, জনসেবামূলক কাজের চাপে পরিবারের প্রতি নজর দেবার মত খুব বেশী সময় তিনি পেতেন না, যেটুকুও বা পেতেন তা তাঁর সব ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্বভাবতই ভাগ করে দিতে হত। সর্বাপেক্ষা ছোট যে থাকত তার ভাগ্যেই অবশ্য আদরটা একটু বেশী জুটত, কিন্তু সে বেশিদিনের জন্য নয়; কারণ পরিবারে নূতন কারও আবির্ভাব ঘটলেই সে এই বিশেষ অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। বাবার অন্তরের কথা যাই হোক্ না কেন, নিরপেক্ষতার ব্যাপারে বাবাকে এতই কঠোর মনে হত যে বড়দের পক্ষেও বিচার করা কঠিন ছিল বাবা কাকে বেশী ভালোবাসেন। আর মা? যদিও তিনি অনেক বেশী স্নেহশীলা ছিলেন এবং কখন কখন তাঁর দুর্বলতা চোখে পড়ত না এমন নয়, তবু বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই তাঁকে সমীহ করে চলত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনিই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন এবং পারিবারিক ব্যাপারে সাধারণত তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। এক প্রবল ইচ্ছাশক্তির তিনি অধিকারিণী ছিলেন, আর তার সঙ্গে তীব্র বাস্তবতাবোধ ও গভীর বিবেচনাশক্তি যুক্ত থাকায় সাংসারিক বিষয়ে তিনি কি কর্তৃত্ব বিস্তার করতেন তা সহজেই অনুমেয়। শৈশব থেকে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করলেও তাঁদের সঙ্গ আরও ঘনিষ্ঠভাবে লাভ করার জন্য আমার মনে তীব্র ইচ্ছা জাগত এবং সেইসব ছেলে-মেয়েকে, যাদের সৌভাগ্যবশত বাবা-মা'র সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ঘটেছে, তাদের ঈর্ষা না করে থাকতে পারতাম না। আমার স্পর্শকাতর ও আবেগপূর্ণ স্বভাবের জন্যই বোধহয় এরকম ইচ্ছা মনে জাগত।

বাবা-মা'র সঙ্গে এই অস্বাভাবিক ভীতিপূর্ণ সম্পর্কটাই একমাত্র দুঃখজনক ব্যাপার ছিল না। আমার উপরে এতগুলি ভাই ও বোনের উপস্থিতির ফলে নিজেকে একেবারেই তুচ্ছ বলে বোধ হত। এতে বোধহয় ভালোই হয়েছিল। আমার উপরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সমান যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, এরকম একটা ধারণা নিয়ে ভয়ে ভয়ে জীবন শুরু করে-ছিলাম। ভালো হোক্ বা মন্দ হোক্, অত্যধিক আত্মবিশ্বাস বা আত্মাভিমান আমার মধ্যে ছিল না। আমি কোন জন্মগত প্রতিভা লাভ করিনি; তবে কঠিন পরিশ্রম করতে কখনও পিছপা'ও হতাম না। আমার বিশ্বাস, আমার অবচেতনমনে এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে কেবলমাত্র পরিশ্রম ও পরিশীলিত আচরণের দ্বারাই সাধারণ গুণসম্পন্ন মানুষ জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে।

বৃহৎ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার অসুবিধা অনেক। শৈশবে যে বিশেষ যত্নের একান্ত প্রয়োজন তা লাভ করা যায় না। তার উপর, ভীড়ের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়; ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, আত্মকেন্দ্রিকতা ও কুনো স্বভাবের পরিবর্তে সমাজের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করার একটা প্রবণতা গড়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকে শুধু নিজের অনেক ভাইবোনের মধ্যেই আমি মানুষ হয়ে উঠিনি; মামা, জ্যাঠা এবং মামাতো ও পিসতুতো ভাইবোনেদের সঙ্গে একত্রে বাস করার মত এক জীবনধারায়ও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কাজেই, 'পরিবার' কথাটির মধ্যে যে অর্থ নিহিত আছে তা আপনা থেকেই ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া, দেশ থেকে যে সব দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসতেন তাঁদের জন্যও আমাদের বাড়িতে অবারিত দ্বার ছিল। দীর্ঘ-কাল ধরে চলতি ভারতীয় প্রথানুসারে, কটক শহরে সম্ভ্রান্ত কোন অতিথি আগমন করলেই, তাঁর সঙ্গে পরিচয়পত্র থাক্ আর নাই থাক্, আশ্রয়লাভের ভরসায় সোজা তিনি আমাদের বাড়ীতে চলে আসতেন। যেখানে হোটেলে বাস করার তেমন রীতি নেই, ভালো হোটেলও নেই, সেখানে সামাজিক প্রয়োজনেই যে কোন প্রকারের একটা ব্যবস্থা সমাজকে করে নিতে হয়।

আমাদের পরিবারের বিরাটত্বের কারণ শুধু তার আয়তনের জন্যই নয়, পোষ্য ও ভৃত্যের সংখ্যাও ছিল প্রচুর; আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাণিজগতের প্রতিনিধি—গরু,

ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া' হরিণ, ময়ূর, পাখী, বেজি ইত্যাদি। ভৃত্যদের নিয়ে ছিল নিজস্ব এক জগৎ; তাদের পরিবারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ধরা হত। তাদের অনেকে আমার জন্মের বহু আগে থেকেই কাজ করে আসছিল এবং কাউকে কাউকে (যেমন সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধা দাসী) আমরা সকলে সমীহ করে চলতাম।[১] ব্যবসায়ীসুলভ মনোবৃত্তি এসে তখনও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়নি; ফলে ভৃত্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট নিবিড়। শৈশবের এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে ভৃত্যশ্রেণী সম্পর্কে আমার মনোভাব গঠনে সহায্য করেছে।

পারিবারিক এই আবহাওয়ায় স্বভাবতই আমার মনের প্রসার ঘটেছিল; তবু তা আমার মুখচোরা লাজুক স্বভাবটি ছাড়তে পারেনি। পরবর্তী জীবনে এই স্বভাব বহু বছর ধরে আমাকে পীড়া দিয়েছে, এবং সন্দেহ হয়, এখনও আমি তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি কি না। আমি বোধহয় অন্তর্মুখী ছিলাম এবং এখনও তাই আছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পারিবারিক ইতিহাস*

আমাদের পরিবারের ইতিহাস প্রায় ২৭ পুরুষ পর্যন্ত জানা যায়। বসুরা[২] জাতিতে কায়স্থ[৩]। বসুদের দক্ষিণ-রাঢ়ী[৪] গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক দশরথ বসু; কৃষ্ণ ও পরম নামে তাঁর দুই পুত্র ছিল। পরম পূর্ববঙ্গে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন, আর কৃষ্ণ পশ্চিমবঙ্গেই থেকে যান। দশরথের এক প্র-প্রপৌত্র মুক্তি বসু কলকাতা থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণে মাহীনগর গ্রামে বাস করতেন, আর সেই থেকেই এই পরিবার মাহীনগরের[৫] বসু পরিবার নামে খ্যাত হয়ে আসছে। দশরথ থেকে শুরু করে একাদশ বংশধর মহীপতি; অসাধারণ বুদ্ধি ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন তিনি। বাঙ্গলার তদানীন্তন শাসকের নজরে পড়ায় তিনি তাঁকে অর্থ ও যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর কাজকর্মে খুশী হয়ে মুসলিম ধর্মাবলম্বী রাজা তাঁকে 'সুবুদ্ধি খাঁ'[৬] উপাধিতে ভূষিত করেন। তখনকার দিনের যেমন প্রথা ছিল, তদনুসারে মহীপতিও রাজানুগ্রহের নিদর্শন-স্বরূপ 'জায়গীর' (ভূসম্পত্তি) প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং মাহীনগর থেকে অনতিদূরে সুবুদ্ধি-পুর গ্রামে সম্ভবতঃ তাঁর জায়গীর ছিল। মহীপতির দশটি পুত্রের মধ্যে চতুর্থ ঈশান খাঁ খ্যাতিলাভ করেন এবং রাজসভায় পিতার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হন। ঈশান খাঁর তিন পুত্র ছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই রাজার কাছ থেকে উপাধি লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়পুত্র গোপীনাথ বসুও অসামান্য যোগ্যতা ও পৌরুষের অধিকারী ছিলেন এবং তদানীন্তন রাজা সুলতান হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) কর্তৃক অর্থমন্ত্রী ও নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত হন। তিনিও 'পুরন্দর খাঁ' উপাধির দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তাঁর নিজ গ্রাম মাহীনগর থেকে অনতিদূরে পুরন্দরপুর নামে এখন যে গ্রাম আছে, সেটি তিনি জায়গীর হিসেবে লাভ করেন। পুরন্দর খাঁ এক মাইল লম্বা একটি দীঘি কাটিয়ে দিয়েছিলেন, যার ধ্বংসা-বশেষ 'খান পুকুর' নামে এখনও পুরন্দরপুরে দেখতে পাওয়া যায়। মাহীনগরের কাছে পুরন্দরের যে বাগান ছিল সেখানেই গড়ে উঠেছে মালঞ্চ গ্রাম।

---

[১] তাদের কেউ কেউ পরে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছে ও পেন্সান ভোগ করছে; কেউ কেউ মারা গেছে।

*এখানে লিপিবদ্ধ কোনও কোনও তথ্যের জন্য বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসুর কাছে আমি ঋণী। (বাঙ্গলা মাসিক পত্র কায়স্থ পত্রিকার ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত পুরন্দর খাঁ সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

[২] সংস্কৃত ভাষায় মূল শব্দটি বসু বা Vasu, বাঙ্গলা কথ্য ভাষায় Vasu বোস হয়েছে।

[৩] কায়স্থরা মনে করে গোড়ায় তারা ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ যোদ্ধৃশ্রেণী) ছাড়া আর কিছু ছিল না। প্রচলিত রীতি অনুসারে কায়স্থদের (তথাকথিত) উচ্চবর্ণের জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়।

[৪] দক্ষিণ-রাঢ়ী বলতে সম্ভবত 'দক্ষিণ-বাঙ্গলা' বোঝায়।

[৫] কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড হারবারের রেলপথে চিংড়িপোতা স্টেশন হয়ে মাহীনগরে যাওয়া যায়।

[৬] এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বাঙ্গলার মুসলিম শাসকেরা তাঁদের উপাধিতে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতেন। 'খাঁ' অবশ্য খাঁটি মুসলিম উপাধি।

তখনকার দিনে মাহীনগরের কাছে দিয়েই হুগলী নদী প্রবাহিত ছিল এবং কথিত আছে যে, বাঙলার তৎকালীন রাজধানী গৌড় থেকে নৌকাযোগেই পুরন্দর যাতায়াত করতেন। তিনি এক শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করে তার সেনাপতি হন; এই বাহিনী বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে এই রাজ্যকে রক্ষা করেছিল।

সমাজ সংস্কারক হিসাবেও পুরন্দরের খ্যাতি ছিল। তাঁর আগে প্রচলিত বল্লালী প্রথানুসারে কায়স্থের দুটি শাখা—কুলীন (যারা শ্রেষ্ঠ বর্ণের লোক, যেমন—বসু, ঘোষ ও মিত্র) ও মৌলিক (দত্ত, দে, রায় ইত্যাদি)—এদের পরস্পরের মধ্যে সচরাচর বিবাহাদি চলত না। পুরন্দর এই রকম এক নতুন নিয়ম[1] চালু করেন যে, কুলীনের প্রথম সন্তানের বিবাহ কুলীন পরিবারে দিতে হবে, আর অন্যান্য সকলের বিবাহ মৌলিকের সঙ্গে হতে পারবে।

এই নিয়ম অদ্যাবধি প্রায় সকলে মেনে আসছে এবং অত্যধিক অন্তর্বিবাহের ফল-স্বরূপ, আসন্ন বিপদ থেকে কায়স্থ জাতিকে ইহা রক্ষা করেছে।

পুরন্দর পণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন। বৈষ্ণবদের ভক্তিমূলক সঙ্গীত পদাবলী রচয়িতাদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়।

কবিরামের 'রায়মঙ্গলের' মত কিছু কিছু বাঙলা কবিতায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রায় দুশো বছর আগে মাহীনগর ও তার সংলগ্ন গ্রামগুলির কাছ দিয়েই হুগলী (বাঙলায় যাকে গঙ্গা বলা হয়) প্রবাহিত ছিল। (এখনও লৌকিক রীতি অনুযায়ী গঙ্গার পূর্বতন গর্ভে যে সমস্ত পুকুর আছে তাদের গঙ্গা বলা হয়; যেমন—বোসের গঙ্গা, যার অর্থ বোসের পুকুর)। নদীগর্ভ সরে যাওয়ায় এই সব গ্রামের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিকে চরম আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। গ্রামাঞ্চলে নদীপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটায় মহামারী দেখা দেয়, ফলে অনেক লোকই গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। বসু পরিবারের একটি শাখা—পুরন্দর খাঁর নিজের বংশধরেরাও সন্নিহিত গ্রাম কোদালিয়ায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিছুকাল অপেক্ষাকৃত চুপচাপ থাকার পর কোদালিয়া, চিংড়িপোতা, হরিণাভি, মালঞ্চ, রাজপুর ইত্যাদি গ্রামের সঙ্গে সমগ্র অঞ্চল আবার কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশক থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে শেষ পর্যন্ত এখানে একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল; তারপর আবার গ্রামাঞ্চল মহামারীর প্রকোপে নষ্ট হয়ে যায়। এইবার ম্যালেরিয়া প্রকট আকার ধারণ করে। যদি কেউ আজ এই সব পরিত্যক্ত গ্রামগুলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে যান, তাহলে বন্যলতাগুল্মে আচ্ছাদিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নদশা তাঁর চোখে পড়বে, আর এ থেকেই তিনি অনুমান করতে পারবেন যে, অল্প কিছুদিন আগেও এ অঞ্চলে কি পরিমাণ সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছিল। প্রায় একশো বছর আগে এখানে যে সব পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষায় শিক্ষিত, অথচ তাঁরা কোনদিক থেকেই প্রগতিবিরোধী ছিলেন না। তাঁদের কেউ কেউ ব্রাহ্ম সমাজের প্রবক্তা ছিলেন, সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করলে এই সমাজ তখন বৈপ্লবিক এক সংস্থারূপেই পরিগণিত হত। কেউ কেউ আবার বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত উদার মতাবলম্বী পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন; এই সব পত্রিকা নতুন বাঙলা সাহিত্যের জন্মদানে ও তৎকালীন জন-জীবনের নানা বিষয়ের উপর প্রভাব রচনায় এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সেকালে 'তত্ত্ববোধিনী' ছিল প্রভাবশালী পত্রিকা, একে ব্রাহ্ম সমাজের প্রবক্তাও বলা যেতে পারে। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ছিলেন এর সম্পাদক। পণ্ডিত দ্বারকা-নাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদনা করতেন সোমপ্রকাশ, বাঙলা ভাষায় সম্ভবত, এটিই সর্বপ্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন তাঁর অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র। হিন্দু আইন, বিশেষত 'দায় ভাগ' বলে যে আইন বাঙলা দেশে প্রচলিত আছে, ভারতচন্দ্র শিরোমণি সে বিষয়ে একজন অন্যতম বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শিল্পী-

---

[1] অসবর্ণ বিবাহ গত ৫০ বছর ধরে চলে আসছে এবং তার ফলে জাতিভেদ সম্বন্ধে যে সব বিধি-নিষেধ ছিল তার কঠোরতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু পুরন্দরের সময়ে এটি একটি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বলেই গণ্য হয়েছিল। যে উচ্চ পদে তিনি আসীন ছিলেন ও সামাজিক ও জনজীবনে তাঁর যেরূপ প্রভাব ছিল, তার ফলেই তাঁর এই সংস্কার আন্দোলন সফল হয়েছিল। কথিত আছে যে এই নতন নিয়ম মেনে নেবার জন্য তিনি তাঁর স্বগ্রামে এক লক্ষেরও উপর কায়স্থকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই উপলক্ষেই এই বিশাল জনমণ্ডলীকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে 'খান পুকুর' কাটানো হয়।

দের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে বিখ্যাত চিত্রকর কালীকুমার চক্রবর্তীর নাম। সঙ্গীতজ্ঞ-দের মধ্যে ছিলেন অঘোর চক্রবর্তী ও কালীপ্রসন্ন বসু। শেষ কয়েকটি দশকে এই অঞ্চল জাতীয় আন্দোলনেও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। হরিকুমার চক্রবর্তী ও সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি ১৯৩৬ সালে দেউলি বন্দী শিবিরে প্রাণত্যাগ করেন), এঁদের মত প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা ও কমরেড এম এন রায়-এর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন পুরুষও এখানেই জন্মগ্রহণ করেন।

আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলতে হয় যে, বসু বংশের যাঁরা কোদালিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা সেখানে অন্ততঃ দশ পুরুষ ধরে বাস করছেন, কেননা তাঁদের বংশানুক্রমিক তালিকা পাওয়া যায়।[১] পুরন্দর খাঁ থেকে হিসেব করলে আমার বাবা ত্রয়োদশ ও দশরথ বসু থেকে ষষ্ঠবিংশতি পুরুষ। আমার পিতামহ ছিলেন হরনাথ। তাঁর চার পুত্র—যদুনাথ, কেদারনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও আমার বাবা জানকীনাথ। ঐতিহ্যানুসারে আমাদের পরিবার যদিও শাক্ত[২]-মতাবলম্বী ছিল, হরনাথ কিন্তু ছিলেন ধার্মিক ও একান্ত-নিষ্ঠ বৈষ্ণব। দুর্গাপুজো বাঙ্গালী হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, এবং প্রতিবছর আমাদের বাড়িতে জাঁকজমকের সঙ্গে এই পুজো অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু হরনাথ ছিলেন অহিংস-স্বভাব বৈষ্ণব। তাই তিনি বাৎসরিক দুর্গাপুজোয় (মাতৃমূর্তিতে শক্তির উপাসনা) প্রচলিত পাঁঠা বলি বন্ধ করে দেন। এই নতুন নিয়ম আজও বর্তমান, তবে ঐ একই গ্রামে বসবাস-কারী বসু পরিবারের অপর একটি শাখা এখনও সম্বৎসর পুজোয় পাঁঠা বলির ব্যবস্থা করে থাকে।

হরনাথের চারপুত্র ভাগ্যান্বেষণে বিভিন্ন স্থানে চলে যান। জ্যেষ্ঠ যদুনাথ ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতেন; তাই জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে সিমলায় কাটাতে হয়েছে। দ্বিতীয়, কেদারনাথ, কলকাতায় গিয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হন। তৃতীয়, দেবেন্দ্রনাথ, সরকারী শিক্ষা দপ্তরের চাকরী গ্রহণ করে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হয়েছিলেন; তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত এবং অবসর গ্রহণের পর তিনিও পাকাপাকিভাবে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন।

আমার বাবা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন আর আমার মা, ১৮৬৯[৩] খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতার এলবার্ট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (তখন এনট্রান্স বলা হত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কিছুকাল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও জেনারেল এসেমব্লিস্ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমানে যার নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) পড়াশুনা করেন। তারপর কটকে গিয়ে র‍্যাভেনশ কলেজের স্নাতক হন। আইন পরীক্ষা দেবার জন্য তাঁকে এরপর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়। এই সময়েই তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র সেন, তাঁর ভাই কৃষ্ণবিহারী সেন ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্তের মত ব্রাহ্ম-সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। রেক্টর কৃষ্ণবিহারী সেনের এলবার্ট কলেজে তিনি কিছুদিন অধ্যাপনার কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কটকে ফিরে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০১ সালে কটক মিউনিসিপ্যালিটির তিনিই প্রথম নির্বাচিত বেসরকারী চেয়ারম্যান। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি Government Pleader ও Public Prosecutor-এর পদ লাভ করেছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন ও রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। জেলা শাসকের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে মতবিরোধ ঘটায় ১৯১৭ সালে তিনি উভয় পদেই ইস্তফা দেন, আর এর তেরো বছর পরে, ১৯৩০-এ তিনি সরকারী দমননীতির প্রতিবাদস্বরূপ রায়বাহাদুর উপাধিও বর্জন করেন।

মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মতন জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই

[১] পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য।

[২] বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে মোটামুটি দুটি শাখা বা সম্প্রদায়—শাক্ত ও বৈষ্ণব। শাক্তরা মাতৃরূপে শক্তির উপাসক। বৈষ্ণবগণ পিতা বা রক্ষকরূপে দেবতাকে কল্পনা করে বাৎসল্যের পুজারী। দীক্ষার সময়েই এই পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়। শাক্তগণ 'গুরু' বা আচার্যের কাছ থেকে যে 'মন্ত্র' বা 'পবিত্র শব্দ' লাভ করেন, বৈষ্ণবদের গুরুর কাছে দীক্ষালব্ধ মন্ত্র তা থেকে পৃথক। বংশপরম্পরায় বিশেষ একটি ধারা অনুসরণ করাই পারিবারিক রীতি; তবে এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হওয়ার পথে কোন বাধা নেই।

[৩] ঠিক করে বলতে গেলে, ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুন তাঁর জন্ম হয়। ১৩৪৪-এর ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর সমতুল।

যে তিনি শুধু জড়িত ছিলেন এমন নয়, ভিক্টোরিয়া স্কুল ও কটক ইউনিয়ন ক্লাবের মত শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয়। তাঁর দান-ধ্যানও কম ছিল না, দরিদ্র ছাত্রেরা সাহায্যের আশায় নিয়মিত তাঁর কাছে আসত। যদিও তার দানের বেশীর ভাগটাই যেত উড়িষ্যায়, তবু নিজ বাসভূমির কথা তিনি বিস্মৃত হননি। সেখানে বাবা ও মা-এর নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাঠাগার তৈরী করিয়েছিলেন। স্বদেশীর[1] প্রতিও তাঁর দৃঢ় সমর্থন ছিল, এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিটি বার্ষিক অধিবেশনেই তিনি যোগ দিতেন। তবে সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি কোনদিন অংশ গ্রহণ করেননি। ১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পর কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যসূচী, যেমন খাদি[2] ও জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। বরাবরই তিনি ছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ, এবং দু-দুবার দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন শাক্ত, দ্বিতীয়জন বৈষ্ণব। তিনি কয়েকবছর স্থানীয় Theosophical Lodge -এর সভাপতিও হয়েছিলেন। দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্যও তাঁর হৃদয়ে কোমল একটা স্থান ছিল, সেজন্য মৃত্যুর আগে পুরোনো ভৃত্য ও অন্যান্য পোষ্যদের ভরণপোষণের জন্য তিনি ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি, আমার মা-এর জন্ম হাটখোলার দত্ত পরিবারে। হাটখোলা কলকাতার উত্তরে। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে কলকাতার যে-সমস্ত পরিবার ঐশ্বর্যের জন্য এবং নবসৃষ্ট শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার সুবাদে প্রভূত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, দত্ত পরিবার তাদের অন্যতম। এর ফলে সেকালে নব্য অভিজাত-মহলেও তাঁদের স্বীকৃতি ছিল। আমার প্র-মাতামহ, কাশীনাথ দত্ত, নিজের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যান এবং কলকাতার প্রায় ছ' মাইল উত্তরে ছোট শহর বরাহনগরে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি ছিলেন যথেষ্ট সুশিক্ষিত; অত্যুৎসাহী পাঠক ও ছাত্র-সমাজের বন্ধু। কলকাতার ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান মেসার্স জার্ডিন স্কীনার এন্ড কোম্পানীতে অফিস-পরিচালনা সংক্রান্ত এক উচ্চ-পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। জামাতা নির্বাচনের ব্যাপারে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়ে আমার মাতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্ত ও প্র-মাতামহ, উভয়েই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফলে, তখনকার দিনে কলকাতার প্রধান প্রধান অভিজাত পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র[3] ছিলেন কাশীনাথ দত্তের অন্যতম জামাতা; তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি কলকাতা হাইকোর্টে অস্থায়ী প্রধান-বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। অপর একজন রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু। তিনি আমার বাবার আগেই কটকে যান এবং ওকালতি করে সমগ্র উড়িষ্যায় এক অনন্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

আমার মাতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্ত সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি নাকি আমার বাবার সঙ্গে আমার মা-এর বিবাহ স্থির করার আগে, বাবার জ্ঞানের পরীক্ষা নেন, এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন। আমার মা ছিলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁর কনিষ্ঠা বোনেদের পর পর যাঁদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে তাঁরা হলেন, ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ স্বর্গতঃ বরদাচন্দ্র মিত্র, আই সি এস, বারাণসীর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু; সাবরডিনেট জজ স্বর্গতঃ চন্দ্রনাথ ঘোষ; এবং কলকাতার স্বর্গতঃ রায়বাহাদুর চুনীলাল বসুর কনিষ্ঠ ভাই স্বর্গতঃ ডাক্তার জে এন বসু।

বংশধারা বিচার করে দেখলে এটা লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, আমার পিত্রালয়ে বৃহৎ পরিবারের অস্তিত্ব কোন সাধারণ রীতি নয়, ব্যতিক্রম মাত্র। অন্যদিকে মাতুলালয়ে বৃহৎ পরিবার স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, কেন না আমার মাতামহ নয় পুত্র ও ছয়[4] কন্যার জনক। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সাধারণতঃ কন্যাদের পরিবারই ছিল বৃহৎ। আমার মা-ও বাদ ছিলেন না। তবে পুত্রদের ক্ষেত্রে সেইরকমটি হয়নি। আমার বাবা-মা-এর আটটি পুত্র ও ছটি[5] কন্যা,

[1] যথা—দেশজ শিল্প।

[2] খাদি বা খদ্দর। হাতে-কাটা সুতোয় তৈরী হাতে বোনা কাপড়।

[3] স্যার রমেশের তিন পুত্র ছিলেন—স্বর্গতঃ মন্মথনাথ, স্যার বিনোদ ও স্যার প্রভাস মিত্র। স্বর্গতঃ স্যার বি. সি. মিত্র বাঙলার এডভোকেট জেনারেল ছিলেন ও পরে প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির সদস্য হন। স্যার প্রভাস মিত্র বাঙলার গভর্নরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন।

[4] বংশতালিকার জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখা যেতে পারে।

[5] পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য।

তাদের মধ্যে নয়জন, সাতপুত্র ও দুই কন্যা বর্তমানে জীবিত। ভাই ও বোনেদের মধ্যে কারও কারও, যদিও বেশীর ভাগের নয়, আট-নয়টি করে সন্তান আছে। কিন্তু একথা বলা সম্ভব নয় যে, ভাইদের অপেক্ষা বোনেদের সন্তানসংখ্যা বেশী, কিংবা তার উল্টো। একথা জানতে ঔৎসুক্য হয় যে, কোনও বিশেষ পরিবারে এই সন্তান লাভের যোগ্যতা নারী বা পুরুষ কার উপর অধিক পরিমাণে বর্তায়। সু-প্রজনন বিজ্ঞানীরাই হয়ত এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমার জন্মের আগে

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজের হাতে চলে যাবার ফলে ভারতীয় সমাজে যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে বর্ণনা করতে গেলে যথেষ্ট কল্পনার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তবুও আজ ভারতবর্ষে যে রকম দ্রুত ও বহুমুখী পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তাকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে এ সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেহেতু বাংলাদেশই প্রথম ইংরেজের অধীনে আসে, তাই তার ফলস্বরূপ পরিবর্তনগুলি অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানেই আরও আগে দেখা যায়। দেশীয় শাসকদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের কেন্দ্র করে যে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তাঁরাও স্বভাবতই নিজেদের প্রাধান্য হারিয়ে ফেলেন। অন্য এক শ্রেণীর লোক এসে তখন তাঁদের স্থান দখল করেন। ইংরেজ এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে, পরে শাসনের সুযোগও তাদের সামনে এসে পড়ে। দেশের অন্তত এক শ্রেণীর লোকের সক্রিয় সহযোগিতা না পাওয়া গেলে, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে ব্যবসা বা দেশ-শাসন কোন কিছুই সম্ভব নয়। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে যাঁরা এই নতুন শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সমতালে চলতে পেরেছিলেন এবং যাঁদের এই নতুন পরিস্থিতিকে সর্বাধিক কাজে লাগাবার মত যথেষ্ট যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতা ছিল, তাঁরাই এ সময়ে অভিজাত শ্রেণী হিসেবে পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

সাধারণত, এই রকম মনে করা হয় যে ইংরেজ-শাসনকালে দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান সম্প্রদায় কোন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেননি, এবং এর কারণ সন্ধান করতে গিয়ে বেশ কয়েকটা তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় যে বাংলার মত প্রদেশগুলিতে যে শাসকগণ ইংরেজ কর্তৃক গদীচ্যুত হন তাঁরা ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী, এবং সেই কারণেই মুসলমান সম্প্রদায় বহুদিন পর্যন্ত এই নতুন শাসকগোষ্ঠী, তাদের সংস্কৃতি ও শাসনব্যবস্থার প্রতি ক্রুদ্ধ আক্রোশ ও অসহযোগিতার মনোভাব পোষণ করে এসেছেন। অন্যদিকে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার ঠিক আগে মুসলমান আভিজাত্য একেবারে জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং ইসলাম প্রথমে ভালভাবে আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অতএব, ইংরেজ শাসনে মুসলমানগণ যে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে এবং কিছুকালের জন্য হলেও পিছিয়ে পড়বে, একথা খুবই স্বাভাবিক। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এই যে, সমগ্র ভারতবর্ষে তাদের সংখ্যার[১] কথা বিচার করলে, ইংরেজ শাসনের পূর্বে বা তাদের শাসনকালে মুসলিমগণ বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। আয়র্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিক-প্রটেস্টান্টের বিরোধের মতন, হিন্দু-মুসলমানের যে পার্থক্যের কথা আজকাল আমরা এত বেশী করে শুনতে পাই, তার অনেকটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এবং এই বিরোধ-রচনায় আমাদের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর হাত আছে। যদি বলি যে, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে মুসলমান আধিপত্যের কথা বলা ভুল হবে, ইতিহাস সেক্ষেত্রে আমাকে সমর্থন জানাবে। দিল্লীর মুঘল বাদশা অথবা

---

[১] ১৯৩১-এর আদম সুমারি অনুসারে, ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যার আনুপাতিক হিসাবে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মোটামুটি শতকরা ২৪.৭ ভাগ, যেখানে ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২৭১.৪ মিলিয়ন। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মোট লোকসংখ্যা ছিল ৭৯ মিলিয়ন, তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা মোটামুটি শতকরা ১৩.৫ ভাগ; আর ভারতের মোট জনসংখ্যা ৩৫০.৫ মিলিয়নের মধ্যে মুসলমান ছিল মোটামুটি শতকরা ২২ ভাগ।

যে তিনি শুধু জড়িত ছিলেন এমন নয়, ভিক্টোরিয়া স্কুল ও কটক ইউনিয়ন ক্লাবের মত শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয়। তাঁর দান-ধ্যানও কম ছিল না, দরিদ্র ছাত্রেরা সাহায্যের আশায় নিয়মিত তাঁর কাছে আসত। যদিও তার দানের বেশীর ভাগটাই যেত উড়িষ্যায়, তবু নিজ বাসভূমির কথা তিনি বিস্মৃত হননি। সেখানে বাবা ও মা-এর নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাঠাগার তৈরী করিয়েছিলেন। স্বদেশীর[1] প্রতিও তাঁর দৃঢ় সমর্থন ছিল, এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিটি বার্ষিক অধিবেশনেই তিনি যোগ দিতেন। তবে সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি কোনদিন অংশ গ্রহণ করেননি। ১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পর কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যসূচী, যেমন খাদি[2] ও জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। বরাবরই তিনি ছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ, এবং দু-দুবার দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন শাক্ত, দ্বিতীয়জন বৈষ্ণব। তিনি কয়েকবছর স্থানীয় Theosophical Lodge -এর সভাপতিও হয়েছিলেন। দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্যও তাঁর হৃদয়ে কোমল একটা স্থান ছিল, সেজন্য মৃত্যুর আগে পুরোনো ভৃত্য ও অন্যান্য পোষ্যদের ভরণপোষণের জন্য তিনি ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি, আমার মা-এর জন্ম হাটখোলার দত্ত পরিবারে। হাটখোলা কলকাতার উত্তরে। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে কলকাতার যে-সমস্ত পরিবার ঐশ্বর্যের জন্য এবং নবসৃষ্ট শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার সুবাদে প্রভূত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, দত্ত পরিবার তাদের অন্যতম। এর ফলে সেকালে নব্য অভিজাত-মহলেও তাঁদের স্বীকৃতি ছিল। আমার প্র-মাতামহ, কাশীনাথ দত্ত, নিজের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যান এবং কলকাতার প্রায় ছ' মাইল উত্তরে ছোট শহর বরাহনগরে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি ছিলেন যথেষ্ট সুশিক্ষিত; অত্যুৎসাহী পাঠক ও ছাত্র-সমাজের বন্ধু। কলকাতার ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান মেসার্স জার্ডিন স্কীনার এণ্ড কোম্পানীতে অফিস-পরিচালনা সংক্রান্ত এক উচ্চ-পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। জামাতা নির্বাচনের ব্যাপারে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়ে আমার মাতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্ত ও প্র-মাতামহ, উভয়েই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফলে, তখনকার দিনে কলকাতার প্রধান প্রধান অভিজাত পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র[3] ছিলেন কাশীনাথ দত্তের অন্যতম জামাতা; তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি কলকাতা হাইকোর্টে অস্থায়ী প্রধান-বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। অপর একজন রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু। তিনি আমার বাবার আগেই কটকে যান এবং ওকালতি করে সমগ্র উড়িষ্যায় এক অনন্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

আমার মাতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্ত সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি নাকি আমার বাবার সঙ্গে আমার মা-এর বিবাহ স্থির করার আগে, বাবার জ্ঞানের পরীক্ষা নেন, এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন। আমার মা ছিলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁর কনিষ্ঠা বোনেদের পর পর যাঁদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে তাঁরা হলেন, ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ স্বর্গতঃ বরদাচন্দ্র মিত্র, আই সি এস, বারাণসীর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু; সাবরডিনেট জজ স্বর্গতঃ চন্দ্রনাথ ঘোষ; এবং কলকাতার স্বর্গতঃ রায়বাহাদুর চুনীলাল বসুর কনিষ্ঠ ভাই স্বর্গতঃ ডাক্তার জে এন বসু।

বংশধারা বিচার করে দেখলে এটা লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, আমার পিত্রালয়ে বৃহৎ পরিবারের অস্তিত্ব কোন সাধারণ রীতি নয়, ব্যতিক্রম মাত্র। অন্যদিকে মাতুলালয়ে বৃহৎ পরিবার স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, কেন না আমার মাতামহ নয় পুত্র ও ছয়[4] কন্যার জনক। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সাধারণতঃ কন্যাদের পরিবারই ছিল বৃহৎ। আমার মা-ও বাদ ছিলেন না। তবে পুত্রদের ক্ষেত্রে সেইরকমটি হয়নি। আমার বাবা-মা-এর আটটি পুত্র ও ছটি[5] কন্যা,

[1] যথা—দেশজ শিল্প।

[2] খাদি বা খদ্দর। হাতে-কাটা সুতোয় তৈরী হাতে বোনা কাপড়।

[3] স্যার রমেশের তিন পুত্র ছিলেন—স্বর্গতঃ মন্মথনাথ, স্যার বিনোদ ও স্যার প্রভাস মিত্র। স্বর্গতঃ স্যার বি. সি. মিত্র বাঙলার এডভোকেট জেনারেল ছিলেন ও পরে প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির সদস্য হন। স্যার প্রভাস মিত্র বাঙলার গভর্নরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন।

[4] বংশতালিকার জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখা যেতে পারে।

[5] পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য।

তাদের মধ্যে নয়জন, সাতপুত্র ও দুই কন্যা বর্তমানে জীবিত। ভাই ও বোনেদের মধ্যে কারও কারও, যদিও বেশীর ভাগের নয়, আট-নয়টি করে সন্তান আছে। কিন্তু একথা বলা সম্ভব নয় যে, ভাইদের অপেক্ষা বোনেদের সন্তানসংখ্যা বেশী, কিংবা তার উল্টো। একথা জানতে ঔৎসুক্য হয় যে, কোনও বিশেষ পরিবারে এই সন্তান লাভের যোগ্যতা নারী বা পুরুষ কার উপর অধিক পরিমাণে বর্তায়। সু-প্রজনন বিজ্ঞানীরাই হয়ত এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমার জন্মের আগে

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজের হাতে চলে যাবার ফলে ভারতীয় সমাজে যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে বর্ণনা করতে গেলে যথেষ্ট কল্পনার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তবুও আজ ভারতবর্ষে যে রকম দ্রুত ও বহুমুখী পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তাকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে এ সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেহেতু বাঙলাদেশই প্রথম ইংরেজের অধীনে আসে, তাই তার ফলস্বরূপ পরিবর্তনগুলি অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানেই আরও আগে দেখা যায়। দেশীয় শাসকদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের কেন্দ্র করে যে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তাঁরাও স্বভাবতই নিজেদের প্রাধান্য হারিয়ে ফেলেন। অন্য এক শ্রেণীর লোক এসে তখন তাঁদের স্থান দখল করেন। ইংরেজ এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে, পরে শাসনের সুযোগও তাদের সামনে এসে পড়ে। দেশের অন্তত এক শ্রেণীর লোকের সক্রিয় সহযোগিতা না পাওয়া গেলে, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে ব্যবসা বা দেশ-শাসন কোন কিছুই সম্ভব নয়। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে যাঁরা এই নতুন শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সমতালে চলতে পেরেছিলেন এবং যাঁদের এই নতুন পরিস্থিতিকে সর্বাধিক কাজে লাগাবার মত যথেষ্ট যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতা ছিল, তাঁরাই এ সময়ে অভিজাত শ্রেণী হিসেবে পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

সাধারণত, এই রকম মনে করা হয় যে ইংরেজ-শাসনকালে দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান সম্প্রদায় কোন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেননি, এবং এর কারণ সন্ধান করতে গিয়ে বেশ কয়েকটা তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় যে বাঙলার মত প্রদেশগুলিতে যে শাসকগণ ইংরেজ কর্তৃক গদীচ্যুত হন তাঁরা ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী, এবং সেই কারণেই মুসলমান সম্প্রদায় বহুদিন পর্যন্ত এই নতুন শাসকগোষ্ঠী, তাদের সংস্কৃতি ও শাসনব্যবস্থার প্রতি ক্রুদ্ধ আক্রোশ ও অসহযোগিতার মনোভাব পোষণ করে এসেছেন। অন্যদিকে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার ঠিক আগে মুসলমান আভিজাত্য একেবারে জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং ইসলাম প্রথমে ভালভাবে আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অতএব, ইংরেজ শাসনে মুসলমানগণ যে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে এবং কিছুকালের জন্য হলেও পিছিয়ে পড়বে, একথা খুবই স্বাভাবিক। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এই যে, সমগ্র ভারতবর্ষে তাদের সংখ্যার[১] কথা বিচার করলে, ইংরেজ শাসনের পূর্বে বা তাদের শাসনকালে মুসলিমগণ বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। আয়র্ল্যান্ডের ক্যাথলিক-প্রটেস্টান্টের বিরোধের মতন, হিন্দু-মুসলমানের যে পার্থক্যের কথা আজকাল আমরা এত বেশী করে শুনতে পাই, তার অনেকটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এবং এই বিরোধ-রচনায় আমাদের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর হাত আছে। যদি বলি যে, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে মুসলমান আধিপত্যের কথা বলা ভুল হবে, ইতিহাস সেক্ষেত্রে আমাকে সমর্থন জানাবে। দিল্লীর মুঘল বাদশা অথবা

---

[১] ১৯৩১-এর আদম সুমারি অনুসারে, ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যার আনুপাতিক হিসাবে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মোটামুটি শতকরা ২৪.৭ ভাগ, যেখানে ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২৭১.৪ মিলিয়ন। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মোট লোকসংখ্যা ছিল ৭৯ মিলিয়ন, তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা মোটামুটি শতকরা ১৩.৫ ভাগ; আর ভারতের মোট জনসংখ্যা ৩৫০.৫ মিলিয়নের মধ্যে মুসলমান ছিল মোটামুটি শতকরা ২২ ভাগ।

বাঙ্গলার মুসলমান নৃপতিবৃন্দ, যাঁদের কথাই ধরা হোক না কেন, দেখা যাবে যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই শাসন-পরিচালনায় হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে কাজ করেছে। বিখ্যাত মন্ত্রী ও সেনাপতিদের মধ্যেও অনেক হিন্দু ছিলেন। উপরন্তু, ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতির মূলে ছিল হিন্দুপ্রধান সেনাপতিদের অবদান। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে সিরাজউদ্দৌলার যে প্রধান সেনাপতি পরাজিত হন, তিনি ছিলেন একজন হিন্দু। এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের যে বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান ইংরেজদের বিরুদ্ধে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল, তা পরিচালিত হয় বাহাদুর শাহ নামে একজন মুসলমানের নেতৃত্বেই।

তবুও কারণ যাই হোক না কেন, বাঙ্গলা দেশের কথা বলতে গেলে একথা সত্য যে, ইংরেজ জয়ের অব্যবহিত পরে এখানে যে সমস্ত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), যিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ[১] প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতকের প্রত্যুষে দেশে এক নবজাগরণ দেখা গিয়েছিল। প্রকৃতিতে, এই জাগরণ ছিল সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধীয়, আর ব্রাহ্মসমাজ ছিল এর পুরোধা। এই জাগরণকে ইউরোপের Renaissance & Reformation-এর এক সংমিশ্রণের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এর একদিক ছিল জাতীয় ও রক্ষণশীল—ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও ধর্মসংস্কারই ছিল এর উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, একে বিশ্বজনীন ও সারগ্রাহী বলা যায়, অর্থাৎ অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির যা কিছু ভাল ও কল্যাণকর, তা গ্রহণ করার জন্য ইহা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই নবজাগরণের জীবন্ত-প্রতিমূর্তি ছিলেন রামমোহন। ভারতের ইতিহাসে তিনি এক নবযুগের অগ্রদূত। তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন যথাক্রমে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা, 'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৮-১৯০৫) ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এক সময় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দেশের সব প্রগতিমূলক আন্দোলন ও ভাবধারাসমূহ প্রতিফলিত হয়েছিল। একেবারে গোড়া থেকেই ব্রাহ্মসমাজের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা গিয়েছিল পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার প্রভাব। আর সেজন্যই যখন নবসৃষ্ট ইংরেজ সরকার তাদের শিক্ষানীতি কি হবে—শুধু মাত্র দেশীয় শিক্ষার উন্নতিসাধন অথবা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তন—এ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তখন রাজা রামমোহন রায়ই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার একজন অগ্রনায়ক হিসাবে তার প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন জানিয়েছিলেন। শিক্ষা[২] সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত 'Minute' রচনার সময়, টমাস বেবিংটন মেকলে, রামমোহনের চিন্তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হন, এবং এটিই শেষ পর্যন্ত সরকারের নীতিতে পরিণত হয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রামমোহন তাঁর যে কোন স্বদেশবাসীর বহু আগেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতকে তার স্বমহিমায় পুনঃস্থাপিত করতে হলে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা গ্রহণ না করে উপায় নেই।

এই সাংস্কৃতিক জাগরণ কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এমন কি যাঁরা ব্রাহ্মদের খুব বেশী নাস্তিক, বিপ্লববাদী, বা পৌত্তলিকতাবিরোধী বলে মনে করতেন তাঁরাও ভারতবর্ষের দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির যত কিছু ভাল তা গ্রহণ করার চেষ্টায় ব্রাহ্মরা ও অন্যান্য প্রগতিপন্থীরা যখন পশ্চিমের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, হিন্দু সমাজের অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মহল তখন, যা চলে আসছিল তা সমর্থন করে প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন যে, পশ্চিমের সমস্ত আবিষ্কার ও সৃষ্টি ভারতের প্রাচীন ঋষিদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। এইভাবে পশ্চিমের আঘাত এসে পড়ায় গোঁড়া মহলেরও আত্মসন্তুষ্টির

---

[১] ব্রাহ্মসমাজের সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয় যে ইহা হিন্দু-সমাজের অভ্যন্তরের এক সংস্কার আন্দোলন। এই সমাজ বেদান্তের মূল ধর্মীয় সূত্রগুলি মেনে নেয় এবং পরে মূর্তিপূজা ও জাতিভেদের মত যে সমস্ত বিষয় এর সঙ্গে মিশে যায়, সেগুলিকে পরিত্যাগ করে। সুরুতে ব্রাহ্মরা হিন্দু-সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যাবে এইরকম একটা লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা নিজেদের হিন্দুসমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্বীকার করে নেওয়ার মনোভাব দেখিয়ে থাকেন।

[২] মেকলে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে বড়লাটের পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্য হিসাবে কলকাতায় আসেন। জনশিক্ষা বিষয়ে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তিনি তার সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি দেখতে পান যে এই কমিটি প্রাচ্যভাষাপন্থী ও ইংরেজী-সমর্থক, এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ইংরেজী-সমর্থকদের সমর্থন করে তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী বড়লাট বেন্টিঙ্কের কাছে এক Minute পেশ করেন এবং এটি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

ভাব কেটে গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখা গেল এবং আবির্ভাব হল শশধর তর্কচূড়ামণির মত যোগ্য ব্যক্তিদের। কিন্তু হিন্দুধর্মের উপর খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচণ্ড আঘাত প্রতিহত করতেই তাদের শক্তির বেশির ভাগ ব্যয় হয়ে যেতে লাগল। এই ব্যাপারে ব্রাহ্ম ও গোঁড়া পণ্ডিতদের মধ্যে এক সাধারণ মিল ছিল, যদিও অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের সম্পর্ক প্রীতির ছিল না। প্রাচীন ও নবীন, রক্ষণশীল ও গণতন্ত্রবাদী (radical), ব্রাহ্ম ও পণ্ডিত—এঁদের এই পারস্পরিক বিরোধের ফলে জন্ম হল এক নতুন আদর্শের—যার মহত্তম প্রতিরূপ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ভারতীয় আদর্শের এই নতুন চরিত্র-রূপটি প্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। এই ধারা সাধারণভাবে বিদেশে সংস্কারের জন্য যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল, তা মেনে নেয়, কিন্তু হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, কিংবা পশ্চিমকে অতিমাত্রায় অনুকরণ করা ব্রাহ্মদের মধ্যে যে প্রবণতা প্রথমে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তা অস্বীকার করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন নিষ্ঠাবান পণ্ডিতের মতই গড়ে উঠেছিল, তিনি হয়ে ওঠেন আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির নায়ক, শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ও মানবপ্রেমিক।[১] এতৎসত্ত্বেও তিনি নৈষ্ঠিক পণ্ডিতের সহজ ও সরল জীবনটি শেষ পর্যন্ত বজায় রেখে গেছেন। তিনি সাহসের সঙ্গে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ সমর্থন করেছিলেন, আর একাজ করতে গিয়ে রক্ষণশীলদের ক্রোধের সম্মুখীন হন। কিন্তু তাঁর যুক্তির মূলকথা ছিল এই যে, প্রাচীন শাস্ত্রসমূহেও এই প্রথার অনুমোদন আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে যে আদর্শ ফুটে উঠেছিল তাই শেষ পর্যন্ত ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করে রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৪-১৮৮৬) ও তাঁর যোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে। অরবিন্দ রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারেননি, বরং এর গভীরে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন। এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ভারতের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন। তাঁর অন্তরে রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলন ঘটেছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে শুধুমাত্র ধর্মসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন; কিন্তু রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার একাত্মতা অক্ষুন্ন থাকে লোকমান্য বি জি তিলক (১৮৫৬-১৯২০) ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনে।

সংক্ষেপে যা বললাম, তা এই বই-এর আলোচ্য-বিষয়ের মোটামুটি একটা পটভূমিকা হিসাবে কাজ দেবে এবং আমার পিতা যখন কলকাতার এলবার্ট স্কুলের[২] ছাত্র ছিলেন, তখনকার সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কেও কিছু ধারণা জন্মাবে। ইংরেজ শাসনের পাশাপাশি সমাজে তখন নতুন এক অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা গিয়েছে, যাকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এখন আমরা ব্রিটিশ 'সাম্রাজ্যবাদের' মিত্র শ্রেণী বলে চিহ্নিত করতে পারি। মোটামুটি তিন শ্রেণীর বা পেশার লোক নিয়ে এই অভিজাত শ্রেণী গঠিত হয়েছিল—(১) জমিদার শ্রেণী, (২) আইনব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীবৃন্দ এবং (৩) প্রধান প্রধান ব্যবসায়িগণ। এঁরা সকলেই ইংরেজের সৃষ্টি, কেননা শাসন ও শোষণের নীতি চালিয়ে যাবার জন্য এঁদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

ইংরেজ শাসনে যে সব ভূম্যধিকারী প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন, তাঁরা সামন্তযুগের মতন অর্ধ-স্বাধীন বা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রাপ্ত অধীশ্বর ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন শুধুই রাজস্ব-সংগ্রহকারী; বিদেশী সরকারের জমিদারীর খাজনা আদায়ের বিষয়ে সহায়তাই ছিল তাঁদের একমাত্র কাজ। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যখন ইংরেজ-রাজের অস্তিত্ব একটি সুতোর উপর দোদুল্যমান, তখন তাঁরা পুরস্কৃত হয়েছিলেন, আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য।

সমাজে এই নতুন অভিজাত-শ্রেণীর প্রাধান্যলাভ ঘটায় তখনকার দিনে যদিও সরকার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মত ব্যক্তিদের নেতৃস্থানীয় বলে

[১] পণ্ডিত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা কবি মধুসূদন দত্ত এক সময়ে লিখেছিলেন—"ভারতে লোকে যেরূপ জানে, তুমি তো শুধু বিদ্যাসাগর (বিদ্যাসাগর বলতে 'জ্ঞানের সাগর') নও, তুমি দয়ার সাগরও বটে।"

[২] এই স্কুলে তিনি সুবিখ্যাত রসায়ন-বিদ ও মানব-প্রেমিক স্যার পি. সি. রায়ের সহপাঠী ছিলেন।

স্বীকার করে নিয়েছিলেন, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে এ'দের প্রেরণা ছিল যৎসামান্য। আমার বাবা তাঁর যৌবনে এই প্রেরণা লাভ করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও কিছু পরিমাণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিদের কাছ থেকে। কেশবচন্দ্র যেখানেই গেছেন, জনগণ তাঁকে অনুসরণ করেছে। বাস্তাবকই, তখন তিনি যুগ-নায়ক। তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতায় আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা, সমগ্র সমাজের, বিশেষতঃ তরুণ সম্প্রদায়ের নীতিবোধকে জাগ্রত করে তুলেছিল। অন্যান্য ছাত্রের মতন, আমার বাবাও তাঁর সম্মোহনী প্রভাবে পড়েছিলেন, এবং এমন একটা সময়ও এসেছিল যখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের কথা চিন্তা করেছিলেন। সে যাই হোক, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে আমার বাবার জীবন ও চরিত্রের উপর কেশবচন্দ্রের একটি স্থায়ী প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে, সুদূর কটকে, তাঁর বাড়ির দেওয়ালে এই মহাপুরুষের বহু প্রতিকৃতি শোভা পেত, এবং সারাটা জীবন স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আন্তরিক।

আমার বাবার যৌবনে যদিও জনগণের মধ্যে গভীর নৈতিক জাগরণ দেখা গিয়েছিল, তবু আমার বিশ্বাস এই যে, রাজনৈতিকভাবে দেশ ছিল তখনও মৃত। একথা তাৎপর্যপূর্ণ যে তাঁর আদর্শ পুরুষগণ—কেশবচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র[১]—সুউন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হলেও কোন ভাবেই সরকার বা ইংরেজ বিরোধী ছিলেন না। কেশবচন্দ্র স্পষ্টই বলতেন যে, ইংরেজের আগমনকে তিনি ঈশ্বরের বিধান বলেই মনে করেন। আর ঈশ্বরচন্দ্র, আজ একজন 'অসহযোগী' যেমন করে থাকেন, তেমন ভাবে সরকার বা ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক পরিহার করে চলেননি, যদিও প্রগাঢ় স্বাধীনতা বা আত্মসম্মানবোধ ছিল তাঁর চরিত্রের মূল কথা। আমার বাবাও উচ্চ চরিত্রাদর্শের মানুষ ছিলেন এবং নিজ-পরিবারকে সেইভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তিনিও সরকারবিরোধী ছিলেন না। সেজন্যই তিনি Government Pleader ও Public Prosecutor -এর পদ এবং সেই সঙ্গে সরকারের উপাধি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমার বাবার অগ্রজ অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ বসুর প্রকৃতিও ছিল অনেকটা একই রকম। তিনি অনিন্দ্য চরিত্রের লোক ছিলেন, পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক গুণের জন্য তাঁর প্রতি ছাত্রদের ভক্তি ও ভালবাসাও ছিল প্রগাঢ়, কিন্তু তিনিও সরকারী শিক্ষাবিভাগে চাকরী করতেন। সেই রকম, আমার বাবার আমলের আগে, 'বন্দে মাতরম'[২] সংগীত রচনা করেও, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের[৩] পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সরকারী চাকরী করা। যদিও তাঁর জাতীয় সংগীতগুলি মানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছে, তবু সরকারী চাকরীতে ডি. এল. রায়[৪] ম্যাজিস্ট্রেট হতে পেরেছিলেন। এ সমস্তই সম্ভব হয়েছে কয়েক দশক আগে, কারণ সেটি ছিল পরিবর্তনের, এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সম্ভবত অপরিণতির যুগ। ১৯০৫ সনে, দেশবাসীর তীব্র বিরোধিতা ও বিক্ষোভ সত্ত্বেও যখন বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হল, সেই সময় থেকেই রাজনৈতিক সচেতনতা তীব্র আকার ধারণ করে। পরিণামস্বরূপ সরকার ও জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে ওঠে অনিবার্য। অধুনা, সরকারী কাজে জনসাধারণ আরও বেশী অসন্তুষ্ট, এবং সরকারও অন্যদিকে তারা কি বলে বা লেখে সে সম্বন্ধে অনেক বেশী সন্দিগ্ধ। নতুনকে জায়গা দিয়ে পুরোনো ব্যবস্থা বিদায় নিয়েছে, এবং আজ আর রাজনীতি থেকে নীতিবোধকে পৃথক করা অর্থাৎ রাজনৈতিক কোলাহলে জড়িত না থেকে নৈতিক নির্দেশ মেনে চলা অসম্ভব। যে কোন মানুষকে তার স্বল্পপরিসর জীবনে জাতীয় ভাবনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়, এবং আমার খুবই স্পষ্ট মনে আছে যে আমিও এইরকম একটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে এসেছি, যাকে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্করহিত নীতিবোধ বলা যেতে পারে। তখন আমি মনে করতাম যে রাজনীতি বর্জন করে চললেও—যার যা প্রাপ্য ছেড়ে দিয়ে আত্মসন্তোষ লাভ করলেও, নৈতিক উন্নতি সম্ভব। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে জীবন এক এবং অখণ্ড। যদি আমরা কোন আদর্শ গ্রহণ করি তাহলে তার জন্য নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে হবে, এবং আমাদের

[১]এ'রা উভয়েই শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং অনেকটা এ'দের প্রেরণাতেই উচ্চ-চরিত্রাদর্শের এক নতুন শ্রেণীর শিক্ষক তৈরী হয়েছিল। আমার বাবাও কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন এবং হয়ত বৃত্তি হিসাবেই তিনি তা গ্রহণ করতে পারতেন।

[২]'বন্দে মাতরম্'-এর প্রকৃত অর্থ, 'আমি মাকে (অর্থাৎ মাতৃভূমিকে) প্রণাম করি।' এটি প্রায় ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

[৩]আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা।

[৪]বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন এবং বহু জাতীয় সংগীত রচয়িতা—দিলীপকুমার রায়ের পিতা। ১৯১৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সমগ্র জীবনটাকেই তার দ্বারা রূপান্তরিত করে নিতে হবে। অন্ধকার ঘরে আলো প্রবেশ করলে তার প্রতিটি কোণ আলোকিত হয়ে উঠতে বাধ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইস্কুলে (১)

আমার পঞ্চম জন্মদিন (জানুয়ারী ১৯০২) যখন প্রায় এসে পড়েছে, বলা হল আমাকে স্কুলে পাঠানো হবে। জানি না, অনুরূপ অবস্থায় অন্য ছেলেমেয়েরা কি রকম বোধ করে থাকে, আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। যদি দেখা যায় বড় ভাই-বোনেরা দিনের পর দিন সেজে গুজে স্কুলে যাচ্ছে, আর যেহেতু ততটা বড় হই নি বা তেমন বয়স হয় নি, এজন্যই বাড়িতে পড়ে থাকতে হয়—এ এক চূড়ান্ত অস্বাস্তকর অনুভূতি। অন্তত আমার তাই মনে হত, আর সেজন্যই আনন্দটা হয়েছিল বেশী।

আমার কাছে এটি একটি উৎসবের দিন বলে মনে হচ্ছিল। অবশেষে আমি বয়স্ক বিশিষ্ট এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি, যারা ছুটীর দিন ছাড়া বাড়ি থাকে না। সকাল প্রায় দশটার সময় আমাদের রওনা হতে হয়েছিল কারণ স্কুল শুরু হত ঠিক দশটায়। আমার প্রায় সমবয়সী দুই মামাও আমার সঙ্গে স্কুলে ভর্তি হবেন। তৈরী হয়ে, যে গাড়ি চড়ে আমরা স্কুলে যাব, তার দিকে ছুটে গেলাম। ঠিক তখনই দুর্ভাগ্যবশতঃ, পা পিছলে আমি পড়ে গেলাম। আমার লেগেছিল ও মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়েছিল; হুকুম হল আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। ভাগ্যবান যারা, তারা চলে গেল, আর আমি পড়ে রইলাম। আমার সামনে সবই অন্ধকার মনে হতে লাগল এবং আমার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সান্ত্বনা মিলল চব্বিশ ঘন্টা পরে।

আমাদের স্কুলটি ছিল মিশনারী স্কুল[1], প্রধানত ইউরোপীয় আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েদের জন্য; ভারতীয়দের জন্য আসনসংখ্যা ছিল শতকরা ১৫ ভাগের মত। আমার সব ভাই-বোনেরা এই স্কুলেই ভর্তি হয়েছিল, এবং আমিও তাই হলাম। আমাদের বাবা-মা কেন যে এই স্কুলটি নির্বাচন করেছিলেন তা জানি না, তবে সম্ভবত এই কারণে যে, অন্য কোথাও অপেক্ষা এখানে আমরা তাড়াতাড়ি ভাল করে ইংরেজী ভাষা শিখতে পারব, আর ইংরেজী শিখলে তখনকার দিনে যথেষ্ট লাভ ছিল। আমার এখনও মনে আছে যে, যখন আমি স্কুলে ভর্তি হই তখন সবেমাত্র ইংরেজী বর্ণমালা শিখেছি এবং তার বেশী কিছু জানি না। ইংরেজীতে একটি কথাও বলতে না পেরেও কিভাবে যে আমি কাজ চালিয়ে নিয়েছিলাম, তা এখনও আমার বোধগম্য হয় না। প্রথম প্রথম ইংরেজীতে কথা বলার যে সমস্ত চেষ্টা করেছি তার একটির কথা এখনও বিস্মৃত হতে পারি নি। আমাদের শ্লেট্ পেন্সিল দেওয়া হয়েছিল, এবং লিখতে আরম্ভ করার আগে, তা সরু করে নিতে বলা হয়েছিল। আমার মামার চাইতে আমারটা ভাল হয়েছিল, তাই পেন্সিলটি দেখিয়ে আমাদের শিক্ষককে বলেছিলাম, 'Ranendra mot[2] । shor[3],— ভেবেছিলাম যে ইংরেজীতে কথা বলেছি।

আমাদের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী Mr or Mrs Young ইংলন্ড থেকে এসেছিলেন, তাঁরা ছাড়া আমাদের শিক্ষকেরা ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান (এবং অধিকাংশই মহিলা)। শিক্ষকদের অধিকাংশকেই আমরা পছন্দ করতাম না। Mr Young -এর মত কারও কারও প্রতি আমাদের ভক্তি থাকলেও, ভয়ও ছিল; কেননা, বেত চালানোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন বড় বেশী উদার। Miss Cadogan- এর মত কাউকে কাউকে সহ্য করে চলতাম। Miss S-এর মত অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রতি ছিল সুনিশ্চিত ঘৃণা; এবং Miss S যদি কখনও স্কুলে অনুপস্থিত হতেন, আমরা 'Hurrah' বলে চেঁচিয়ে উঠতাম। Mrs Young-কে ভাল লাগত। তবে শিশু শ্রেণীতে আমাদের প্রথম শিক্ষক

[1] ব্যাপটিস্ট মিশন কর্তৃক পরিচালিত প্রটেস্টান্ট ইউরোপীয় স্কুল (পি. ই. স্কুল)।
[2] বাঙলার 'মোটা' শব্দটি থেকেই অপভ্রংশ করা হয়েছিল 'Mot'
[3] বাঙলার 'সরু' শব্দটিরই অপভ্রংশ রূপ পেয়েছিল 'Shor' ।

Miss Sarah Lawrence-কে আমরা ভালবাসতাম। শিশুমন উপলব্ধি করার মত তাঁর এই রকম একটা দরদী হৃদয় ছিল যে, আমরা তাঁর প্রতি অদম্য একটা আকর্ষণ বোধ না করে পারতাম না। তিনি না থাকলে, যখন ইংরেজীতে আমি মনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারি না, তখন এত সহজে এগিয়ে যেতে পারতাম কিনা আমার সন্দেহ আছে।

যদিও শিক্ষক ও ছাত্রদের অধিকাংশই ছিল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, তবু স্কুলটি ভারতীয় পরিবেশে যতটা সম্ভব ইংরেজী ধাঁচে তৈরী হয়েছিল এবং ইংরেজী ধারাতেই চলত। এখানে এমন কিছু কিছু জিনিস আমরা শিখেছিলাম যা কোনও ভারতীয় স্কুলে সম্ভব হত না। ভারতীয় স্কুলগুলিতে যেমন পড়াশুনার উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, এখানে তেমনটি ছিল না। পড়াশুনা ছাড়াও, ভারতীয় স্কুল অপেক্ষা এখানে আচরণ, পরিচ্ছন্নতা ও সময়ানুবর্তিতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। পড়াশুনার ব্যাপারে শিক্ষকেরা প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন এবং দৈনন্দিন কাজ এমন নিয়মিত ও প্রণালীসম্মত ভাবে করানো হত, যা কোন ভারতীয় স্কুলে সম্ভব ছিল না। ফলে, যখন পরীক্ষা এসে পড়ত, তখন প্রকৃতপক্ষে কোন প্রস্তুতিরই প্রয়োজন হত না। উপরন্তু, ভারতীয় স্কুলে যে ইংরেজী শেখানো হত, তদপেক্ষা এখানকার মান ছিল অনেক উন্নত। কিন্তু এসব বিষয় উপযুক্তভাবে বিবেচনা ও তারিফ করবার পরেও আমার সন্দেহ আছে যে আজ কোন ভারতীয় ছাত্রকে এধরনের স্কুলে ভর্তি হতে আমি উপদেশ দেব কি না। এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হত, তার মধ্যে নিয়ম ও শৃংখলা ছিল ঠিকই, কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্যটি কদাচিৎ ভারতীয় ছাত্রদের প্রয়োজনোপযোগী হত। বাইবেল শেখানোর উপর বড় বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত, আর শেখানোর পদ্ধতিটা ছিল যেমন অবৈজ্ঞানিক তেমনি বিরক্তিকর। কিছু বুঝি আর নাই বুঝি বাইবেলের পড়া আমাদের মুখস্থ করতে হত, যেন আমরা সব পাদ্রী, পবিত্র বাণী সকল কণ্ঠস্থ করছি। একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে, দীর্ঘ সাত বছর ধরে যদিও রাতদিন আমাদের বাইবেল শিখতে হয়েছে, কিন্তু বাইবেল আমার প্রথম ভাল লাগে কয়েক বছর পরে, যখন আমি কলেজে পড়ি।

পাঠ্যসূচী সন্দেহাতীত ভাবে এমন করে তৈরী করা হয়েছিল যাতে মানসিকভাবে আমরা যতটা সম্ভব ইংরেজী ভাবাপন্ন হয়ে উঠি। আমরা গ্রেট ব্রিটেনের ভূগোল ও ইতিহাস বেশী করে পড়তাম, তদনুপাতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমাদের সামান্যই পড়তে হত—এবং যখন ভারতীয় নাম উচ্চারণ করতে হত, তখন এমন ভাবে তা করতাম যেন আমরা সব বিদেশী। আমরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই ল্যাটিন শব্দরূপ—'bonus—bona—bonum'——শুরু করে দিয়েছিলাম, এবং পি. ই. স্কুল ত্যাগ করবার আগে সংস্কৃত শব্দরূপ—গজ, গজৌ, গজাঃ, নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা করতে হয় নি। সঙ্গীতে 'সা-রে-গা-মা'-র পরিবর্তে 'ডো-রে-মি-কা' দিয়ে আমাদের কানকে অভ্যস্ত করতে হয়েছিল। আমাদের বইপত্রে যে সমস্ত গল্প ও কাহিনী ছিল, তা সমস্তই ইংরেজী ইতিহাস বা রূপকথা থেকে নেওয়া হয়েছিল, যা ইউরোপে চলত এবং ভারতে সৃষ্ট একটি কথাও তাতে ছিল না। বলাই বাহুল্য, কোন ভারতীয় ভাষা শেখানো[১] হত না, আর সে কারণেই ভারতীয় স্কুলে ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত আমরা মাতৃভাষার প্রতি একেবারেই নজর দিতে পারি নি।

উপরোক্ত কথাগুলি থেকে এ রকম ধারণা করা ভুল হবে যে আমরা স্কুলে অসুখী ছিলাম। বরং তার উল্টোটা। প্রথম কয়েক বছরে আমরা বুঝতেই পারি নি যে এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা ভারতীয় অবস্থার অনুপযোগী। যা আমাদের শেখানো হয়েছে, তাই আগ্রহ সহকারে শিখেছি, এবং অন্যান্য ছাত্রের মত স্কুলের আইন-কানুনের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মানিয়ে নিয়েছি। এই স্কুলে সদাচারী ছাত্র-ছাত্রী তৈরী হয় বলে একটা সুখ্যাতি ছিল, আর আমরা সেইভাবে চলতে চেষ্টা করতাম। মনে হয়, আমাদের অগ্রগতিতে বাবা-মা, মোটের উপর সন্তুষ্টই ছিলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছেও আমাদের সুনাম ছিল, কেননা যে কোন ক্লাসেই হোক না কেন, আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই সাধারণত শীর্ষস্থান অধিকার করত।

খেলাধুলার প্রতি স্বভাবতই কিছুটা পরিমাণে মনোযোগ দেওয়া হত, তবে ঠিক ততটা নয়, যতটা ইংরেজী স্কুলে লোকে আশা করে থাকে। তার কারণ সম্ভবত ছিল এই যে আমাদের প্রধান শিক্ষক নিজে সেরকম খেলোয়াড় ছিলেন না। নানা দিক থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অতুলনীয়, এবং তিনি দৃঢ়চেতা ছিলেন—স্কুলের চতুঃসীমানায় সর্বত্রই চোখে পড়ত

[১] আমার বিশ্বাস সম্প্রতি অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

তাঁর চরিত্রের ছাপ। তিনি ছিলেন কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ ও সদাচারের পরমভক্ত। অগ্রগতির বিবরণে বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়েই শুধু নম্বর দেওয়া হত না, (১) চরিত্র, (২) আচরণ, (৩) পরিচ্ছন্নতা, (৪) সময়ানুবর্তিতা—এসব বিষয়গুলিও ধরা হত। কাজেই যে সব ছেলে মেয়ে পাশ করে আসত তাদের ব্যবহার যে মার্জিত হবে, এতে কোন আশ্চর্য নেই। অসৎ আচরণ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ছেলেদের বেত্রাঘাতের[১] রীতি ছিল—তবে এ অধিকার ছিল কেবল মাত্র দুজনের,—প্রধান শিক্ষক ও তাঁর সুযোগ্যা পত্নী।

Mr Young-এর চরিত্রে কয়েকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তাঁকে উপলক্ষ্য করে আমরা নানা ধরনের রসিকতা করতাম। অবিবাহিত ও ধর্মপ্রচারক, তাঁর এক দাদা ছিলেন, এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা উদ্রেক করানোর মত তাঁর এক দাড়ি ছিল। তিনি শিশুদের বিশেষ ভালবাসতেন ও তাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতেন। দুই ভাই-এর পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য, প্রধান শিক্ষকের নাম আমরা দিয়েছিলাম 'Young Young', আর তাঁর দাদাকে বলতাম 'Old Young'. Mr Young Young -এর অল্পেই ঠাণ্ডা লেগে যেত, সেজন্য এমন কি গরমের দিনেও তিনি জানালাগুলি বন্ধ করে রাখতেন পাছে বাতাস ঢুকে পড়ে। সর্দি লাগার সম্ভাবনা ও তা থেকে কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে তিনি মাঝে মাঝেই আমাদের সাবধান করে দিতেন। যদি কখনও তিনি অসুস্থ বোধ করতেন, তখন এমন কড়া একমাত্রা কুইনাইন সেবন করতেন যে প্রায় বধির হয়ে যেতেন। এদেশে কুড়ি বছর থেকেও তিনি স্থানীয় ভাষার একটি কথাও বলতে পারতেন না, এবং কোন দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরে দেখা বা দেশভ্রমণের কোন ইচ্ছাই, তাঁর কখনও হত না। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক যদি কখনও তাঁর টেবিলের উপর কিছু রেখে যেতে ভুল করত, Mr Young ঘন্টা বাজিয়ে তাকে ডাকতেন এবং যে জিনিসটা চাইতেন তা দেখিয়ে দিতেন; কিন্তু স্থানীয় ভাষায় তাকে ভর্ৎসনা করতে না পেরে তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড় বিড় করতেন "On this ought to have been done before". এতেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। যদি কোন পিওন চিঠি নিয়ে আসত, আর তাকে অপেক্ষা করতে বলার প্রয়োজন হত, Mr Young ছুটে তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে ঠিক ঠিক কথাগুলি জেনে আসতেন, এবং যতক্ষণ না বাইরে এসে সেই কথাগুলি লোকটির দিকে ছুঁড়ে দিতে পারেন, ততক্ষণ সেগুলি আওড়িয়ে চলতেন।

এতৎসত্ত্বেও, আমাদের প্রধান শিক্ষক মর্যাদাসম্পন্ন ও মানী লোক ছিলেন এবং আমাদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করতেন, যদিও তা ভয়মিশ্রিত ছিল। আমাদের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন মাতৃতুল্যা, সকলেই তাঁকে পছন্দ করতাম। আর একথা অবশ্যস্বীকার্য যে আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ধারণাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপারে কখনও অন্যায় কোন চেষ্টা করা হয় নি। কয়েকটা বছর বেশ ভালভাবেই কেটেছিল, এবং পরিবেশের সঙ্গে আমরা বোধহয় চমৎকারভাবে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সুর যেন ক্রমশঃই কেটে যেতে লাগল। এমন কিছু ঘটেছিল, যার দ্বারা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য আমরা বুঝতে শুরু করেছিলাম। স্থানীয় কারণগুলি এর জন্য দায়ী, না, তা বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোড়নের প্রতিধ্বনি, এটি একটি কঠিন প্রশ্ন, যার উত্তর আমি আপাতত দেব না।

কতক পরিমাণে এই পার্থক্য ছিল অনিবার্য। তবে যা অনিবার্য ছিল না, তা হল এই পার্থক্য থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষ। দুটি স্বতন্ত্র পৃথিবীতে আমরা বাস করছিলাম, এবং যতই সচেতন হয়ে উঠছিলাম, ততই বুঝতে শুরু করেছিলাম যে এই দুটি পৃথিবী সব-সময় একত্র হয় না। একদিকে পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব, যা ছিল ভারতীয়, অন্য-দিকে ছিল আলাদা পৃথিবী, স্বতন্ত্র আবহাওয়া যেখানে আমরা কাজের দিনগুলির অধিকাংশই কাটিয়েছি। জায়গাটি অবশ্যই ইংল্যান্ড ছিল না, তবে প্রায় তার কাছাকাছি। যদিও বার্ষিক পরীক্ষায় আমাদের অনেকেই ক্লাসে শীর্ষস্থান অধিকার করত, তবু আমাদের বলা হয়েছিল যে, যেহেতু আমরা ভারতীয়, তাই স্কুলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষাগুলিতে[২] আমরা বসতে পারব না। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেরা স্বেচ্ছাসেবক

---

[১] Mrs Young যেভাবে বেত মারতেন, তাতে কারও কোন ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না, কেননা ছেলেরা সচরাচর তাঁর ঘর থেকে হাসিমুখেই বের হত। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের বেত মারার কাহিনী ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম এবং যখন তিনি 'মহাশয় আমার ঘরে যাও', বলে গর্জন করে উঠতেন, তখন এমন ছেলে খুব কমই ছিল যার মুখ শুকিয়ে যেত না।

[২] এর কারণ এই যে, ভারতীয় ছেলেরা বৃত্তি নিয়ে যাবে।

বাহিনীতে যোগদান করে কাঁধে রাইফেল তুলতে পারবে, কিন্তু আমরা পারব না। এই ধরনের ছোট ছোট ঘটনা এই সত্যের প্রতি আমাদের চোখ খুলিয়ে দিতে লাগল যে, যদিও আমরা একই স্কুলে পড়ি, তবু ভারতীয় বলে আমরা ভিন্ন শ্রেণী। তারপর মাঝে মাঝে ইংরেজ (অথবা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান) ও ভারতীয় ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া হত, যার ফলে ঘুষোঘুষিও[১] বেধে যেত। এই জাতীয় কলহে, জাতিগত ভিত্তিতে পক্ষাবলম্বন করা হত। আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ত, যার বাবা ছিলেন খুব উচ্চপদস্থ এক ভারতীয় কর্মচারী। সে তার বাড়িতে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করত, আর আমাদের মধ্যে যারা ভাল খেলতে পারত তারা প্রতিপক্ষে যোগদান করত। আমার একথাও মনে আছে যে আমরা ভারতীয় ছেলেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে কখনও কখনও বলাবলি করতাম যে বাইবেল নিয়ে আমরা হাঁফিয়ে উঠেছি, এবং এ পৃথিবীতে কোন কিছুর বিনিময়েই আমরা কোনদিন ধর্মান্তরিত হব না। তারপর এল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইন—প্রবেশিকা, ইন্টারমিডিয়েট, ও ডিগ্রী পরীক্ষাগুলিতে বাঙলাকে আবশ্যিক বিষয় করতে হবে এবং প্রবেশিকার পাঠ্যসূচীতেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হল। শীগগিরই আমরা বুঝতে পারলাম যে, পি. ই. স্কুলের পাঠ্যসূচী আমাদের উপযোগী নয়, এবং অন্যান্য ছাত্রদের দরকার না হলেও, কোন ভারতীয় স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হলে আমাদের বাঙলা ও সংস্কৃত নতুন করে পড়তে শুরু করতে হবে। শেষে একথাও অনস্বীকার্য যে আমার বড় দাদাদের প্রভাবও এসে পড়েছিল—যাঁরা ইতি-মধ্যেই এই স্কুল ছেড়ে প্রবেশিকা, ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এবং তাঁদের ভিন্ন পৃথিবীর সব কথা বাড়িতে আমাদের শোনাতেন।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এই রকম ধারণা করা অসঙ্গত হবে যে কয়েক বছর পড়বার পর আমি আমার স্কুলের পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলুম। ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৮ সাল,—সাত বছর আমি এখানে পড়েছি এবং বাস্তবিকপক্ষে আমার পরিবেশ সম্বন্ধে সন্তুষ্টই ছিলুম। যে সমস্ত উপদ্রবের কথা উপরে উল্লেখ করেছি, সে সবই ছিল সাময়িক, তার জন্য আমাদের সুশৃঙ্খল জীবনধারা ব্যাহত হয় নি। শুধু শেষের দিকে সূক্ষ্ম একটা যন্ত্রণাবোধ, আমার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারার[২] একটা অনুভূতি, আমাকে পেয়ে বসেছিল এবং কোন ভারতীয় স্কুলে ভর্তি হবার তীব্র ইচ্ছা জাগত। মনে হত সেখানে আমি অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারব। আর খুবই আশ্চর্য লাগে যখন ভাবি যে, ১৯০৯ সালের জানুয়ারীতে আমি আমাদের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে করমর্দন করে যখন স্কুল, শিক্ষকগণ ও ছাত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, আমার কোন দুঃখ হয় নি, ক্ষণিকের জন্য কোন যন্ত্রণাও না। সে সময়ে আমার কি ভুল হয়েছে তা উপলব্ধি করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। তখন যে কারণগুলি কাজ করেছিল, আজ এতদিন পরে, পরিণত মনের সাহায্যে তার কয়েকটিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

পড়াশুনার ব্যাপারে সে সময়ে আমার ফলাফল সন্তোষজনক ছিল কারণ সচরাচর আমি শীর্ষস্থান অধিকার করতাম। কিন্তু যেহেতু খেলাধুলায় আমি ভাল ছিলুম না, এবং যেহেতু ভারতীয় স্কুলে পড়াশুনার উপর সচরাচর যেমন গুরুত্ব দেওয়া হত, এখানে তা হত না, সেই কারণে নিজের[৩] সম্পর্কে এক খারাপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে-ছিলুম। তুচ্ছতাবোধ, সংশয়ানুভূতি বার বার আমাকে পীড়া দিত। স্কুলের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার দরুনই বোধহয় অন্য সবাইকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা ও নিজেকে ঘৃণা করা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সর্বকিছু বিবেচনা করলে, কোন ভারতীয় ছেলে বা মেয়েকে এখন আর এধরনের স্কুলে পাঠানো সংগত মনে হয় না। শিশুটির নিশ্চয়ই মনে হবে, সে ঠিকমত তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না, এবং কষ্ট পাবে, বিশেষত, সে যদি অনুভূতিপ্রবণ হয়। ভারতের কোন কোন অভিজাত মহলে ছেলেদের ইংলণ্ডে পাব্লিক স্কুলে পড়তে পাঠানোর যে রীতি প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে[৪], সে সম্বন্ধেও আমি ওই একই কথা বলব। ঐ একই

---

[১] এ সব লড়াই-এ আমার মামারা ও আমার কয়েকজন ভাই বরাবরই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে।

[২] প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে যা বলেছি, অর্থাৎ বিশেষভাবে অন্তর্মুখী ছিলাম বলেই বোধহয় আমার মধ্যে এরকম অনুভূতি হত।

[৩] ইহাই বোধহয় আমার মনঃপীড়ার জন্য কতকাংশে দায়ী—যা পূর্বে অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

[৪] আমি যখন কেম্ব্রিজে ছাত্র ছিলাম, তখন ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলগুলি থেকে যে সমস্ত ভারতীয় পাশ করে আসত, তাদের দেখেই আমার এধরণের দৃঢ় অভিমত জন্মেছে।

কারণে তীব্র ভাষায় সেই সমস্ত ভারতীয়দের নিন্দা করব যাঁরা ইংরেজ শিক্ষকদের নিয়ে ইংরেজী পাবলিক স্কুলের ধারায় ভারতীয় স্কুল চালানোর চেষ্টা করছেন। কিছু কিছু ছেলের উদাহরণ দেখানো যেতে পারে, যারা মনের দিক থেকে বহির্মুখী, তারা মানিয়ে চলতে না পারার ভাবনায় হয়ত ভুগবে না। এবং এই ধরনের পরিবেশে সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। কিন্তু অন্তর্মুখী শিশুদের কষ্টভোগ অবশ্যম্ভাবী, এবং এই রকম অবস্থায়, এই শিক্ষাব্যবস্থা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত কিছুর প্রতিক্রিয়া বিরূপ হতে বাধ্য। মনস্তত্ত্বের এই দিকটি অগ্রাহ্য করেও একথা বলা যেতে পারে যে, যে শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের অবস্থা, প্রয়োজন ও তার ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানকে অস্বীকার করে, তা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক ও যার যুক্তিসঙ্গত কোন সমর্থন দুর্লভ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সাংস্কৃতিক মিলনের যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক উপায়, শৈশবে ভারতীয় ছেলেদের উপর জোর করে 'ইংরেজী' শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং তারা বয়োপ্রাপ্ত হলে তাদের ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিমের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে আসা। সেক্ষেত্রে তারা নিজেরাই বিচার করতে পারবে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে কোনটা ভাল আর কোনটা নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(২)

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে অন্যে একজন সম্পর্কে কি ভাবে, তাই দিয়েই সে নিজের সম্পর্কে অভিমত গড়ে তোলে। ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে, যখন আমি কটকের র‍্যাভেন শ' কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হই, আমার মধ্যে সহসা এক পরিবর্তন ঘটে গেল। ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলেদের কাছে আমার বংশমর্যাদার কোন মূল্য ছিল না, কিন্তু স্বদেশীয়দের কাছে ছিল। উপরন্তু, আমার ইংরেজীর জ্ঞান, সাধারণ মান অপেক্ষা উন্নত ছিল, যা আমার নতুন সহপাঠীদের চোখে আমাকে অতিরিক্ত সম্মান এনে দিয়েছিল। এমন কি, শিক্ষকেরাও আমার সঙ্গে অতিরিক্ত সহানুভূতিসূচক ব্যবহার করতেন, কারণ তাঁদের আশা ছিল আমি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করব; আর ভারতীয় স্কুলে খেলাধুলো নয়, পড়াশুনার দ্বারাই প্রশংসা ও পুরস্কার অর্জন করা যেত। প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় আমার সম্পর্কে তাঁদের আশার সঙ্গত প্রমাণ রাখতে পেরেছিলাম। যে নতুন আবহাওয়ায় আমি গড়ে উঠতে লাগলাম, সেখানে নিজের সম্পর্কে ভাল ধারণা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল—অর্থাৎ আমারও কিছু মূল্য আছে, আমি তুচ্ছ জীব নই। আমার মধ্যে যে ভাব জেগে উঠছিল, গর্ব না বলে, তাকে বরং বলা যায় আত্মবিশ্বাস, যার অভাব তখনও আমি বোধ করছিলাম এবং যা ব্যতীত জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায় না।

এবার শিশু শ্রেণীতে ভর্তি না হয়ে চতুর্থ[১] শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম—সেজন্য সব সময় উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত না। চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেরা নিজেদের উপরের শ্রেণীর ছাত্র বলে মনে করত এবং গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলত। আমিও তাই করতাম। অন্যান্য অনেক সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও একদিক দিয়ে আমাকে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। এই স্কুলে ভর্তি হবার আগে আমি আমার মাতৃভাষা—বাঙলার একটি শব্দও পড়ি নি, যেখানে অন্যান্য ছেলেরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমার মনে আছে, প্রথম দিন গরু (কিংবা ঘোড়া!) সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে গিয়ে সহপাঠীদের কাছে আমাকে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছিল। আমি ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, বানানেও খুবই দুর্বল ছিলাম। সেজন্য শিক্ষক মহাশয়, যখন আমার রচনা সারা ক্লাসে পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তখন চতুর্দিক থেকে টিপ্পনী ও হর্ষধ্বনি ভেসে আসছিল। মনে হয়েছিল, একেবারে ধুলোয় মিশে গেছি। পড়াশুনায় কাঁচা থাকার জন্য বিদ্রূপ—এমন অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও আমার হয় নি, তার উপর সম্প্রতি আমার মধ্যে একপ্রকার আত্মসচেতনতা দেখা দেওয়ায় আমি অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠেছিলাম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের

[১] এখন যেভাবে সংখ্যা ধরা হয়, আমাদের সময় তা ছিল অন্যরকম। যেমন আগে, প্রথম শ্রেণী ছিল হাই স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণী।

পর মাস, বাঙলা পড়া আমায় বিড়ম্বনায় ফেলেছিল। সাময়িক ভাবে মানসিক যন্ত্রণা যতই তীব্র হোক না কেন, এ অপমান সহ্য করা ও গোপনে গোপনে ভাল ফল করার জন্য সংকল্প নেওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করণীয় ছিল না। ধীরে ধীরে, কিন্তু অবিচলিত-ভাবে আমি অগ্রসর হতে শুরু করলাম, এবং বার্ষিক পরীক্ষায় এই বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে তবেই সন্তুষ্ট বোধ করতে পারলাম।

নতুন পরিবেশ বেশ ভালই লাগছিল, কারণ এই রকম পরিবর্তনই আমার কাম্য ছিল। অন্য স্কুলে যদিও আমি সাতবছর ছিলাম, আমার কোন বন্ধু ছিল না। এখানে সহপাঠীদের অন্ততঃ কয়েকজনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব স্থায়ী হবে বলে মনে হচ্ছিল। আমার বন্ধুদের কেউই খেলোয়াড় ছিলেন না, কারণ খেলাধুলোকে আমি ভাল চোখে দেখতাম না, শুধু ড্রিল করতেই যা ভাল লাগত। আমার নিজের এই সঙ্কুচিতভাব ছাড়াও আরও একটা বাধা ছিল, যার ফলে খেলাধুলায় উৎসাহ বোধ করি নি। স্কুল ছুটীর পর, কিছু খাবার খেয়ে ছেলেরা খেলতে যাবে, এটাই ছিল রীতি। আমরা এরকম করি, বাবা-মা তা পছন্দ করতেন না। হয় তাঁরা মনে করতেন, খেলাধুলার ফলে আমাদের পড়াশুনার ক্ষতি হবে, নতুবা খেলার মাঠের আবহাওয়াকে তাঁরা মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী বলে স্বীকার করতেন না। সম্ভবত পরবর্তী সম্ভাবনাটাকেই তাঁরা বেশী গুরুত্ব দিতেন। যাই হোক, পারিবারিক পরিস্থিতি ছিল এই রকম যে, বাইরে খেলতে যেতে কৌশলাবলম্বন করতে হত। আমার কোন কোন ভাই ও মামারা অবশ্যই এমন করত, এবং মাঝে মাঝে যখন তারা ধরা পড়ে যেত, তখন শাসনও করা হত। তবে আমার বাবা-মা-এর অভ্যাস জানা থাকার দরুন,—বিশেষতঃ তাঁরা গাড়ী করে অথবা হেঁটে বেড়াতে বার হতেন বলে—সাধারণতঃ তাঁদের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হত। যদি আমার অন্যান্যদের মতন তীব্র ইচ্ছা থাকত, তা হলে অনায়াসেই আমি তাদের সঙ্গে খেলতে যেতে পারতাম। কিন্তু আমি যেতাম না। উপরন্তু আমি তখন শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলাম, এবং নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সংস্কৃত শ্লোকগুলি আগ্রহের সঙ্গে পড়তে ব্যস্ত। এই সব শ্লোকের কোন কোনটাতে বলা হয়েছে যে, পিতাকে মান্য করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম—পিতার সন্তুষ্টিতেই সব দেবতার সন্তুষ্টি[১]—মাতা, পিতা অপেক্ষাও গরীয়সী, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং বাবা, মা যাতে অসন্তুষ্ট হন, এরকম কোন কাজ না করাই সংগত মনে করতাম। তাই যারা বাইরে খেলতে যেত না, তাদের নিয়ে বাগানের কাজে লেগে যেতাম। আমাদের বাড়ির সংলগ্ন মোটামুটি বড় একটা রান্নাবাড়ী ও ফুলের বাগান ছিল। মালীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাছে জল দিতাম ও গাছের যত্ন করতাম, কিংবা খোঁড়াখুঁড়ি বা কেয়ারি সাজানোর কাজে সাহায্য করতাম। বাগানের কাজে এত আনন্দ পেতাম যে তার মধ্যে একেবারে ডুবে থাকতাম। অন্যান্য জিনিস ছাড়াও, প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিষয়ে, এই বাগান-পরিচর্যা আমার চোখ খুলে দিয়েছিল, সে সম্বন্ধে পরে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বাগানের কাজ ছাড়াও, শারীরিক ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌশল অভ্যাস করতে হত। বাড়িতে এ সবের ব্যবস্থা ছিল।

আমার অতীত জীবনের দিকে ফিরে তাকালে একথাই মনে হয় যে খেলাধুলোকে অবহেলা করা আমার উচিত হয় নি। এর ফলে সম্ভবত আমি বালবৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম, এবং আমার অন্তর্মুখী প্রবণতা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। কি গাছ, কি মানুষ, কারও পক্ষেই খুব বেশী অকালে পেকে যাওয়া ভাল নয়, এবং এর জন্য পরিণামে ফল ভোগ করতে হয়। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠার প্রাকৃতিক নিয়মটা অলঙ্ঘনীয়। এবং শিশুদের যত অত্যাশ্চর্য প্রতিভাই প্রথমে আমাদের আকৃষ্ট করুক না কেন, বড় হবার পর উহা সাধারণতঃ তেমন আর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

বছর-দুয়েক জীবনটা প্রায় একইভাবে কেটে গেল। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বাঙ্গালী ও উৎকলবাসী দুই-ই ছিল, আর তাদের সম্পর্কও ছিল খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ। প্রতিবেশী দুটি প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে কোন রকম বৈরী-ভাব বা মনোমালিন্যের কথা তখনকার দিনে শোনা যেত না—অন্ততঃ আমরা ছাত্রেরা তো শুনি নি। আমাদের পরিবারের কথা যতদূর বলতে পারা যায়, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা থেকে সৃষ্ট কোন চিন্তা বা অনুভূতি আমাদের মধ্যে কখনও ছিল না। সেজন্য আমাদের বাবা-মা-কেই ধন্যবাদ দিতে হয়। আমার বাবা উড়িষ্যার বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তদ্দেশীয় অনেক বিখ্যাত পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কাজেই তাঁর

[১] পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমং তপঃ ইত্যাদি।

দৃষ্টিভঙ্গী ও সহানুভূতি ছিল উদার ও বিস্তৃত, এবং পরিবারের আর সকলের উপর অজ্ঞাতেই তা প্রভাব বিস্তার করেছিল। উড়িষ্যা বা অন্য কোন প্রদেশের লোক সম্পর্কে একটিও অপমানসূচক মন্তব্য বা ঐ জাতীয় কিছু কখনও তাঁর মুখে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। যদিও তিনি অবাধ ভাবোচ্ছাসের অধিকারী ছিলেন না, এবং গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলতেন, তবু যখন যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি যাঁদের সঙ্গেই মিশেছেন, তাঁদেরই প্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছেন। পিতামাতার এমন প্রভাব গোপনে কাজ করে থাকে, এবং পরবর্তী জীবনেই শুধু ছেলেমেয়েরা বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝতে পারে, তাদের চরিত্র গঠনে বা জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে কিসের সাহায্য রয়েছে।

শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি আমার কিশোর মনে স্থায়ী একটি রেখা অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। তিনি হলেন বাবু বেণীমাধব দাস, আমাদের প্রধান শিক্ষক। একেবারে প্রথম দিন—তখন আমার বয়স সবে বারো দাঁড়িয়েছে—আমি যখন তাঁকে পরিদর্শন কাজে রত দেখলাম তখন আমার যা মনে হয়েছিল, তাকে এখন বলা যায় তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা অপ্রতিরোধ্য নৈতিক আবেদন। তখনও পর্যন্ত আমি জানতাম না, মানুষকে শ্রদ্ধা করা বলতে ঠিক কি বোঝায়। কিন্তু বেণীমাধব দাসকে দেখলেই আমার মন শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে যেত। আমি ঠিক কি শ্রদ্ধা করতাম, তা বুঝবার মত যথেষ্ট বয়স তখন আমার হয় নি। আমি শুধু এটুকু বুঝতে পারতাম যে তিনি একজন সাধারণ শিক্ষক ছিলেন না, এবং তাঁর সমশ্রেণীর অন্যান্য সকলের থেকে তিনি শুধু পৃথকই নন, তাঁদের উপরেও বটে। আর মনে মনে নিজেকে বোঝাতাম যে, যদি আমাকে জীবনে কোন আদর্শ গ্রহণ করতে হয়, তবে তা হবে তাঁকে অনুকরণ করা।

আদর্শের কথা বলতে গিয়ে, যখন পি. ই. স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন সেখানে কি রকম এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম, তা মনে পড়ল। আমার বয়স তখন প্রায় দশ। বড় হয়ে আমরা কে কি হতে চাই, সে সম্পর্কে শিক্ষক-মশাই আমাদের একটি রচনা লিখতে বলেছিলেন। আমার সর্বজ্যেষ্ঠ দাদার এই রকম অভ্যাস ছিল যে তিনি জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও এরকম আরও অনেক কিছুর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের আলোচনা করে শোনাতেন। তাঁকে যা বলতে শুনতাম, তা থেকেই কোন কোন কথা বেছে নিয়েছিলাম। যতগুলি সে সময় মনে পড়ল, সব একসঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেললাম। এবং এই বলে আমি শেষ করেছিলাম যে ম্যাজিস্ট্রেট হতে চাই। শিক্ষক মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন যে কমিশনারের পর ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া লক্ষ্যের বিপরীত হবে। কিন্তু আমি এতই ছোট ছিলাম যে বিভিন্ন পেশা ও পদের মর্যাদা সম্যক বুঝে উঠতে পারি নি। এর পরে ভবিষ্যত জীবনে আমার কি হতে ইচ্ছে করে, এই রকম কোন চিন্তা নিয়ে ভবিষ্যত জীবনে আর কখনও আমাকে মাথা ঘামাতে হয় নি। শুধু স্মরণ আছে, পারিবারিক মহলে আলোচনা শুনতে পেতাম যে, সর্বোচ্চ যে পদ লোকে লাভ করতে পারে তা হল ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের[১] পদ।

ছেলেরা সেকেন্ড ক্লাসে না ওঠা পর্যন্ত প্রধান-শিক্ষক মহাশয় সাধারণত নিয়মিত তাদের ক্লাস নিতেন না। সুতরাং আমি সেই দিনটির প্রতীক্ষায় রইলাম, যবে আমি সেকেন্ড ক্লাসে উঠব, এবং তাঁর কাছে পড়বার অধিকার অর্জন করব। সেই দিনটি সত্যিই এল[২], কিন্তু আমার সৌভাগ্য বেশীদিন স্থায়ী হল না। কয়েক মাস পরেই তাঁর বদলীর হুকুম এল। যাই হোক, বিদায় নেওয়ার আগে তিনি আমার মধ্যে একটা অস্পষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ—মনুষ্যজীবনে অন্য যে কোন জিনিসের চাইতে নৈতিক মূল্যকেই অধিক গণ্য করা উচিত—এই জাতীয় এক অপরিণত অনুভূতি জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্যভাবে বলা যায় তিনি আমার মধ্যে এই সত্যানুভূতি জাগিয়ে তুলেছিলেন, আমাদের কবিতার বইতে যা আমরা পড়েছিঃ

The rank is but the guinea's stamp
The man is the gold for all that.

ভালই হয়েছিল যে প্রায় এই সময়েই আমার মধ্যে সেই স্বাভাবিক মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল—যা বয়ঃসন্ধির প্রাক্‌কালে ঘটে থাকে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে যথার্থভাবে যৌন-চেতনা বলে, তা আমার মধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছিল।

[১] তখনকার দিনে এর নাম দেওয়া হয়েছিল ঈশ্বর-দত্ত চাকরী।
[২] তখন আমার বয়স চোদ্দ।

প্রধান-শিক্ষক বেণীমাধব যেদিন তাঁর অনুরাগী ও মুগ্ধ ছাত্রদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন, সেই দৃশ্যটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি ক্লাসে ঢুকলেন, তাঁর বিচলিতভাব গোপন ছিল না, এবং যখন তিনি আবেগকম্পিত স্বরে বলতে লাগলেন, 'ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন এ প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই'... আমি আর শুনতে পারলাম না। আমার চোখে জল এসে গেল এবং ভিতরে ভিতরে আমি কেঁদে উঠেছিলাম। কিন্তু শত সজাগ দৃষ্টির সামনে, কোনমতে নিজেকে সংযত করতে পেরেছিলাম। তারপর সমস্ত ক্লাসের ছুটী হয়ে গেল এবং ছেলেরা সার বেঁধে চলে যেতে লাগল। তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ দেখলাম, তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলেদের চলে যাওয়া লক্ষ্য করছেন। আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হল। যে চোখের জলকে ক্লাসের মধ্যে কোনমতে সংবরণ করেছিলাম, তা এখন আর বাঁধ মানল না। এ দেখে তিনিও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, এবং তিনি এগিয়ে এসে বললেন, আমাদের আবার দেখা হবে। আমার বিশ্বাস, জীবনে এই প্রথম বিদায়-মুহূর্তে আমার কান্না পেয়েছিল, আর এই প্রথম আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, আমরা যখন বিচ্ছেদকে মেনে নিতে বাধ্য হই, তখনই শুধু আমরা বুঝি আমাদের ভালবাসা[1] কত গভীর।

পরের দিন শিক্ষক ও ছাত্রেরা তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য একটি প্রকাশ্য সভার আয়োজন করেছিলেন। যাদের বলতে হয়েছিল, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। আমি আমার ভূমিকা কিভাবে সম্পন্ন করেছিলাম জানি না, কেননা ভিতরে ভিতরে আমি কাঁদছিলাম। যাই হোক, একটা জিনিস দেখে আমি বিস্ময় ও বেদনা বোধ করেছিলাম যে এই বিচ্ছেদ যে কতখানি মর্মান্তিক, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তা বুঝতে পারেন নি। প্রধান শিক্ষক যখন উত্তরে বলতে লাগলেন, বোধ হচ্ছিল, তাঁর কথা-গুলি যেন আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। তিনি এই বলে শুরু করেছিলেন যে, যখন তিনি প্রথম কটকে আসেন, তখন কখনও ভাবতে পারেন নি, তাঁর জন্য এত ভালবাসা এখানে সঞ্চিত হয়ে আছে।—আমি শুধু এইটুকুই শুনতে পেয়েছিলাম, তারপর আর কিছু শুনি নি। শুধু তাঁর ভাবদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, যার মধ্যে অনেক কথা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। এমন একটা অভিব্যক্তি ছিল, এমন একটা দীপ্তি—কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে যা দেখেছি। আর এতে কোনই আশ্চর্য ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত অনুরাগী শিষ্য ও ভক্ত[2]।

স্কুলটা এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেল—কেমন নিরানন্দ, একঘেয়ে, আর প্রাণ-হীন—কারণ যে আলো এতদিন সেখানে জ্বলছিল, তা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু করার কিছুই ছিল না, ক্লাসে যেতেই হবে, পড়া শিখতে হবে, আর পরীক্ষা দিতে হবে। জীবন-চক্র নির্বিচারে আমাদের আনন্দ আর দুঃখকে চূর্ণ করে দিয়ে চলতে থাকে।

এটি এক কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে, কারও কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনও কখনও তার কত ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। প্রধান শিক্ষক বেণীমাধবের সঙ্গে আমার পত্র বিনিময় শুরু হল, যা কয়েক বছর ধরে চলেছিল। একটা জিনিস এখন তাঁর কাছে শিখলাম—সৌন্দর্যের বিচারেই শুধু নয়, বরং নৈতিকতার দিক থেকেও প্রকৃতিকে কিভাবে ভালবাসা যায় এবং তার কাছে অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়। তাঁর উপদেশানুসারে, যা করতে লাগলাম, তাকে বলা যায় একপ্রকার প্রকৃতি-পূজা। মনোরম সূর্যাস্তের আভায় নদীর তীরে বা পাহাড়ের উপরে কিংবা নির্জন প্রান্তরের মধ্যে সুন্দর একটা স্থান খুঁজে নিয়ে ধ্যান করতে থাকতাম। 'প্রকৃতির কাছে নিজেকে একেবারে সঁপে দাও', তিনি লিখতেন, 'এবং প্রকৃতির সদা পরিবর্তনীয় রূপের মধ্যে দিয়ে তার ভাষা শুনে নাও।' এই রকম ধ্যানের দ্বারা তিনি মানসিক শান্তি, আনন্দ, ও মনোবল লাভ করতেন।

এই রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে নীতিবোধের দিক থেকে কতটা লাভবান হয়েছিলাম বলতে পারি না। তবে এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রকৃতির গোপন ও উপেক্ষিত সৌন্দর্যের প্রতি আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল ও আমাকে একাগ্রচিত্ত হতেও সাহায্য করেছিল। বাগানে ফুলের মধ্যে, নব পত্রপল্লবে ও নবীন বৃক্ষরাজিতে আমি এক অনির্বচনীয় আনন্দ খুঁজে পেতাম এবং একাকী অথবা বন্ধুদের সঙ্গে প্রকৃতির এই আরণ্যক সৌন্দর্যের মধ্যে আমার

[1] পরবর্তী জীবনে এ নিয়মের প্রমাণ বার বার পেয়েছি।
[2] সংস্কৃতে একটি কথা আছে—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।

ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগত, যা গ্রামাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। আমি সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারলাম, কবি যাকে বলেছেনঃ

A primrose by the river's brim,
A yellow primrose into him,
And it is something more.

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় এখন নতুন একটা অর্থ খুঁজে পেলাম এবং কালিদাসের[১] কাব্যে ও মহাভারতে[২] নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা পরমানন্দে উপভোগ করতামঃ আমার পণ্ডিত মশাইকে ধন্যবাদ, তা আমি মূল সংস্কৃতেই উপভোগ করতে পারতাম।

এই সময়ে আমার মানসিক জীবনের সম্ভবত সব চাইতে অশান্ত অধ্যায়ের সূচনা দেখা যাচ্ছিল এবং যা পাঁচ-ছয় বছর স্থায়ী হয়। এটি ছিল এমন একটা সময় যখন তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের ফলে অব্যক্ত দুঃখ আর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, বন্ধুদের কারও পক্ষে তার ভাগ নেওয়া সম্ভব ছিল না, এবং ইহা বাইরের কারও কাছে দৃষ্টিগোচর ছিল না। যেটা গড়ে ওঠার বয়স, সে সময়ে কাউকে স্বাভাবিক অবস্থায় এরকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় কি না জানি না—অন্ততঃ আশা করি হয় না। কিন্তু আমার মানসিক গঠনে কোন কোন দিক থেকে অস্বাভাবিকতার স্পর্শ ছিল। শুধু যে খুব বেশী অন্তর্মুখিনতাই আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা নয়, কোন কোন ব্যাপারে অকালপক্কও হয়ে উঠেছিলাম। ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, যে বয়সে ফুটবল মাঠে নিজেকে পরিশ্রান্ত করে ফেলার কথা, তখন এমন সব চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছিল, যেগুলি পরিণত বয়সের জন্য রেখে দিলেই ভাল হত। এতদিন পরে বিচার করলে দেখতে পাই, এই মানসিক দ্বন্দ্ব ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত, এই পার্থিব জীবন ও তার চিরাচরিত কাজকর্মের প্রতি ছিল স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ, যার বিরুদ্ধে আমার বিবেক বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিল। দ্বিতীয়ত, এই বয়সে যা খুবই স্বাভাবিক সেই যৌন-চেতনা আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল, যাকে আমি অস্বাভাবিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা বলে মনে করতাম, আর যাকে দমন অথবা অতিক্রম করার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

প্রকৃতি-পূজা—যার কথা আগেই লিখেছি—মানসিক উন্নতি ঘটায় এবং সেজন্য একদিক দিয়ে উপকারী, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। আমার যা প্রয়োজন ছিল—আর যা আমি নিজের অজ্ঞাতেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—তা হল একটি মূল নীতি যাকে অবলম্বন করে আমার সমগ্র জীবন গড়ে উঠতে পারে: আর সেই সঙ্গে জীবনে আর কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার এক দৃঢ় সংকল্প। এই নীতি বা আদর্শকে খুঁজে নিয়ে তার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা সহজ কাজ ছিল না। যদি আমি শুরুতেই অন্যান্য অনেকের মত পরাজয় স্বীকার করতাম এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে কোন একটি আদর্শকে স্থির করে, অন্য সব প্রলোভনকে সাহসের সঙ্গে পাশ কাটিয়ে চলতাম, তাহলে এ যন্ত্রণার অবসান হত, বা অন্ততঃ বহুলাংশে হ্রাস পেত। কিন্তু আমি কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করি নি—আমার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমাকে তা করতে দিত না। সেজন্যই আমাকে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল। আর যেহেতু আমি দুর্বল ছিলাম, সে কারণে এ লড়াই ছিল তীব্র। জীবনের লক্ষ্য স্থির করা আমার কাছে ততটা কষ্টকর ছিল না, যতটা ছিল, সেই একমাত্র লক্ষ্যে সমগ্রভাবে মনোনিবেশ করা। জীবনের যে উদ্দেশ্য সর্বাপেক্ষা আমার কাম্য ছিল সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরেও, বিপরীত বা অবাধ্য ইচ্ছাগুলিকে বশে এনে মানসিক শান্তি ও সমাবস্থা লাভ করতে আমার অনেকদিন সময় লেগেছিল, কারণ মন যত উন্মুখ হোক না কেন প্রাকৃতিক দুর্বলতাও ছিল। আমার চাইতে অপেক্ষাকৃত বেশী মনের জোরের অধিকারী ব্যক্তির নিঃসন্দেহে এই সব সমস্যার আরও সহজে সমাধান করা সম্ভব হত।

একদিন নেহাতই দৈবক্রমে এমন একটি জিনিস পেয়ে গেলাম, এই সংকটকালে যা আমার প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়াল। আমার এক আত্মীয়[৩] পাশের বাড়িতেই থাকতেন; তিনি এই শহরে নতুন এসেছিলেন আর আমাকে তাঁর কাছে প্রায়শই যেতে হত। তাঁর বইগুলির উপর চোখ বোলাতে বোলাতে নজরে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী। কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বুঝলাম, এতে এমন কিছু আছে যা আমি খুঁজে মরছি। বইগুলি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বাড়িতে এসে সাগ্রহে পড়তে আরম্ভ করলাম। মজ্জাবধি আমার

---

[১] প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার, যিনি সংস্কৃতে সমস্ত কিছু রচনা করে গেছেন।
[২] রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন ভারতের দুটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।
[৩] শ. চ. ম।

শিহরণ খেলে গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য ও নীতিবোধ জাগ্রত করেছিলেন, আমার জীবনে নতুন এক শক্তি এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কোন আদর্শ তাঁর কাছ থেকে লাভ করি নি, যার জন্য সমগ্র সত্তাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি। বিবেকানন্দ আমাকে তাই এনে দিলেন।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাঁর রচনাগুলি মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগলাম। কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত তাঁর পত্রাবলী ও বক্তৃতাগুচ্ছ—স্বদেশবাসীকে প্রদত্ত বাস্তব উপদেশে পরিপূর্ণ—আমাকে সর্বাপেক্ষা অনুপ্রাণিত করেছিল। পড়বার ফলে, তাঁর শিক্ষার মূলকথা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হল। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'—তোমার নিজ মুক্তি ও মানবসেবা—এই হবে জীবনের লক্ষ্য। মধ্যযুগের স্বার্থবাদী monasticism বা বেন্থাম ও মিলের modern utilitarianism কোনটাই সম্পূর্ণ আদর্শ হতে পারে না। মানবসেবার মধ্যে স্বদেশ সেবাও অবশ্য স্বীকৃত হয়েছিল—কেন না তাঁর জীবন-চরিত লেখিকা ও প্রধানা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা[1] বলেছেন—'তাঁর আরাধ্যা দেবী ছিল তাঁর মাতৃভূমি। মাতৃভূমির এমন কোন দুঃখ ছিল না যা তাঁর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত না।' স্বামিজী নিজেও তাঁর এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় বলেছেন, 'উচ্চকণ্ঠে বল ভাই—দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ (পুরোহিত শ্রেণী), ক্ষত্রিয় (যোদ্ধশ্রেণী) ও বৈশ্য (বণিক শ্রেণী), এঁদের প্রত্যেকেই এক সময় সুদিন ভোগ করেছে এবং এখন এসেছে পদদলিত সাধারণ মানুষ শূদ্রদের পালা। প্রাচীন শাস্ত্রগুলির তিনি এক আধুনিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন। শক্তিই যে উপনিষদের[2] বাণী, তা তিনি প্রায়ই ঘোষণা করতেন। প্রাচীনকালে নচিকেতা[3] যা করেছে, তোমরাও সেই রকম নিজেদের উপর বিশ্বাস (শ্রদ্ধা) রাখ। আশ্রমবাসী শ্রমবিমুখ সন্ন্যাসী-দের লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, 'ফুটবল খেলার মধ্যে দিয়েই মুক্তি আসবে, গীতা[4] পাঠ করে নয়।'

আমার জীবনে যখন বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে তখন সবে পনেরয় পড়েছি। তারপর আমার মধ্যে শুরু হল এক বিপ্লব এবং সমস্ত কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। তাঁর শিক্ষার পূর্ণ তাৎপর্য অথবা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব সম্যক উপলব্ধি অবশ্যই তখনই করতে পারি নি। তবু আমার মনে শুরু থেকেই এমন দাগ পড়েছিল, যা মুছবার নয়। যুগপৎ তাঁর ছবি আর শিক্ষা থেকে বিবেকানন্দকে এক পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব বলেই আমার বোধ হয়েছিল। এমন অনেক প্রশ্ন আমার মনকে নাড়া দিত যা খুব স্পষ্ট ছিল না এবং যেগুলি সম্বন্ধে পরে আমি চিন্তা করতাম, তাঁর মধ্যে সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পেতাম। প্রধান-শিক্ষকের ব্যক্তিত্বকে আর যথেষ্ট বড় বলে মনে হত না, যাতে তাঁকে আমার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। আগে ভাবতাম তাঁর মতই দর্শন নিয়ে পড়া-শুনা করব এবং তাঁকে অনুকরণ করব। এখন বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথের কথা ভাবতে লাগলাম।

বিবেকানন্দ থেকে ক্রমে ক্রমে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়েছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন, এবং বহু পুস্তক প্রকাশ করেছেন যেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে দুর্লভ নয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ প্রায় একেবারে নিরক্ষর ছিলেন বলে তেমন কিছু করেন নি। তিনি নিজের মত চলেছেন আর তাঁর জীবন ব্যাখ্যা করা ছিল অন্যের কাজ। তথাপি, তাঁর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যে সমস্ত শিক্ষা লাভ করা গেছে তাঁর মূলকথা সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যরা বহু পুস্তক বা দিনপঞ্জী প্রকাশ করেছেন। এই সব বই-এর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান হল সাধারণভাবে চরিত্র-গঠন ও বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব নির্দেশ। তিনি অবিরতই এ কথা বলতেন যে, ত্যাগের দ্বারাই শুধু সিদ্ধিলাভ সম্ভব—সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করতে না পারলে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় না। তাঁর শিক্ষার মধ্যে নতুনত্ব কিছু ছিল না, ভারতীয় সভ্যতার মতই তা প্রাচীন। হাজার হাজার বছর আগে উপনিষদ বলেছে যে, পার্থিব আকাঙ্ক্ষাসমূহকে

---

[1] তাঁর 'The Master as I saw him' পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

[2] প্রাচীন বেদশাস্ত্রের দর্শন সম্বন্ধীয় অংশই হল উপনিষদ।

[3] ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিদের একজনের পুত্র।

[4] হিন্দু দর্শনের সার-সঙ্কলন হচ্ছে গীতা অথবা ভাগবদগীতা এবং একে হিন্দুদের বাইবেল বলে ধরে নেওয়া যায়।

পরিত্যাগ করতে পারলে তবেই অবিনশ্বর জীবন লাভ করা যায়। তবুও, রামকৃষ্ণের উপদেশের সার্থকতা ছিল এই যে, তিনি যে কথা বলতেন, সেইভাবেই চলতেন এবং তাঁর শিষ্যদের মতানুসারে, আধ্যাত্মিক দিক থেকে তাঁর চরমোন্নতি ঘটেছিল।

রামকৃষ্ণের উপদেশগুলির মূলকথা ছিল—কাম ও কাঞ্চন ত্যাগ। তিনি মনে করতেন, আধ্যাত্মিক জীবনে কোন মানুষের যোগ্যতা বিচার করতে হলে, এই দ্বিবিধ ত্যাগের মাপকাঠিতেই তা বিচার্য। কামকে একেবারে জয় করার অর্থ যৌন-প্রবৃত্তিকে মহৎ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা, যার দ্বারা যে কোন পুরুষ প্রত্যেক নারীকেই মাতৃবৎ দেখতে পারে।

শীঘ্রই আমার এক বন্ধুগোষ্ঠী (আমার আত্মীয় এস. সি. এম ছাড়াও) গড়ে উঠল, যারা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। স্কুলে ও স্কুলের বাইরে যখনই কোন সুযোগ পেতাম এ প্রসঙ্গ ছাড়া আমরা আর কিছু নিয়ে আলোচনা করতাম না। ক্রমে ক্রমে আমরা হেঁটে অনেকদূর চলে যেতাম, কি কোথায় বেড়াতে যেতাম যার ফলে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ ও আলোচনার অনেক বেশী ভাল সুযোগ পাওয়া যেত। আমাদের সংখ্যা বাড়তে থাকল, এবং এক অল্পবয়স্ক ছাত্রকে[১] আমাদের মধ্যে সাদরে টেনে নিয়েছিলাম, যে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ছিল এবং ভক্তিগীতি গভীর আবেগের সঙ্গে গাইতে পারত।

বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে আমার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে লাগল। আমাদের অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণের জন্যই তা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্কুলে শীর্ষস্থান অধিকার করত, সেজন্য আমরা উচ্চ-মর্যাদার অধিকারী ছিলাম এবং ছাত্রেরা আমাদের ঠাট্টা করতে সাহস পেত না। বাড়ির অবস্থা কিন্তু অন্য-রকম ছিল। অচিরেই বাবা মা লক্ষ্য করলেন যে আমি প্রায়ই অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বের হয়ে যাই। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল, ভালভাবে সতর্ক করে দেওয়া হল, এবং অবশেষে ভর্ৎসনা করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হল না। আমার মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল, এবং আমি আর নেহাৎ ভালছেলে ছিলাম না যে তার বাবা মাকে অসন্তুষ্ট করতে ভয় পাবে। আমার সামনে এখন নতুন একটা আদর্শ ছিল, যা আমার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়েছিল—নিজের মুক্তিসাধন এবং পার্থিব আকাঙ্ক্ষাসমূহকে বিসর্জন দিয়ে ও সব অন্যায়ের বিধিনিষেধ থেকে বের হয়ে এসে মানবসেবাকে সফল করে তোলাই ছিল আমার লক্ষ্য। আমি আর সেই সব সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতাম না, যেগুলিতে পিতা মাতাকে মান্য করার কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে; পক্ষান্তরে যে সমস্ত শ্লোকে বিদ্রোহের[২] কথা ছিল সেগুলির প্রতিই আকৃষ্ট হতে লাগলাম।

এই সময়ে যে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাকে দিন কাটাতে হচ্ছিল তার চাইতে তীব্র আর কোন পরীক্ষা আমার জীবনে এসেছে কিনা সন্দেহ। রামকৃষ্ণের ত্যাগ ও শুদ্ধতার দৃষ্টান্তের ফল হয়েছিল এই যে আমার সমস্ত কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে প্রচন্ড লড়াই হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। আর বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচলিত পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমার সংঘর্ষ ডেকে এনেছিল। আমি দুর্বল ছিলাম, আর এই লড়াই যত দীর্ঘদিনব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল; তাতে জয়লাভ করা সহজ ছিল না। মানসিক উত্তেজনা ও অশান্তি তাই প্রতিনিয়ত লেগেই ছিল, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে যুক্ত হত নৈরাশ্যবোধ।

এ কথা বলা শক্ত, বাইরের অথবা অন্তরের—সংঘর্ষের কোন দিকটা ছিল অধিক যন্ত্রণাদায়ক। আমার চাইতে বেশী বা কম অনুভূতিপ্রবণ মনের অধিকারী হলে অনেক সহজেই তা কাটিয়ে ওঠা যেত, কিংবা যন্ত্রণার তীব্রতা হত অনেক কম। কিন্তু প্রতিকারের কিছু ছিল না। আমার জন্য যা জমা ছিল তা আমাকে ভোগ করতেই হয়েছে। বাবা-মা আমাকে যতই সংযত করবার চেষ্টা করছিলেন, ততই আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠছিলাম। অন্যান্য সকল চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল, আমার মা কান্নার আশ্রয় নিলেন। কিন্তু, তাতেও আমার মধ্যে কোনই প্রতিক্রিয়া হল না। আমি উদাসীন, হয়তো বা খামখেয়ালী। নিজের পথে চলার জন্য যেন আরো বেশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছিলাম; যদিও আমি অসুখী এই বোধটা ভিতরে ভিতরে সর্বদাই বর্তমান ছিল। এভাবে পিতামাতাকে অমান্য করা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকর ছিল কিন্তু দুর্বার স্রোতে আমি যেন সামনের দিকে এগিয়ে চলছিলাম। সে সময়ে আমি কি স্বপ্নে বিভোর ছিলাম বাড়িতে গুরুজন তার

[১] হ. ম. স।

[২] 'হে জগদম্বে, পিতা নয়, মাতা নয়, ভাই অথবা বন্ধু নয়—তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় ইত্যাদি।'

খুব সামান্যই বিচার করতে বা বুঝতে পারতেন। আর সেজন্যেই আমার দুঃখটা ছিল বেশী। একমাত্র সান্ত্বনা পেতাম বন্ধুদের সান্নিধ্যে আর বাড়ির বাইরে গেলেই অনেক বেশী সহজ বোধ করতে শুরু করতাম।

আমার কাছে পড়াশুনার গুরুত্ব কমে আসছিল এবং কয়েকবছর খুব বেশী পড়াশুনা করেছিলাম বলেই আমার সর্বনাশ ঘটতে পারেনি। এখন আমার কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মানসিক বা আধ্যাত্মিক অনুশীলন। এই সময়ে আমার কোন উপযুক্ত পথ-প্রদর্শক ছিল না, বই পড়ে যতটা সাহায্য লাভ করা যায় সেদিকেই মনোনিবেশ করেছিলাম। কিন্তু এ সব বইয়ের অধিকাংশই যে বিশ্বস্ত বা অভিজ্ঞ লোকের লেখা নয় এ কথা পরে বুঝেছিলাম। ব্রহ্মচর্য অথবা যৌন-সংযম সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তক ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পড়ে ফেলেছিলাম। তারপর সাগ্রহে শেষ করেছিলাম ধ্যান সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি। অনেক চেষ্টার পর, যোগ, বিশেষত হঠযোগ[১] সংক্রান্ত পুস্তকগুলি খুঁজে বের করে কাজে লাগিয়েছিলাম। এ ছাড়া, অন্যান্য সকল পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। যা যা আমাকে করতে হয়েছে তার যথাযথ বিবরণ দিতে গেলে তা একটি পরম উপভোগ্য কাহিনী হবে। মোটেই আশ্চর্য নয় যে কেউ কেউ মনে করেছিলেন, উন্মাদ হতে আমার আর বেশী দেরী নেই।

প্রথমে যখন যোগাভ্যাস শুরু করা স্থির করলাম, তখন সমস্যা দেখা দিল কি ভাবে নিভৃতে তা করা যায় এবং কেউ দেখে ফেললে কি ভাবে উপহাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায়। যোগাভ্যাসের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল সূর্যাস্তের পর অন্ধকারে অনুশীলন এবং আমি তাই করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন ধরা পড়ে গেলাম এবং তা নিয়ে হাসাহাসি হল। একদিন রাত্রে যখন লুকিয়ে ধ্যান করছিলাম, দাসী বিছানা করতে এলে অন্ধকারে আমার সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল। যখন সে বুঝতে পারল এক তাল মাংসের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছে, তখন তার বিস্ময়টা একবার কল্পনা করুন!

একাগ্রতার জন্য নানা রকম উপায় অবলম্বন করেছিলাম। সাদা পটভূমির কেন্দ্রস্থলে কালো একটা বৃত্ত এঁকে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম যতক্ষণ না মন সম্পূর্ণভাবে ফাঁকা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু সব কিছুকে হার মানিয়েছিল মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত সূর্যের দিকে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। নানারকম আত্ম-নিগ্রহেরও সাহায্য নিয়েছিলাম—যেমন সাধারণ নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ, অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ, গরম ও ঠাণ্ডায় শরীরকে শক্ত করে গড়ে তোলা ইত্যাদি।

কি বাড়িতে, কি বাড়ির বাইরে, এর অনেকটাই যতদূর সম্ভব গোপনে করতে হয়েছিল। রামকৃষ্ণের প্রিয় উপদেশগুলির একটি ছিলঃ জঙ্গলে বা তোমার বাড়ির নির্জন কোণে কিংবা মনে মনে ধ্যান কর, যাতে কেউ তোমাকে দেখতে না পায়। শুধু যে সমস্ত লোক তার কথা জানতে পারবে তারা হল স্ব-শ্রেণীর সাধক বা যোগীগণ। যাকে আমরা যোগ বলে মনে করেছিলাম কিছুকাল তা অভ্যাস করবার পর তার বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলনা করে যেতে শুরু করলাম। কেউ আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হলে অন্তরের ভিতর বহু আধিদৈবিক এবং সেই সঙ্গে অসাধারণ শক্তির আবির্ভাব ঘটে থাকে, এ কথা রামকৃষ্ণ প্রায়ই বলতেন এবং এতে উল্লসিত বোধ করা বা যে কোন প্রকারের আত্মপ্রচার বা আত্মসম্ভোগকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক চেতনার উচ্চতর স্তরে পৌঁছতে হলে এই সব আধিদৈবিক অভিজ্ঞতা ও শক্তিকে অতিক্রম করতে হবে। কয়েকমাস চেষ্টার পরেও দেখলাম এই রকম কোন অভিজ্ঞতা আমার হয় নি। এক ধরনের বিশ্বাসের মনোভাব এবং আগের চাইতে অপেক্ষাকৃত বেশী মানসিক শান্তি ও আত্মসংযম লাভ করেছিলাম, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ভাবলাম গুরুর অভাবেই বোধহয় এটা হয়েছে, কেননা লোকে বলে গুরু ব্যতীত যোগসাধনা সম্ভব নয়। অতএব শুরু হল আমার গুরুর সন্ধান।

ভারতবর্ষে যাঁরা সংসার ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁরা কখনও কখনও পরিব্রাজকের জীবন বরণ করে নেন, অথবা সারা ভারতে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান। অতএব হরিদ্বার, কাশী, পুরী, (বা জগন্নাথ) অথবা রামেশ্বরের মত তীর্থস্থানগুলির আশে পাশে তাঁদের দর্শনলাভ করা কষ্টকর নয়। পুরীর নিকট-

---

[১] যোগের প্রকৃত অর্থ 'মিলন' (ঈশ্বরের সহিত)। যাই হোক, 'যোগ' কথাটির দ্বারা শুধুমাত্র লক্ষ্যকেই নয়, উপায়কেও বোঝানো হয়ে থাকে। 'রাজ-যোগ' ও 'হঠ-যোগ'—দুই প্রকারের যোগাভ্যাস আছে। 'রাজ-যোগ'-এর উদ্দেশ্য মানসিক ও 'হঠ-যোগ'-এর উদ্দেশ্য দৈহিক সংযম।

বর্তী হওয়ায় কটকের প্রতিও তাঁদের মধ্যে অনেকেরই একটা আকর্ষণ ছিল। এই সন্ন্যাসীদের[১] মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে—যাঁরা 'আশ্রম' বা 'মঠ' জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং যাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত ও কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নন এবং যে কোন বন্ধনকে ঘৃণা করেন। শহরে যে সব সাধুর আগমন ঘটত তাঁদের প্রতি আমাদের গোষ্ঠী—ইতিমধ্যে আমাদের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী তৈরী হয়ে গিয়েছিল—কৌতূহলী হয়ে উঠত, এবং এই গোষ্ঠীর কেউ এরকম কোন আগন্তুকের সংবাদ পেলে, একে একে বাকী সকলের কাছে তা পৌঁছে দিত। যাঁদের কাছে আমরা যেতাম তাঁদের মধ্যে নানা ধরনের সাধু ছিলেন, তবে ঋষিতুল্যদেরই বেশী পছন্দ করতাম, একথা অবশ্যই বলতে হবে। কেউ তাঁদের শিষ্য হল কি হল না, এতে তাঁরা বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপও করতেন না, এবং যে কোন প্রকারের আর্থিক ব্যাপারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতেন। কাউকে যোগসাধনায় দীক্ষিত করতে হলে তাঁরা এমন লোককেই বেছে নিতেন যাঁরা তাঁদের মতই বৈষয়িক আসক্তি থেকে একেবারে মুক্ত। যে সব সাধু কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকতেন কিংবা নিজেরা বিবাহিত ছিলেন, তাঁদের আমার ভাল লাগত না। তাঁরা সাধারণত ধনী ও বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে শিষ্য খুঁজে বেড়াতেন, তাঁদের শিষ্য করতে পারলে প্রতিষ্ঠানের লাভ হত।

একবার এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হল, নব্বই বছরেরও বেশী তাঁর বয়স। তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন একটি সুপরিচিত আশ্রমের প্রধান ছিলেন, আর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, এ শহরেরই একজন প্রধান চিকিৎসক। শীগগিরই তাঁর দর্শন লাভের জন্য সকলে ছুটতে লাগল এবং আমরাও দলে ভিড়ে গেছিলাম। তাঁকে প্রণাম করে আমরা[২] জায়গা নিলাম। তিনি আমাদের প্রতি খুব সদয়, প্রকৃতপক্ষে স্নেহের ভাব দেখিয়েছিলেন, এবং আমরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমরা ভক্তিভরে তাঁর শিষ্যদের কয়েকটি স্তোত্রপাঠ শুনলাম। শেষে আমাদের কিছু কাগজপত্র দেওয়া হল, যেগুলির মধ্যে তাঁর সব উপদেশ মুদ্রিত ছিল। এবং ঐ গুলি মেনে চলার জন্য বলা হল। আমরা—অন্তত আমি—মনে মনে স্থির করলাম সেগুলি মেনে চলব। প্রথম নির্দেশটি ছিল—মাছ, মাংস অথবা ডিম খাবে না। আমাদের পরিবারে কেউ নিরামিষাশী ছিল না, তাই সমালোচনা হয়ত বা সেই সঙ্গে বাধার সম্মুখীন না হয়ে প্রতিদিন নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। তবু সব বাধা সত্ত্বেও নির্দেশটি মেনে চলতে লাগলাম। দ্বিতীয় নির্দেশটি ছিল, প্রতিদিন কয়েকটি স্তোত্র পাঠ করতে হবে। এটি কঠিন ছিল না। কিন্তু পরের নির্দেশটি ছিল ভয়ানক—নিজের পিতা মাতার বাধ্য হয়ে চলা। প্রতিদিন সকালে উঠে বাবা-মাকে প্রণাম করার কথা বলা হয়েছিল। দুটি কারণে একাজ করা অসুবিধাজনক ছিল। প্রথমত, আমাদের বাবা-মাকে প্রত্যহ প্রণাম করবার রীতি কখনও চালু ছিল না, দ্বিতীয়ত, আমি সেই অবস্থা পার হয়ে এসেছিলাম যখন আমার বিশ্বাস ছিল, পিতা-মাতার বাধ্য হওয়াটাই একটা ধর্ম। আমার মধ্যে বরং এই রকম একটা ভাব এসেছিল যে, যে কোন দিক থেকেই আসুক না কেন, আমার লক্ষ্যপথের প্রতিটি বাধাকে অগ্রাহ্য করতে হবে। যাই হোক, চূড়ান্ত ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে নিজেকে বশে আনলাম আর ভোরবেলা দৃঢ় পদক্ষেপে সোজা বাবার সামনে হাজির হয়ে গুরুর নির্দেশমত প্রণাম করলাম। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমার বাবা কি রকম বিস্মিত হয়েছিলেন, সে দৃশ্য এখনও আমার মনে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? কিন্তু একটিও কথা না বলে আমার কর্তব্য সেরে তেমনই দৃঢ় পদক্ষেপে ফিরে আসলাম। তিনি অথবা আমার মা (তাঁকেও ওই একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল) সে সময় আমার সম্বন্ধে কি ভেবেছিলেন, তার ক্ষীণতম ধারণাও আজ পর্যন্ত আমার নেই। প্রতিদিন সকালে যথেষ্ট মানসিক শক্তি সংগ্রহ করে বাবা-মার কাছে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করা কিছু কম যন্ত্রণা ছিল না। পরিবারের লোকেরা এমন কি ভৃত্যেরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে ভেবেছে কিসের ফলে বিদ্রোহী ছেলেটি হঠাৎ এত বাধ্য হয়ে

[১] এঁদের সন্ন্যাসী, সাধু, অথবা ফকিরও বলা হয়, যদিও ফকিররা সাধারণতঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকেন। পুরোহিত শ্রেণী অবশ্যই পৃথক। হিন্দুদের মধ্যে পুরোহিতগণ সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁরা ব্রাহ্মণ ও সাধারণত বিবাহিত হন। সাধারণ গৃহস্থের হয়ে তাঁরা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে থাকেন। বিপরীত দিকে, সাধুগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করবার সময় জাতিত্ব বা এঁদের পারিবারিক সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সাধারণত এঁরা গৃহস্থের হয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেন না। এঁদের একমাত্র কাজ হল অন্য সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দেখানো। সামাজিক প্রথাসমূহের গণ্ডীর বাইরে এঁদের গণ্য করা হয়ে থাকে।

[২] আমার এক বন্ধু H.M.S. এতে আমার সঙ্গী হয়েছিল।

উঠল। তারা বোধহয় জানত না যে ব্যাপারটির পিছনে একজন সাধুর হাত ছিল।

কয়েক সপ্তাহ, বোধহয় কয়েকমাস পর নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম যে উপরোক্ত সাধনার দ্বারা আমার কি লাভ হয়েছে, এবং সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে তা ছেড়ে দিলাম। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথায় ফিরে গেলাম। নিজেকে আবার বোঝালাম—ত্যাগ ভিন্ন সিদ্ধি অসম্ভব।

ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে আমার ধারণা ব্যক্তিগত যোগসাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এ রকম ধারণা করা ভুল হবে। যদিও কিছুদিন যোগসাধনা নিয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, তবু ধীরে ধীরে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সমাজের সেবা করা আবশ্যক। ধারণাটা সম্ভবত বিবেকানন্দের কাছ থেকে এসেছিল, কেননা আগে যেমন বলেছি, তিনি মানবসেবার আদর্শ প্রচার করে গেছেন, যার মধ্যে স্বদেশসেবাও স্বীকৃত হয়েছিল। দরিদ্রের সেবা করার জন্যও তিনি কিন্তু প্রত্যেককে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, কারণ তাঁর মতে, দরিদ্রের বেশেই ঈশ্বর মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন আর দরিদ্রের সেবাই নারায়ণসেবা। মনে আছে যে, ভিখিরী, ফকির ও সাধুদের প্রতি আমি খুব উদার হয়ে উঠেছিলাম, এবং যখনই তাদের কেউ আমাদের বাড়িতে আসত, হাতের কাছে যা পেতাম, তাই দিয়েই তাদের সাহায্য করতাম। দান করার মধ্যে লাভ করতাম অদ্ভুত এক-ধরনের তৃপ্তি।

ষোল বছরে পড়বার আগেই আমি প্রথম এরকম একটা অভিজ্ঞতা লাভ করলাম যাকে গ্রামোন্নয়নের কাজ আখ্যা দিয়ে গৌরবান্বিত হতে পারি। কিছু কাজ করবার চেষ্টা করব এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা শহরতলীর একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কিছু শিক্ষা দান করলাম। শিক্ষকগণ ও সাধারণভাবে গ্রামবাসীরা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এবং আমরা গভীর উৎসাহ বোধ করেছিলাম। তারপর আমরা আর একটি গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু সেখানকার অভিজ্ঞতা আদৌ সুখপ্রদ ছিল না। যখন আমরা গ্রামে প্রবেশ করলাম, গ্রামবাসীরা দূর থেকে আমাদের দেখে একত্রে জড় হল, এবং আমরা যেই অগ্রসর হলাম, তারা সরে যেতে আরম্ভ করল। বন্ধুভাবে তাদের কাছে পেঁছন বা তাদের সঙ্গে আলাপ করা সহজ ছিল না। আঘাত পেয়েছিলাম এই কথা ভেবে যে আমাদের শুধু অপরিচিত বলেই মনে করা হয় নি। বরং সন্দেহজনক লোক বা শত্রু বলেও ধরে নেওয়া হয়েছিল। আমাদের বুঝতে বিলম্ব হয় নি যে, সুবেশ লোকেরা যখনই গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে, তারা রাজস্ব সংগ্রহ বা ঐ জাতীয় কোন কিছু নিশ্চয়ই করেছে এবং এমন ব্যবহার করেছে যাতে গ্রামবাসী ও আমাদের মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক বছর পরে, উড়িষ্যার কয়েকটি গ্রামে আমাকে ঐ একই অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছিল।

একথা সত্যি যে, যতদিন স্কুলে ছিলাম, ততদিন অন্যান্য বিষয়ে হলেও রাজনৈতিক ব্যাপারে আমার মন পরিণত হয় নি। আমার মধ্যে অকালপক্কতার ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। এটি সম্ভব হয়েছিল কতকটা আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্য, যা ভিন্ন পথে চালিত হয়েছিল, কতকটা এই কারণে যে রাজনীতির স্রোত তখনও উড়িষ্যা অবধি পেঁছয় নি, এবং কতকটা পারিবারিক মহলে প্রেরণার অভাবে। মাঝে মাঝে আমি আমার বড় দাদাদের কাছে কংগ্রেসের কাজের বিষয়ে শুনতাম, কিন্তু তা আমার মনে কোন রেখাপাত করে নি। ১৯০৮ সালে প্রথম বোমা ছোঁড়ার ঘটনায় সর্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল এবং আমরাও ক্ষণিকের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। তখন আমি পি. ই. স্কুলের ছাত্র, আমাদের প্রধান শিক্ষকা বোমা ছোঁড়ার ঘটনাকে নিন্দা করেছিলেন। যাই হোক, ব্যাপারটা তাড়াতাড়িই ভুলে গেলাম। প্রায় ঐ সময়েই, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ও স্বদেশীর (কুটির-শিল্প) উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য বহু মিছিল বের হত। তাতে কখনও কখনও সামান্য আগ্রহ বোধ করতাম, কিন্তু আমাদের বাড়িতে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। সেজন্য রাজনৈতিক কোন কার্যকলাপে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি নি। অদ্ভুত সব উপায়ে কখনও কখনও আমাদের আগ্রহ প্রকাশ পেত, যেমন খবরের কাগজ থেকে বিপ্লবীদের ছবি কেটে সেগুলি আমাদের পড়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখা। একদিন আমাদের বাড়িতে এক অতিথি এসেছিলেন—আমাদের আত্মীয় ও পুলিশ অফিসার—তিনি এই ছবিগুলি দেখিয়ে আমার বাবার কাছে নালিশ করলেন, যার ফলে আমরা স্কুল থেকে ফিরবার আগেই ছবিগুলি সরিয়ে ফেলা হল। আমরা এতে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম।

১৯১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, রাজনৈতিক দিক থেকে আমি এমন অপরিণত

ছিলাম যে, রাজার (পঞ্চম জর্জ) অভিষেক বিষয়ে একটি রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলাম। যদিও ইংরেজী রচনায় আমি সাধারণত প্রথম হতাম, তবু এবার পুরস্কার পেলাম না। বড়দিনের ছুটীতে রাজা পঞ্চম জর্জ কলকাতায় এসেছিলেন, বাড়ির আর সকলের সঙ্গে আমিও সে সময় কলকাতায় গিয়েছিলাম, এবং যখন ফিরে আসলাম তখন মনের মধ্যে ছিল উদ্দীপনার ভাব।

প্রথম রাজনৈতিক প্রেরণা আমি লাভ করি ১৯১২ সালে, প্রায় আমার সমবয়সী এক ছাত্রের[১] কাছ থেকে। সে কটক ও পুরী বেড়াতে এসেছিল, এবং প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আসবার আগে সে কলকাতার একটি বিশেষ দলের[২] সঙ্গে জড়িত ছিল যার নিজস্ব আদর্শ ছিল—আধ্যাত্মিক উন্নতি ও গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে জাতির সেবা। যখন আমার মন জাতীয় ও সামাজিক সমস্যাগুলির দিকে ফিরতে শুরু করেছিল, সেই সময়েই কটকে তার আগমন হয়। আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে একজন ছিল যে যোগের চাইতে জাতির সেবাতেই বেশী আগ্রহী ছিল। আর একজন বন্ধু সর্বদাই বাঙ্গালী সৈনিক সুরেশ বিশ্বাসের স্বপ্ন দেখত, যিনি দক্ষিণ-আমেরিকায় (মনে হয় ব্রাজিলে) গিয়ে বসবাস করেছিলেন এবং সেখানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। আর যখন আমাদের কেউ কেউ যোগ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন এই বন্ধুটি জীবনে ওই রকম উন্নতি করার জন্য কুস্তি শিখছিল। মনস্তত্ত্বের বিচারে বলা যায় যে, একটি উপযুক্ত মুহূর্তে এই আগন্তুকটি স্বদেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও কলকাতায় তার দলের বিষয়ে এমন আবেগের সঙ্গে আমাদের বলেছিল যে, আমার মনে তা গভীর ছাপ ফেলে দেয়। মহানগরীর একটি দলের সঙ্গে জড়িত থাকা মন্দ ছিল না, তাই আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা তার আগমনকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলাম। কলকাতায় ফিরে সে আমাদের বিষয়ে জানিয়েছিল এবং অনতিবিলম্বেই দলের নেতার কাছ থেকে আমরা এক চিঠি পেলাম। এইভাবে যোগাযোগ শুরু হল যা কয়েকবছর স্থায়ী হল।

আমার স্কুল-জীবন যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল, ততই গভীরভাবে বাড়তে লাগল ধর্মীয় আবেগ। পড়াশুনার গুরুত্ব আর আমার কাছে মুখ্য ছিল না। আমাদের দলের সদস্যরা যতটা সম্ভব ঘন ঘন মিলিত হত ও বাইরে বেড়াতে যেত। তার ফলে আমরা বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে পরস্পরের সান্নিধ্য বেশীক্ষণ উপভোগ করতে পারতাম। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অনুগামী—দুই একজন ছাড়া—সাধারণভাবে আর কোন শিক্ষক আমাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেন নি। প্রায় এই সময়েই আমার বাবা-মার গুরু[৩] কটকে এলেন, এবং যতদিন তিনি এখানে ছিলেন, আমার মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহটা আরও কিছু পরিমাণে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রেরণা বেশীদূর অগ্রসর হয় নি, কারণ তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না। শিক্ষকদের মধ্যে একজনই শুধু ছিলেন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং, যখন আমাদের প্রায় স্কুল ছাড়বার সময় হল, তিনি আমাকে কলকাতায় যাওয়ার সিদ্ধান্তে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, যেখানে বহু লোকের সাক্ষাৎ মিলবে এবং যাঁরা আমাকে রাজনৈতিক প্রেরণা দান করতে পারবেন।

আমার বিশ্বাস যে, ছোটবেলায় মনের উপর যে ছাপ পড়ে তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়, এবং ভাল হোক বা মন্দ হোক, বাড়ন্ত শিশুর মনের উপর তা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মনে আছে যে, শৈশবে প্রায়ই ভৃত্যদের কাছে অথবা পরিবারের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকেদের কাছে ভূতের গল্প শুনতাম। বিশেষ একটি গাছকে ভূতের প্রিয় বাসস্থান বলে দেখানো হত। এই গল্পগুলি যখন রাত্রিতে বলা হত, তখন শরীর হিম হয়ে আসত। জ্যোৎস্না রাত্রে এই রকম গল্প শোনার পর আলোছায়ার কারসাজিতে গাছের উপর ভূত দেখা সহজ ছিল। আমাদের ভৃত্যদের মধ্যে একজন—একটি মুসলমান পাচক—একে নিশ্চয়ই দেখেছিল কারণ, একদিন রাত্রে সে বলে বসল তাকে কোনও ভূতে ভর করেছে। ওঝা ডেকে ভূত তাড়াতে হয়েছিল। অন্যান্য মহলেও এই রকম অভিজ্ঞতার আরও অনেক কথা শোনা যেত। যেমন আমাদের এক মুসলমান সহিস ছিল, যে আমাদের বলত ভূত তাড়াবার কাজে সে কি রকম দক্ষ এবং এজন্য কতবার তার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সে বলত, তাকে কব্জির কাছে হাত চিড়ে কিছু রক্ত দিতে হত, যাতে ভূত চলে যাবার সময় তা পান করে যেতে

---

[১] হেমন্তকুমার সরকার।

[২] এই দলের নেতা ছিলেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ডাক্তারি পড়তেন।

[৩] ইনি তাঁদের প্রথম গুরু ছিলেন। এ'র মৃত্যুর পর তাঁরা আর একজন গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

পারে। তার কথার সততা সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে, কিন্তু আসল কথা হল এই যে, আমরা তার কব্জির উপরে মাঝে মাঝে পুরোনো দাগের সঙ্গে সদ্য কাটা দাগও দেখতে পেতাম। সে একটু-আধটু হাকিমিও[1] করত এবং অজীর্ণতা, উদরাময় ইত্যাদি নানা প্রকার রোগের হাতুড়ে ওষুধ তৈরী করত। আমি অবশ্যই বলব যে শৈশবের এই রকম অভিজ্ঞতার ফল আমার মনের উপর বিশেষ উপকারী হয় নি এবং কৈশোর প্রাপ্তির পর এই সব প্রভাব কাটিয়ে উঠতে বেগ পেতে হয়েছিল।

মনকে সংস্কারমুক্ত করার এই কাজে বিবেকানন্দ আমার অনেকখানি সহায় হয়েছিলেন। তিনি যে ধর্ম-প্রচার করেছেন—সেই সঙ্গে যোগ সম্পর্কে তাঁর ধারণা—যুক্তিসংগত দর্শনের উপর, বেদান্তের[2] উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বিজ্ঞানের বিরোধী ছিল না বরং বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলিকে[3] ভিত্তি করেই ইহা গড়ে উঠেছিল। তাঁর জীবনের ব্রতগুলির মধ্যে একটি ছিল বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় সাধন, এবং তাঁর মতে এটা সম্ভব ছিল বেদান্তের মধ্যে দিয়েই।

আজকের দিনে যে সব অস্বাস্থ্যকর প্রভাব শিশুর মন গড়ে তোলে, ভারতবর্ষে যাঁরা শিশু-শিক্ষার সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত আছেন তাঁদের একথা চিন্তা করে দেখতে হবে। এই একই কারণে, মা, মাসি বা পালিকা শিশুকে দোল দিয়ে ঘুম পাড়াবার সময় যে সব গান গেয়ে থাকেন অথবা সে খেতে না চাইলে যে উপায়ে তাকে খাওয়ানো হয়, সেই বিষয়েও ভেবে দেখা দরকার। এই দুটি করাতেই শিশুকে অধিকাংশ সময় ভয় দেখানো হয়ে থাকে। বাঙ্গলা দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঘুমপাড়ানি গানগুলির একটিতে দিবা-বসানের পর গ্রামাঞ্চলে 'বর্গীদের' (অথবা মারাঠী দস্যুদল) আক্রমণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নিদ্রাতুর শিশুর উপযোগী সঙ্গীত নিশ্চয়ই এটি নয়।

যে সব স্বপ্ন কখনও কখনও শিশুর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় ও সেই সঙ্গে তার গঠনশীল জীবনের উপর ছাপ রেখে যায়, তা-ও বিচার করা কর্তব্য। মনস্তত্ত্ব ও স্বপ্ন দেখার কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের দ্বারাই অভিভাবক বা শিক্ষকের পক্ষে শিশুর মন বোঝা এবং তার দ্বারা যে সব প্রভাবের কবলে পড়ে তার মানসিক ক্ষতি হয় তা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে শিশুকে সাহায্য করা সম্ভব হতে পারে। একথা বলার কারণ আমি নিজে ছোটবেলায় সাপ, বাঘ, বানর ও ঐ জাতীয় বিষয়ে ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে খুব কষ্ট পেয়েছি। পরে যখন অভিজ্ঞতালব্ধ উপায়ে যোগ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলাম তখনই শুধু একটি মানসিক প্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে এ ধরনের স্বপ্নগুলির[4] হাত থেকে শেষবারের মত পরিত্রাণ লাভ করেছিলাম।

ভারতবর্ষের মত দেশে এবং বিশেষতঃ সেই সব পরিবারে, যেখানে রক্ষণশীল, সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক বা বর্ণগত প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, সেখানে মনের প্রকৃত মুক্তি অর্জন না করেও বড় হয়ে ওঠা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী লাভ করা সম্ভব। অতএব প্রায়ই কোন না কোন অবস্থায় সামাজিক ও পারিবারিক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়। যা হোক, সৌভাগ্যবশতঃ যে পরিবেশে আমি গড়ে উঠেছিলাম, তা আমার মানসিক প্রসারতা বিকাশে মোটামুটি সহায়ক ছিল। শৈশবে, ইংরেজ, ইংরেজী শিক্ষা, ও ইংরেজী সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিলাম। তার পর আমাদের সংস্কৃতি—প্রাচীন ও আধুনিক—দুই-এর প্রতিই মন দিলাম এবং আমি যখন মাত্র স্কুলে পড়ি তখনই আমার সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশবাসীর সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, বাঙ্গলা দেশে থাকলে যা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

[1] ভারতবর্ষে চিকিৎসার দুটি দেশীয় প্রথা আছে, যা এখনও চালু—আয়ুর্বেদ ও হাকিমি। যাঁরা আগেরটার চর্চা করেন তাঁদের কবিরাজ বা বৈদ্য বলা হয়, আর যাঁরা পরেরটার সাহায্যে চিকিৎসা করেন তাঁদের বলে হাকিম। সুপ্রাচীন কাল থেকে আয়ুর্বেদীয় প্রথা চলে আসছে, আর হাকিমি প্রথা চালু হয় মুঘল সম্রাটদের আমলে। যদিও অনেক হাতুড়ে এই সব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন, তবু সন্দেহ নেই যে অনেক সময় পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকেরা যেখানে ব্যর্থ হন, কবিরাজ ও হাকিমেরা সেখানে আশ্চর্যজনক উপায়ে রোগ সারিয়ে থাকেন।

[2] হিন্দু-শাস্ত্রগুলির দর্শন-সম্বন্ধীয় অংশকে সাধারণ অর্থে বেদান্ত বলা হয়।

[3] মনে রাখা উচিত যে, বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ ও দর্শনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব পড়বার আগে তিনি নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী হয়ে উঠতে চলেছিলেন। মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন বলেই, রাশি রাশি কুসংস্কার এবং ভারতে ধর্মকে যে অলৌকিকতার আতিশয্যে কখনও কখনও জড়িয়ে ফেলতে দেখা যেত, তা থেকে ধর্মের সারকথা উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

[4] অন্যান্য যে সব স্বপ্ন মাঝে মাঝে আমাকে পীড়া দিত যেমন—যৌন-বিষয়ক স্বপ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার স্বপ্ন, গ্রেপ্তার ও কারাবাসের স্বপ্ন ইত্যাদি—এগুলি সম্বন্ধে পরে উল্লেখ করার সুযোগ ঘটবে।

সবশেষে, মুসলমানদের প্রতি সাধারণভাবে আমার মনোভাব গড়ে উঠেছিল অনেকটা ছোট-বেলার মেলামেশার ফলে, যদিও তা আমার অজ্ঞাতসারেই ঘটেছিল। আমরা যে অঞ্চলে থাকতাম তা মুসলমান প্রধান ছিল এবং আমাদের প্রতিবেশীদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। সাধারণ গ্রামের লোকেরা পরিবারের কর্তাকে যেরকম দেখে থাকে, আমার বাবাকে তারা সকলে সেইরকম মনে করত। আমরা মহরমের মত তাদের সব উৎসবে যোগ দিতাম এবং তাদের আখড়া[১] উপভোগ করতাম। আমাদের ভৃত্যদের মধ্যে মুসলমান ছিল, যারা আর সকলের মতই আমাদের প্রতি অনুরক্ত ছিল। স্কুলে বহু মুসলমান শিক্ষক ও সহপাঠী ছিল, তাদের সঙ্গে আমার ও অন্যান্য ছাত্রদের সম্পর্ক ছিল খুবই হৃদ্য। বস্তুত আমার মনে হয় না যে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া ছাড়া আর কোন ভাবে তাদের নিজেদের চাইতে পৃথক মনে করেছি। আর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষের কথা ছোটবেলায় আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল।

যে আবহাওয়ায় আমি মানুষ হয়েছিলাম, তা যদিও মোটের উপর উদার ভাবাপন্ন ছিল তবু কোন কোন সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক প্রথাগুলির সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধে যেত। আমার বয়স যখন প্রায় চোদ্দ কি পনেরো, সে সময়কার একটা ঘটনা মনে আছে। আমাদের প্রতিবেশী এবং আমার সহপাঠী[২], আমাদের কয়েকজনকে সান্ধ্য-ভোজের নিমন্ত্রণ করেছিল। আমার মা তা জানতে পেরে হুকুম দিলেন যে কারও যাওয়া চলবে না। হতে পারে যে তাদের সামাজিক মর্যাদা আমাদের চাইতে নীচু ছিল, কিংবা সে নীচু জাতির ছিল কিংবা নিতান্তই স্বাস্থ্যের কারণে বাইরে খাওয়া দাওয়া অনুচিত মনে করা হয়েছিল। এবং একথা সত্যি যে খুব কদাচিৎই আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতাম। যা হোক, মায়ের হুকুমের মধ্যে কোনও যুক্তি খুঁজে পেলাম না এবং তা অগ্রাহ্য করতে কেমন অদ্ভুত এক আনন্দ বোধ করলাম। যখন আমি ঐকান্তিকতার সঙ্গে ধর্ম ও যোগসাধনায় ব্যাপৃত ছিলাম এবং যেখানে খুশী যাওয়ার এবং যার সঙ্গে ইচ্ছা দেখা করার স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, তখন আমাকে প্রায়ই পিতামাতার বহু আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছে। কিন্তু এই সব আদেশ অমান্য করতে আমি কিছুমাত্র ইতঃস্তত করি নি কারণ ইতিমধ্যে বিবেকানন্দের প্রেরণায় আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আত্ম-বিকাশের জন্য বিদ্রোহ প্রয়োজন—শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর যখন কেঁদে ওঠে, তখন চতুষ্পার্শ্বের বন্ধনের বিরুদ্ধেই সে প্রতিবাদ জানায়।

আমার স্কুলের দিনগুলির দিকে ফিরে তাকালে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সকলে আমাকে একগুঁয়ে, খামখেয়ালী, ও অবাধ্য বলেই ধরে নিয়েছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাল ফল করে আমি স্কুলের গৌরব-বৃদ্ধি করব এই রকম আশা করা হয়েছিল। অথচ যখন আমার শিক্ষকেরা দেখলেন আমি পড়াশুনাকে অবহেলা করে ভস্মাচ্ছাদিত সাধুদের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি তখন তাঁরা খুব নিরাশ হয়েছিলেন। এবং যে ছেলের ভবিষ্যত সম্ভাবনাপূর্ণ তার মাথা বিগড়িয়ে যাওয়ার ফলে আমার বাবা-মার কি রকম ভাবনা হয়েছিল, তা-ও বেশ কল্পনা করা যায়। কিন্তু আমার মধ্যে যেসব স্বপ্ন ছিল সেগুলি ছাড়া আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাই নি, এবং যতই আমার সামনে বাধা এসে পথরোধ করছিল, ততই আমি জেদী হয়ে উঠছিলাম। এরপর অমার বাবা-মা ভাবলেন, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে হয়ত আমার ভাল হবে এবং কলকাতার বাস্তব আবহাওয়ায় আমার সব অদ্ভুত স্বভাব ঝেড়ে ফেলে আমি আমার সমবয়স্ক আর সকলের মতই স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারব।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে আমি সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলাম। আমার বাবা-মা বিশেষ আনন্দিত হলেন। আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

[১] মহরম উৎসব উপলক্ষ্যে মুসলমানেরা যে শারীরিক ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়ে থাকে।
[২] ধীরেন্দ্রনাথ কর।

প্রেসিডেন্সি কলেজ (১)

কলকাতায় আমার জন্য যা সঞ্চিত হয়ে ছিল, সে সম্পর্কে আমার আত্মীয়-স্বজন সামান্যই জানতেন। কটকে আমার চারপাশে যে সব অদ্ভুত স্বভাবের স্কুলের ছেলের ভীড় জমিয়ে তুলেছিলাম তাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু কলকাতায় দেখতে পেলাম, তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। শীঘ্রই যে বাবা-মা আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন, তাতে আর আশ্চর্য কি!

কলকাতায় এই আমার প্রথম পদার্পণ ছিল না। শৈশব থেকেই কয়েকবার সেখানে গিয়ে কাটিয়েছি। কিন্তু প্রতিবারই এই মহানগরী আমাকে এতই বিস্মিত ও বিমূঢ় করেছে যে বলার নয়। আমি এই শহরের প্রশস্ত রাজপথগুলিতে ও এর উদ্যান ও যাদুঘরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতাম আর মনে হত যে কারও পক্ষে এটি দেখে শেষ করা সম্ভব নয়। এটি যেন একটি অতিকায় প্রাণী, বাইরে থেকে যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকতে হয়। এবার কিন্তু আমি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে ও এর প্রকৃত জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য এসেছিলাম। অবশ্য তখন আমি জানতাম না যে, এটি এক যোগাযোগের শুরু, যা হয়ত সারা-জীবন থাকবে।

অন্য যে কোন আধুনিক বড় শহরের মত কলকাতার জীবনধারা সকলের পক্ষে অনুকূল নয়, এবং সেখানে বহু সম্ভাবনাময় জীবনের সর্বনাশ হয়েছে। আমার ক্ষেত্রে এরকম দুর্দশা ঘটতে পারত, যদি না আমার মনে কতকগুলি নির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতি দৃঢ়বদ্ধ করে আমি সেখানে আসতাম। যখন স্কুল ছাড়লাম তখন যদিও দারুন এক পরিবর্তনের ঝড় আমার মধ্যে বইছিল, তবুও ইতিমধ্যেই নিজের সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলাম। যাই হোক না কেন, গতানুগতিক পথে আমি চলব না; আমার জীবনের ধারা হবে এ রকম যা আমার আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও মানব-সমাজের উন্নতির সহায়ক হবে। আমি দর্শন নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা করব যাতে জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারি; বাস্তব-জীবনে যতটা সম্ভব অনুসরণ করব রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে, এবং কোনমতেই ব্যবহারিক জীবনের দিকে আমি যাব না। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম।

এই সব সংকল্প কোন এক রাত্রির চিন্তার ফলে গজিয়ে ওঠে নি, অথবা এতে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নির্দেশ ছিল না। মাসের পর মাস, ও বছরের পর বছর গভীর সন্ধানের ফলেই আমি এই সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম। আমার জীবন কিভাবে গঠিত হবে, শ্রেষ্ঠতম কি সেই আদর্শ যা নিজের সামনে তুলে ধরতে পারব, ইহা আবিষ্কারের জন্য আমাকে বহু বই পড়ে দেখতে হয়েছিল। যদি একদিকে আমার কুপ্রবৃত্তিগুলি ও অন্যদিকে পারিবারিক প্রভাব আমাকে না টানত, তাহলে এই আবিষ্কার কঠিন হত না. এবং একে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কাজও অধিকতর সহজসাধ্য হত। দুই দিকের এই চাপের ফলে, স্কুল-জীবনের শেষের দিকে আমাকে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটাতে হয়েছে, এবং পরিণামে অশান্তিভোগ করতে হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব আসলে নতুন কিছু ছিল না। যে কোন ব্যক্তি যে নিজের সামনে একটি আদর্শকে ধরে রাখে এবং নতুন কোন পথে চলতে চেষ্টা করে তাকেই ইহা সহ্য করতে হয়। কিন্তু দুটি কারণে আমার কষ্টভোগ অস্বাভাবিক রকম তীব্র হয়েছিল। প্রথমতঃ, লড়াইটা আমার জীবনে অনেক আগে শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, দুটি লড়াই একই সঙ্গে আমার উপর এসে পড়েছিল। যদি আমি একের পর এক তাদের সম্মুখীন হতাম তাহলে যন্ত্রণা অনেকখানি লাঘব হত। কিন্তু মানুষ সব-সময় নিজের ভাগ্যের রচয়িতা নয়, কখনও কখনও তাকে অবস্থার ক্রীড়নক হয়ে পড়তে হয়।

আমার মত অন্তর্মুখী ও ভাবপ্রবণ যুবকের পক্ষে দুই দিকের লড়াই-এর চাপ এত বেশী ছিল যে তার ফলে একেবারে ভেঙ্গে পড়া বা মানসিক বিভ্রান্তি ঘটা আমার ক্ষেত্রে ঘটা খুবই সম্ভব ছিল। সেরকম কিছু যে আমার হয়নি তা নিতান্তই অদৃষ্টের ফল কিংবা যদি বিশ্বাস করেন, উচ্চতর কোন শক্তির নির্দেশ। যেহেতু সেই কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অপেক্ষাকৃত অক্ষত অবস্থায় আমি বের হয়ে এসেছি, তাই আজ সেজন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। নিজেকে এই সান্ত্বনা দিতে পারি যে, এই সংগ্রাম আমার মধ্যে মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করেছিল। আগে

যে আত্মবিশ্বাস আমার ছিল না, তা লাভ করেছিলাম এবং আমার জীবনের কয়েকটি মূল নীতি নির্ধারণ করতে সফল হয়েছিলাম। কিন্তু, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বাবা-মা ও অভিভাবকদের সাবধান করে দিতে পারি যে, যে সব শিশু ভাবপ্রবণ ও অভিমানী প্রকৃতির তাদের সঙ্গে ব্যবহারে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত। কোন বিশেষ একটি ধাঁচে তাদের গড়ে তোলার জন্য জোর করার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, কেননা যতই তাদের শাসন করে রাখা হোক না কেন ততই তারা অবাধ্য হয়ে ওঠে, আর এই অবাধ্যতা শেষ-পর্যন্ত পুরোদস্তুর খামখেয়ালীপনায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্যদিকে, সহানুভূতি-সূচক মনোভাব দেখালে এবং সেই সঙ্গে কিছুটা স্বাধীনতা দিলে, তারা তাদের প্রকৃতিগত দোষগুলি ও খামখেয়ালিপনা কাটিয়ে উঠতে পারে। আর যখন তারা এমন কোন ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয় যার সঙ্গে সাংসারিক ধারণাগুলির মিল নেই, তখন পিতামাতা ও অভিভাবকদের তাতে বাধা দেওয়া বা উপহাস করা উচিত নয়; বরং তাদের বুঝতে এবং প্রয়োজন হলে এই বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই তাদের বশে আনার চেষ্টা করা উচিত।

ঈশ্বর, আত্মা ও ধর্ম—এ জাতীয় ধারণাগুলির সম্বন্ধে চরম সত্য যাই হোক না কেন, সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলতে পারি যে, ছোটবেলায় ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ ও যোগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দরুন আমার অনেকখানি উপকার হয়েছিল। জীবনের গুরুত্ব আমি বুঝতে শিখেছিলাম। কলেজ-জীবনের সূচনায় আমার নিশ্চিত ধারণা জন্মেছিল যে, জীবনের একটা অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হলে শরীর ও মনের নিয়মিত অনুশীলন প্রয়োজন। আমি স্কুল-জীবনে নিজেই এই প্রশ্নগুলির ভাব যদি না নিতাম, তাহলে জন্মগত শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যত জীবনের সমস্ত পরীক্ষা ও কষ্টভোগের সম্মুখীন হতে সমর্থ হতাম কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

আগেই বলেছি যে আমার জীবনে বিশেষ একটা সময় পর্যন্ত আমি আমার পরি-বেশের সঙ্গে নিজেকে চমৎকারভাবে মানিয়ে নিয়েছিলাম এবং বাইরে থেকে যে সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক বিচার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি মেনে নিয়েছিলাম। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এইরকম ঘটে থাকে। তারপর আসে একটা সংশয়ের কাল—ডেকার্টের মত শুধু মাত্র জ্ঞানগত সংশয় নয়—সমগ্র জীবনকে ঘিরে সংশয়। মানুষ তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন করতে শুরু করে—কেন সে জন্মেছে, কি তার জীবনের উদ্দেশ্য আর তার চরম লক্ষ্যই বা কি। স্থায়ী বা সাময়িক যে কোন প্রকারেরই হোক না কেন, এইরকম সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যদি সে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহলে প্রায়ই জীবন সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়—সব কিছুকে সে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে শুরু করে এবং প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যগুলির পুনর্নির্ধারণে ব্যাপৃত হয়। সে চিন্তা ও চরিত্রের এক নতন জগৎ নিজের মধ্যে তৈরী করে এবং তার দ্বারা বলীয়ান হয়ে বহির্জগতের সম্মুখীন হয়। তারপর, নিজের আদর্শ অনুযায়ী হয় সে তার পরিবেশকে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়, নতুবা সংগ্রামে হেরে গিয়ে বাস্তবের কাছে নতি স্বীকার করে। কার সংশয় কত দূর ব্যাপ্ত হবে এবং জগতকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সে তার আত্মিক জীবনকে কতটা পুনর্গঠন করতে চাইবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপর, এবিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি (পুরুষ অথবা স্ত্রী) পৃথক, তবে একটি সত্য সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভিতরের অথবা বাইরের কোনও মহৎ কাজই কারও জীবনে বিপ্লব ব্যতীত সম্ভব নয়। আর এই বিপ্লবের দুইটি ধাপ আছে—সংশয় বা নাস্তিকতার সময় এবং পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা। কি ব্যক্তিগত কি সমষ্টিগত—আমাদের বাস্তব জীবনের আমূল সংস্কারের জন্য যে সকল অপেক্ষাকৃত মৌলিক সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের খুব সঙ্গত কারণেই একটা সন্দেহের মনোভাব থাকতে পারে, ওগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। সুপ্রাচীন কাল থেকে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের বহু মতবাদ আছে, জড়বাদ বা নাস্তিকতার উপরে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত। যাই হোক, আমার নিজের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাধনা ছিল একটা বাস্তব প্রয়োজন। যে জ্ঞানগত সংশয় আমাকে পীড়া দিত তা নিরসনের প্রয়োজন হয়েছিল এবং আমার মানসিক অবস্থা তখন যেরূপ দাঁড়িয়েছিল তাতে যুক্তিসঙ্গত কোন দর্শন ব্যতীত ঐ নিরসন সম্ভব হত না, বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে যে দর্শন আমি খুঁজে পেয়েছিলাম তা আমার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে প্রায় যথেষ্ট ছিল এবং তাকে ভিত্তি করে আমার নৈতিক ও বাস্তব জীবন নতুন করে গড়ে তুলতে আমি পেরেছিলাম, এর সাহায্যে কয়েকটি মূলনীতি আমি শিখেছিলাম যার দ্বারা আমার সামনে যখনই কোন সমস্যা বা সঙ্কট দেখা দিত তখনই

আমার আচরণ কিংবা কার্যধারা নির্ণয় করা সম্ভব হত।

এর অর্থ এই নয় যে আমার সব সন্দেহের চিরকালের মত অবসান ঘটেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অতটা সরলপ্রকৃতিরও ছিলাম না, তাছাড়া জীবনের, জীবনের অগ্রগতির অর্থই তো একের পর এক সন্দেহের উদ্ভব আর সেগুলোর ক্রমাগত সমাধানের প্রয়াস।

আমার নিজের সঙ্গে বোধহয় সবচেয়ে তীব্র যে সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল তা হ'ল যৌন-প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে, আত্মোন্নতির জীবন মেনে না নিয়ে বরং আমার জীবনকে কোনও মহৎ কাজে উৎসর্গ করব—তা স্থির করার জন্য প্রকৃতপক্ষে আমাকে কোনও বেগ পেতে হয় নি, সেবা আর অনিবার্য ক্লেশপূর্ণ জীবনকে মেনে নিতে গেলে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কিছুটা প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, তবে যৌন প্রবৃত্তিকে দমন কিংবা মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল অবিরাম চেষ্টার; অদ্যাবধি তা চলছে।

আমার বিশ্বাস, যৌন প্রবৃত্তিকে পরিহার করে চলা, এমন কি সক্রিয় কামপ্রবৃত্তিকে দমন করাও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কিন্তু ভারতীয় যোগী ও ঋষিগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে কারও আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে তাই যথেষ্ট নয়। যে মানসিকতা প্রবৃত্তি (instinct) ও আবেগের ক্রীড়াভূমি এবং যা থেকে কাম প্রবৃত্তির উদ্ভব তাকে রূপান্তরিত করা দরকার, যখন এই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় তখন পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কোনও প্রকারের যৌন-আবেদন থাকে না এবং অপর সকলের যৌন-আবেদনে অবিচল থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়; কামকে সে তখন সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়, কিন্তু এটা সম্ভব, না অলীক কল্পনা মাত্র? রামকৃষ্ণের মতে এটা সম্ভব; এবং যতক্ষণ না কেউ সংযমের এই স্তরে উন্নীত হয় ততক্ষণ আধ্যাত্মিক চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছনো তার পক্ষে অসম্ভব। কথিত আছে, যে সমস্ত লোক রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতা ও মনের নিষ্কলুষতাকে বিশ্বাস করতেন না, তাঁরা প্রায়ই তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই যখন তাঁকে সুন্দরী রমণীদের মাঝে ছেড়ে দেওয়া হত তখন তাঁর মধ্যে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যেত তা যৌনসম্বন্ধীয় ছিল না। মায়ের কাছে নিষ্পাপ শিশু যেরকম বোধ করে থাকে, তিনিও রমণীদের সান্নিধ্যে তদ্রূপ বোধ করতেন। রামকৃষ্ণ সর্বদাই বলতেন যে, কামিনী আর কাঞ্চন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সর্বপ্রধান দুটি বাধা, এবং তাঁর কথাগুলোকে আমি বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছিলাম।

বাস্তব ক্ষেত্রে অসুবিধা ছিল যে, যতই আমি যৌন-প্রবৃত্তিকে দমন কিংবা মহত্তর প্রেরণায় রূপান্তরিত করার জন্য গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলাম ততই তা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে বলে বোধ হয়েছিল—অন্ততঃ প্রাথমিক অবস্থায় তো বটেই যৌন-সংযম আয়ত্ত করবার ব্যাপারে দৈহিক ও মানসিক কয়েকটি অভ্যাস ও সেই সঙ্গে কয়েক প্রকারের ধ্যান সহায়ক হয়েছিল। যদিও ক্রমে ক্রমে আমার উন্নতি হচ্ছিল, তবু রামকৃষ্ণ শুদ্ধতার যে মাত্রার উপর জোর দিয়েছিলেন তা অর্জন করা অসম্ভব বলেই বোধ হয়েছিল, মানব মনে এই যৌন প্রবৃত্তি যে কিরূপ স্বাভাবিক সে সময়ে তা জানতাম না, তাই মাঝে মাঝে অবসাদ ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করলেও চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলাম, পরিপূর্ণ শুদ্ধতা লাভের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম বলেই ভবিষ্যত জীবনে যে অকৃতদার থাকব তা ধরে নিতে হয়েছিল।

প্রাণীজীবনে যেমন, মানবপ্রকৃতিতেও তেমনি যা জন্মগত প্রবৃত্তি তাকে সমূলে বিনষ্ট কিংবা মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের এত বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করা উচিত কি না—এটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। অবশ্য বাল্যে ও যৌবনে শুদ্ধতা এবং মিতাচারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন তা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী,—যৌন চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা। যাই হোক, আমাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির সঞ্চয় সীমিত। কামজয়ের চেষ্টায় তাকে এত বেশী পরিমাণে ব্যয় করার সার্থকতা কি? প্রথমতঃ, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পুরোপুরি কামজয় অর্থাৎ যৌন-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা বা মহত্তর লক্ষ্যে তাকে চালিত করা কি অপরিহার্য? দ্বিতীয়তঃ যদি বা তা হয় যে জীবন আধ্যাত্মিক সাধনা অপেক্ষা সমাজসেবায়—অর্থাৎ অধিকাংশ জনগণের সর্বোত্তম কল্যাণ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, সে জীবনে যৌন-সংযমের[১] আপেক্ষিক গুরুত্ব কতটা? এ দুটি প্রশ্নের উত্তর যাই হোক না কেন,

[১] যেহেতু আমি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার আদর্শ থেকে ক্রমে ক্রমে সমাজসেবার জীবনে সরে এসেছি, সে কারণে যৌন বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাগুলোর পরিবর্তন হয়েছে।

১৯১৩ সালে যখন আমি কলেজে ভর্তি হই তখন আমার মনে এ ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আধ্যাত্মিকতার পথে চলতে গেলে কামজয় প্রয়োজন, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত মানুষের জীবনের মূল্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে কামরিপুকে যদিও সংযত করে রেখেছিলাম, তাকে বশে আনতে পারি নি।

নতুন করে আবার যদি আমার জীবন শুরু করতে পারতাম তা হলে খুব সম্ভবতঃ আমি যৌন বিষয়ে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতাম না, বাল্যে ও যৌবনে যা করেছি। এর অর্থ এই নয় যে যা করেছি তার জন্য অনুতাপ করছি। যৌন-সংযমকে খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে যদি কোনও ভুল করে থাকি, সে ভুলে সম্ভবতঃ আমার ভালই হয়েছে, কেননা এর ফলে ঘটনাচক্রে হলেও আমি উপকৃত হয়েছিলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, এর ফলে নিজেকে এমন একটা জীবনের জন্য তৈরী করে তুলেছিলাম যা চিরাচরিত পথ ধরে চলবে না এবং যাতে স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও নিজের বৈষয়িক উন্নতির কোনও স্থান নেই।

আমার কাহিনীতে ফিরে যাওয়া যাক; আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম এবং এটা তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ কলেজ বলে গণ্য হত। গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলবার আগে তিন মাসের ছুটি পেয়েছিলাম। আমি কিন্তু সেই দলটার সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেরী করলাম না, যার একজন গুপ্ত প্রচারকের সঙ্গে একবছর আগে কটকে দেখা হয়েছিল। কলকাতার মত বড় শহরে ষোল বছরের একটি ছেলে প্রায়ই দিশেহারা হয়ে পড়ে, কিন্তু আমার অবস্থা সেরকম হয়নি। কলেজ খুলবার আগেই কলকাতায় নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম এবং আমার মনের মতো বন্ধুও জুটে গিয়েছিল অনেক।

কলেজ জীবনের প্রথম কয়েকটি দিন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক (interesting) হয়েছিল। ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অপেক্ষা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার মান নিম্ন হওয়ায় ভারতীয় ছেলেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংরেজ ছেলেদের তুলনায় অনেক আগেই কলেজে প্রবেশ করে। আমার বয়স তখন সবে মাত্র সাড়ে ষোল বছর যখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের সীমানায় পা দিলাম; তবু অন্যান্য অনেকের মতই, আমারও মনে হয়েছিল যেন হঠাৎ পূর্ণবয়স্ক এক মানুষের মর্যাদালাভ করতে চলেছি। তাতে বাস্তবিকই একটা সুখের অনুভূতি ছিল। আমরা আর বালক নই, এবং এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছি। প্রথম কয়েকদিন আমাদের সহপাঠীদিগের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে ও তাদের দর বুঝতে কেটে গেল। যারা শীর্ষস্থান অধিকার করেছে তাদের দেখবার জন্য প্রত্যেকেই ব্যগ্র বলে বোধ হচ্ছিল। জেলা শহর থেকে আসার দরুণ আমি প্রথমতঃ লাজুক ও গম্ভীর হয়ে ছিলাম। হিন্দু এবং হেয়ার স্কুলের মত কলকাতার স্কুলগুলো থেকে আগত ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ উন্নাসিক ছিল এবং নিজেদের সম্বন্ধে জাহির করত। কিন্তু তারা ঐরকম চালিয়ে যেতে পারে নি, কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চতর স্থানগুলোর বেশীরভাগই দখল করেছিল অন্যান্য স্কুলের ছেলেরা এবং উপরন্তু আমরা শীঘ্রই এই শহুরেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে সমর্থ হয়েছিলাম।

অনতিবিলম্বেই আমার সহপাঠীদিগের মধ্যে এরূপ লোকদের খুঁজতে শুরু করলাম যাদের চিন্তাধারা আমার মতই ছিল। সমচিন্তার লোকেরা নাকি একসঙ্গে ভীড় জমায়—তাই এরূপ একটা দলের সন্ধান পেয়ে গেলাম। আমরা জ্ঞাতসারেই বাহ্যিক চালচলনে কঠোর নীতিবাগীশ ছিলাম বলে এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, আমাদের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে; কিন্তু আমরা তা অগ্রাহ্য করতাম। তখনকার দিনে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কয়েকটি দল[১] দেখা যেত, প্রত্যেকটির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের ছেলেরা আর তাদের সাথে দহরম মহরম করতে যারা ভালবাসত তাদের নিয়ে ছিল প্রথমে একটা দল, তারা সাজত ভাল এবং পড়াশুনার প্রতি তাদের আগ্রহও খুব গভীর ছিল না। তারপর আর একটি দল ছিল বই-এর পোকাদের নিয়ে—তাদের মুখের বর্ণ ছিল পাণ্ডুরাভ এবং চোখে পুরু চশমা, নেহাৎই ভাল ছেলে তারা। তৃতীয়তঃ ছিল আমাদের মত নিষ্ঠাবান ছাত্রদের নিয়ে একটি দল, যারা নিজেদের রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী বলে মনে করত, শেষে উল্লেখ করলেও, বিপ্লবীদের একটা গুপ্ত দলও কম ছিল না, যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছাত্রদের অধিকাংশই খুব বেশী অবহিত ছিল না। প্রেসিডেন্সী

[১] কখনও কখনও এই দলগুলোর মধ্যে একটার সাথে অপরটার সংঘর্ষ ঘটত।

কলেজের বৈশিষ্ট্যও সে সময়ে ভিন্ন প্রকারের ছিল।[১] যদিও এটা একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান, তবু ছাত্ররা সচরাচর আর যাই হোক না কেন রাজানুগত্যে বিশ্বাসী ছিল না। কারণ, কোনও অতিরিক্ত সুপারিশ ও বংশপরিচয় ব্যতিরেকে সবচেয়ে ভাল ছাত্রদেরকেই কলেজে ভর্তি করা হত। C.I.D. -র দপ্তরে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের একটা দুর্নাম আছে—এরূপ একটা গুজব ছিল। কলেজের প্রধান হোস্টেল, যা ইডেন হিন্দু হোস্টেল নামে পরিচিত ছিল, তাকে রাজদ্রোহের উপযোগী ক্ষেত্র ও বিপ্লবীদের মিলনস্থল বলে মনে করা হত; এবং সেখানে প্রায়ই পুলিসের তল্লাসী চলত।

কলেজ জীবনের প্রথম দুই বছর উপরোক্ত দলটির প্রভাব বিশেষভাবে আমার উপর পড়েছিল এবং এই সময় জ্ঞানের দিক থেকে আমি উন্নতি করেছিলাম। প্রধানতঃ ছাত্রদের নিয়ে দলটি গঠিত হয়েছিল, নেতা ছিলেন মেডিকেল কলেজের[৩] দুইজন ছাত্র। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষা সাধারণভাবে এ'রা অনুসরণ করতেন, তবে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় হিসেবে জোর দিতেন সমাজসেবার উপর। সমাজসেবা বলতে বিবেকানন্দের অনুগামীগণের ন্যায় এ'রা হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণই বুঝতেন না, বরং এ'দের মতে তা ছিল জাতীয় পুনর্গঠন, প্রধানতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে।[৪] বিবেকানন্দের নিজের অনুগামীগণ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর শিক্ষাগুলোকে অবহেলা করেছেন—আমরা ঐগুলোকে কার্যকর করতে চেয়েছিলাম। সুতরাং আমাদেরকে নব্য-বিবেকানন্দগোষ্ঠী বলা যেতে পারত এবং আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শুধু মতবাদের ক্ষেত্রেই নয়, বাস্তব জীবনেও ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা। তখনকার দিনে কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়ায় জাতীয়তাবাদের এই গুরুত্ব অনিবার্য ছিল।

১৯১৩ সালে যখন আমি কটক ত্যাগ করলাম তখন আমার মতামত সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল না। আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও এক ধরনের সমাজসেবা সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা আমার ছিল। কলকাতায় আমি শিখলাম যে যোগের একটা অবিচ্ছেদ্য অংগই হল সমাজসেবা এবং এর দ্বারা শুধু খোঁড়া, পংগু ও অন্ধকে সাহায্য করাই নয়, বরং আধুনিক ভিত্তিতে জাতীয় পুনর্গঠন বোঝায়। দলটি বহুদিন পর্যন্ত এর বেশী আর অগ্রসর হয় নি, কারণ আমার মতই দলটিও আরও আলোক ও তার বাস্তব আদর্শগুলোর একটা ব্যাখ্যার জন্য হাতড়াচ্ছিল। দলটি সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল এই যে এর সদস্যরা খুব সতর্ক ও সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে খুব পণ্ডিত ছিলেন। দলের কার্যকলাপ তিনদিকে প্রকাশ পেয়েছিল। নতুন নতুন ভাবধারাগুলোর জন্য ছিল একটা স্পৃহা; তাই দর্শন, ইতিহাস এবং জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে নতুন নতুন বই আগ্রহের সাথে পড়া হত এবং সংগৃহীত তথ্য পৌঁছিয়ে দেওয়া হত অপর সকলের কাছে। নানা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে নতুন নতুন সদস্য করবার ব্যাপারেও দলের সদস্যগণ সক্রিয় ছিলেন, যার ফলে অল্পকালের মধ্যেই এর সংগঠন অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তৃতীয়ত, সে সময়কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংগে যোগাযোগ করার ব্যাপারেও দলের সদস্যরা তৎপর ছিলেন। ছুটিগুলো কাটানো হত কাশী অথবা হরিদ্বারের মত তীর্থস্থানগুলিতে, এই আশায় যে এমন সব ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলবে যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রেরণা দিতে পারবেন। আবার যাঁরা জাতীয় ইতিহাসে আগ্রহী ছিলেন তাঁরা ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে গিয়ে সেখানেই ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশুনা করতেন। আমি একবার একটি ভ্রাম্যমাণ দলের সংগে গিয়েছিলাম, যাঁরা বই হাতে সাত দিন ধরে প্রাক্-ব্রিটিশ আমলের বাংগলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং তার ফলে বাংগলার পূর্বেকার ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বাড়িতে অথবা স্কুলে মাসের পর মাস যা করতে পারতাম না, তার চাইতে বেশী অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলাম।

গুরুত্বপূর্ণ কোনও কোনও প্রশ্নে দলের মতামত সুনির্দিষ্ট ছিল না। আমাদের নিজ নিজ পরিবারের সংগে আমাদের সম্পর্ক ছিল এইরকম একটা প্রশ্ন। দলের নাম, গঠনতন্ত্র, কাজের পরিকল্পনা ইত্যাদি কোনটাই ঠিক ছিল না। তবে আমাদের ধারণা

---

[১] কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে স্বর্গতঃ স্যার জে. সি. বসু ও স্যার পি. সি. রায়ের মতো লোকেরা থাকায়ও কিছুটা ফল হয়েছিল।

[২] ভারতের Scotland Yard (Criminal Investigation Department)

[৩] এস. সি. বি এবং জে. কে. এ।

[৪] সম্ভবতঃ খৃষ্টান মিশনারীদের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে কিছুটা কাজ করেছিল।

ধীরে ধীরে উচ্চস্তরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার দিকে চলেছিল যা প্রকৃত মানুষ তৈরী করবে এবং বিভিন্ন স্থানে যার শাখা থাকবে। দলের কিছু কিছু সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তি-নিকেতন ও উত্তর ভারতে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে পড়াশুনা করছিলেন। নতুন সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্রদের তালিকাভুক্ত করার দিকে মনোযোগ দেওয়া হত, যাতে আমাদের পরিকল্পনাকে চালু করার সময় সমস্ত বিষয়েই আমরা শিক্ষণপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের লাভ করতে পারি। দলের আদর্শ ছিল চির-কুমার থাকা এবং নেতৃগণ মনে করতেন যে কোনও না কোনও অবস্থায় পরিবারের সংগে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

সদস্যরা যে পথে চলেছিল, তাতে পারিবারিক বিচ্ছেদ অনিবার্য ছিল কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হত না। সাপ্তাহিক ছুটি-গুলির অধিকাংশই বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে কাটানো হত, প্রায়ই তার জন্য অনুমতি নেওয়া হত না। কখনও কখনও বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের মঠের মত প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাওয়া হত। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের[১] সংগে, সাধারণত যাঁরা ধর্মীয় ভাবাপন্ন ছিলেন, কখনও কখনও সাক্ষাৎ করা হত। কখনও বা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দলের সদস্যরাই আমাদের নিমন্ত্রণ করত এবং একদিন বা দু-দিন আমরা তাঁদের সংগে কাটাতাম। কলেজের সময় ছাড়া বেশীর ভাগ সময়ই আমার দলের সভ্যদের সংগে কাটত। বাড়ির প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ ছিল না—কারণ এটি আমার স্বপ্নের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। আমার জীবনে দ্বিমুখী দ্বন্দ্ব চলছিলই এবং তা মানসিক অশান্তির উৎস। আমার ধারণা বা কার্যকলাপ সম্পর্কে যখনই বাড়িতে বিরূপ মন্তব্য করা হত, তখনই তা বৃদ্ধি পেত।

রাজনীতির ব্যাপারে দলটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও যে কোন প্রকারের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বিরোধী ছিল। ছাত্রদের মধ্যে দলটি সেজন্য তত প্রিয় হয়ে ওঠে নি; কারণ তখনকার দিনে সন্ত্রাসবাদমূলক বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতি বাঙ্গলাদেশের ছাত্রদের অদ্ভুত একটা আকর্ষণ ছিল। এমন কি যারা এইরকম কোন সংগঠন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলত তারা নিজেরা কোন ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়লে, অন্যদিকে জনশ্রুতি ও সরকারী অভিযোগ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদী পথিকৃৎ তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সংগে তাঁকে যুক্ত করে তাঁকে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। শেষে এটাও অনস্বীকার্য যে আধ্যাত্মিকতা ও রাজনীতির সংমিশ্রণ ধর্মীয় ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিকট তাঁর ব্যক্তিত্বকে অধিকতর মহিমময় করে তুলেছিল। ১৯১৩ সালে যখন আমি কলকাতায় এলাম, তার পূর্বেই অরবিন্দ এক কিংবদন্তীর পুরুষ হয়ে উঠেছেন। কোনও নেতা সম্বন্ধে লোককে এরূপ গভীর উৎসাহের সাথে কথা বলতে আমি খুব কমই দেখেছি: এবং এই বিরাট পুরুষটি সম্বন্ধে কতই না কাহিনী ছিল—কিছু কিছু সম্ভবতঃ সত্য,—যা মুখে মুখে ছড়াত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, আমি শুনেছিলাম যে অরবিন্দের আপনা-আপনি লিখবার মত একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। অর্ধ-সমাধি অবস্থায়, পেন্সিল হাতে, তাঁর লিখিত সংলাপ চলত নিজের সাথে যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'মানিক'। তাঁর বিচারের সময় ঐ সব কাগজপত্রের কিছু কিছু পুলিসের চোখে পড়ে যায়, যেগুলোর মধ্যে 'মানিকের' সাথে কথোপকথনগুলো লিপিবদ্ধ ছিল; এবং একদিন পুলিস প্রসিকিউটর, এই আবিষ্কারের ফলে উত্তেজিত হয়ে আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে এক নতুন ষড়যন্ত্রকারী 'মানিকের' বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারীর প্রার্থনা জানান; কাঠগড়ার সম্মুখস্থ ভদ্রমহোদয়গণ এতে পরম কৌতুক উপভোগ করেছিলেন।

এইসময় এরূপ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে অরবিন্দ বারো বছর ধ্যান করার জন্য পণ্ডিচেরীতে অবসর গ্রহণ করেছেন। ঐ সময় পার হয়ে গেলে স্বদেশের রাজনৈতিক মুক্তিকে ফলপ্রসূ করবার জন্য প্রাচীনকালের গৌতম বুদ্ধের মত একজন 'সিদ্ধ' পুরুষ-রূপে তিনি সক্রিয় জীবনে প্রত্যাবর্তন করবেন। অনেক লোক সত্য সত্যই এটা বিশ্বাস করত, বিশেষতঃ যাঁরা মনে করতেন যে, কোনও অপার্থিব শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ব্রিটেন-বাসীদের সাথে স্থূল শক্তির লড়াইয়ে সাফল্য অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। এটা লক্ষ্য ও অনুধাবন করার বিষয় যে মানুষের মন যখন কোনও অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক বাধার সম্মুখীন হয় তখন তা আধ্যাত্মিক উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের পর যখন

[১] কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও আমরা গিয়েছিলাম, এবং তিনি গ্রামের পুনর্গঠন সম্বন্ধে একটি আলোচনা করেছিলেন। কংগ্রেস এই কাজের ভার নেওয়ার বহু আগে ১৯১৪ সালে ইহা ঘটেছিল।

বিরাট আন্দোলন শুরু হয়, তখন অলৌকিক কিছু কিছু গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন, বলা হত যে ব্রিটিশের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার দিনে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে এক 'কম্বলধারীদের অভিযান' হবে। সন্ন্যাসী বা ফকিররা তাঁদের কাঁধে কম্বল নিয়ে ফোর্টের ভিতরে প্রবেশ করবেন। ব্রিটিশ সৈন্যরা লড়তে বা যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং জনগণের হাতে ক্ষমতা চলে যাবে। ইচ্ছা থেকে এরূপ চিন্তা জন্মে এবং আমরা আমাদের বাল্যকালে এরূপ গল্প শুনতে ও বিশ্বাস করতে ভালবাসতাম।

কলেজের ছাত্ররূপে যা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল তা অরবিন্দের নামকে ঘিরে দুর্জ্ঞেয়তা নয়, বরং তাঁর রচনা ও পত্রগুলি। অরবিন্দ তখন 'আর্য্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর দর্শন ব্যাখ্যা করতেন। বাংলা দেশে কয়েকজন বিশেষ লোকের কাছে তিনি পত্রও লিখতেন। ঐসব পত্র হাতে হাতে দ্রুত ঘুরে বেড়াত, বিশেষতঃ সেইসব মহলে যারা আধ্যাত্মিকতা মিশ্রিত রাজনীতিতে আগ্রহী ছিল। আমাদের মহলে সাধারণতঃ কোনও একজন পত্র পড়িয়ে শুনাত এবং আমাদের মধ্যে বাকী সকলে তা থেকে উদ্দীপনা লাভ করত। এরূপ একটি পত্রে অরবিন্দ লিখেছিলেন, 'আমাদেরকে অবশ্যই দিব্য আলোকশক্তির উৎস হতে হবে, যাতে আমাদের প্রত্যেকে যখন উঠে দাঁড়াবে তখন চতুর্দিকে হাজার হাজার জন সেই আলোকে উদ্ভাসিত হবে—স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।' আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলাম যে জাতীয় সেবাকে কার্যকরী করতে আধ্যাত্মিক সিদ্ধির প্রয়োজন।

কিন্তু যা আমাকে স্থায়িভাবে প্রভাবিত করেছিল তা এরূপ চমকপ্রদ উক্তিগুলো নয়। তাঁর গভীরতর দর্শন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। শংকরের মায়াবাদ কাঁটার মত আমার মধ্যে বিঁধেছিল। আমি আমার জীবনকে তার সাথে মানিয়ে নিতে বা সহজে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারিনি। এর পরিবর্তে প্রয়োজন হয়েছিল আমার আর একটি দর্শনের। এক ও বহু এবং ঈশ্বর ও সৃষ্টির মধ্যে সমন্বয়,—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যা প্রচার করেছেন,—বাস্তবিকই আমার মনে রেখাপাত করেছিল কিন্তু তখনও পর্যন্ত তা মায়ার বন্ধন থেকে আমাকে মুক্তি দিতে পারেনি। এই মুক্তির পথে অরবিন্দ আমার আর এক সহায়রূপে দেখা দিলেন। দর্শনের দিক দিয়ে তিনি আত্মা ও জড়, ঈশ্বর ও সৃষ্টির মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেছিলেন এবং সত্যকে লাভ করবার উপায়গুলোর মধ্যে যোগসাধন করে তাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন—যার নাম দিয়েছিলেন তিনি যোগের সমন্বয়। হাজার হাজার বছর আগে ভগবদ্গীতায় বিভিন্ন যোগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—জ্ঞানযোগ অথবা জ্ঞানের সাহায্যে সত্যোপলব্ধি; ভক্তিযোগ অথবা প্রেম ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে সত্যোপলব্ধি; কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মের দ্বারা সত্যোপলব্ধি। এর সাথে পরে অন্যান্য মতের যোগ যুক্ত হয়েছে—দৈহিক সংযমের জন্য হঠযোগ এবং শ্বাসযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মানসিক সংযমের উদ্দেশ্যে রাজযোগ। চরিত্রকে সব দিক দিয়ে গড়ে তোলার জন্য জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের প্রয়োজনের কথা বিবেকানন্দ অবশ্য স্বীকার করেছেন, কিন্ত যোগের সমন্বয় সম্বন্ধে অরবিন্দের ধারণার মধ্যে মৌলিক ও অতুলনীয় কিছু ছিল। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন কিরূপে বিভিন্ন যোগের যথাযথ অনুশীলনের দ্বারা কেউ ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ সত্যে উপনীত হতে পারে। পরবর্তীকালের বাংলার বৈষ্ণবগণের জ্ঞান ও কর্মের বিরুদ্ধাচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অরবিন্দের লেখাগুলো পড়ে কি নতুন শক্তি, প্রেরণাই না লাভ করা যেত! আমার মতে অরবিন্দকে মানব সমাজের আদর্শ গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যা আবশ্যক ছিল তা হল সক্রিয় জীবনে তাঁর প্রত্যাবর্তন।

অরবিন্দ থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক ধরনের ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি একসময় বাংলার নায়ক ও অবশ্যই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন। কলকাতা টাউন হলে[১] দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ[২] অভিযানের ব্যাপারে এক সভায় তাঁকে আমি প্রথম দেখি। সুরেন্দ্রনাথের তখনও পূর্ণ প্রতিপত্তি এবং তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর ও ছন্দসমৃদ্ধ বক্তৃতার সাহায্যে তিনি সভায় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষার অলঙ্কার ও উৎকৃষ্ট বাগ্মিতা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে সেই গভীরতর ভাবাবেগ ছিল না যা পাওয়া যেত অরবিন্দের এরকম সরল কথাগুলোর মধ্যেঃ

[১] ১৯১৩ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯১৪ সালের গোড়ায় সম্ভবতঃ এটা ঘটেছিল।
[২] একে ভাবান্তরে বলা যেতে পারে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' অথবা 'আইন অমান্য আন্দোলন'।

"আমি দেখতে চাই যে সেই দারিদ্র্য ও অখ্যাতি তোমরা মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত করেছ। মাতৃভূমির গৌরব তোমাদের কর্মের লক্ষ্য হোক, তোমাদের দুঃখবরণের ভিতর দিয়ে মাতৃভূমি পরমানন্দ লাভ করুক।"[1]

যতদিন রাজনীতিতে আমার আগ্রহ জন্মেনি, ততদিন দুটি জিনিষের প্রতি আমি মনোনিবেশ করেছিলাম—যত বেশী সম্ভব ধর্মীয় আচার্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং সমাজসেবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করা। কলকাতায় কিংবা তার কাছাকাছি এমন কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ছিল কি না যার সংস্পর্শে আমরা আসি নি, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। সমাজসেবার ব্যাপারে কিছু অভিনব ও উপভোগ্য অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। যখন আমি বাস্তবে কিছু কাজ করবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলাম, তখন দরিদ্রকে সাহায্য করে এরকম একটি সমিতির সন্ধান পেয়ে গেলাম। প্রতি রবিবারে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে এই সমিতি[2] অর্থ ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত। ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকেরা ভিক্ষাকার্য করত এবং আমিও তাদের একজন হয়ে গিয়েছিলাম। সংগ্রহের মধ্যে প্রধানতঃ থাকত চাল, এবং প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে তার পালার শেষে প্রায় ১মণ থেকে ২মণের মত চাল আনতে হত। প্রথম যেদিন চাল সংগ্রহের জন্য থলি হাতে বের হলাম, এ জাতীয় কাজে অভ্যস্ত ছিলাম না বলে মন শক্ত করে একটা তীব্র লজ্জাবোধ আমাকে জয় করতে হয়েছিল। আজ পর্যন্ত আমি জানি না আমাদের পরিবারের লোকেরা আমার এই কার্যের বিষয়ে কোনও দিন জানতে পেরেছিলেন কিনা। এই লজ্জাবোধ আমাকে অনেকদিন পর্যন্ত পীড়া দিয়েছিল এবং যখনই কোন পরিচিত ব্যক্তির সামনে পড়ে যাওয়ার ভয় হত, আমি ডাইনে বা বামে কোনও দিকে না তাকিয়ে হাতে বা কাঁধে থলি চাপিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যেতাম।

কলেজে আমার পড়াশোনায় অবহেলা করতে শুরু করেছিলাম। অধিকাংশ লেকচারই ছিল নীরস[3], আর অধ্যাপকরাও ছিলেন ততোধিক। আমি অন্যমনস্কভাবে বসে বসে এরূপ নিরর্থক পড়াশোনার সার্থকতা দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করে যেতাম। সর্বাধিক বিরক্তিকর ছিলেন অঙ্কের অধ্যাপক, আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন সূত্রগুলো তাঁর একঘেয়ে টেনে টেনে বুঝাবার চেষ্টায় বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে যেতাম। জীবনটাকে আরও চিত্তাকর্ষক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ করার জন্য, ছাত্রসম্প্রদায়ের নানাপ্রকার জনসেবার কাজে আমি নিজেকে নিয়োগ করেছিলাম, খেলাধূলাকে অবশ্য বাদ দিয়ে। বিখ্যাত রসায়নবিদ ও মানবপ্রেমিক স্যার পি. সি. রায়, যিনি আমাদের বিভাগে ছিলেন না কিন্তু ছাত্রদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন,—তাঁর মত অধ্যাপকদের সাথে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করতাম। বিতর্কসভার আয়োজন করা, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার গঠন করা, কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রদের প্রতিনিধি হয়ে যাওয়া,—সহাধ্যায়ীদের নিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণে বের হওয়া ভাল লাগত—এরকম কাজই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা ভাল লাগত। খুব ধীরে ধীরে আমি আমার অন্তর্মুখিনতা ঝেড়ে ফেলছিলাম এবং ব্যক্তিগত যোগ-সাধনার বদলে সমাজসেবা করছিলাম।

মাঝে মাঝে আমার আশ্চর্য বোধ হয় কিরূপে বিশেষ কোন একটা মুহূর্তে ক্ষুদ্র একটা ঘটনা আমাদের জীবনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে যেতে পারে। কলকাতায় আমাদের বাড়ীর সম্মুখে বসে এক জবুথবু বৃদ্ধা ভিখারী মহিলা প্রতিদিন ভিক্ষা করত। যতবার আমি বাইরে যেতাম বা বাড়ি ফিরতাম, তাকে না দেখে পারতাম না। যখনই তাকে দেখতাম বা এমনকি তার কথা চিন্তা করতাম, তার করুণ মুখখানি আর তার ছিন্ন বস্ত্র আমাকে যন্ত্রণা দিত। পাশাপাশি, নিজেকে এত সচ্ছল ও সুখী মনে হত যে আমি অপরাধী বোধ করতাম। আমার মনে হত—তিনতলা বাড়ীতে বাস করার মত এরূপ ভাগ্য লাভ করার কি অধিকার ছিল আমার, যখন এই নিঃস্ব ভিখারী মহিলাটির তার মাথার উপরে কোনও আচ্ছাদন এবং প্রকৃতপক্ষে কোনও খাদ্য বা বস্ত্র জুটত না? পৃথিবীতে এত দুঃখ যদি থেকেই যায় তাহলে যোগের কি মূল্য? এরকম সব চিন্তা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

কিন্তু কি করার ছিল আমার? একটা সামাজিক ব্যবস্থাকে একদিনে ভাঙতে বা রূপান্তরিত করতে পারা যায় না। ইতিমধ্যে এই ভিখারী মহিলাটির জন্য কিছু একটা

---

[1] অরবিন্দের একটা রাজনৈতিক বক্তৃতার এটা উদ্ধৃতাংশ যা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবৃত্তি করতে ভালবাসতেন।

[2] দক্ষিণ কলকাতার অনাথ ভাণ্ডার।

[3] এই ধারণা নিশ্চয়ই কতকটা এই কারণে হয়েছিল যে পড়াশোনায় আমার আগ্রহ কমে গিয়েছিল।

করা দরকার—এবং নিজেকে জাহির করার চেষ্টা না করে, তা করতে হবে। ট্রামে করে কলেজে যাতায়াতের জন্য বাড়ী থেকে আমি টাকাকড়ি পেতাম। তা আমি সঞ্চয় করে দানকার্যে ব্যয় করব স্থির করলাম। প্রায়ই আমি কলেজ থেকে হেঁটে বাড়ী ফিরতাম—যার দূরত্ব ছিল তিন মাইলের উপর—এবং কোনওদিন যথেষ্ট সময় থাকলে হেঁটেও কলেজে যেতাম। তা আমার অপরাধবোধ কতকাংশে লাঘব করেছিল।

কলেজের প্রথম বৎসরে আমি পিতামাতার সাথে ছুটি কাটাবার জন্য কটকে ফিরে গেলাম। কলকাতায় আমার কার্যকলাপের নজির কটকের অপেক্ষাও খারাপ ছিল, সেজন্য সেখানে আমার বন্ধুদের নিকট ফিরে যেতে দেওয়ায় কোনও ক্ষতি ছিল না, কটকে যদিও আমি আমার বন্ধুদের সাথে নিয়মিতভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি, তবু রাত্রিকালে কখনও বাড়ির বাইরে থাকি নি। কিন্তু কলকাতায় প্রায়ই আমি অনুমতি ছাড়াই দিনের পর দিন বাড়ির বাইরে কাটাতাম। কটকে ফিরে আমার পুরোনো দলের সাথে পুনরায় মিলিত হলাম। একবার, যখন আমার পিতমাতা শহরের বাইরে গিয়েছিলেন, বন্ধুদের একটা দলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আমাকে বলা হল, যারা কলেরায় আক্রান্ত একটা সুদূরবর্তী অঞ্চলে সেবাকার্য চালাবার জন্য যাচ্ছিল। দলে কোনও চিকিৎসক ছিল না। আমাদের ছিল শুধু একজন আধা ডাক্তার যাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল একটা হোমিওপ্যাথির বই, এক বাক্স হোমিওপ্যাথির ওষুধ, আর ছিল যথেষ্ট সাধারণ বুদ্ধি; আমরা ছিলাম দলে সেবাকার্য করবার জন্য। আমার এক মাতুল তখন পিতার হয়ে দেখাশোনা করছিলেন; আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম এবং এই বলে তাঁর নিকট বিদায় চাইলাম যে কয়েকদিনের জন্য আমি বাইরে থাকব। তিনি তখন জানতেন না যে আমি কলেরা রোগীর সেবা করার জন্য বাইরে যাচ্ছি, সেজন্য আপত্তি করলেন না। মাত্র এক সপ্তাহ বাইরে ছিলাম, কেননা আমি চলে যাবার কয়েকদিন পরেই আমার মাতুল আমাদের আসল মতলব জানতে পেরে আমার পিছন পিছন আরেকজন মাতুলকে পাঠিয়েছিলেন অবিলম্বে আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। সারা গ্রামাঞ্চল খুঁজে আমাদের পাওয়া গিয়েছিল।

তখনকার দিনে কলেরাকে একটা মারাত্মক ব্যাধি বলে মনে করা হত এবং কলেরা রোগীর সেবা করার জন্য লোক পাওয়া সহজ ছিল না। ঐ বিষয়ে আমাদের দল ছিল সম্পূর্ণ নির্ভয়। বস্তুতঃ, সংক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা কোনও সাবধানতাই অবলম্বন করতাম না এবং আমরা সকলেই একসঙ্গে থাকতাম ও খাওয়া-দাওয়া করতাম। প্রকৃত চিকিৎসার ব্যাপারে আমরা বেশী সাহায্য করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। আমরা সেখানে পৌঁছবার আগেই অনেকে মারা গিয়েছিল এবং যে সমস্ত রোগীকে আমরা দেখেছি ও সেবা করেছি, তাদের মধ্যে অধিকাংশই সেরে ওঠে নি। তথাপি এক সপ্তাহের অভিজ্ঞতা আমার চোখের সামনে এক নতুন জগৎ খুলে দিয়েছিল এবং প্রকৃত ভারতবর্ষের একটা চিত্র উদ্ঘাটিত করেছিল। বহু গ্রাম নিয়ে যে ভারতবর্ষ—যে দেশে দারিদ্র্য সদর্পে বিরাজ করে, মাছির মত মরে মানুষ এবং নিরক্ষরতা হল সর্বব্যাপী নিয়ম। আমাদের সঙ্গে বিছানাপত্র ও জামাকাপড় বলতে খুব সামান্যই ছিল; যাতে পায়ে হেঁটে অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করতে সমর্থ হই সেজন্য সামান্য মালপত্র নিয়ে আমাদের ভ্রমণ করতে হত। খাদ্য যা আমাদের জুটেছে তাই খেয়েছি এবং যেখানে সম্ভব হয়েছে ঘুমিয়েছি। আমার কাছে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যকর হয়েছিল সেই বিস্ময়মিশ্রিত অভ্যর্থনা যখন আমরা প্রথম মানবসেবার ক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম। আমরা কেন সেখানে এসেছি জানবার জন্য দরিদ্র গ্রামবাসীরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আমরা কি সরকারী কর্মচারী? এরূপ কর্মচারীরা আগে কখনও তাদের সেবা করবার জন্য আসে নি। শহর থেকে সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরাও তাদের জন্য মাথা ঘামাতে আসে নি। অতএব তারা সিদ্ধান্ত করল যে আমরা খ্যাতি বা যোগ্যতা লাভ করার জন্য নিশ্চয়ই এই ভ্রমণ শুরু করেছি। তাদের মাথা থেকে এই চিন্তা দূর করা কার্যতঃ অসম্ভব হয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে আমার 'সাধু সন্ধানে'র পাগলামি চলতেই লাগল। মহানগরী থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে একটা জেলা শহরের নিকটে নদীর তীরে পাঞ্জাব থেকে আগত এক যুবক সন্ন্যাসী থাকতেন। যখনই কলকাতা থেকে পালানো সম্ভব হত আমার এক বন্ধুকে[১] সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই তাঁর কাছে উপস্থিত হতাম। এই সাধু কখনও কোন আচ্ছাদনের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করতেন না, কারণ যে আদর্শ তিনি সাধনা করতেন তা স্পষ্টতই ছিলঃ

[১] হেমন্তকুমার সরকার।

The sky thy roof, the grass thy bed,
and food what chance may bring.

"আকাশ তোমার ছাদ, তৃণ তোমার শয্যা
আর খাদ্য ভাগ্যে যাহা জোটে।"

এই লোকটি তাঁর পার্থিব আকাঙ্ক্ষা সমূহের পরিহার—তাপ, শৈত্য[1] ইত্যাদির প্রতি চরম ঔদাসীন্য, তাঁর মানসিক শুদ্ধতা ও স্নেহময় প্রকৃতি আমার মনে গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল। তিনি কখনও কিছু চাইতেন না, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রায়ই যেরূপ ঘটে থাকে, লোকের ভীড়[2] তাঁর কাছে লেগেই থাকত এবং খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি নিবেদন করা হত; কিন্তু তিনি তাঁর ন্যূনতম প্রয়োজনের অধিক কিছুই গ্রহণ করতেন না। যদি তিনি কেবল জ্ঞানের দিক থেকে অধিকতর উন্নত হতেন, তা হলে তিনি আমাকে আমার পার্থিব বন্ধনগুলো থেকে টেনে নিতে পারতেন।

এই সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসবার পর আমার গুরুলাভের ইচ্ছে আরও বেড়ে গেল এবং ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশে আমি আমার আর একজন বন্ধুর[3] সাথে গোপনে তীর্থযাত্রায় বের হয়ে পড়লাম। এক সহপাঠীর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলাম,—সে একটা বৃত্তি পাচ্ছিল এবং পরে আমার বৃত্তি থেকে তাকে শোধ করে দিয়েছিলাম। অবশ্য, বাড়ীতে কাউকে জানাই নি এবং অনেক দূরে গিয়ে শুধু একখানা পোষ্টকার্ড লিখেছিলাম। লছমোন-ঝোলা, হৃষিকেশ, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া—উত্তর ভারতের কয়েকটি সুপরিচিত তীর্থস্থানে আমরা গিয়েছিলাম। হরিদ্বারে আমাদের সঙ্গে আর একজন বন্ধু এসে যোগ দিয়েছিল। মাঝে দিল্লী ও আগ্রার মত ঐতিহাসিক স্থানগুলোতেও আমরা গিয়েছিলাম। ঐসব স্থানে যত বেশী পেরেছি সাধুদর্শন করেছি এবং কয়েকটি 'আশ্রম'[4], সেই সঙ্গে গুরুকুল ও ঋষিকুলের[5] মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলোতেও গিয়েছি। হরিদ্বারে আশ্রমগুলোর একটিতে যখন আমরা গেলাম তখন তারা অস্বস্তি বোধ করল—আমরা প্রকৃতই আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন যুবক না ছদ্মবেশী বাঙালী বিপ্লবী, তারা বুঝতে পারে নি। প্রায় দুইমাসব্যাপী এই ভ্রমণে শুধু যে বহু ধার্মিক লোকের সংস্পর্শেই আমরা এসেছিলাম তা নয়, উপরন্তু হিন্দু সমাজের মৌলিক ত্রুটিগুলোর কয়েকটির সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছিল। অধিকতর জ্ঞান লাভ করে আমি বাড়ী ফিরেছিলাম এবং সন্ন্যাসী ও সংসারত্যাগীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেকখানিই হ্রাস পেয়েছিল। ভালই হয়েছিল যে নিজের কার্যের দ্বারাই আমি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, কেননা জীবনে এমন অনেক কিছুই আছে যা আমাদের নিজেদেরই শিখতে হয়।

আমি প্রথম আঘাত পেয়েছিলাম যখন হরিদ্বারে একটি ভোজনালয়ে আমাদের খাদ্য পরিবেশন করতে অস্বীকার করা হল। তারা বলল যে, বাঙালীরা খৃষ্টানদের মতই অপরিচ্ছন্ন, কারণ তারা মাছ খায়। আমরা আমাদের থালা নিয়ে গেলে তারা খাদ্য ঢেলে দেবে, কিন্তু আমরা যেখানে থাকি সেখানে নিয়ে গিয়ে খেতে হবে। যদিও আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল ব্রাহ্মণ, তাকেও এ অবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল। বুদ্ধ-গয়াতেও আমরা অনুরূপ এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। এক মঠে আমরা অতিথি হয়েছিলাম, যার সাথে কাশীর রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বাধ্যক্ষ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। খাওয়ার সময় আমাদের জিজ্ঞাসা করা হল, আলাদা বসতে আমাদের আপত্তি আছে কিনা, কারণ আমাদের মধ্যে সকলে একই জাতের ছিল না। এ প্রশ্নে আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম কারণ তাঁরা ছিলেন শঙ্করাচার্যের অনুগামী, এবং তাঁর একটি শ্লোক[6] উদ্ধৃত করলাম যাতে তিনি সব ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করতে লোককে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা আমার কথা

[1] মধ্যাহ্নে তিনি পাঁচটি ধুনি (পঞ্চাগ্নি) জ্বালতেন এবং তার মাঝখানে বসে প্রখর সূর্যের মধ্যে ধ্যান করতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, রাত্রিকালে প্রায়ই অনেক সাপ তাঁর শরীরের উপর হেঁটে বেড়ায় কিন্তু তাতে তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

[2] তাঁর কাছে যারা যেত তাদের মধ্যে সি. আই. ডি পুলিশ ছিল; তিনি শুধু মাত্র একজন নিরীহ সন্ন্যাসী কিনা তারা জানতে যেত।

[3] এইচ. পি. সি।

[4] এগুলো সন্ন্যাসীদের আশ্রম। আজকাল রাজনৈতিক কর্মীদের জন্যও আশ্রম আছে।

[5] প্রাচীন হিন্দু আদর্শগুলোর উপর ভিত্তি করে এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আর্যসমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে স্বভাবতঃই ঋষিকুল অপেক্ষা গুরুকুল দৃষ্টিভঙ্গীতে অধিকতর সংস্কারপন্থী, বিশেষতঃ জাতিভেদ সম্বন্ধে।

[6] সর্বতোৎসৃজ ভেদ-জ্ঞানম্।

অস্বীকার করতে পারলেন না কারণ তা অখণ্ডনীয় ছিল। পরদিন যখন আমরা স্নান করতে গেলাম, কিছু লোক সেখানে আমাদের কুয়ো থেকে জল তুলতে নিষেধ করল কারণ আমরা ব্রাহ্মণ নই। ভাগ্যক্রমে আমার ব্রাহ্মণ বন্ধুর পৈতাটি যা সচরাচর অন্য কোথাও টাঙানো থাকত, তন্মুহূর্তে তার গলাতেই ছিল। সে তা দর্পের সাথে তার চাদরের তলা থেকে টেনে বের করে তাদের গ্রাহ্য না করে কুয়ো থেকে জল তুলে আমাদের দিকে এগিয়ে দিতে শুরু করল, এবং তারা খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।[১]

মথুরাতে আমরা এক পান্ডার[২] বাড়ীতে বাস করেছিলাম এবং এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম যিনি নদীর অপর তীরে মাটির তলায় একটা ঘরে বাস করছিলেন। তিনি জোরের সাথে আমাদের গৃহে ফিরে যাবার জন্য এবং সংসার ত্যাগের সকল চিন্তা ত্যাগ করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। স্মরণ আছে সন্ন্যাসীর এধরনের কথাবার্তায় আমি খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। আমরা যখন মথুরাতে ছিলাম তখন প্রতিবেশী এক আর্য সমাজপন্থীর[৩] সাথে আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমাদের পান্ডার পক্ষে তা অসহ্য হয়ে উঠেছিল এবং সে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল যে এই আর্য সমাজপন্থীরা সাঙ্ঘাতিক লোক; যেহেতু তারা মূর্তিপূজা অস্বীকার করে।

মথুরায় হনুমানের উপদ্রব ছিল নিয়মিত, কোনও প্রকারেই তাদের বাগ মানাতে পারা যেত না। যদি অল্পক্ষণের জন্যও কোনও দরজা বা জানলা একটু খোলা রাখা হত তাহলে তারা ভিতরে ঢুকে যা দেখত নিয়ে যেত কিংবা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে যেত। মথুরা থেকে চলে আসতে আমাদের দুঃখ হয় নি। সেখান থেকে আমরা বৃন্দাবনের দিকে গেলাম যেখানে পৌঁছনো মাত্র কয়েকজন পান্ডা আমাদের ঘিরে ধরল এবং আমাদের আহার ও বাসস্থানের ভার নিতে চাইল। তাদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা বললাম যে আমরা গুরুকুল প্রতিষ্ঠানে যেতে চাই। তৎক্ষণাৎ তারা কানে আঙুল দিয়ে বলল যে, কোনও হিন্দুর সেখানে যাওয়া উচিত নয়। যা হোক, তাদের সঙ্গ থেকে অনুগ্রহ করে আমাদের অব্যাহতি দিল।

বৃন্দাবন থেকে কয়েক মাইল দূরে কুসুম সরোবর নামে এক স্থানে অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁরা কুঞ্জবনের মধ্যে একটা কুটিরে বাস করতেন, যেখানে হরিণ ও ময়ূর ঘুরে বেড়াত। এটা বাস্তবিকই একটা মনোরম স্থান ছিল—ধার্মিক মনের পক্ষে সত্যই উপযুক্ত। তাঁদের কাছে গেলে তাঁরা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং আমরা কয়েক-দিন তাঁদের সাহচর্যে কাটালাম। ঐ একই সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন ছিলেন মৌনীবাবা যিনি দশ বছর একটিও কথা বলেন নি। এই অঞ্চলের নেতা বা গুরু যিনি ছিলেন তিনি হলেন রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী; হিন্দু দর্শনে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি তাঁর কথার দৃঢ়তার সাথে এই যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে বৈষ্ণবীয় মতবাদ শঙ্করাচার্যের মায়াবিষয়ক অদ্বৈত মতবাদকে ছাড়িয়ে আরও অধিক অগ্রসর হয়েছে। সে-সময়ে যদিও শঙ্করাচার্যের মতবাদের সাথে আমার জীবনকে মানিয়ে নিতে পারি নি, এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষাকে অধিকতর বাস্তব বলে মনে করেছিলাম—তবু তাই আমার কাছে হিন্দু দর্শনের সার ছিল এবং শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে কোন কথা উপভোগ করতে পারতাম না। মোটের উপর, কুসুম সরোবরে আমার ভালই কেটেছিল এবং সেখানকার সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে একটা খুব উঁচু ধারণা নিয়ে আমরা বিদায় নিয়েছিলাম।

কাশীতে এসে রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে গেলে স্বর্গতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন; তিনি আমার পিতা ও আমাদের পরিবারকে খুব ভাল করেই চিনতেন। যখন সেখানে ছিলাম তখন বাড়ীতে খুব হৈ চৈ চলছে। আমার প্রত্যাবর্তনের আশায় আমার পিতামাতা অনেকদিন অপেক্ষা করে এখন হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আমার ভ্রাতা ও মাতুলদের কিছু একটা করা নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁরা কি বা করতে পারতেন? পুলিশে সংবাদ দেওয়া তাঁদের মনঃপূত ছিল না, কারণ তাঁরা ভয় করেছিলেন যে পুলিশে যতটা

---

[১] এই সমস্ত ঘটেছিল ১৯১৪ সালে। কিন্তু ভারতবর্ষ এখন বদলে গিয়েছে।

[২] পান্ডা হচ্ছে কোন একটা মন্দিরের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ পুরোহিত। সে একটা যাত্রী-নিবাস চালায়, যেখানে সেই স্থানে আগত তীর্থযাত্রীরা এসে বাস করে। তাদের অনেকে রীতিমত রক্ত-শোষণকারী এবং যাত্রীরা রেল স্টেশনে পৌঁছবার পর থেকেই তারা তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

[৩] দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূল শাস্ত্র-বেদসমূহ ও প্রাচীনকালের মৌলিক শুদ্ধতাকে পুনরায় আশ্রয় করে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকে সংশোধন করা ছিল এর লক্ষ্য। মূর্তি পূজো বা জাতি প্রথায় আর্যসমাজ বিশ্বাস করে না। এই বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজের সাথে এর মিল আছে। পাঞ্জাবে এবং উত্তর প্রদেশেও আর্যসমাজের বহু অনুগামী আছে।

না সাহায্য করতে পারবে তদপেক্ষা হয়রানি করবে বেশী। সুতরাং তাঁরা সৎ বলে খ্যাতি ছিল এরূপ একজন জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হলেন। এই ভদ্রলোক অপ্রাকৃত শক্তির সাহায্যে গণনা করে বললেন যে আমার শরীর বেশ ভালই আছে এবং আমি তখন কলকাতার উত্তর-পশ্চিমে এমন একটা স্থানে আছি—যার নাম শুরু হয়েছে বি অক্ষর দিয়ে। তৎক্ষণাৎ এটা ধরে নেওয়া হল যে সেই স্থানটি অবশ্যই বৈদ্যনাথ হবে কারণ সেখানে একটা আশ্রম ছিল যার কর্তা ছিলেন একজন সুপরিচিত যোগী। যে মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত করা হল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরবার জন্য আমার এক মাতুলকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তা অনর্থক হয়রানিতে পর্যবসিত হয়েছিল কারণ আমি তখন বারাণসীতে ছিলাম।

উত্তেজনাপূর্ণ এক অভিজ্ঞতার পর একদিন সুপ্রভাতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরে এলাম, না বলে চলে গিয়েছিলাম বলে আমার কোনও অনুতাপ হয় নি। তবে এত করে যে গুরুকে খুঁজেছি তাঁকে না পেয়ে কিছুটা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিলাম। কয়েক-দিন পরে টাইফয়েডে বিছানা নিলাম—তীর্থ-ভ্রমণ আর গুরু সন্ধানের মূল্য দিতে হল। স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী মেনে না চললে তার পরিণাম থেকে আত্মাও শরীরকে বাঁচাতে পারে না।

যখন বিছানায় পড়ে আছি তখন শুরু হয়ে গেল মহাযুদ্ধ।

স প্ত ম প রি চ্ছে দ

প্রেসিডেন্সি কলেজ (২)

কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়া ও ছাত্রদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রচার-কার্য সত্ত্বেও, কয়েকটি অভাবনীয় ঘটনা না ঘটলে আমি রাজনৈতিক দিক দিয়ে কিভাবে গড়ে উঠতাম বলতে পারি না। হয় কলেজে না হয় হোস্টেলে প্রায়ই এমন কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হত যাঁরা—পরে শুনেছিলাম—সন্ত্রাসবাদমূলক বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিশিষ্ট লোক ছিলেন এবং পরে পলাতক হয়েছিলেন। কিন্তু আমি কখনও তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হইনি; মহাত্মা গান্ধীর মত অহিংসায় বিশ্বাস করতাম বলে নয়; তার কারণ ছিল এই যে আমি তখন আমার নিজের এক জগতে বাস করছিলাম এবং বিশ্বাস করতাম যে, জাতীয় পুনর্গঠনের কার্যপ্রণালীর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশবাসীর চরম মুক্তি আসবে। এটা অবশ্যই স্বীকার করব যে আমাদের স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত কিভাবে আসবে সে সম্বন্ধে আমাদের দলের ধারণা মোটেই স্পষ্ট ছিল না। বস্তুতঃ ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারটা ব্রিটিশকে দেখাশোনা করতে দিয়ে দেশ শাসন আমাদের নিজেদের হাতে রেখে দেওয়া একটা সম্ভব পরিকল্পনা হতে পারে কিনা, কখনও কখনও গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হত, কিন্তু দুটি ব্যাপার আমাকে রাজনীতির দিক থেকে গড়ে উঠতে ও নিজের জন্য একটা স্বাধীন কার্যনীতি উদ্ভাবন করতে বাধ্য করেছিল—কলকাতায় ব্রিটিশদের ব্যবহার ও মহাযুদ্ধ।

১৯০৯ সালের জানুয়ারীতে পি. ই. স্কুল ছাড়বার পর ব্রিটিশদের সাথে আমার খুব সামান্যই সম্পর্ক ছিল। ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে কখনও কখনও এক একজন ব্রিটিশ চোখে পড়ত—হয়ত বা স্কুল পরিদর্শনে আগত কোনও পদস্থ কর্মচারী। কটক শহরেও তাদের বড় একটা দেখতে পেতাম না, কারণ সংখ্যায় তারা অল্পই ছিল ও দূরবর্তী কোন অংশে বাস করত। কিন্তু কলকাতার অবস্থা ছিল অন্যরকম। প্রতিদিন কলেজে যাতায়াতের সময়, তারা যে অঞ্চলে বাস করত তার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হত। ট্রাম-গাড়ীগুলোতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটা বিরল ছিল না। গাড়ীতে যাতায়াত কালে ব্রিটিশগণ ইচ্ছে করেই ভারতীয়দের প্রতি নানা প্রকার রূঢ় ও অপমানসূচক ব্যবহার করত, কখনও কখনও তারা সামনের আসনগুলোতে ভারতীয়রা বসে থাকলে ঐগুলোতে পা তুলে দিত যাতে ভারতীয়দের শরীরে তাদের জুতোর ছোঁওয়া লাগে। বহু ভারতীয় দরিদ্র কেরানী অফিসযাত্রীরা এ অপমান সহ্য করত, কিন্তু অন্য সকলের পক্ষে এ অপমান সহ্য করা কঠিন ছিল। আমার প্রকৃতিটা শুধু যে কেবল স্পর্শকাতর ছিল তাই নয়, শৈশব থেকেই অন্য-রকম ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছিলাম। প্রায়ই ট্রামে ব্রিটিশদের সঙ্গে আমার ঝগড়া বেধে যেত। কদাচিৎ কোন কোন ভারতীয় যাত্রীর সঙ্গে তাদের হাতাহাতি হয়ে যেত।

রাস্তাঘাটেও ঐ একই ব্যাপার ঘটত। ব্রিটিশরা চাইত ভারতীয়রা তাদের পথ ছেড়ে দেবে এবং যদি তারা একাজ না করত, তাহলে জোর করে ঠেলে তাদের পাশে সরিয়ে দেওয়া হত, অথবা তাদের কান মলে দেওয়া হত। এ বিষয়ে অসামরিক ব্যক্তিদের চাইতে ব্রিটিশ টমিরা ছিল আরও খারাপ, এবং তাদের মধ্যে গর্ডন হাইল্যান্ডারদের কুখ্যাতিই ছিল সর্বাধিক। রেলগাড়ীগুলিতে কখনও কখনও লড়াই করার জন্য প্রস্তুত না হয়ে কোন ভারতীয়ের পক্ষে আত্মসম্মানের সঙ্গে ভ্রমণ করা কঠিন হত। রেলের কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ ভারতীয় যাত্রীদের রক্ষার কোন বৈধ ব্যবস্থা করত না, হয় তারা নিজেরাই ব্রিটিশ (অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান) ছিল, কিংবা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে ভয় পেত। যখন আমি নিতান্ত ছোট ছিলাম, তখন কটকের একটি ঘটনার কথা মনে আছে। রেলের উচ্চতর শ্রেণীর কামরা দখলকারী ব্রিটিশরা কোনও ভারতীয়কে সেখানে প্রবেশ করতে দেবে না। এজন্য আমার এক মাতুলকে স্টেশন থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমরা উচ্চপদে আসীন ভারতীয়দের সম্বন্ধে গল্প শুনতাম—তাঁদের মধ্যে হাইকোর্টের বিচার-পতিও ছিলেন—রেলগাড়ীতে ব্রিটিশদের সঙ্গে যাঁদের সংঘর্ষ ঘটে গেছে। গল্পগুলি স্বভাবতঃই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত।

যখনই এরকম কোন ঘটনা ঘটতে দেখতাম আমার স্বপ্নগুলি প্রচণ্ড আঘাত পেত, এবং শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের ভিত্তিমূল পর্যন্ত একেবারে নড়ে উঠত। নিজেকে বোঝানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হত যে কোনও বিদেশীর হাতে অপমানিত হওয়া একটা মায়া, যা উপেক্ষনীয়। অবস্থাটা আরও জটিল হত যদি কলেজের কোন ব্রিটিশ অধ্যাপক আমাদের প্রতি রূঢ় বা অপমানকর আচরণ করতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব[1] ঘটত না। কলেজে প্রথম বছরে এ সম্বন্ধে আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তবে সেগুলি তত সাংঘাতিক ধরনের ছিল না। যদিও তিক্ততা সৃষ্টি করবার পক্ষে সেগুলি ছিল যথেষ্ট।

জাতিগত এই সব বিরোধে ভারতীয়েরা আইনের কোন সাহায্য পেত না। ফলে কিছুকাল পরে ভারতীয়গণ অনন্যোপায় হয়ে প্রত্যাঘাত করতে শুরু করল। রাস্তাঘাটে, ট্রামে, রেলগাড়ীতে তারা আর মুখ বুজে[2] সব সহ্য করত না। সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া গেল। সর্বত্র ভারতীয়দের সমীহ করে চলা হতে লাগল। তখন চারিদিকে এ কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ইংরেজ দৈহিক শক্তি ছাড়া আর কিছু বোঝে না বা সম্মান করতে জানে না। এই ব্যাপারটিই মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সন্ত্রাসবাদমূলক বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল—অন্ততঃ বাঙলাদেশে।

উপরে বর্ণিত অভিজ্ঞতা স্বভাবতই আমার রাজনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করেছিল কিন্তু তা আমার মনোভাবকে কোনও নির্দিষ্ট দিকে চালিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল মহাযুদ্ধের ধাক্কা। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে যখন শয্যাশায়ী অবস্থায় পত্রিকাগুলি পড়ে কাটাচ্ছি, এবং যোগী ও সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে কিছুটা মোহমুক্তি ঘটেছে, তখন আমার সমস্ত ধারণার পুনর্বিচার ও এ যাবৎ স্বীকৃত মূল্যগুলির পুন-র্নির্ধারণে ব্যাপৃত হলেম। জাতির জীবনকে দুটি অংশে ভাগ করা এবং তাদের একটিকে বিদেশীর হাতে তুলে দিয়ে অন্যটি আমাদের নিজেদের জন্য রাখা কি সম্ভব? অথবা জীবনকে সমগ্রভাবেই গ্রহণ বা বর্জন আমাদের পক্ষে অবশ্য করণীয়? নিজেকে যে উত্তর আমি দিয়ে-ছিলাম তা একেবারে পরিষ্কার ছিল। যদি ভারতবর্ষকে একটি আধুনিক সভ্যজাতিতে পরিণত হতে হয় তাহলে তার মূল্য দিতেই হবে, এবং কোন প্রকারেই তার পক্ষে দৈহিক বা সামরিক প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। যাঁরা দেশের মুক্তির জন্য কাজ করবেন, তাঁদের সামরিক ও অসামরিক উভয়বিধ শাসনভার গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবিভাজ্য এবং এর দ্বারা বৈদেশিক শাসন ও অধীনতামুক্ত পূর্ণ স্বরাজ বোঝায়। *যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে যে, যে জাতির সামরিক শক্তি নেই, সে জাতি তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হবে এমত আশা করা যায় না।*

অসুখ থেকে সেরে উঠবার পর আমি আবার আমার স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করলাম এবং অধিকাংশ সময় বন্ধুদের সঙ্গে কাটাতে লাগলাম, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার অনেক

[1] আমার কলেজে যোগদানের আগে কয়েকবার ছাত্ররা ইংরেজ অধ্যাপকদের ধরে খুব মেরেছিল। এই সব ঘটনার বিবরণ সযত্নে রক্ষা করা হত এবং পুরুষানুক্রমে গল্পগুলি চলে আসছিল।

[2] কলেজে একজন ছাত্রকে জানতাম, সে ভাল মুষ্টিযোদ্ধা ছিল; শহরের যে অঞ্চলে ব্রিটিশরা বাস করত সেখানে সে স্বাস্থ্য-ভ্রমণে বের হত এবং টমিদের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিত।

পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল; সংখ্যা ও উৎকর্ষের দিক দিয়ে আমাদের দলটি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সদস্যদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ও উদীয়মান এক চিকিৎসককে[১] উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পাঠানো হল যাতে সে ফিরে এসে দেশ ও দলের অধিকতর সেবা ও সাহায্যের কাজে লাগতে পারে। প্রত্যেকে সাধ্যানুসারে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করেছিল এবং আমি আমার বৃত্তির একটা অংশ দিয়েছিলাম। এর পর আর একজন বিশিষ্ট সদস্য ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে একটি কার্যভার গ্রহণ করল, এবং আশা করা হয়েছিল যে, তার দ্বারা সে মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং ভবিষ্যতের কাজের জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয়ও হবে।

দু বছর ঝড়ের মত জীবনযাত্রার ফলে আমার পড়াশুনার অবস্থা শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৫ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও (যা অবশ্য একটি সহজ ব্যাপার ছিল), তালিকার নীচের দিকে আমি স্থান পেয়েছিলাম। ক্ষণিকের জন্য আমার তীব্র অনুশোচনা হল, এবং আমি সংকল্প করলাম ডিগ্রী পরীক্ষায় ভাল ফল করব।

আমার ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য আমি দর্শনে অনার্স নিলাম—বহুদিন ধরে আমার এরকম ইচ্ছা ছিল। মনে প্রাণে নিজেকে পড়াশুনায় নিয়োজিত করলাম। আমার কলেজ জীবনে এই প্রথম আমি পড়াশুনায় আগ্রহ বোধ করলাম। কিন্তু যা লাভ করলাম, বাল্যকালে যেমনটি ভেবেছিলাম, তার চাইতে একেবারে অন্যরকম ছিল। স্কুলে পড়বার সময় ভেবেছিলাম যে দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করলে প্রজ্ঞা লাভ করব—জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নগুলির বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হব। সম্ভবত, দর্শন নিয়ে পড়াশুনাকে কোনও এক রকমের যোগাভ্যাসরূপে ধরে নিয়েছিলাম, এবং সেজন্য হতাশ হতে বাধ্য হয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে যুক্তিপূর্ণ চিন্তাশীলতা ও বিচারশক্তির অধিকারী হলাম কিন্তু জ্ঞানলাভ হল না। পাশ্চাত্ত্য দর্শন শুরু হয় সংশয় নিয়ে (কেউ কেউ বলেন, ইহা শেষও হয় সংশয়ের মধ্যে)। সমালোচকের দৃষ্টিতে সব কিছুকে তা বিচার করে। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোন কিছুকে মেনে নেয় না; আর যুক্তির সাহায্যে তর্ক করতে এবং ভুলগুলি ধরতে ইহা আমাদের শিক্ষা দেয়। অন্য কথায় বলা যায়, পূর্বের বদ্ধমূল ধারণাগুলি থেকে এটি আমাদের মনকে মুক্ত করে। এতে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, যে বেদান্তকে অবলম্বন করে এতদিন আমি গড়ে উঠেছি তার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। নিতান্তই জ্ঞানানুশীলনের জন্য, জড়বাদের সমর্থনে বহু প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলাম। শীঘ্রই আমাদের দলের আবহাওয়ার সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধে গেল। এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম যে সত্যিকারের কোনও মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রমাণ ও যুক্তি ভিন্ন কিছু গ্রহণ করা উচিত নয়, কিন্তু এদের মতগুলির মধ্যে গোঁড়ামি আছে, অনেক কিছু তারা বিনা যুক্তিতেই মেনে নিয়েছে।

পড়াশুনা নিয়ে বেশ আনন্দে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এমন সময় আমার জীবনে অকস্মাৎ একটি ঘটনা ঘটে গেল। ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে একদিন সকালে যখন আমি লাইব্রেরীতে ছিলাম, তখন শুনলাম যে একজন ইংরেজ অধ্যাপক আমাদেরই শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে আমাদের কয়েকজন সহপাঠী Mr. O- এর লেকচার ঘরের পাশের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়ে Mr. O গোলমালে বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে আসেন এবং ছাত্রদের মধ্যে যারা সামনের দিকে ছিল তাদের অনেককে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। প্রত্যেক ক্লাস থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করার নিয়ম ছিল, যাদের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে অধ্যক্ষ পরামর্শ করতেন এবং আমি ছিলাম আমার ক্লাসের প্রতিনিধি। তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি আমি অধ্যক্ষকে জানালাম এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই প্রস্তাব করলাম যে, যে সমস্ত ছাত্রকে অপমান করা হয়েছে, Mr. O-র তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। অধ্যক্ষ বললেন যে, যেহেতু Mr. O ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসের একজন সদস্য, একাজ করবার জন্য তিনি তাঁকে বাধ্য করতে পারেন না। তিনি আরও বললেন যে, Mr. O কোন ছাত্রের প্রতি দুর্ব্যবহার বা তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করেন নি—তবে 'তাদের হাত ধরে সরিয়ে দিয়েছেন' মাত্র, যাকে অপমান বলে ধরা যায় না। স্বভাবতই আমরা সন্তুষ্ট হতে পারলাম না এবং পরদিন সমস্ত ছাত্রদের একটি সাধারণ ধর্মঘট হল। এই ধর্মঘটকে ভেঙ্গে দেবার জন্য অধ্যক্ষ সব রকমের দমনমূলক

---

[১] এই পরীক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল কারণ সে এক ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করে ইংলণ্ডে থেকে যায় এবং ভারতবর্ষে আর কখনও প্রত্যাবর্তন করেনি।

ও কূটনৈতিক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। এমন কি মুসলমান ছাত্রদের নিরস্ত করার জন্য মৌলবী সাহেবের সকল চেষ্টাও ব্যর্থতায় পরিণত হল। তদ্রূপ স্যার পি সি রায় ও ডাক্তার ডি এন মল্লিকের মত জনপ্রিয় অধ্যাপকদের আবেদনেও কাজ হল না। অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে, অধ্যক্ষ সকল অনুপস্থিত ছাত্রের উপর একটা পাইকারী জরিমানা ধার্য করলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে এই ধর্মঘটের সাফল্যে সারা শহরে প্রবল উত্তেজনার কারণ হয়েছিল, ধর্মঘটের ছোঁয়াচ ছড়িয়ে পড়তে লাগল, এবং কর্তৃপক্ষ ঘাবড়াতে শুরু করলেন। আমার অধ্যাপকদের একজন—যিনি আমাকে ভালবাসতেন,—ভয় পেয়ে গেলেন যে ধর্মঘটের নেতাদের একজন হিসেবে আমি বিপদে পড়ব। তিনি আমাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন কিসের মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়েছি তা আমি বুঝছি কিনা। আমি বললাম, হ্যাঁ আমি জানি,—যার উত্তরে তিনি বললেন যে, আর কিছু তাঁর বলবার নেই। যা হোক দ্বিতীয় দিনের ধর্মঘটের শেষে Mr. O-কে চাপ দেওয়া হল। তিনি ছাত্রদের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠালেন এবং আপোষে তাদের সাথে ঝগড়া মিটিয়ে ফেললেন। উভয় পক্ষের দিক থেকে সম্মানজনক একটা সূত্র ইতিমধ্যেই বের করা হয়েছিল।

পরদিন পড়াশোনা শুরু হল, এবং ছাত্ররা 'ক্ষমা কর ও যা হয়েছে ভুলে যাও' এরকম একটা আবহাওয়ার মধ্যে ক্লাসে যোগদান করল, স্বভাবতই আশা করা হয়েছিল যে, ধর্মঘটের সময় অধ্যক্ষ যে সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, মিটমাট হয়ে যাবার পর তিনি সেগুলো প্রত্যাহার করে নেবেন; কিন্তু নিরাশ হতে হল। তিনি এক চুলও নড়বেন না—দারিদ্র্যের জন্য অপারগ না হলে ছাত্রদের জরিমানা দিতেই হবে। ছাত্রদের সাথে সাথে অধ্যাপকদের সকল আবেদনও নিষ্ফল হল। এই জরিমানা ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করল, কিন্তু কিছুই করতে পারা গেল না।

প্রায় একমাস পর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অনুরূপ আর এক ঘটনা ঘটল। খবর ছড়িয়ে পড়ল যে Mr. O আবার এক ছাত্রের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন—কিন্তু এবার ছাত্রটি ছিল প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর। ছাত্রদের কি করণীয়? ধর্মঘটের মত নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ-গুলোর দ্বারা কেবল শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই ডেকে আনা হবে এবং অধ্যক্ষের কাছে সমস্ত আবেদনও বিফল হবে। সুতরাং কিছু কিছু ছাত্র স্থির করল তারা নিজেরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর ফল হল এই যে Mr. O-র বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের পন্থা বেছে নেওয়া হল এবং তদনুযায়ী তাঁকে নিদারুণভাবে প্রহার করা হল। সংবাদপত্রের অফিস থেকে গভর্নমেন্ট হাউস পর্যন্ত সর্বত্র দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল।

সে-সময়ে অভিযোগ করা হয়েছিল যে ছাত্ররা Mr. O-কে পশ্চাত দিক থেকে আক্রমণ করেছে এবং সিঁড়ি থেকে তাঁকে নীচে ফেলে দিয়েছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। Mr. O পশ্চাত দিক থেকে একটা আঘাতই শুধু পেয়েছিলেন, কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তাঁর আক্রমণকারীরা—যারা তাঁকে ফেলে দিয়েছিল—সকলেই তাঁর সম্মুখে তাঁর সাথে একই স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। নিজে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম বলে প্রতিবাদের ভয় না করে জোর দিয়ে আমি তা বলতে পারি। ছাত্রদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে হলে এই এই বিষয়টি পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন।

এর পরেই বাংলা সরকার কলেজ বন্ধ করার আদেশ দিয়ে ও ঐ প্রতিষ্ঠানে ক্রমাগত গোলমালের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে এক ইস্তাহার প্রচার করলেন। স্বাভাবিকভাবেই সরকার খুব রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন এবং অবাধে এরূপ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে চিরকালের মত কলেজ বন্ধ করে দিতেও সরকার ইতস্ততঃ করবেন না। ছাত্রদের বিরুদ্ধে সরকার অধ্যাপকদেরই পুরোপুরি সমর্থন জানাতেন সন্দেহ নেই; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সরকারী ইস্তাহার নিয়ে গভর্ণমেন্টের সাথে অধ্যক্ষের ঝগড়া বেধে উঠল। যেহেতু সরকারী আদেশগুলো তাঁকে পরামর্শ না করেই জারী করা হয়েছিল; তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছে ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তিনি মাননীয় শিক্ষা-সচিবের সাথে দেখা করে সেখানে এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করলেন। পরদিন আর একটা সরকারী ইস্তাহার প্রচার করে বলা হল যে মাননীয় সচিবকে 'ব্যক্তিগত গুরুতর ধরনের অপমান' করার জন্য অধ্যক্ষকে[১] সাময়িকভাবে পদচ্যুত করা হল।

[১] পরে, সম্ভবতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করবার পর, অধ্যক্ষকে ঐ পদে আবার বহাল করা হয়েছিল এবং তারপর তিনি একেবারেই অবসর গ্রহণ করেন, এখানে ন্যায়সংগতভাবে বলতে গেলে অবশ্যই বলব যে,

কিন্তু অধ্যক্ষের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবার পূর্বে তিনি কিছু কাজ করেছিলেন। তাঁর অপরাধীদের তালিকায় যে সব ছাত্রের নাম ছিল, আমার নামও ছিল তাদের মধ্যে, তাদের সকলকে তিনি ডেকে পাঠালেন। আমাকে লক্ষ্য করে তিনি যে কথাগুলো বললেন—প্রায় গর্জন করে উঠলেন—সেগুলো ভুলবার নয়, 'বোস, তুমিই হচ্ছ কলেজের সব নষ্টের গোড়া। আমি তোমাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দিলাম।' আমি 'ধন্যবাদ' বলে বাড়ী চলে এলাম। শঙ্করাচার্যের মায়া সম্পূর্ণ অসার বলে বোধ হল।

এরপর শীঘ্রই গভর্ণিং বডির সভা বসল এবং অধ্যক্ষের আদেশ অনুমোদন করা হল। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আমি বহিষ্কৃত হলাম। অন্য কোনও কলেজে পড়ার অনুমতি দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন জানালাম। তা অগ্রাহ্য হল। সুতরাং কার্যতঃ আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই একেবারে বহিষ্কৃত করা হল।

এখন কী করণীয়? কোনও কোনও রাজনীতিবিদ্ এই বলে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন যে অধ্যক্ষের এই আদেশ দেবার কোনও অধিকার নেই কারণ তদন্ত কমিটি তাঁর ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল কমিটির দিকে।

প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ও হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। স্বভাবতঃই আমরা সুবিচার আশা করেছিলুম। ছাত্রদের পক্ষ থেকে যাদের সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলুম। আমাকে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করা হল— Mr. O-র ওপর এই আক্রমণকে আমি সমর্থন করি কি না। আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে যদিও এই আক্রমণকে সমর্থন করা যায় না, কিন্তু ছাত্রদের উত্তেজিত হওয়ার গুরুতর কারণ ছিল। তার পর আমি গত কয়েক বছরে প্রেসিডেন্সী কলেজে ব্রিটিশদের কুকীর্তিগুলোর আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে শুরু করলাম। এটা একটা গুরুতর অভিযোগ ছিল, কিন্তু পণ্ডিতম্মন্যের দল মনে করলেন যে, অন্য কথা বাদ দিয়ে Mr. O-র ওপর আক্রমণকে বিনাসর্তে নিন্দা না করে আমি আমার নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছি। তবুও আমার মনে হয়েছিল যে আমার ওপর তার ফল যাই হোক না কেন, আমি ঠিক কাজই করেছি।

অনুকূল কিছু ঘটতে পারে, নৈরাশ্যের মধ্যেও এরূপ একটা আশা নিয়ে আরও কিছুদিন কলকাতায় থেকে গেলাম। কমিটি রিপোর্ট পেশ করলেন এবং তাতে ছাত্রদের অনুকূলে একটা কথাও ছিল না। কেবল আমার নামটাই আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছিল—অতএব আমার ভাগ্য নির্ণীত হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল, এবং সর্বশেষ শিকার যারা হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকজন বহিষ্কৃত ছাত্র ছিল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা শঙ্কিত হয়ে জরুরী পরামর্শ করলেন। সকলেই একমত হলেন যে কোন বিশেষ কর্মোপলক্ষে ছাড়া কলকাতায় থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অতএব আমাকে কটকের মত শান্তিপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোনও স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

রাত্রিতে ট্রেনের মধ্যে বাঙ্কের উপর শুয়ে গত কয়েক মাসের ঘটনাগুলো আবাব বিচার করে দেখলাম। আমার ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও অনিশ্চিত। কিন্তু আমি দুঃখিত হইনি—যা করেছি তার জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ ছিল না। বরং আমি যে ঠিক কাজ করেছি, আমাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদার জন্য লড়েছি এবং মহৎ এক উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছি, এজন্য আমার মধ্যে এক পরম তৃপ্তি ও আনন্দবোধ ছিল। নিজেকে বোঝালাম, ত্যাগ বিনা জীবনের মূল্য কি, এবং ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৯১৬ সালের ঘটনাগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তখন আমি সামান্যই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার অধ্যক্ষ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি ঠিক করে দিয়েছিলেন। আমি আমার নিজের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলাম, ভবিষ্যতে যা থেকে সরে আসা আমার পক্ষে সহজ হবে না। এক সঙ্কটের মধ্যে সাহস ও স্থৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়েছি এবং আমার কর্তব্য পালন করেছি।

কয়েকবার পুলিসের নির্যাতন থেকে ছাত্রদেরকে বাঁচাবার ফলে তিনি তাদের খুব প্রিয় ছিলেন। বর্তমান ঘটনায় সম্ভবতঃ তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন এবং কর্তৃপক্ষগণকে না ছাত্রদের—কোন পক্ষকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন করবেন তা ঠিক করতে পারেন নি। দুটোর মধ্যে একটা যদি তিনি করতেন, একপক্ষ অন্ততঃ তাঁর দিকে থাকত।

আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সেই সঙ্গে উদ্যমশীলতা গড়ে উঠেছিল, যা ভবিষ্যতে আমার খুব কাজে লাগবে। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হলেও, নেতৃত্বের ও তার আনুষঙ্গিক আত্মত্যাগের স্বাদ আমি পেয়েছিলাম। এক কথায়, আমার চরিত্র তৈরী হয়ে গিয়েছিল এবং প্রশান্তচিত্তে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে সমর্থ হয়েছিলাম।

অ ষ্ট ম প রি চ্ছে দ

শিক্ষার পুনরারম্ভ

১৯১৬ সালের মার্চের শেষাশেষি একজন বহিষ্কৃত ছাত্র হিসাবে কটকে এসে উপস্থিত হলাম। ভাগ্যক্রমে, ঐ আখ্যার সাথে কোনও কলঙ্ক যুক্ত ছিল না। ছাত্ররা সর্বত্র শ্রদ্ধামিশ্রিত সহানুভূতির সঙ্গে আমাকে দেখেছে, কারণ আমি তাদের জন্যই লড়াই করেছি। আমার পিতামাতার মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হয় নি এবং আশ্চর্যের বিষয় যে কলেজের ঘটনা বা তাতে আমার ভূমিকা সম্বন্ধে আমার পিতা কখনও একটা কথাও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নি। কলকাতায় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আমার দুর্ভোগে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, যে পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছিল তাতে আমি ঠিক কাজই করেছিলাম। আমার পিতামাতা গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলতেন; তৎসত্ত্বেও তাঁদের আচরণ থেকে যতদূর বিচার করতে পারতাম, তাঁদের মনোভাব বোধহয় এরকম ছিল যে, ছাত্রদের মুখপাত্র ছিলাম বলেই আমাকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। এটা জেনে পরম স্বস্তিবোধ করেছিলাম যে, যাঁদের সাথে আমাকে দিবারাত্র কাটাতে হত তাঁরা আমার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং আমি বিতাড়িত হয়েছি বলে মন্দ কোনও ধারণা তাঁরা আমার সম্বন্ধে করেন নি।

সুতরাং আমার পরিবারের সাথে আমার সম্পর্কের অবনতি হয় নি; বরং উন্নতি ঘটেছিল। দলের সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা সম্ভব ছিল না। সারা জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের উত্তেজনাকর ঘটনাগুলোর মধ্যে আমি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করি নি এবং একেবারে আমার নিজের উদ্যোগেই কাজ করে গিয়েছিলাম, পরে জেনেছিলাম যে, যা করেছি তাকে তারা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেনি এবং কর্তৃপক্ষের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে দেখলেই তারা খুশী হত। যখন কলকাতা ত্যাগ করার সংকল্প করলাম তখন তাদের তেমন কোনও সংবাদ দিইনি; যদিও পূর্বে তাদের সঙ্গে দিবারাত্র কাটিয়েছি, তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলোতে অংশগ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে দলটা একটা সুসংহত প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। কলকাতার বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে যারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের অধিকাংশই একটা বোর্ডিং-এ বাস করত; যারা বাড়ীতে বা অন্যান্য হোস্টেল-গুলোতে থাকত তারা প্রতিদিন বিকেলে আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদানের জন্য সেখানে এসে সমবেত হত। দলটি তার মুখপত্ররূপে গোপনে প্রচারের জন্য একটা হাতে লেখা পত্রিকা বের করত। সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়মিত শিক্ষাদান করা হত, এবং যেহেতু নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত সেজন্য গীতার ক্লাসগুলো বৈকালিক এইসব সমাবেশের স্বভাবতঃই একটা নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এটা সহজেই বোধগম্য যে, দুইবছর আগে যখন গুরুলাভের জন্য গৃহ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলাম তখন মনের দিক থেকে যে মানুষ আমি ছিলাম, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর পর ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলাম। এই পরিবর্তন কিছুটা আকস্মিকভাবে—একটা ঝড়ের মত—ঘটেছিল এবং সবকিছু ওলট পালট করে দিয়েছিল। কিন্তু ঝড় বয়ে যাওয়ার বহুকাল আগেই আমার ভেতরে নিঃশব্দে এক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল, যে সম্বন্ধে আমি তখন সচেতন ছিলাম না। প্রথমতঃ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সমাজসেবার দিকে। দ্বিতীয়তঃ, আমার সকল পাগলামি সত্ত্বেও, নৈতিক বল লাভ করছিলাম। কাজেই, যখন আকস্মিক একটা সংকটের সম্মুখীন হলাম, যা আমার সামাজিক কর্তব্য-বোধের পরীক্ষা-স্বরূপ ছিল, তখন পিছিয়ে আসি নি। অকম্পিতভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলাম ও আনন্দের সাথে ফলাফলের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। লাজুক প্রকৃতি ও আত্মসংশয় শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল।

এখন আমার কি করণীয়? পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ কোথায় ও কবে আমাকে আবার শুরু করতে হবে তা আমি জানতাম না। অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই বহিষ্কার কার্যতঃ সারা জীবনের জন্য শাস্তির সামিল ছিল, এবং এরকম কোনও নিশ্চয়তা ছিল না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ কিছুকাল পরে নরম হয়ে আমাকে পুনরায় আমার পড়াশোনা শুরু করবার অনুমতি দেবেন। আমাকে বিদেশে পড়তে পাঠানো হবে কিনা এ বিষয়ে আমার পিতামাতার অভিপ্রায় জানতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার পিতা এ প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি জানালেন। তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল এই যে বিদেশে যাওয়ার কথা চিন্তা করার আগে আমাকে আমার বংশের নামে যে কলংক পড়েছে তা অপনোদন করতে হবে। অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আমাকে প্রথমে ডিগ্রী লাভ করতে হবে।

সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যে পর্যন্ত না তাঁদের আদেশগুলি পুনর্বিবেচনার কথা চিন্তা করছেন, ততদিন আমাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে কোনরকমে সময় কাটাতে হয়েছিল। বইপত্র দূরে সরিয়ে রেখে আমি গভীর উৎসাহের সঙ্গে সমাজসেবায় লেগে গিয়েছিলাম। তখনকার দিনে উড়িষ্যায় কলেরা ও বসন্তের মত মহামারীর প্রাদুর্ভাব প্রায়ই ঘটত। অধিকাংশ লোক এত দরিদ্র ছিল যে ডাক্তার দেখাতে পারত না, এবং পারলেও শুশ্রূষা করবার লোক পাওয়া ছিল আরও এক কঠিন ব্যাপার। কখনও কখনও এরকম ঘটত যে, যদি কোন হোস্টেল বা বোর্ডিং-এ কলেরা দেখা দিত, তাহলে তার বাসিন্দারা আক্রান্তদের তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে তল্পি-তল্পা সুদ্ধ সরে পড়ত। এতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই, কেন না লিওনার্ড রজার্সের গবেষণানুসারে স্যালাইন ইঞ্জেকশনের চিকিৎসা চালু হওয়ার আগে কলেরা ছিল অন্যতম মারাত্মক ব্যাধি, এবং সঙ্গে সঙ্গে খুবই সংক্রামক। ভাগ্যক্রমে, ছাত্রদের মধ্যে একটি দল ছিল—আমার পুরোনো বন্ধুরা কেউ কেউ ঐ দলে ছিল,—যারা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে শুশ্রূষার কাজ করত। আমি সানন্দে তাদের সঙ্গে যোগদান করলাম। কলেরা ও বসন্তের মত এই-রকম মারাত্মক ব্যাধিগুলির দিকে আমরা বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলাম, তবে অন্যান্য ব্যাধি হলেও আমাদের সাহায্য পাওয়া যেত। আমরা স্থানীয় সিভিল হাসপাতালের কলেরা ওয়ার্ডেও ডিউটি দিতাম। কারণ সেখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন নার্স ছিল না, এবং অজ্ঞ ও অপরিচ্ছন্ন ঝাড়ুদারদের হাতে শুশ্রূষার কাজ ছেড়ে দেওয়া হত। পর্যাপ্ত শুশ্রূষার ভীষণ অভাব সত্ত্বেও হাসপাতালে কলেরায় মৃত্যুর হার সেই গ্রামটি থেকে অনেক কম ছিল, যেখানে দু-বছর আগে একজন আধা-ডাক্তারের নেতৃত্বে হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটি বাক্স নিয়ে আমরা হাজির হয়েছিলাম। আসল কথা হল স্যালাইন ইঞ্জেকশন মন্ত্রের মত কাজ করত, রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রয়োগ করা হলে সেরে ওঠার শতকরা আশি ভাগ সম্ভাবনা থাকত।

কলেরা রোগীদের সেবা করে আমরা খুব আনন্দ বোধ করতাম, বিশেষতঃ যখন দেখতাম যে তার দ্বারা কয়েকজন রোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা গিয়েছে। কিন্তু সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারে আমি সাংঘাতিকভাবে অমনোযোগী ছিলাম। যখন বাড়ী ফিরতাম তখন আমার জামাকাপড়গুলো রোগজীবাণু থেকে মুক্ত করার কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম না এবং আমি কোথায় ছিলাম এ বিষয়ে নিজের থেকে কাউকে কিছু বলতাম না। যে কয় মাস ধরে শুশ্রূষার কাজ করেছি, অন্যান্য লোকের মধ্যে আমি যে সংক্রমণ ছড়াইনি বা নিজে আক্রান্ত হই নি, এটা আশ্চর্যের বিষয়।

কলেরা রোগীদের সম্বন্ধে আমার কখনও কোনও বিরূপভাব ছিল না, এমন কি যখন ময়লা কাপড়চোপড় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি তখনও না; কিন্তু বসন্ত থেকে উঠবার চরমাবস্থায় ঐ কথা প্রযোজ্য ছিল না। এরূপ কোন রোগীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হতে আমার মনের সকল শক্তির প্রয়োজন হত। যাহোক, শিক্ষা হিসাবে এজাতীয় সেবাকার্যের মূল্য ছিল এবং আমি তা এড়িয়ে চলি নি।

এই শুশ্রূষার কাজে আনুষঙ্গিক অন্যান্য সমস্যার উদ্ভব হত। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সত্ত্বেও যারা মারা যেত তাদের কি হবে? মৃতদেহগুলোর ভার নিয়ে যথাযথভাবে সেগুলোর দাহকার্য করার মত কোনও সমিতি ছিল না। বেওয়ারিশ দেহগুলোর ক্ষেত্রে পৌর প্রতিষ্ঠানের ঝাড়ুদারেরা এসে তাদের খুশী মত সেগুলোর ব্যবস্থা করত। কিন্তু মৃত্যুর পর নিজের দেহ বেওয়ারিশ বলে গণ্য হবে এটা ভাবতে কারই বা ভাল লাগে? সেজন্য শুশ্রূষাকারীদের কাছে প্রায়ই মৃতদেহ সংকার করার জন্য সাহায্য চাওয়া হত। ভারতীয় প্রথা

অনুসারে আমাদের নিজেদেরই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্যাদি সম্পন্ন করতে হত। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনরা যদি অবস্থাপন্ন হত এবং কেবল স্বেচ্ছাসেবকদেরকেই যদি প্রয়োজন হত তাহলে সমস্যা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অর্থের কোনও সংস্থান ছিল না এবং সৎকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাদেরকে চাঁদা তুলে বেড়াতে হত। যে সব ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকেরা শুশ্রূষা করেছে সেগুলো বাদ দিলেও, অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পাদন করার জন্য লোকবলের প্রয়োজন হত এবং এরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা আমাদের করতে হত।

শুশ্রূষার কাজ প্রেরণাদায়ক ও হিতকর হলেও এতে আমার সমস্ত সময় ব্যয় হত না। উপরন্তু শুশ্রূষার কাজটা ছিল উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায় মাত্র; আমাদের জাতীয় সমস্যাগুলোর কোনও একটারও স্থায়ী প্রতিকার এর মধ্যে ছিল না। স্থায়ী ধরনের জাতি-গঠনমূলক কাজে অবহেলা করে হাসপাতালের এবং বন্যা দুর্ভিক্ষের সাহায্যদানের উপর বেশী জোর দেওয়ার জন্য আমাদের দলের মধ্যে আমরা সর্বদাই রামকৃষ্ণ মিশনকে সমালোচনা করেছি; তাঁদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না, সুতরাং, যুব সংগঠনের কাজে আমি হাত দিলাম। আমি বহু তরুণ একত্র করে তাদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন বিভাগ-সহ একটা সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম। যতদিন আমি এর মধ্যে ছিলাম ততদিন কাজ বেশ ভালই চলছিল। প্রায় এই সময়ই আমি অস্পৃশ্যতার সমস্যার সম্মুখীন হই। ছাত্রদের একটা হোস্টেলে, যেখানে আমরা প্রায়ই যেতে ভালবাসতাম, মাঝি নামে একটা সাঁওতাল ছাত্র ছিল। সাঁওতালদেরকে একটা নিম্ন জাতি বলে মনে করা হত; কিন্তু উদারভাবাপন্ন ছাত্ররা তা গ্রাহ্য না করে মাঝিকে হোস্টেলের একজন বাসিন্দারূপে সাদরে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিছুকাল সব ঠিকঠাক চলল। একদিন হোস্টেলের বাসিন্দাদের মধ্যে একজনের ব্যক্তিগত এক ভৃত্য কি ক'রে জানতে পারল যে মাঝি সাঁওতাল এবং অন্যান্য ভৃত্যদের কাছে গিয়ে সে এরূপ একটা গন্ডগোল পাকিয়ে তুলতে চেষ্টা করল যে মাঝি যদি চলে না যায় তাহলে তারা হোস্টেলের কাজ করতে অস্বীকার করবে। সৌভাগ্যবশতঃ, তার এই দাবীতে কর্ণপাত করার মত মনের ভাব কারোরই ছিল না এবং এই গন্ডগোলকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছিল। সে সময়ে যা আমার মনে হয়েছিল তা এই যে, প্রকৃতই উচ্চতর বর্ণের যারা আপত্তি করতে পারত তারা কখনও সাঁওতাল ছাত্রের ব্যাপারে বেশী মাথা ঘামায় নি—পক্ষান্তরে, যে কিনা নিজেই অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতির ছিল সেই ভৃত্যটির ক্রোধই দেখা দিয়েছিল খুব বেশী। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই মাঝি টাইফয়েড অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং আমরা তাকে বিশেষ যত্ন ও অনুকম্পার সাথে শুশ্রূষা করব ঠিক করলাম। এতে আমার মা আমার সাথে যোগ দিয়েছিলেন, যা আমার কাছে পরম বিস্ময় ও আনন্দের বলে বোধ হয়েছিল।

আমার অবসর সময় কাটানোর জন্য বন্ধুদের সাথে ধর্ম বা ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থানগুলোতে আমি বেড়াতে বের হতাম। উন্মুক্ত স্থানে জীবনযাপন এবং প্রচুর ভ্রমণ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী ছিল; এবং এর দ্বারা অন্যের সাথে সেই ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগের সুযোগ পেতাম, ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে যা কখনই সম্ভব নয়। উপরন্ত এই-ভাবে বাড়ী থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হত যেহেতু সেখানে আমার বিশেষ কিছুই করার ছিল না এবং ব্যক্তিগত যোগ সাধনার প্রতি আমার আর কোনও আকর্ষণ ছিল না, পাঠ্যপুস্তকগুলোও পড়বার আগ্রহ বোধ করতাম না। সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রধান প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো উৎসবে পরিণত হয়েছে, যাতে সমগ্র সমাজই অংশগ্রহণ করে থাকে। বাঙ্গলা দেশের একটি গ্রামের দুর্গাপূজার কথাই ধরা যাক। পূজোর ধর্মীয় দিকটা যদিও পাঁচদিন মাত্র চলে, কিন্তু এতৎ সংক্রান্ত কাজকর্ম চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে। বাস্তবিক পক্ষে, এই সময় পূজোর ব্যাপারে গ্রামের প্রত্যেক জাতি বা পেশার লোককে কোন না কোন কাজে প্রয়োজন হয়। সুতরাং—পূজো যদিও একটি বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়, সারা গ্রামই কিন্ত ওই উৎসবে যোগদান করে এবং আর্থিক দিক থেকেও পূজোর দ্বারা তারা লাভবান হয়। আমার শৈশবে আমাদের দেশের বাড়িতে পূজোর পরে একটি নাটক অভিনীত হত, যা সারা গ্রামের লোক উপভোগ করতে পারত। গত পঞ্চাশ বছর ধরে দেশ ক্রমশঃ গরীব হয়ে পড়ার দরুন ও গ্রামগুলি থেকে লোকজন সরে আসায় এইসব ধর্মীয় উৎসব অনেক কমে গেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই লোপ পেয়েছে। এর ফলে গ্রাম্য অর্থনীতিতে টাকাকড়ির লেনদেনে ক্ষতি হয়েছে এবং সামাজিক দিক দিয়ে ইহা জীবনকে করেছে নীরস এবং একঘেয়ে।

আর এক প্রকার ধর্মীয় উৎসব আছে যাতে জনসাধারণ আরও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে পুজো একটা বাড়িতে-না হয়ে জনসাধারণের ব্যবহার্য কোনও বৃহৎ হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ব্যয়ভার একটা পরিবারকে বহন করতে হয় না, জনসাধারণই করে থাকে, এই সব উৎসব যেগুলোকে বারোয়ারী পুজো[1] বলা হয়, ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। সেজন্য ১৯১৭ সালে আমরা এরকম একটা পুজোর আয়োজন করা স্থির করলাম। সামাজিক দিক দিয়ে তা বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল এবং সেজন্য পরবর্তী বছরগুলোতে তা পুনরনুষ্ঠিত হয়েছিল।

স্মরণ আছে, এ সময়েই মনের এক দিক দিয়ে আমার স্পষ্ট উন্নতি হয়েছিল—তা হল আত্মবিশ্লেষণের[2] অভ্যাস। সেই সময় থেকে বরাবর আমি নিয়মিতভাবে এরকম অভ্যাস করে আসছি এবং এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছি। এর উদ্দেশ্য নিজের মনের উপর তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজেকে আরও ভাল করে জানা। সচরাচর ঘুমোতে যাবার আগে অথবা অতি প্রত্যুষে এটা নিয়ে কিছু সময় কাটাতম। এই বিশ্লেষণ দুই প্রকারের হত—সে সময়ে আমি নিজে যেরকম ছিলাম তার এবং আমার সমগ্র জীবনের বিশ্লেষণ। প্রথমোক্তটি থেকে আমার মনে যে সমস্ত গোপন ইচ্ছে ও আবেগ, আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সেগুলো সম্বন্ধে আরও অধিক অবহিত হতে পারতাম। পরেরটি থেকে আমার জীবনকে অধিকতর ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে, ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাকে বিচার করতে, অতীতে নিজেকে পূর্ণ করবার জন্য আমাকে কিরূপে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে সে সম্বন্ধে বুঝতে ও আমার ভুলভ্রান্তিগুলো উপলব্ধি করতে এবং ঐগুলোর দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম।

অল্পদিন আত্মবিশ্লেষণের ফলেই আমার নিজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দুটো আবিষ্কার আমি করেছিলাম। প্রথমতঃ, তখনও পর্যন্ত আমার নিজের মন সম্বন্ধে, আমার মধ্যে বাহ্যিক ভদ্র চালচলনের আড়ালে যে বহু কুপ্রবৃত্তি লুকিয়ে ছিল ঐগুলো সম্বন্ধে খুব সামান্যই অবগত ছিলম। দ্বিতীয়তঃ, যে মুহূর্তে আমি আমার মধ্যে নীচ অথবা অসঙ্গত কোনও কিছুর প্রতি আমার অঙ্গুলি নির্দেশ করতাম, সে মুহূর্তে তার অর্ধেক জয় করতে পারতাম। মনের দুর্বলতাগুলো দেহের রোগের মত নয়; সেগুলো তখনই শুধু বেড়ে যেত যখন ধরা পড়ত না; ধরা পড়লে পালাবার[3] পথ পেত না।

এই আত্মবিশ্লেষণের যে সব আশু প্রয়োগ আমি করেছিলাম, সেগুলোর মধ্যে একটা হল কয়েকটা বিরক্তিকর স্বপ্ন থেকে পরিত্রাণ লাভ করা। শৈশবে কিছুটা সাফল্যের সঙ্গে এরূপ স্বপ্নগুলোর বিরুদ্ধে আমি লড়াই করেছি, কিন্তু যতই ধীরে ধীরে আমার বিশ্লেষণ প্রণালীর উন্নতি হচ্ছিল ততই আরও ভাল ফল লাভ করছিলাম। বাল্যকালের বিরক্তিকর স্বপ্নগুলোর মধ্যে ছিল সাপ, হিংস্র প্রাণী ইত্যাদির স্বপ্ন। সাপের স্বপ্ন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাত্রিতে ঘুমাবার আগে বসে বসে নিজেকে বিষধর সর্পসংকুল একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে কল্পনা করে বার বার বলতাম, 'দংশনের ভয়ে আমি ভীত নই; মৃত্যুকে আমি ভয় করি না।' এইভাবে দৃঢ়তার সাথে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তাম। কয়েকদিন এরকম অভ্যাস করার পর একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। প্রথম প্রথম আমার স্বপ্নের মধ্যে সাপের আবির্ভাব ঘটত কিন্ত তাতে আমি ভয় পেতাম না। তারপর সেগুলো একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। অন্যান্য হিংস্র প্রাণী সম্বন্ধীয় স্বপ্নগুলোর ক্ষেত্রে ঐ একই ব্যবস্থা করেছিলাম। সেই সময় থেকে আমি আদৌ কোনও কষ্ট পাইনি।

কলেজ থেকে যখন আমি বহিষ্কৃত হই, সে সময় বাড়ি তল্লাসী ও গ্রেপ্তাবের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। নিঃসন্দেহ ঐগুলো ছিল আমার অবচেতন মনের চিন্তা ও গোপন উৎকণ্ঠাগুলোর প্রতিফলন, কিন্তু কয়েক দিনের চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ লাভ করেছিলাম। আমাকে কেবল মনে মনে এইরকম কল্পনা করতে হয়েছে যে আমার

[1] গত দশ বছর ধরে কলকাতায় পুনবার বারোয়ারী পুজো খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এইসব পুজোর সাথে সাথে ব্যায়াম কৌশল, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে।

[2] আমি আমার নিজের মনকে বশ আনবার জন্য নিজের চেষ্টায় ও অভিজ্ঞতা থেকে এই পদ্ধতিটা উদ্ভাবন করেছিলাম। সে সময়ে মনোবিশ্লেষণ বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না।

[3] পরে যখন আমি মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম তখন জেনেছিলাম যে, ভুক্তভোগী মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে তার মানসিক দ্বন্দ্বের উৎস বা কারণ বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সে তা থেকে নিষ্কৃতি পায়।

কোন অসুবিধে না করেই বাড়ী তল্লাসী ও গ্রেপ্তার চলছে এবং নিজেকে বার বার বলতে হয়েছে যে, যাই ঘটুক না কেন আমি বিচলিত নই। আর এক রকম স্বপ্ন, ততটা না হলেও মাঝে মাঝে আমাকে বিরক্ত করত; সেগুলি ছিল পরীক্ষা-সংক্রান্ত—যেমন, হয় আমি প্রস্তুত নই, কিংবা পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হয়েছে। এইরকম স্বপ্ন আয়ত্তে আনবার জন্য নিজেকে বার বার বলতে হয়েছে যে, পরীক্ষার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং ভালো ফল করব, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি বহু লোকের কথা জানি, যাঁরা বেশী বয়স পর্যন্ত এই-রকম স্বপ্নের দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকেন এবং কখনও কখনও তাঁরা স্বপ্নের মধ্যে ভীষণ ভয় পেয়ে থাকেন। এ'দের পক্ষে অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু তাঁরা লেগে থাকলে প্রতিকার হবেই। যদি বিশেষ এক ধরনের স্বপ্নকে স্থায়ী হতে দেখা যায়, তাহলে প্রতিকার নিরূপণের উদ্দেশ্যে সেগুলির সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়।

যে স্বপ্ন থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সর্বাপেক্ষা কঠিন সেগুলি হল যৌন-সম্বন্ধীয়। এর কারণ, মানুষের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রবৃত্তিগুলির একটি হচ্ছে যৌন-প্রবৃত্তি এবং যেহেতু যৌন-তাড়নার একটি কাল আছে, সেই কারণে মাঝে মাঝে এই রকম স্বপ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। তথাপি, অন্তত কিছুটা প্রতিকার লাভ করা সম্ভব। যা হোক, আমার ঐ অভিজ্ঞতাই হয়েছে। পদ্ধতিটি হবে—যে বিশেষ রূপটি কাউকে তার স্বপ্নের মধ্যে উত্তেজিত করে, তা মনে মনে কল্পনা করা, এবং নিজেকে বারবার বলা যে এর দ্বারা আর সে উত্তেজিত হয় না—কামকে সে জয় করেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি এমন হয় যে স্ত্রীলোকের দ্বারা কোন লোকের কামোত্তেজনা জন্মে, তাহলে তার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হবে, সেই রূপটিকে মাতা বা বোন হিসেবে মনে মনে কল্পনা করা। যদি একথা মনে রাখা না যায় যে, যৌন-তাড়নার একটি কাল আছে যা অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলির বেলায় প্রযোজ্য নয়, এবং যৌন-প্রবৃত্তিকে কেবলমাত্র ধীরে ধীরে জয় বা মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব, তা হলে যৌন-বিষয়ক স্বপ্ন দমন করার ব্যাপারে হতাশ হতে হবে।

আমাদের কাহিনীর জের টেনে বলতে হয়, এক বছরের অনুপস্থিতির পর বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষদের কাছে আর একবার আমার ভাগ্য পরীক্ষা করবার জন্য কলকাতায় ফিরে এলাম। এটি ছিল কঠিন কাজ, কিন্তু এ ব্যাপারের চাবিকাঠিটি ছিল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে, যিনি কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহৃত হতে পারত। কি ঘটবে তার জন্য প্রতীক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম এবং আমার কর্মশক্তিকে উপযুক্ত কোন কাজে লাগাতে পারি, এইরকম একটা পথ খুঁজছিলাম। ঠিক তখনই 49th Bengalee বাহিনীতে নতুন লোক সংগ্রহের অভিযান চলছিল। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এই উদ্দেশ্যে আহূত এক সভায় হাজির হলাম এবং খুব আগ্রহান্বিত বোধ করলাম। বিডন স্ট্রীটে যে অফিসে নতুন প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছিল, পরদিন গোপনে সেখানে হাজির হয়ে আমাকে ভর্তি করে নেবার জন্য বললাম। সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সর্বদাই জঘন্য হয়ে থাকে, এবং কোন লজ্জাবোধকে তারা গ্রাহ্য করে না। নিঃসঙ্কোচে স্বাস্থ্য-পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, অন্যান্য সব পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হব, কিন্ত চোখের দোষ ছিল বলে আমি ভয় পেয়েছিলাম। I.M.S. অফিসার একজন ভারতীয় জুটে গিয়েছিল, আমাকে উপযুক্ত বলে চালিয়ে দেবার জন্য তাঁর কাছে অনুনয় করলাম; কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, চোখ পরীক্ষার জন্য আমাকে আর একজন অফিসারের কাছে যেতে হবে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়'—আর এক্ষেত্রে তেমনই ঘটেছিল। এই অফিসারটি,—কোন এক মেজর কুক—চোখের ব্যাপারে খুব কড়া ছিলেন এবং যদিও আমি অন্যান্য প্রত্যেকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে-ছিলাম, তবু তিনি আমাকে অনুপযুক্ত বলে রায় দিলেন। ভগ্ন-হৃদয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

আমাকে জানানো হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগণ সম্ভবত সদয় হবেন, তবে আমাকে তখন একটি কলেজ দেখতে হবে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তি না থাকলে আমি ভর্তি হতে পারি। বঙ্গবাসী কলেজ আমাকে ভর্তি করে নিতে চেয়েছিল কিন্তু সেখানে দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়বার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য স্কটিশ চার্চ কলেজে চেষ্টা করব স্থির করলাম। যাই হোক, একদিন সুপ্রভাতে কোন সুপারিশ ছাড়াই ঐ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. Unquharst-এর কাছে সোজা গিয়ে হাজির হলাম। তাঁকে বললাম যে আমি একজন বহিস্কৃত ছাত্র, তবে বিশ্ববিদ্যালয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে এবং

আমি তাঁর কলেজে দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়তে চাই। স্পষ্টতই আমার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভালই হয়েছিল, কেননা তিনি আমাকে ভর্তি করে নিতে সম্মত হলেন, তবে এই শর্তে যে যদি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ বাধা না দেন। আমাকে তাঁর কাছ থেকে এই মর্মে একটি চিঠি আনতে হবে যে স্কটিশ চার্চ কলেজে আমার ভর্তিতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। এটি আমার পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। যা হোক, কলকাতায় আমার অভিভাবক, আমার মেজ দাদা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আমার হয়ে তা করতে চাইলেন এবং নতুন অধ্যক্ষের[১] সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে Mr. W খুব সহজেই স্বীকৃত হয়েছিলেন, তবে তিনি আমাকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। আমি গেলাম এবং তিনি আমাকে পূর্ববর্তী বছরের ঘটনাবলী সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করলেন। শেষে এই বলে তিনি ক্ষান্ত হলেন যে, অতীত অপেক্ষা ভবিষ্যতের গুরুত্বই তাঁর কাছে বেশী এবং অন্য কোন কলেজে আমার ভর্তির ব্যাপারে তিনি আপত্তি করবেন না। এমনটি আমি চেয়েছিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না।

ভর্তি হয়েই আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনা করতে লেগে গেলাম। দুটি বছর আমার নষ্ট হল, এবং ১৯১৭ সনের জুলাইয়ে যখন পুনরায় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যোগদান করলাম তখন আমার সহপাঠীরা, বি, এ, পাশ করে এম, এ ডিগ্রীর জন্য পড়াশুনা করছে। কলেজে আমি গণ্ডগোল এড়িয়ে চলেছিলাম। অধ্যক্ষের পদে Dr. Unquharst এর মত একজন বিচক্ষণ ও সহানুভূতিশীল লোক ছিলেন বলেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল না। তিনি নিজে দর্শনের লোক ছিলেন, এবং বাইবেল পড়ানো ছাড়াও ঐ বিষয়ে পড়াতেন। তাঁর বাইবেল পড়ানো অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল এবং এই প্রথম বাইবেল আমার কাছে একঘেয়ে মনে হত না। P. E. School-এর বাইবেল পড়ানোর সঙ্গে এর পার্থক্য আমার খুবই মনোমত হয়েছিল। কলেজ জীবনটা ছিল সাধারণতঃ একঘেয়ে, কেবল কলেজের সমিতিগুলির বিশেষতঃ দর্শন সমিতির সব কার্য-কলাপে আমি অংশ গ্রহণ করে তার ব্যতিক্রম ঘটাতাম। কিন্তু শীঘ্রই আমার দৈনন্দিন জীবনে করার মত আরও কিছু পেয়ে গেলাম।

গভর্নমেন্ট ভারত-রক্ষা বাহিনীর—যা ভারতের আঞ্চলিক বাহিনী ছিল—একটি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গঠন করতে সম্মত হয়েছিলেন এবং দুটি কোম্পানীবিশিষ্ট এই শাখার জন্য লোক সংগ্রহের কাজ চলছিল। নিয়মিত সেনাবাহিনীতে স্বাস্থ্যপরীক্ষা যেরকম কঠোর হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে সেরকম পরীক্ষা হবে না, বিশেষতঃ দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারে। অতএব আমার ভর্তি হওয়ার একটা সুযোগ ছিল। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে এই পরীক্ষার উদ্যোগ করছিলেন, কলকাতার বিখ্যাত সার্জন স্বর্গত ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারী[২]; বাঙালীদের জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবার ব্যাপারে যাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। এবার আমাকে নিরাশ হতে হল না। কলকাতা ময়দানে সাধারণ পোষাকে আমাদের ট্রেনিং শুরু হল এবং ফোর্ট-উইলিয়ামস্থ লিংকনস্ রেজিমেন্ট অফিসার ও শিক্ষকের ব্যবস্থা করলেন। প্রথম দিন নাম ডাকবার সময় সেখানে বিচিত্র জমায়েত হয়েছিল। কারও পরনে ধুতি (বাঙালী ধরন) কারও পরনে হাফপ্যান্ট (আধা-সামরিক ধরন) কারও ফুলপ্যান্ট (অসামরিক ধরন), কারও খালি মাথা, কেউ পাগড়ি পরে, কেউ টুপী, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরা সৈন্য তৈরী করবে মনে হয় নি। কিন্তু দুই মাস পরে যখন আমরা ফোর্টের কাছে চলে গেলাম, সামরিক পোষাক পরলাম, এবং তাঁবু গেড়ে রাইফেল নিয়ে কুচকাওয়াজ করতে শুরু

[১] Mr. W.

[২] বাঙালীদের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করবার জন্য গভর্নমেন্টকে রাজী করবার আন্দোলনে ডাক্তার সর্বাধিকারী, ডাক্তার এস, কে, মল্লিক, (আধুনা মৃত) ও অন্যান্য কয়েকজন অগ্রণী হয়েছিলেন। যুদ্ধের সময়, গভর্নমেন্টের যখন জনশক্তির অভাব হল, তখন তাঁরা কৃতকার্য হলেন। বাঙালীদের প্রথমে ambulance corps- এ যোগ দেবার সুযোগ দিয়ে মেসোপটেমিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। তারা সেখানে খুব ভাল কাজ করায়, তাদের নিয়মিত বাহিনীতে ভর্তি করা হয় এবং 49th Bengalee বাহিনী তখন গঠন করা হয়। ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনীতে বাঙালীদের ভর্তি করা হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় পদাতিক বাহিনী ছিল, ঐ বাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। বিশ্ববিদ্যালয় পদাতিক বাহিনী এখন একটি স্থায়ী বাহিনী কিন্তু নিয়মিত বাহিনীতে বাঙালী ইউনিটগুলি যুদ্ধের পর ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯১৬ সালে Bengal Ambulance corps-এর একজন যুদ্ধফেরৎ অফিসারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি কুৎ-এল-আমরা'র অবরোধকালে উপস্থিত ছিলেন এবং তারপর তুরস্কে একজন যুদ্ধবন্দী হয়েছিলেন। তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনীগুলি শুনে আমি খুব উত্তেজিত হয়েছিলাম এবং সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিলাম।

করলাম, তখন সমগ্র রূপটি বদলে গেল। চারমাস আমরা শিবির জীবন যাপন করেছিলাম এবং বিশেষ উপভোগ করেছিলাম। এর মধ্যে কিছুদিন কলকাতা থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে বেলঘরিয়ায় কাটিয়েছিলাম, যেখানে রাইফেলের পাল্লায় আমরা বন্দুকচালনা অভ্যাস করেছিলাম। সন্ন্যাসীদের পায়ের কাছে বসে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা এবং রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে সৈন্যবাহিনীর একদল ব্রিটিশ অফিসারের হুকুম তামিল করা—কি পরিবর্তন!

আমরা কোন যুদ্ধ দেখি নি বা প্রকৃত কোন দুঃসাহসিক কাজ আমাদের করতে হয় নি। তথাপি আমরা শিবির-জীবনে খুব উৎসাহ পেয়েছিলাম। পূর্বে যদিও কখনও আমাদের সামরিক জীবনের মত কোন কিছুর অভিজ্ঞতা ছিল না, নিঃসন্দেহে ইহা নিজেদের মধ্যে প্রকৃত ভাই ভাই ভাব জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কুচকাওয়াজ ছাড়াও আমাদের—সরকারী ও বেসরকারী—সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদ, ও সেই সঙ্গে খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের ট্রেনিং-এর শেষের দিকে, অন্ধকারে লড়াই-এর মহড়া হয়েছিল যা ছিল বিশেষ কৌতূহলপ্রদ ও উত্তেজনাপূর্ণ। এই বাহিনীতে মজার মজার সব চরিত্র ছিল। এবং আমরা তাদের নিয়ে নানা রকমের কৌতুক উপভোগ করতাম। প্রথমাবস্থায় তাদের আলাদা একটি দলে রাখা হত যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'আনাড়ির দল'। তবে তাদের যেমন যেমন উন্নতি হত, নিয়মিত বাহিনীগুলিতে তাদের বাছাই করে ভর্তি করে নেওয়া হত। কিন্তু জ্যাক জনসনের[১] কোনও পরিবর্তন ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত অনন্য এক ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেই সে চলেছিল, এবং কম্যাণ্ডিং অফিসার পর্যন্ত তাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আমাদের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন গ্রে ছিলেন একটি চরিত্র। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ-পদাধিকারী, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর প্রাচীন ঐতিহ্য বিবেচনা করলে যার মূল্য অনেক। তাঁর চাইতে ভাল কোন শিক্ষক পাওয়া কঠিন হত। কট্টর স্কটল্যাণ্ডবাসী, গলার স্বর কর্কশ, প্যারেড গ্রাউণ্ডে সর্বদাই তিনি গোমড়ামুখো হয়ে থাকতেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়টা ছিল সোনার মত খাঁটি। তিনি সর্বদাই ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতেন, যা তাঁর অনুগামীরা জানত এবং সেজন্য তাঁর রুক্ষ ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁকে পছন্দ করত। সে সময়ে আমরা মনে করতাম যে ক্যাপ্টেন গ্রে-র জন্য আমরা সব কিছু করতে পারি। তিনি যখন আমাদের বাহিনীতে যোগ দেন, ফোর্ট উইলিয়ামের স্টাফ অফিসাররা এরকম মত প্রকাশ করেছিলেন যে সৈনিক হিসাবে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। ক্যাপ্টেন গ্রে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদের ধারণা ভুল। আসলে, সকলেই শিক্ষিত ছিলাম বলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলেছিলাম। সাধারণ সৈনিকদের যা শিখতে কয়েক মাস লাগত, আমরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা শিখে ফেলতাম। তিন সপ্তাহ বন্দুক-চালনা শিক্ষার পর আমাদের ও আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে একটা বন্দুক ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং তাতে শিক্ষকগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। আমাদের শিক্ষকরা প্রথমে বিশ্বাস করতে চান নি যে আমরা আগে কখনও রাইফেল নিয়ে নাড়াচাড়া করি নি। মনে আছে আমাদের বাহিনীর শিক্ষককে একদিন সৈনিক হিসাবে আমাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি তা অকপটে আমার কাছে ব্যক্ত করার জন্য বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে, কুচকাওয়াজের সময় আমরা খুব সপ্রতিভ, তবে আমাদের লড়াই-এর শক্তির পরীক্ষা হতে পারে শুধু যুদ্ধের সময়। আমাদের অধিনায়ক আমাদের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, অন্তত আমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হলে এইরকম বলেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমরা যেদিন গভর্নরকে গার্ড-অফ-অনার প্রদর্শন করি, সেদিন আমাদের কুচকাওয়াজ দেখে যখন গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী আমাদের প্রশংসা করেছিলেন তখন তিনি গর্ব বোধ করেছিলেন। তাঁর সন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেল যখন আমরা নববর্ষের দিনে শপথ ঘোষণার কুচকাওয়াজে পারদর্শিতা দেখালাম।

সৈনিকের কাজ করে যখন আনন্দ লাভ করতাম সেই দিনগুলি থেকে আমার কতই না পরিবর্তন হয়েছে! তখন নতুন পরিবেশের সঙ্গে মেনে চলতে না পারার কোন লক্ষণ তো ছিলই না, বরং এর মধ্যে সত্যিই একধরনের আনন্দ আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। এই শিক্ষা আমাকে এমন কিছু দিয়েছিল যা আমার প্রয়োজন ছিল অথবা যা আমার মধ্যে ছিল না। মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাসবোধ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সৈনিক হিসাবে আমাদের এমন কতকগুলি অধিকার ছিল ভারতীয় হিসাবে যা আমাদের ছিল না। ভারতীয় হিসাবে আমাদের কাছে ফোর্ট উইলিয়াম ছিল সীমার বাইরে, কিন্তু সৈনিক হিসাবে আমাদের

---

[১] ইহা তার ছদ্মনাম ছিল।

সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল। এবং বাস্তবিকপক্ষে, আমরা প্রথম যেদিন আমাদের রাইফেল আনবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতরে মার্চ করে ঢুকলাম, সেদিন অদ্ভুত এক ধরনের তৃপ্তিবোধ আমাদের হয়েছিল, যেন আমরা এমন একটা কিছুর দখল নিচ্ছি, যাতে আমাদের একটা জন্মগত অধিকার আছে, অথচ যা থেকে আমাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। শহরে ও অন্যত্র রুট মার্চগুলি উপভোগ করতাম, সম্ভবত এই কারণে যে ইহা আমাদের একটা মর্যাদাবোধ দিয়েছিল। পুলিশ ও গভর্নমেন্টের যে সব অনুচরের দ্বারা হয়রান বা সন্ত্রস্ত হওয়া আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাদের আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারতাম।

কলেজে তৃতীয় বর্ষটা সৈনিক জীবন ও এতৎসংক্রান্ত উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। চতুর্থ বর্ষেই[১] শুধু আগ্রহসহকারে আমি আমার পড়াশুনা শুরু করলাম। ১৯১৯ সালে বি এ পরীক্ষায় আমার ফল ভাল হল, কিন্তু আমার প্রত্যাশানুযায়ী নয়। দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেলেও, গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। এম এ-তে দর্শন নিয়ে আর পড়াশুনা করার ইচ্ছে আমার ছিল না। আগে যেমন বলেছি, দর্শন সম্পর্কে আমার মোহ কিছুটা কেটে গিয়েছিল। যদিও বিষয়টি বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল, সংশয়বোধ জাগিয়েছিল এবং জ্ঞানানুসন্ধানে শৃংখলাবোধ এনেছিল, আমার মৌলিক সমস্যাগুলির কোন একটিরও ইহা সমাধান করে নি। আমার সমস্যাগুলির সমাধান একমাত্র আমিই করতে পারতাম। এটি ছাড়াও আরও একটি কারণ কাজ করেছিল। গত তিন বছরের মধ্যে আমার নিজের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। অতএব, এম এ পরীক্ষার জন্য পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করব স্থির করলাম। এই অপেক্ষাকৃত নতুন বিজ্ঞানটি আমার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লেগেছিল, কিন্তু কয়েকমাসের বেশী বিষয়টি আঁকড়ে থাকা আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল না।

আমার বাবা তখন কলকাতায় ছিলেন; একদিন সন্ধ্যেবেলা তিনি হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার মেজ দাদা শরৎ-এর সঙ্গে তাঁকে একান্তে দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পড়বার জন্য ইংলণ্ডে যেতে আমি রাজী আছি কি না। যদি আমি রাজী থাকি তাহলে আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব রওনা হতে হবে। মনস্থির করবার জন্য আমাকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দেওয়া হল।

এটি আমার কাছে এক চরম বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। আমি একান্তে বিবেচনা করে দেখলাম, এবং কয়েকঘন্টার মধ্যেই যাবার জন্য মনস্থির করে ফেললাম। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করার আমার সমস্ত পরিকল্পনা সরিয়ে রাখলাম। কতবার যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আমার সযত্নে রচিত পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়ে যাবে, একথা ভেবে আশ্চর্য বোধ হল। মনস্তত্ত্ব ছাড়তে আমার তত কষ্ট হয় নি. কিন্তু ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে একটি চাকরী গ্রহণ করে কি হবে? স্বপ্নেও এমন কথা ভাবি নি। যা হোক, নিজেকে বোঝালাম যে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি কখনও আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব না কারণ ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে নিতে নিতে আর মাত্র আট মাস সময় থাকবে এবং আমার বয়সের দরুন পরীক্ষা দেবার একটিমাত্র সুযোগ আমি পাব। যদি আমি কোনক্রমে উত্তীর্ণ হয়েও যাই, আমি কি করব, সেকথা ভাববার যথেষ্ট সময় থাকবে।

আমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে রওনা হতে হয়েছিল। সমস্তটাই সমুদ্রপথে যাবে এমন একটা জাহাজে কোনরকমে একটা বার্থ যোগাড় করা গেল। কিন্তু অসুবিধা হল আমার পাসপোর্ট নিয়ে। ব্যাপারটি সি আই ডির সানুগ্রহ দয়ার উপর ছেড়ে দিতে হত, বিশেষত বাংলার মত একটি প্রদেশে। আর পুলিশের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার পূর্ব-ইতিহাস নিশ্চয়ই নিষ্কলঙ্ক ছিল না। আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাঁর মাধ্যমে আমাকে পুলিশের সদর দপ্তরে পরিচয় করে দেওয়া হল, এবং ছয়দিনের মধ্যেই আমার পাসপোর্ট পাওয়া গেল। আশ্চর্য ব্যাপার বটে!

আর একবার আমি নিজের বিবেচনামত কাজ করলাম। যখন আমার ইংল্যাণ্ড যাত্রার প্রস্তাব সম্বন্ধে দলের সঙ্গে পরামর্শ করলাম, তারা এই পরিকল্পনায় আমাকে নিরুৎসাহ করল। বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ সদস্যদের মধ্যে একজন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বিবাহ করে সেখানেই

---

[১] ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১ম ও ২য় বর্ষের পর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হয়। ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের পর হয় বি. এ অথবা বি. এস. সি পরীক্ষা, এবং এম. এ কিংবা এম, এস সি পরীক্ষা হয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষের পর।

স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছে এবং ফেরবার নাম করে নি। আর একটি পরীক্ষা করে দেখতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু আমার জেদ চেপে গিয়েছিল। একজন সদস্য যদি ভুল পথে গিয়ে থাকে, তাতে কি আসে যায়? তার দ্বারা এমনটি প্রতিপন্ন হয় না যে অন্যান্য সকলেই তা করবে। আমি এরকম যুক্তি দেখালাম। দলের সংগে আমার সম্পর্কটা কিছুদিন ধরেই কমে আসছিল, এবং তাদের সংগে পরামর্শ না করেই আমি বিশ্ববিদ্যালয় পদাতিক বাহিনীতে যোগদান করেছিলাম। কিন্তু ইহাই শেষ। প্রকাশ না করলেও আমরা অনুভব করেছিলাম যে যাত্রাপথে আমাদের বিচ্ছেদের সময় এসেছে, কারণ আমি আমার নিজের মত একটি পথ খুঁজে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম।

অতঃপর ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনার ব্যাপারে যিনি প্রাদেশিক উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁর সংগে দেখা করলাম। তিনি নিজে ছিলেন কেম্ব্রিজের ছাত্র ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। তিনি আমার মুখ চিনতেন এবং স্বভাবতই একজন বহিষ্কৃত ছাত্র সম্বন্ধে তাঁর উঁচু ধারণা ছিল না। যে মুহূর্তে তিনি শুনলেন যে আমি পরের বছর আই সি এস পরীক্ষায় বসতে চাই, আমাকে নিরস্ত করবার জন্য তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করলেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের 'সেরা সেরা' ছাত্রদের সংগে প্রতিযোগিতায় আমার কোনই আশা নেই; কেন আমি দশহাজার টাকা নষ্ট করতে যাচ্ছি? তাঁর হিতোপদেশের এটাই ছিল মূলকথা। তাঁর যুক্তির অকাট্যতা উপলব্ধি করে এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে পেয়ে শুধু বললাম, "আমার বাবা নষ্ট করবার জন্যই আমাকে দশ হাজার টাকা দিতে চান।" এর পর কেম্ব্রিজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে তিনি আমাকে কোনও সাহায্য করবেন না দেখে তাঁর কাছ থেকে চলে এলাম।

সম্পূর্ণ নিজের সম্বলের উপর ভরসা করে এবং ইংলণ্ডে আমার ভাগ্যপরীক্ষার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর আমি জাহাজে রওনা হলাম।

ন ব ম প রি চ্ছে দ

কেম্ব্রিজে

আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করার আগেই অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের বিরাট হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। কিন্তু পাঞ্জাবের বাইরে তার কোনও সংবাদই প্রায় পেঁছয়নি। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়েছিল এবং ঐ প্রদেশ থেকে পাঠানো সব সংবাদের উপর সেন্সরের কড়া ব্যবস্থা ছিল। কাজেই লাহোর ও অমৃতসরে ভয়ানক কিছু ঘটেছে এরকম ভাসা ভাসা গুজবই কেবল আমরা শুনেছিলাম। আমার একজন ভাই তখন সিমলায় কাজ করছিলেন; তিনি পাঞ্জাবের ঘটনাবলী ও ইংরাজ-আফগানের যুদ্ধে যে আফগানরা ব্রিটিশদের পরাস্ত করেছিল ঐ সম্বন্ধেও কিছু খবর—বরং গুজবই বলা যায়—নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ উত্তর-পশ্চিমে কি ঘটছিল সে বিষয়ে কোনও খবরই জানত না, এবং আমি একটা আত্মতুষ্টির ভাব নিয়েই ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

জাহাজে বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় যাত্রী ছিল—অধিকাংশই ছাত্র। সেজন্য আমরা পৃথক একটি খাবার টেবিল নেওয়া সংগত মনে করলাম যেখানে আমরা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব। আমাদের টেবিল পরিচালনা করতেন একজন বয়স্কা ও শ্রদ্ধেয়া মহিলা, এক ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভেন্টের বিধবা পত্নী। যাত্রীদের অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ—রোদে পোড়া তামাটে রঙ ও উন্নাসিক প্রকৃতির। তাদের সংগে মেলামেশা প্রায় অসম্ভব ছিল—সেজন্য আমরা ভারতীয়রা বেশীর ভাগ নিজেদের নিয়েই থাকতাম। মধ্যে মধ্যে কোন না কোন ব্যাপারে ভারতীয় যাত্রীর সংগে কোনও ব্রিটিশের সংঘর্ষ ঘটত; এবং যদিও আমাদের ইংলণ্ড পেঁছানো পর্যন্ত খুব গুরুতর কিছু ঘটেনি তবু ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশের গর্বান্ধিত মনোভাবে আমরা সকলে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। এই সমুদ্রযাত্রাকালে কৌতূহলোদ্দীপক একটা আবিষ্কার আমি করেছিলাম—ভারতের বাইরে গেলেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ভারত ও ভারতবাসীদের প্রতি ভালোবাসা বেড়ে ওঠে। জাহাজের কয়েকজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যাত্রী ছিল। যতই আমরা ইউরোপের নিকটবর্তী হচ্ছিলাম, ততই তাদের বাড়ীর জন্য—অর্থাৎ ভারতের জন্য—'মন কেমন' করছিল। ইংলণ্ডে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা নিজেদের ইংরাজ বলে চালাতে পারে না। তা ছাড়া—সেখানে তাদের কোন আশ্রয়, সমাজ বা আত্মীয়-বন্ধু

নেই। অতএব এটা অবশ্যম্ভাবী যে ভারতবর্ষ থেকে তারা যতই দূরে যাবে, ততই তারা নিবিড়তরভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

'সিটি অব ক্যালকাটা' অপেক্ষা মন্থরতর জাহাজ হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। ৩০ দিনে তার Tilbury পৌঁছবার কথা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক সপ্তাহ বেশী লেগে গেল। কারণ, ইংলণ্ডে কয়লা-শ্রমিকদের ধর্মঘটের দরুন কয়লা না পাওয়ায় জাহাজ সুয়েজে আটকে পড়েছিল। আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই যে পথে আমরা অনেক বন্দরে ভিড়েছিলাম। জাহাজে পাঁচ সপ্তাহের মেয়াদটিকে কিছুটা সহনীয় করবার জন্য আমাদের জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদস্বরূপ ঠাট্টা পরিহাসের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এক সহযাত্রী স্ত্রীর নির্দেশে গো-মাংস স্পর্শ করত না। আর একজন যাত্রী তাকে ঠকিয়ে গো-মাংসের 'কোপ্তা কারী' খাইয়েছিল—ভেড়ার মাংসের 'কোপ্তা কারী' মনে করে সেটি সে খুব উপভোগ করেছিল। বারো ঘন্টা বাদে ভুল বুঝতে পেরে তার কি অনুশোচনা! আর একজন যাত্রীকে তার বাগদত্তা প্রতিদিন একটি করে চিঠি লিখতে বলে দিয়েছিল। সারাক্ষণ প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করে ও তার সম্বন্ধে গল্প করে সে কাটাত। ভালো লাগুক আর না লাগুক, আমাদের শুনতেই হত। বারবার পীড়াপীড়ি করার ফলে একদিন যখন আমি মন্তব্য করলাম যে তার বাগদত্তার মুখাবয়বে গ্রীক বৈশিষ্ট্য আছে তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘতম প্রতীক্ষারও অবসান আছে; তাই শেষ পর্যন্ত আমরা Tilbury পৌঁছলাম। সেদিনটা ছিল স্যাঁতস্যাঁতে ও মেঘাচ্ছন্ন—লণ্ডনের আবহাওয়ার যা বৈশিষ্ট্য। তবে প্রকৃতির কথা মন থেকে মুছে দেবার মত যথেষ্ট উত্তেজনা আমাদের মধ্যে ছিল। প্রথম যখন ভূগর্ভ রেলস্টেশনে নেমে গেলাম তখন তার নূতনত্ব আমি বিশেষ উপভোগ করেছিলাম।

পরদিন সকালে খোঁজখবর করতে বেরিয়ে পড়লাম। ক্রমওয়েল রোডে ভারতীয় ছাত্রদের উপদেষ্টার অফিসে গেলাম। তিনি আমার সঙ্গে খুব সুন্দর ব্যবহার করলেন, অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু শেষে বললেন যে কেম্ব্রিজে ভর্তির ব্যাপারে কিছু করার নেই। ভাগ্যক্রমে, সেখানে আমার সঙ্গে কেম্ব্রিজের কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রের দেখা হয়ে গেল। তাদের একজন আমাকে দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দিল, ক্রমওয়েল রোডে সময় নষ্ট না করে সোজা কেম্ব্রিজে গিয়ে সেখানে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে। আমি রাজী হলাম. এবং পরদিন কেম্ব্রিজে উপস্থিত হলাম। উড়িষ্যা থেকে আগত কয়েকজন ছাত্র, যাদের আগে আমি সামান্য চিনতাম, আমাকে সাহায্য করল। তাদের একজন[১] ছিল Fitzwilliam Hall -এর; সে আমাকে সেন্সর মিঃ রেডাওয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। মিঃ রেডাওয়ে অতিশয় সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন, ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনলেন, এবং এই বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন যে অবিলম্বে তিনি আমাকে ভর্তি করে নেবেন। ভর্তির সমস্যা মিটল, কিন্তু তার পর প্রশ্ন দেখা দিল চলতি টার্ম নিয়ে যা দুই সপ্তাহ আগেই শুরু হয়ে গেছে। যদি আমার ঐ টার্মটি নষ্ট হয় তাহলে সম্ভবত আমার ডিগ্রী লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য আরও প্রায় এক বছর সময় লেগে যবে; তা না হলে ১৯২১ সালের জুনের মধ্যে আমি ডিগ্রী লাভ করব। এই প্রশ্নেও মিঃ রেডাওয়ে আমার আশার অতিরিক্ত সুযোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে আমার অনুকূলে রায় দেন সেজন্য তিনি কয়লা-শ্রমিকদের ধর্মঘট ও সৈন্যবাহিনীতে আমার অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি কৃতকার্য হলেন, ফলে ঐ টার্মটি আমার নষ্ট হল না। মিঃ রেডাওয়ে না থাকলে ইংলণ্ডে আমার কি হত জানি না।

২৫শে অক্টোবর নাগাদ আমি লণ্ডনে পৌঁছেছিলাম এবং কেম্ব্রিজে গুছিয়ে বসে কাজকর্ম শুরু করতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হয়ে গেল। আমাকে অস্বাভাবিক রকম বেশী লেকচারে উপস্থিত থাকতে হত—ঐগুলির কিছু ছিল Mental ও Moral Sciences Tripos- এর জন্য আর বাকি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য। লেকচারের সময় ছাড়া আমাকে যতদূর সম্ভব পরিশ্রম করে পড়াশুনা করতে হত। এই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যা পেতাম তা ছাড়া আর কোনও আমোদের প্রশ্ন আমার কাছে ছিল না। সিভিল সার্ভিসের পুরাতন নিয়মাবলী অনুসারে আমাকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল বলে আমাকে আট-নয়টি বিভিন্ন বিষয় নিতে হয়েছিল; এর মধ্যে কয়েকটি ছিল আমার কাছে নতুন। আমার বিষয়গুলি ছিল—ইংরাজী রচনা, সংস্কৃত. দর্শন, ইংরাজী আইন, রাজনীতি-বিজ্ঞান,

---

[১] এস. এম. ডি.

আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল। এই বিষয়গুলির অধ্যয়ন ছাড়াও, ভূগোলপত্রের জন্য আমাকে সমীক্ষা ও মানচিত্র-অংকন করতে হয়েছিল (ইংরাজীতে যাকে Cartography বলে) এবং আধুনিক ইতিহাসের পত্রের জন্য কিছু কিছু ফরাসী শিখতে হয়েছিল।

Mental ও Moral Sciences Tripos-এর কাজ বেশী আকর্ষণীয় ছিল কিন্তু লেকচারগুলিতে উপস্থিত থাকা ছাড়া বেশী সময় তার জন্য দিতে পারতাম না। আমার লেকচারারদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সোরলি (নীতিশাস্ত্র), অধ্যাপক মায়র্স (মনস্তত্ত্ব) ও অধ্যাপক ম্যাক্‌টেগার্ট (অধিবিদ্যা)। প্রথম তিনটি টার্মে কার্যত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যই আমার সমস্ত সময় ব্যয় করেছিলাম। অবসর-বিনোদনের জন্য ভারতীয় মজলিস ও ইউনিয়ন সোসাইটির সভাগুলিতে যোগদান করতাম।

যুদ্ধের পর কেম্ব্রিজ রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিল। অক্সফোর্ড অনেকটা সেরকমই ছিল, তবে উদারপন্থী হতে শুরু করেছিল। একটি বিষয় থেকেই প্রচলিত আবহাওয়া সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে : শান্তিবাদী, সমাজবাদী, নীতিগতভাবে যুদ্ধবিরোধী, ও ঐ ধরনের মতাবলম্বীরা কেম্ব্রিজে প্রকাশ্য জনসভায় সহজে বক্তৃতা করতে পারতেন না। অস্নাতক ছাত্রেরা সাধারণত এসে ঐ সব সভা ভেঙে দিত এবং বক্তার প্রতি ময়দার ঠোঙা নিক্ষেপ করে বা তাকে নদীতে চুবিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলত। এই 'র‍্যাগিং' অবশ্য সেখানকার অস্নাতকদের একটা বৈধ আমোদ ছিল এবং আন্তরিকতার সংগে আমি তা অনুমোদন করতাম। কিন্তু বক্তা ভিন্ন-মতাবলম্বী শুধু সেই কারণেই সভা ভেঙে দেওয়া আমার ভালো লাগত না।

আমার মত একজন বহিরাগতের মনে যা বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল তা হল ছাত্রদের যে পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া হত, এবং সাধারণভাবে যে শ্রদ্ধার চোখে সকলে তাদের দেখত। তাদের চরিত্রের উপর নিঃসন্দেহে এর খুব ভালো প্রভাব হয়েছিল। আমার মনে হত, কলকাতার মত পুলিশে ভরা শহর, যেখানে প্রত্যেকটি ছাত্রকে এক একজন সম্ভাব্য বিপ্লবী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিরূপে গণ্য করা হত, তার সংগে এখানকার কত পার্থক্য! আর কেম্ব্রিজের আবহাওয়ায় বাস করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনাবলী—ছাত্রদের প্রতি অধ্যাপকদের দুর্ব্যবহার—কল্পনা করাও কঠিন ছিল; কারণ এখানে অধ্যাপকদের প্রতিই ছাত্রদের দুর্ব্যবহার করার সম্ভাবনা ছিল। বাস্তবিক পক্ষে, যে সমস্ত অধ্যাপককে অপছন্দ করা হত, অ-স্নাতকরা কখনো কখনো তাঁদের ঘরে চড়াও হয়ে তাঁদের 'র‍্যাগ' করত; অবশ্য বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এরকম করা হত; কারণ কোন ক্ষতি হলে পরে তাঁদের ক্ষতি-পূরণ করা হত। এমন কি কেম্ব্রিজের রাস্তায় রাস্তায় যখন এই ধরনের গণ্ডগোল চলত এবং সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি হত, পুলিশ তখনও আশ্চর্য সংযমের সংগে ব্যবহার করত, ভারতবর্ষে বা একেবারে অসম্ভব।

ব্রিটিশ ছাত্ররা স্বাধীন আবহাওয়ায় জন্মেছে ও গড়ে উঠেছে, তাই স্বভাবতই ছাত্রদের এই স্বাধীনতাবোধ তাদের চেয়ে আমাকেই বেশী আকর্ষণ করত; এ কথা ছেড়ে দিলেও, যে খাতির ও শ্রদ্ধার সংগে সর্বত্র তাদের প্রতি আচরণ করা হত তা দেখে খুবই আশ্চর্য হতে হত। সম্পূর্ণ নবাগতেরও তৎক্ষণাৎ এই ধারণা হত যে উচ্চমানের চরিত্র ও আচরণ তার কাছে আশা করা হবে; এবং এর প্রতিক্রিয়া অবশ্যই অনুকূল হত। কেবল কেম্ব্রিজেই যে অ-স্নাতকদের এরকম খাতির করা হত তা নয়, সারা দেশ জুড়েই কম-বেশী এর প্রচলন ছিল। রেলগাড়ীতে কারও প্রশ্নের উত্তরে যদি কেউ বলত যে সে কেম্ব্রিজের (বা অক্সফোর্ড) ছাত্র, তাহলে সংগে সংগে প্রশ্নকর্তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটত। সে বন্ধুভাবাপন্ন—কিংবা হয়ত বলতে পারি, আরও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠত। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ডে যারা যায় তাদের মধ্যে যদি উন্নাসিকতার কোনও লক্ষণ দেখা যায় তা নিশ্চয়ই আমি সমর্থন করি না। তবে পুলিশী নির্যাতনের একটা আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার দরুন আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে ছাত্র ও তরুণদের দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে মেনে নিয়ে তাদের অধিকতর স্বাধীনতা দান এবং সমীহ করে চলার পক্ষে অনেক কথা বলার আছে।

কলকাতায় যখন কলেজের ছাত্র ছিলাম তখনকার একটি ঘটনা আমার স্মরণ আছে। নতুন নতুন বই কেনার তখন আমার ভীষণ শখ ছিল। দোকানের শো-কেসে কোন বইয়ের ওপর যদি আমার ঝোঁক পড়ত তাহলে সেটি না পাওয়া পর্যন্ত স্থির থাকতে পারতাম না। বইটি যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ এত অস্বস্তি বোধ করতাম যে বাড়ী ফিরবার আগেই সেটি

আমায় কিনতে হত। একদিন কলেজ স্ট্রীটের বড় বড় দোকানগুলির একটিতে গিয়ে দর্শনের একটি বই চাইলাম যেটি পড়ার জন্যে তখন আমি খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। দাম বলা হলে দেখলাম যে কয়েক টাকা আমার কম পড়ছে। আমি ম্যানেজারকে বইটি আমাকে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম এবং পরদিন বাকি টাকাটা এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম। তিনি উত্তর দিলেন যে তা সম্ভব নয়, আমাকে পুরো দামটাই তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিতে হবে। বইটি না পেয়ে কেবল যে নিরাশ হয়েছিলাম তাই নয়, আমাকে এরকম[1] অবিশ্বাস করা হয়েছিল বলে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম। সুতরাং যখন দেখলাম কেম্ব্রিজে যে কোন দোকানে ঢুকে পছন্দমত যে কোন জিনিসের অর্ডার দেওয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে দাম দেবার জন্য বিব্রত হতে হয় না তখন সত্যিই স্বস্তি বোধ করেছিলাম।

আর একটি ব্যাপার আমাকে মুগ্ধ করেছিল—তা হল ইউনিয়ন সোসাইটির বিতর্ক-সভাগুলি। সমস্ত পরিবেশই ছিল অতীব আনন্দদায়ক। যা খুশী বলবার বা যাকে ইচ্ছা আক্রমণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সদস্যগণ ও কখনো কখনো মন্ত্রিসভার সদস্যগণ পূর্ণ মমতার ভিত্তিতে এই সব বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন এবং অবশ্যই কঠোর সমালোচনার ও কখনো কখনো কটাক্ষের সম্মুখীন হতেন। পার্লামেন্ট সদস্য হোরেশিও বটমলী (Horatio Bottomley) একবার একটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিরোধী পক্ষীয় একজন বক্তা তাঁকে সাবধান করে বলেছিলেন—"There are more things in heaven and earth Horatio than your John Bull dreams of".

ছোটখাটো চমকপ্রদ রসিকতা সভার কার্যধারাকে প্রাণবন্ত করে তুলত। আয়ারল্যান্ড সম্বন্ধে এক বিতর্ক চলার সময়ে একজন আইরিশপন্থী বক্তা গভর্নমেন্টের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে বলেছিলেন-"the forces of law and order on one side and Bonar Law and disorder on the other".

এই সব বিতর্কসভায় অতিথিদের মধ্যে পার্লামেন্টের বিতর্কে দক্ষ ও সুপরিচিত ব্যক্তিগণ ছাড়াও এমন আরো অনেকে ছিলেন যাঁদের তখন সবেমাত্র রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্মরণ আছে যে ডাঃ হিউ ডাল্টন প্রায়ই এই সব বিতর্কে উপস্থিত থাকতেন। তিনি ছিলেন পার্লমেন্টের ভাবী সদস্য; সেই সময়ে কোন এক নির্বাচন কেন্দ্রে কাজ করছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্যার অসওয়াল্ড মোসলে; তিনি তখন বামপন্থী, উদারনৈতিক (বা শ্রমিক দলের সদস্য) ছিলেন। ডায়ার এবং ও'ডায়ারের নীতিকে তিনি তীব্রভাবে নিন্দা[2] করেছিলেন, এবং ১৯১৯ সালে অমৃতসরের ঘটনাবলী জাতিবিদ্বেষেরই প্রকাশ, এই মন্তব্য করে ব্রিটিশ মহলে ঝড় তুলেছিলেন। স্যার জন সাইমন ও মিঃ ক্লাইনস একবার গিল্ডহলে কেম্ব্রিজবাসীদের কাছে খনি-শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বলতে এসেছিলেন। তাঁদের বাধা দেবার জন্য অ-স্নাতকেরা এসে উপস্থিত হল। স্যার জন সাইমনকে চারদিক থেকে আক্রমণ করা হয়েছিল, কিন্তু মিঃ ক্লাইনস (তিনি নিজেও বোধহয় একজন খনি-শ্রমিক ছিলেন) উঠে দাঁড়িয়ে এমন আন্তরিকতা ও আবেগের সঙ্গে বললেন যে যারা বিদ্রূপ করতে এসেছিল তারা প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল।

কেম্ব্রিজে যে ছয়টি টার্ম কাটিয়েছিলাম ঐ সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ ও ভারতীয় ছাত্রদের সম্পর্ক মোটের ওপর সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই তা প্রকৃত বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। শুধু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নয়, সাধারণভাবে যা দেখেছি তা থেকেই একথা বলছি। অনেকগুলি কারণ এর জন্যে দায়ী। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ত ছিলই এতে সন্দেহ নেই; সাধারণ ব্রিটিশের মধ্যে অমায়িকতার বাহ্যিক আবরণের আড়ালে একটা শ্রেষ্ঠতাবোধ লক্ষ্য করা যেত যা অন্যান্যদের পছন্দ হত না। আমাদের দিক থেকে, যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে যে সব ঘটনা ঘটেছিল এবং বিশেষত অমৃতসরের শোচনীয় ঘটনার পর আমাদের আত্মসম্মান ও জাতির মর্যাদার ব্যাপারে আমরা স্পর্শকাতর (বোধহয় অতিমাত্রায়) না হয়ে পারিনি। আমাদের দেখে দুঃখ হত যে মধ্যবিত্ত ইংরেজদের মধ্যে জেনারেল ডায়ারের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। সাধারণভাবে বলা যায় যে ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে বন্ধুত্বের কোন ভিত্তি বোধহয় ছিল না। রাজনীতির দিকে থেকে আগের চেয়ে আমরা আরও সচেতন ও অধিকতর স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিলাম। কাজেই, কোনও ভারতীয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের

[1] অবস্থার যে এখন পরিবর্তন হয়েছে তা আমার অজ্ঞাত নয়।
[2] এখন তার কত পরিবর্তন হয়েছে।

মূল্যে ছিল তার রাজনৈতিক মতামতের প্রতি সহানুভূতি, কিংবা অন্তত সহনশীলতা, যা সব সময়ে পাওয়া যেত না। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কেবল শ্রমিক দলই ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করত। সেজন্য শ্রমিক-দলের সদস্যগণ বা সেই সব ব্যক্তি যাদের মত ও ভাবধারা শ্রমিক-দলপন্থী ছিল, তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যের অধিকতর সম্ভাবনা ছিল।

উপরের মন্তব্যগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, তার ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। আমার নিজের, ছাত্র এবং অন্যান্য বহু লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, ব্রিটিশ রাজনীতি সম্বন্ধে যাদের মতামত ছিল রক্ষণশীল এবং আমার জীবনের ভিন্ন গতি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ আছে। আমার মতামতের প্রতি তাঁরা যথেষ্ট সহনশীল ছিলেন বলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। গত দশকে এবং বিশেষত গত পাঁচ বছর ধরে গ্রেট ব্রিটেনের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে একপ্রকার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে; এবং আমার ধারণা কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, লন্ডন ও অন্যান্য স্থানগুলিতে এর প্রভাব পড়েছে। সুতরাং ১৯১৯ ও ১৯২০ সালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আজকের অভিজ্ঞতা নাও মিলতে পারে।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যেরকম দেখেছি তাতে ব্রিটিশ মনোবৃত্তি সম্পর্কে আমার ধারণা যে ভুল হয়নি, দুই একটি ঘটনা থেকে তা দেখানো যেতে পারে। সাধারণত দাবী করা হয় যে সাধারণ ইংরাজের মধ্যে একটা ন্যায়বিচারবোধ, খেলোয়াড়সুলভ একটা মনোভাব আছে। আমি যখন কেম্ব্রিজে তখন আমরা ভারতীয়রা এর আরও প্রমাণ পেয়েছিলাম। সে বছর টেনিস চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল সুন্দর দাস নামে এক ভারতীয় ছাত্র—সুতরাং সে ব্লু পেয়েছিল। আমরা আশা করেছিলাম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় টীমের অধিনায়কত্ব করার জন্য তাকেই বলা হবে। কিন্তু ঐ আশাকে ব্যর্থ করার জন্য একজন পুরানো ব্লু-কে, যাকে ইতিপূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল, ডেকে পাঠানো হল এবং আর এক বছরের জন্য তাকে থেকে যেতে বলা হল। কাগজপত্রে সব কিছু ঠিক ছিল। টীমের অধিনায়কত্ব করার ব্যাপারে সিনিয়র ব্লু-র দাবীই প্রথমে গ্রাহ্য, কিন্তু পর্দার অন্তরালে কি ঘটে গেছে তা প্রত্যেকেই জানত এবং ভারতীয় ছাত্রমহলে নীরব ক্ষোভ জমে উঠেছিল।

আর একটি দৃষ্টান্ত। একদিন আমরা নোটিশে দেখলাম যে ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর-এ ভর্তির জন্য অ-স্নাতকদের কাছে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অগ্রণী হয়ে দরখাস্ত করল। আমাদের বলা হল যে প্রশ্নটি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে বিবেচনার জন্যে পাঠাতে হবে। কিছুকাল পরে উত্তর এল যে ও টি সি-তে আমাদের ভর্তির ব্যাপারে ইণ্ডিয়া অফিস আপত্তি জানিয়েছে। বিষয়টি ভারতীয় মজলিসের সামনে আনা হল এবং স্থির হল এ বিষয়ে ভারত সচিবের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, আর প্রয়োজন হলে Mr. K. L. Gauba ও আমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার অধিকার দেওয়া হল। তদানীন্তন সচিব, মিঃ ই এস মন্টেগু আমাদের বিষয়টি সহকারী সচিব আর্ল অব লিটনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন; তিনি আমাদের আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন এবং ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শুনলেন। তিনি আমাদের জোর দিয়ে বললেন যে ইণ্ডিয়া অফিসের আদৌ কোন আপত্তি নেই এবং বাধাটা আসছে ওয়ার অফিস (War Office) থেকে। ওয়ার অফিসকে জানানো হয়েছিল যে ও টি সি-তে ভারতীয়দের ভর্তি করা হলে ব্রিটিশ ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হবে। তা ছাড়া, ওয়ার অফিসের ভয় এই যে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করলে যেহেতু ও টি সি-র সদস্যদের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে কর্মভার প্রাপ্ত হওয়ার অধিকার জন্মায়, সেহেতু ভারতীয় ছাত্ররা যদি ও টি সি-তে শিক্ষালাভ করার পর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী দাবী করে তাহলে এক সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। লর্ড লিটন আরও বলেছিলেন, ভবিষ্যতে যে ভারতীয় অফিসার সম্মিলিত বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত হবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি তা অবশ্যম্ভাবী মনে করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন কোন মহলে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ আছে যা উপেক্ষা করা যায় না। আমরা উত্তর দিয়েছিলাম যে, ঐ অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা আশ্বাস দিতে প্রস্তুত যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে আমরা চাকরি চাইব না। আমরা আরও বলেছিলাম যে পেশাগত ভাবে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করা অপেক্ষা শিক্ষালাভের দিকেই আমাদের আগ্রহটা বেশী। কেম্ব্রিজে ফিরে আবার আমরা ও টি সি স্টাফদের ধরাধরি করলাম এবং আবার আমাদের বলা হল যে ঐ প্রস্তাবে ওয়ার অফিস আপত্তি করছে না, বরং ইণ্ডিয়া অফিসই করছে। সত্য যাই হোক না কেন, কোনও কোনও ব্রিটিশ মহলে যে ভারতীয়দের প্রতি একটা বিদ্বেষ ছিল এতে

সন্দেহ নেই। যতদিন আমি সেখানে ছিলাম, কর্তৃপক্ষ ততদিন আমাদের দাবীগুলি পূরণ করেননি এবং আমার মনে হয়, সতেরো বছর আগে অবস্থা যা ছিল এখনও তাই আছে।

সেই সময়ে কেম্ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের রেকর্ড মোটের উপর সন্তোষজনক ছিল, বিশেষত পড়াশুনার ব্যাপারে। খেলাধুলায়ও তারা মোটেই খারাপ ছিল না। আমরা শুধু নৌকাবাইচে তাদের আরও উন্নতি দেখলে সুখী হতাম। এখন ভারতবর্ষে নৌকা-বাইচ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, সুতরাং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে নৌকাবাইচেও তারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে পাঠানো বাঞ্ছনীয় কিনা এবং বাঞ্ছনীয় হলে কোন বয়সে পাঠানো উচিত এই বিষয়ে প্রায়ই প্রশ্ন উঠে থাকে। ১৯২০ সালে গ্রেট ব্রিটেনে বসবাসকারী ভারতীয় ছাত্রদের বিষয়ে বিবেচনা করে দেখার জন্য লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে এক সরকারী কমিটি গঠিত হয়েছিল, এবং ঐ প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটিও আলোচিত হয়েছিল। আমার সুচিন্তিত অভিমত যা ছিল এবং এখনও আছে তা এই যে ভারতীয় ছাত্রদের খানিকটা সাবালকত্ব অর্জনের পরই বিদেশে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ, সাধারণত বি এ পাস করার পর তাদের যাওয়া কর্তব্য। সেক্ষেত্রে তারা তাদের প্রবাসজীবনকে সর্বাপেক্ষা বেশী কাজে লাগাতে পারে। কেম্ব্রিজে ভারতীয় মজলিসের প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য গঠিত উপরোক্ত কমিটির সামনে এই মতই আমি পেশ করেছিলাম। বৃটেনে পাবলিক স্কুলের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়ে থাকে। বৃটেনের অধিবাসী ও বৃটিশ ছাত্রদের উপর এর ফল কিরকম হয়ে থাকে সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, এর স্বপক্ষে আমি কিছুই খুঁজে পাইনি। ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলি থেকে পাশ করেছে এরকম কিছু ভারতীয়ের সঙ্গে কেম্ব্রিজে আমার দেখা হয়েছিল এবং তাদের[১] সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণা হয়নি। যাদের বাবা-মা তাদের সঙ্গে ইংলণ্ডে বাস করেছেন এবং স্কুলের শিক্ষার অতিরিক্ত বাড়ীর প্রভাবও যাদের উপর পড়েছে তারা সম্পূর্ণ একাকী ছাত্রদের থেকে ভালো ফল দেখিয়েছে। নিম্নতর ধাপগুলিতে শিক্ষা অবশ্যই 'জাতীয়' হওয়া চাই, দেশের মাটির সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ থাকা চাই। স্বদেশের সংস্কৃতি থেকে মনের খোরাক আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অল্প বয়সেই কাউকে অন্য স্থানে পাঠিয়ে দিলে তা কি করে সম্ভব হবে? না, ছেলেমেয়েদের অপরিণত বয়সে একেবারে একাকী বিদেশের স্কুলগুলিতে পাঠাবার চিন্তাকে আমাদের সচরাচর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষা আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে উচ্চতর ধাপগুলিতে। তখনই শুধু ছাত্রেরা বিদেশে গিয়ে উপকৃত হতে পারে, এবং তখনই পারস্পরিক কল্যাণের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন ঘটতে পারে।

ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের আগে বলা হত 'সবজান্তা', যার অজানা কিছুই নেই। এই কথার মধ্যে কিছু যৌক্তিকতা ছিল কারণ সকল প্রকার কাজে তাদের নিযুক্ত করা হত। যে শিক্ষা তারা লাভ করত তা তাদের খানিকটা স্থিতিস্থাপকতা এবং সেই সঙ্গে বহু বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান দিত, যা প্রকৃত শাসনকার্যে তাদের সহায়ক হত। আমি একথা উপলব্ধি করেছিলাম যখন নয়টি বিষয় ঘাড়ে নিয়ে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসি। পরবর্তী জীবনে ঐগুলির সমস্তই যে আমার কাজে লেগেছে এমন নয়, তবে আমি অবশ্যই বলব যে রাজনীতি-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরাজী ইতিহাস, ও আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে উপকার হয়েছিল—বিশেষ করে আধুনিক ইউরোপীয় ইতি-হাসের ক্ষেত্রে। এই বিষয়টি পড়বার আগে ইউরোপ মহাদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না। আমরা ভারতীয়রা ইউরোপকে গ্রেট ব্রিটেনের একটা বৃহৎ সংস্করণ হিসাবে গণ্য করতে শিখেছি। কাজেই ইংলণ্ডের চোখ দিয়ে ঐ মহাদেশকে দেখার একটা অভ্যাস আমাদের আছে। এটা অবশ্য একেবারেই ভুল, কিন্তু ইউরোপে যাইনি বলে, আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাস ও তার কিছু কিছু মূল সূত্রগুলি যথা বিসমার্কের আত্ম-জীবনী, মেটারনিকের স্মৃতিকথা, কাভুরের পত্রাবলী না পড়া পর্যন্ত এই ভুল আমি উপলব্ধি করিনি। কেম্ব্রিজে পড়া এই মূল সূত্রগুলি আমার রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির আভ্যন্তরীণ ধারাগুলি সম্বন্ধে আমার ধারণা গড়ে তুলতে সর্বাধিক সাহায্য করেছিল।

১৯২০-র জুলাই-এর গোড়ার দিকে সিভিল সার্ভিসের প্রকাশ্য প্রতিযোগিতামূলক

[১] প্রত্যেক নিয়মেরই অবশ্য ব্যতিক্রম আছে।

পরীক্ষা লণ্ডনে শ্রুরু হল। এটি একমাস যাবৎ চলেছিল এবং মানসিক যন্ত্রণাও বহুদিন ভোগ করেছিলাম। মোটের উপর আমি খেটেছিলাম খুব; কিন্তু আমার আশানুরূপ একেবারেই তৈরী হয়নি। সেজন্য আশান্বিত বোধ করতে পারিনি। কত মেধাবী ছাত্র বছরের পর বছর প্রস্তুতি সত্ত্বেও কৃতকার্য হয়নি, সেজন্য আত্মবিশ্বাস রাখতে হলে আত্মনির্ভরতার আশ্রয় নিতে হত। সংস্কৃত পত্রে প্রায় ১৫০-এর মত নিশ্চিত নম্বর বোকার মত ছেড়ে দেওয়ার পর নিজের উপর আস্থা আরও হারালাম। সেটি ছিল ইংরাজী থেকে সংস্কৃতে অনুবাদের পত্র, এবং আমি ভালই করেছিলাম। প্রথমে অনুবাদটির মোটামুটি একটা খসড়া তৈরী করেছিলাম এই মনে করে যে উত্তর-পত্রে সেটি ভালো করে লিখে দেব; কিন্তু সময়ের কথা এমনই ভুলে গিয়েছিলাম যে যখন ঘণ্টা বেজে গেল তখন যে মূল খসড়াটি করেছিলাম তার অংশমাত্র ঠিকমত লেখা হয়েছে। কিন্তু কি আর করা—উত্তরপত্র জমা দিতে হল, আঙুল কামড়ানো ব্যতীত আমার আর কিছু করার ছিল না।

আমি আমার আত্মীয়স্বজনদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি ভালো করিনি এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে স্থান পাবার আশা করতে পারি না। আমি এখন Tripos-এর জন্য আমার প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম। এই অবস্থায় লণ্ডনে থাকাকালীন যখন এক রাত্রে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে তার পেলাম—'অভিনন্দন জানাচ্ছি, মর্ণিং পোস্ট দেখ'—তখন আমার বিস্ময়টা কল্পনা করুন! এর অর্থ কি হতে পারে আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম। পরদিন সকালে যখন মর্ণিং পোস্টের একটা সংখ্যা পেলাম তখন দেখলাম যে আমি চতুর্থ স্থান অধিকার করেছি। আমি আনন্দিত হলাম। তৎক্ষণাৎ দেশে একটা তার পাঠিয়ে দিলাম।

এবার আমার সামনে আর এক সমস্যা দেখা দিল। এই চাকরি নিয়ে আমি কি করব? আমার সমস্ত স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে নিশ্চিন্ত একটা জীবনে কি প্রতিষ্ঠিত হতে যাব? এতে নূতনত্ব কিছুই নেই। পূর্বে কতজনই ত এই পথে গিয়েছে—কতজন তাদের অল্প বয়সে বড় বড় কথা বলে বড় হয়ে অন্য রকম আচরণ করেছে। কলকাতার এক যুবকের কথা জানতাম, কলেজে পড়ার সময়ে যার জিহ্বাগ্রে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ছিল; কিন্তু পরে সে এক ধনী পরিবারে বিবাহ করে এবং এখন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে আশ্রয় নিয়েছে। তা ছাড়া, বোম্বাইয়ের এক বন্ধুর দৃষ্টান্ত আছে যে স্বর্গত লোকমান্য তিলকের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে যদি সে আই সি এস পরীক্ষায় কোনও রকমে উত্তীর্ণ হয়ও তাহলে সে পদত্যাগ করে দেশের কাজে[১] আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু আমার অল্পবয়সেই আমি স্থির করেছিলাম যে গতানুগতিক পথে চলব না এবং তা ছাড়া, আমার কতগুলি আদর্শ ছিল যেগুলি অবলম্বন করে আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। অতএব যে পর্যন্ত না আমি আমার অতীত জীবনকে মুছে ফেলতে পারছি ততক্ষণ চাকুরি গ্রহণ করা ছিল আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

পদত্যাগের কথা ভাবার পূর্বে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুটি চিন্তাকে আমার গুরুত্ব দিতে হয়েছিল। প্রথমত, আমার আত্মীয়স্বজনেরা কি ভাববেন? দ্বিতীয়ত, উত্তেজনার ঝোঁকে যদি এখন আমি পদত্যাগ করি তাহলে ভবিষ্যতে আমার কাজের জন্য দুঃখ করবার

[১] লোকমান্য বি. জি. তিলক যখন ১৯১৯ সালে কেম্ব্রিজে আসেন তখন তিনি ভারতীয় ছাত্রদের কাছে সরকারী চাকুরীর পিছনে না ছুটে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য আবেদন জানান। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে কত মেধাবী ও সম্ভাবনাপূর্ণ ছাত্র সরকারী চাকুরীর জন্য লালায়িত। এই বন্ধুটি হঠাৎ প্রেরণার বশবর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল যে যদিও সে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের যোগ্যতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করছে, তবু যদি সে কোনরকমে পরীক্ষা পাশ করে তাহলে সে পদত্যাগ করবে এবং তারপর জাতীয় স্বার্থে কাজ করবে। প্রথমবার সে পাশ করেনি কিন্তু পরের বছর সে কৃতকার্য হয়েছিল এবং এখনও ঐ চাকুরী করছে।

লোকমান্য তিলকের কেম্ব্রিজে আসার কথা শুনে ইণ্ডিয়া অফিস ও পররাষ্ট্র দপ্তর ঘাবড়ে গিয়েছিল। সম্ভব হলে তার আসা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে তদানীন্তন পররাষ্ট্র-সচিব, লর্ড কার্জন, ভাইস-চ্যান্সেলরকে লিখেছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে ভাইস-চ্যান্সেলর ভারতীয় ছাত্রদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু তারা জানিয়ে দিয়েছিল যে যেহেতু লোকমান্য তিলককে ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তাঁর আসা বন্ধ করা একেবারেই অসম্ভব। এর পর, লর্ড কার্জনের পত্র সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আর কোনও হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

কেম্ব্রিজে লোকমান্য তিলকের বক্তৃতার মূল কথা ছিল এই যে 'পনেরো বছরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন' তাঁর দাবী। কিছু কিছু ইংরাজ স্নাতক যারা শুনেছিল যে লোকমান্য তিলক একজন তেজস্বী পুরুষ, তারা তাঁর বক্তৃতায় কিছু গরম গরম কথা শোনার আশায় এসেছিল। বক্তৃতার পর তারা মন্তব্য করেছিল: 'এরাই যদি তোমাদের চরমপন্থী হয়, তাহলে আমরা তোমাদের নরমপন্থীদের কথা শুনতে চাই না।'

কোন কারণ ঘটবে কি? আমি যে ঠিক কাজ করছি এ সম্বন্ধে আমি কি একেবারে সুনিশ্চিত?

মনস্থির করতে আমার দীর্ঘ সাত মাস সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে, আমি আমার মেজদাদা শরৎ-এর সঙ্গে পত্র লেখালেখি শুরু করলাম। সৌভাগ্যবশত, আমার লেখা পত্রগুলি তিনি রেখে দিয়েছিলেন। আমি যেগুলি পেয়েছিলাম সেগুলি সমস্তই প্রচণ্ড রাজনৈতিক জীবনের ঝড়-ঝাপটায় হারিয়ে গিয়েছে। আমার পত্রগুলি প্রণিধানযোগ্য, কারণ ঐগুলি থেকে ১৯২০ সালে আমার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি, আই সি এস পরীক্ষার ফল ঘোষিত হয়েছিল। এর কয়েকদিন পরে আমি যখন এথেন্সে লে-অন-সীতে ছুটি কাটাচ্ছি, তখন ২৫শে সেপ্টেম্বর তাঁকে এই রকম একটি চিঠি লিখি :

'আপনার অভিনন্দনসূচক চিঠি পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। জানি না আই সি এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে আমার তেমন কি লাভ হয়েছে, কিন্তু এই খবরে যে সকলে খুশী হয়েছেন এবং বিশেষতঃ বাবা ও মায়ের মন এই দুর্দিনে যে একটু হালকা হয়েছে এতেই আমার আনন্দ।

'আমি এখানে কেট্স্ পরিবারের অতিথি হিসাবে বাস করছি। শ্রীমতী কেট্সের মধ্যে ইংরেজ চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই। ভদ্রলোক মার্জিত, উদার মতাবলম্বী এবং ভাবে সর্বদেশিক।......রুশ, পোল্যান্ডবাসী, লিথুয়ানীয়, আয়ারল্যান্ডীয় ও অন্যান্য বিদেশীয় সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। রাশিয়ান, আইরিশ, ও ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর প্রচুর উৎসাহ, রমেশ দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর গভীর অনুরাগ।......পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করায় আমি রাশিকৃত অভিনন্দন পাচ্ছি। তবে আই সি এস গোষ্ঠীতে প্রবেশ করার চিন্তায় যে কিছুমাত্র আনন্দ পাচ্ছি একথা বলা চলে না। যদি এই চাকরীতে যোগ দিতে হয় তবে এই পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করতে যেরকম অনিচ্ছা নিয়ে এসেছিলাম সেইরকম অনিচ্ছার সঙ্গেই তা করতে হবে। চাকরী-জীবনে মোটা মাইনে এবং তারপর মোটা পেন্সন্ আমার বরাদ্দ থাকবে তা জানি। দাসত্বে যদি যথেষ্ট কুশলতা অর্জন করি তাহলে একদিন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হবার আশা আছে। যোগ্যতা থাকলে, গোলামিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, হয়ত একদিন কোন প্রদেশ-সরকারের মুখ্য সচিব হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু চাকরীকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য বলে মেনে নিতে হবে? চাকরীতে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাবে, কিন্তু সেটা কি আত্মার মূল্যের বিনিময়ে? আমার মনে হয় আই সি এস গোষ্ঠীর কোন লোককে চাকরীর আইন-কানুন যে ভাবে মাথা নীচু করে মেনে নিতে হয়, তার সঙ্গে জীবনের উচ্চ আদর্শকে মেনে নেবার চেষ্টা ভণ্ডামি ভিন্ন কিছুই নয়।

'সাধারণ লোকের কথায় যাকে বলে জীবনে উন্নতি করা তার প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে, আমার মানসিক অবস্থাটা ঠিক কি রকম, তা আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন। এ চাকরীর পক্ষে বলবার অনেক কিছু আছে। প্রত্যহ অগণিত মানুষ যে অন্নের চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছে, সেই অন্নচিন্তা এ চাকরীতে চিরদিনের জন্য মিটে যাবে। জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে সাফল্য, অসাফল্য সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মত মানসিকতার মানুষ যে চিরদিন "উদ্ভট" চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থেকেছে তার পক্ষে স্রোতে গা ভাসিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াটাই শ্রেষ্ঠ পথ নয়। সংগ্রাম ছাড়া, বিপদ ছাড়া, জীবনের স্বাদই অনেকখানি অন্তর্হিত হয়ে যায়। যার অন্তরে সাংসারিক উচ্চকাঙ্ক্ষা নেই তার কাছে, জীবনের সংশয়, বিপদ ততটা ভয়াবহ নয়। উপরন্তু একথা ঠিক যে সিভিল সার্ভিসের শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ থেকে দেশের সত্যিকারের কাজ করা চলে না। এক কথায় সিভিল সার্ভিসের আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে মেলানো চলে না!

'আমি বুঝতে পারছি, এসব কথা বলে কোন ফল হবে না, কারণ আমার ইচ্ছায় কিছু হওয়ার নয়। সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে আপনার কোন মোহ নেই, আমি জানি। কিন্তু আমার চাকরী ছাড়ার কথাতে বাবা যে খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। তিনি আমাকে জীবনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুপ্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্য উদ্গ্রীব।...... সুতরাং দেখছি যে, অর্থনৈতিক কারণে ও স্নেহের বন্ধনের ফলে আমার ইচ্ছাকে আদৌ আমার বলে দাবী করতে পারি না। কিন্তু একথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আমার ইচ্ছাই যদি চূড়ান্ত হত, তাহলে সিভিল সার্ভিসে আমি কখনই যোগ দিতাম না।

'আপনি হয়ত বলবেন যে এ চাকরী এড়াবার চেষ্টা না করে এর ভিতরে প্রবেশ করে এর পাপকে দূর করাই উচিত, এবং সে কথা বললে অবশ্যই অন্যায় বলা হবে না। কিন্তু

যদি তাই-ই করি, তাহলেও যে কোনদিন অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াতে পারে যে, ইস্তফা দেওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর থাকবে না। এখন থেকে পাঁচ দশ বছর পরে যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে জীবনে নতুন করে পথ করে নেবার উপায় থাকবে না। সেক্ষেত্রে আজ আমার সামনে অন্য পথ উন্মুক্ত রয়েছে।

'সন্দেহবাদী লোকে বলবে যে চাকরীর প্রশস্ত কোলে একবার স্থান করে নেবার পর আমার সমস্ত তেজ উবে যাবে। কিন্তু এই ক্ষয়কারী প্রভাব আমার উপর কিছুতেই পড়তে দেব না, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি বিবাহ করব না, অতএব যা আমি সত্য বুঝব তা পালন করার পথে সাংসারিক বিবেচনার অধীন হয়ে থাকতে হবে না।

'আমার মনের গঠন যে রকম তাতে আমার সত্যিই সন্দেহ হয় যে সিভিল সার্ভিসের যোগ্যতা আমার আছে কি না। বরঞ্চ আমার ধারণা, যেটুকু ক্ষমতা আমার আছে, তা অন্যভাবে আমার নিজের ও দেশের কাজে লাগাতে পারব।

'এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে পারলে আনন্দিত হব। বাবাকে এ বিষয়ে কিছু লিখিনি—কেন তা ভেবে পাচ্ছি না। তাঁর মত-ও জানতে পারলে সুবিধে হত।'

উপরের চিঠিটিতে দেখা যায় যে, আমার মনের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্তে পেঁছবার মত কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। ১৯২১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ঐ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করে আমি লিখেছিলাম :

'......আপনি বলতে পারেন যে এই কুৎসিত ব্যবস্থাকে পরিহার না করে এর ভিতরে প্রবেশ করে, এর সঙ্গে সংগ্রাম করাই আমার কর্তব্য। কিন্তু সে সংগ্রাম করতে হবে একাকী, কর্তৃপক্ষের হুমকি ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী সহ্য করে, উন্নতির পথ বন্ধ করে। চাকরীর থেকে এইভাবে যেটুকু উপকার করা যায় সেটুকু বাইরে থেকে যা করা যায়, তার তুলনায় যৎসামান্য। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্যই সার্ভিসের আওতায় অনেক কাজ করেছিলেন, তবু আমার মনে হয় আমলাতন্ত্রের বাইরে থাকলে তাঁর কাজ দেশের পক্ষে অনেক বেশী মঙ্গলজনক হত। তাছাড়া এক্ষেত্রে প্রকৃত প্রশ্নটি নীতিগত। নীতি অনুসারেই, আমি এই শাসনযন্ত্রের অংশ হওয়ার কথা চিন্তা করতে পারি না। গোঁড়ামিতে, স্বার্থান্ধ শক্তিতে, হৃদয়হীনতায়, সরকারী মার-প্যাঁচের জটিলতায় এই শাসনযন্ত্র বিকল। এর প্রয়োজনের দিন বিগত।

'আমি এখন এই দুই পথের সংযোগস্থলে উপস্থিত, এবং কোন মধ্যপথ আশ্রয় করবার কোন উপায় নেই। হয় আমাকে এই জঘন্য চাকরীর মায়া ত্যাগ করে সর্বান্তঃকরণে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে, নতুবা সমস্ত আদর্শ আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে হবে।......আমি জানি আমার এই বিপজ্জনক হঠকারিতায় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই তুমুল সোরগোল তুলবেন।......কিন্তু তাঁদের মতামতে, নিন্দায়, বা প্রশংসায় আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু আপনার আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে তাই আপনার কাছে আবেদন করছি। পাঁচ বছর আগে এই সময়ে আমার পক্ষে বিপর্যয়কারী একটি ঘটনায় আপনার নৈতিক সমর্থন পেয়েছিলাম। এক বছরের জন্য সেই সময় আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বোধ হয়েছিল, তবু আমি তার সমস্ত পরিণাম নির্ভয়ে মাথা পেতে নিয়েছিলাম। কখনও নিজের কাছে অভিযোগ করিনি এবং সে ত্যাগ স্বীকার করতে পেরেছিলাম বলে আজও গর্ব অনুভব করি। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করে মনে বল পাচ্ছি, আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হচ্ছে যে ভবিষ্যতে আত্মত্যাগের যে কোনও আহ্বানকে আমি দৃঢ়তা, সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব। পাঁচ বছর আগে আপনি স্বেচ্ছায় এবং মহৎভাবে আমাকে যে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন, আজও তার ব্যতিক্রম হবে না, এমন আশা কি সত্যিই দুরাশা?......

'এবার বাবাকে তাঁর সম্মতি ভিক্ষা করে আলাদাভাবে লিখলাম। আশা করি আপনি যদি আমার সঙ্গে একমত হন তাহলে বাবাকেও তাতে সম্মত করাবার চেষ্টা চালাবেন। আমার স্থির বিশ্বাস, এ বিষয়ে আপনার মতের বিশেষ গুরুত্ব আছে।'

১৯২১ সালের ২৬শে জানুয়ারীর এই চিঠিটিতে দেখা যাচ্ছে যে একটা সিদ্ধান্তে প্রায় উপনীত হয়েছি, তবে বাড়ীর অনুমোদনের জন্য তখনও অপেক্ষা করে আছি।

পরের যে চিঠিতে আমি ঐ একই বিষয়ের উল্লেখ করেছিলাম তার তারিখ, ১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী। তাতে আমি লিখেছিলাম :

'......আমার "বিস্ফোরক" চিঠি এতদিনে আপনি বোধকরি পেয়ে থাকবেন। এই চিঠিতে আমার যে কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেছি, পরবর্তী চিন্তার দ্বারা তাই-ই দৃঢ়তর

হয়েছে......যদি চিত্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে সংসারের সব কিছু ছেড়ে জীবনে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারেন; তবে আমার সাংসারিক সমস্যাবিহীন তরুণ-জীবনে এ ক্ষমতা আরও অনেক বেশী। চাকরী ছাড়লেও আমার কাজের বিন্দুমাত্র অভাব ঘটবে না। শিক্ষকতা, সমাজ-সেবা, সমবায় প্রতিষ্ঠানাদি, গ্রাম-সংগঠন ইত্যাদি বহু কাজ আছে—যা হাজার হাজার কর্মঠ তরুণকে ব্যাপৃত রাখতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বর্তমানে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছি। ন্যাশনাল কলেজ এবং নতুন সংবাদপত্র "স্বরাজ"-এ যথেষ্ট কাজের সুযোগ পাব।......আত্মত্যাগের আদর্শ নিয়েই জীবন আরম্ভ করতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ-চিন্তা এবং দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল। তাছাড়া বিদেশী শাসকের অধীনে কাজ করা অতি ঘৃণিত বলে মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার কাছে মহৎ, নিঃস্বার্থ ও অনুপ্রেরণার পথ, যদিও সে পথ রমেশ দত্তের পথের চাইতে অনেক বেশী কন্টকাকীর্ণ।

'দারিদ্র্য ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার অধিকার ভিক্ষা করে বাবা মার কাছে চিঠি লিখেছি। এই পথে, ভবিষ্যতে লাঞ্ছনার ভয় আছে এই চিন্তায় তাঁরা হয়ত আকুল হবেন। আমি নিজে দুঃখ-ক্লেশের ভয় করি না, সেদিন যদি আসেই দুঃখ থেকে সরে আসবার চেষ্টা না করে অগ্রসর হয়ে তাকে গ্রহণ করব।'

১৯২১-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারীর চিঠিটাও কৌতূহলোদ্দীপক। তাতে আমি বলেছি :

'যেদিন আই সি এস পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে, সেইদিন থেকেই আমার মনে এই প্রশ্ন আন্দোলিত : যদি চাকরীতে থাকি তাতে দেশের বেশী উপকারে আসব, না চাকরী ছাড়াটাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। এই প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয় হয়েছি যে জনসাধারণের মধ্যে থেকেই আমি দেশের বেশী মঙ্গল করতে পারব, আমলাতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে নয়। চাকরীতে থেকে দেশের কোনই উপকার করা যায় না, আমার বক্তব্য তা নয়। আমি বলতে চাই যে তাতে যেটুকু মঙ্গল হতে পারে আমলাতন্ত্রের শৃঙ্খলমুক্ত দেশসেবার তুলনায় তা অতি নগণ্য। নীতির দিকটিও এখানে দেখতে হবে সে কথা আগেই বলেছি। বিদেশী আমলাতন্ত্রের অধীনতা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। জনসেবার প্রথম প্রয়োজন সমস্ত সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। সাংসারিক উন্নতির পথ একবার ত্যাগ করলে তবেই জাতীয় কর্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব।......আমার মনশ্চক্ষুতে অরবিন্দ ঘোষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সর্বদা জাগ্রত। আমার বিশ্বাস—এই আত্মত্যাগের দ্বারা সেই দৃষ্টান্তের দাবী মেটাতে পারব। আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তার অনুকূল।'

উপরের চিঠিটি থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমার মধ্যে তখনও অরবিন্দ ঘোষের প্রভাব ছিল। বাস্তবিক পক্ষে, এই সময়ে সকলেই বিশ্বাস করত যে, তিনি শীঘ্রই সক্রিয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করবেন।

পরবর্তী চিঠিটি অক্সফোর্ড থেকে লেখা হয়েছিল ৬ই এপ্রিল তারিখে, যেখানে আমি ছুটি কাটাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে বাবার চিঠি পেয়েছি, তিনি আমার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন নি। অথচ পদত্যাগ করবার জন্য আমি সুনির্দিষ্টভাবে মনস্থির করে ফেলেছিলাম। নিম্নের উদ্ধৃতাংশ কৌতূহলজনক :

'বাবার ধারণা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সিভিল সার্ভিস চাকুরীয়ার পক্ষে নতুন শাসন-ব্যবস্থায় জীবন মোটেই দুর্বিষহ হবে না। দশ বছরের মধ্যে এদেশে স্বায়ত্তশাসন অনিবার্য। কিন্তু আমার জীবন নতুন শাসনব্যবস্থায় সহনীয় হবে কি না, তা আমার প্রশ্ন নয়। পরন্তু আমার ধারণা যে চাকরীতে বহাল থেকেও আমি দেশের কিছু মঙ্গল করতে পারব। আমার প্রধান প্রশ্ন নীতিগত। বর্তমান অবস্থায় কি আমাদের এক বিদেশী আমলাতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করে এক কাঁড়ি টাকার জন্য আত্মবিক্রয় করা সমীচীন? যারা ইতিমধ্যেই চাকরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বা চাকরী গ্রহণ করা ছাড়া যাদের গত্যন্তর নেই, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমার অবস্থা অনেক দিক দিয়ে যখন সুবিধেজনক তখন আমার কি এত তাড়াতাড়ি বশ্যতা স্বীকার করা উচিত? যেদিন আমি চাকরীর প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করব, সেদিন থেকে আমি আর স্বাধীন মানুষ থাকব না, এই আমার বিশ্বাস।

'যদি আমরা উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি, তবে দশ বছরে কেন, তার আগেই স্বায়ত্তশাসন আমরা অর্জন করতে পারব। সেই মূল্য আত্মত্যাগ ও ক্লেশ-স্বীকার। কেবল এই আত্মত্যাগ ও দুঃখ বরণের ভিত্তিতেই জাতীয় সৌধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যদি আমরা সকলে নিজের নিজের চাকরীর খুঁটি আঁকড়িয়ে বসে থাকি, তবে পঞ্চাশ বছরেও

আমাদের স্বায়ত্তশাসন মিলবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যদি সম্ভব না হয়, অন্তত প্রত্যেক পরিবারকে আজ দেশমাতার চরণে অর্ঘ্য এনে দিতে হবে। বাবা আমাকে এই আত্মত্যাগ থেকে রক্ষা করতে চান। আমাকে, আমার স্বার্থেই এই দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁর ইচ্ছার মধ্যে যে স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তার মূল্য বুঝব না, এমন হৃদয়হীন আমি নই। তাঁর স্বভাবতই আশংকা হয় বুঝি বা আমি তরুণ-সুলভ উত্তেজনার ঝোঁকে কিছু একটা করে বসব। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, এই ত্যাগ কাউকে না কাউকে করতেই হবে।

'যদি অন্য কেউ অগ্রসর হত, তবে আমার পিছ-পা হবার, অন্তত আরও খানিকটা ভেবে দেখবার কারণ বুঝতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে লক্ষণ মোটেই দেখা যাচ্ছে না। অথচ অমূল্য সময় বয়ে যাচ্ছে। সমস্ত আলোড়ন সত্ত্বেও এটুকু ঠিক যে এখন পর্যন্ত একজন সিভিলিয়ানও চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে আন্দোলনে নামতে সাহস করে নি। ভারতবর্ষের সামনে এই চ্যালেনজ এসেছে—অথচ কেউ তাতে সমুচিত সাড়া দেয় নি। আরও অগ্রসর হয়ে বলতে পারি যে, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে একজন ভারতীয়ও স্বেচ্ছায় দেশসেবার জন্য সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে নি। দেশের সর্বোচ্চ কর্মচারীদের নিম্নতর শ্রেণীর লোকেদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার সময় এসেছে। সরকারী উচ্চ-চাকুরিয়ারা যদি বশ্যতার প্রতিজ্ঞা পরিহার করেন, এমন কি তার ইচ্ছাটুকুও প্রকাশ করেন তাহলেই আমলাতন্ত্রের যন্ত্র ধসে পড়ে।

'সুতরাং এই ত্যাগ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। এই ত্যাগের অর্থ আমি সম্যক জানি। দারিদ্র্য, দুঃখ, ক্লেশ, কঠিন পরিশ্রম তো আছেই আরও নানা ভোগ আছে যার কথা স্পষ্ট ভাবে বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনার পক্ষে বুঝে নেওয়া সহজ। কিন্তু এ ত্যাগ করতেই হবে,জেনে, শুনে, বুঝে করতে হবে। দেশে ফিরে পদত্যাগ করার যে পরামর্শ আপনি দিয়েছেন তা অতি যুক্তিসঙ্গত হলেও, এর বিরুদ্ধে দু-একটি কথা বলার আছে। প্রথমত গোলামির প্রতীকস্বরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে। দ্বিতীয়ত বর্তমানের জন্য যদি চাকরিতে প্রবেশ করি তাহলে প্রথা অনুযায়ী আমি ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারীর আগে দেশে ফিরতে পারব না। যদি এখন পদত্যাগ করি তাহলে জুলাই মাসেই ফিরতে পারব। ছয় মাসের মধ্যেই বহু পরিবর্তন ঘটবে। ঠিক মুহূর্তে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়ার ফলে আন্দোলন দমে যেতে পারে, দেরীতে সাড়া মিললে তা হয়ত ফলপ্রসূ হবে না। আমার বিশ্বাস আরেকটি এ জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করতে বহু বছর লেগে যাবে। সুতরাং বর্তমান আন্দোলনের ঢেউকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগাবার চেষ্টা করাই সমীচীন। যদি আমাকে পদত্যাগ করতে হয় তবে তা দুদিন পরে অথবা একবছর পরে করলেও আমার বা অন্যকারও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কিন্তু দেরী করলে আন্দোলনের পক্ষে হয়ত ক্ষতি হতে পারে। আমি জানি যে আন্দোলনকে সাহায্য করার ক্ষমতা আমার হাতে অল্পই, তবু যদি নিজের কর্তব্য পালনের সন্তোষ লাভ করতে পারি তা-ও এক বিরাট লাভ বলতে হবে।......যদি কোন কারণে পদত্যাগ সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করি, তবে বাবার কাছে তৎক্ষণাৎ তার পাঠাব, তাতে তাঁর আশঙ্কা ঘুচবে।'

কেম্ব্রিজ থেকে ২০শে এপ্রিল তারিখে লেখা চিঠিতে বলেছিলাম যে ২২শে এপ্রিল আমার পদত্যাগপত্র পাঠাব।

কেম্ব্রিজ থেকে আমার ২৮শে এপ্রিল তারিখের চিঠিতে এইরকম লিখেছিলাম :

'আমার পদত্যাগ সম্বন্ধে ফিট্জউইলিয়ম হলের সেন্সার রেডাওয়ে সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা হল। তাঁর কাছে আমার যা প্রত্যাশা ছিল, ঠিক তার বিপরীত হল। তিনি আমার চিন্তাধারার প্রতি সোৎসাহে সমর্থন জানালেন। আমি মত পরিবর্তন করেছি শুনে তিনি নাকি আশ্চর্য এমন কি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ এ পর্যন্ত তিনি কোন ভারতীয়কে এমন করতে দেখেন নি। আমি তাঁকে বলি যে পরে আমি সাংবাদিকতাকেই গ্রহণ করব। তাঁর মতে সাংবাদিক-জীবন একঘেয়ে সিভিল সার্ভিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

'এখানে আসবার আগে আমি তিন সপ্তাহ অক্সফোর্ডে ছিলাম এবং সেখানেই আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শেষ কয় মাস যে চিন্তা আমাকে অহরহ পীড়া দিয়েছে তা শুধু এই যে বহু ব্যক্তির, বিশেষ করে বাবা ও মার দুঃখ ও ক্লেশ হয়, এই রকম কাজ নীতিগত ভাবে আমার করা উচিত কি না।......সুতরাং নতুন জীবনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বাবা-মার সুস্পষ্ট ইচ্ছা ও আপনার উপদেশের বিরোধিতা করতে হচ্ছে—

অবশ্য আপনি "যে কোনও পথে আমি চলি না কেন" আপনার "সাদর অভিনন্দন" জানিয়ে রেখেছেন। সার্ভিসে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে আমার প্রধানতম যুক্তির ভিত্তি এই ছিল যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে আমাকে এমন এক বৈদেশিক আমলাতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে যার এদেশে থাকবার নৈতিক অধিকার আমি বিন্দুমাত্র স্বীকার করি না। একবার প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করলে, আমি তিন বছর অথবা তিন দিন কাজ করি তাতে কিছু যায় আসে না। আমি বুঝেছি যে আপোষের মনোবৃত্তি হীন বস্তু—এতে মানুষের অধঃপতন এবং আদর্শের হানি হয়।......সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে জীবনান্তে সরকারী উপাধির মুকুট পরে মন্ত্রিত্বের গদীতে আসীন হয়েছেন তার কারণ তিনি এডমন্ড বার্কের সুবিধবাদের দর্শনে বিশ্বাসী। সুবিধাবাদীর নীতি গ্রহণ করার অবস্থা আমাদের এখনও আসেনি। আমাদের এক নীতি গঠন করতে হবে এবং হ্যাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষহীন আদর্শবাদ ভিন্ন তা সম্ভব নয়।......আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে ব্রিটিশ সরকারের সংগে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় আজ উপস্থিত। প্রতি সরকারী কর্মচারী, সে তুচ্ছ চাপরাশী অথবা প্রাদেশিক গভর্নরই হোক, নিজের কাজের দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল ব্রিটিশ সরকারের বুনিয়াদ পাকা করছে। সরকারের অবসান ঘটানোর শ্রেষ্ঠ উপায় তার কাছ থেকে সরে আসা। আমি টলস্টয়ের নীতির কথা শুনে অথবা গান্ধীর প্রচারে মুগ্ধ হয়ে একথা বলছি না, আত্মোপলব্ধি থেকে বলছি।......কয়েকদিন হল আমার পদত্যাগপত্র দাখিল করেছি। গৃহীত হবার সংবাদ এখনও পাইনি।

'আমার চিঠির উত্তরে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সম্প্রতি দেশে যে কাজ চলছে, তার বিষয়ে লিখেছেন। বর্তমানে আন্তরিকতাসম্পন্ন কর্মীর অভাব সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ করেছেন। সুতরাং দেশে ফিরবার পর অনেক প্রীতিপ্রদ কাজ আমি পাব।......আর কিছু আমার বলবার নেই। ফিরবার সব পথ রুদ্ধ করে আমি ঝাঁপ দিলাম।—আশা করি এর ফল শুভই হবে।'

১৮ই মে তারিখে কেম্ব্রিজ থেকে এই চিঠিটি লিখেছিলাম :

'স্যার উইলিয়াম ডিউক আমাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে রাজী করাতে চেষ্টা করছেন। তিনি এ বিষয়ে বড়দাদার সংগে পত্রালাপও করেছেন। কেম্ব্রিজের সিভিল সার্ভিস বোর্ডের সেক্রেটারী রবার্টস সাহেবও আমাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পরামর্শ দিয়েছেন, এবং আমাকে জানিয়েছেন যে ইণ্ডিয়া অফিসের নির্দেশানুসারেই তাঁর এই হস্তক্ষেপ। আমি স্যার উইলিয়ামকে জানিয়ে দিয়েছি যে পূর্ণ বিবেচনার পরই আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি।'

এই চিঠিটির একটু টীকা প্রয়োজন। আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেবার সংগে সংগেই ইণ্ডিয়া অফিসের লোকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। স্বর্গতঃ স্যার উইলিয়াম ডিউক ছিলেন তখন স্থায়ী সহকারী ভারত সচিব; উড়িষ্যার কমিশনার থাকাকালীন তিনি আমার বাবাকে চিনতেন। তিনি আমার বড় দাদা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুর সংগে যোগাযোগ করলেন, তিনি তখন লণ্ডনে ব্যারিষ্টারি পড়ছিলেন। চাকরী থেকে পদত্যাগ না করার জন্য স্যার উইলিয়াম আমার দাদার মারফৎ আমাকে উপদেশ দিলেন। কেম্ব্রিজের লেকচারাররাও আমাকে অনুরোধ করলেন এবং আমার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যও আমাকে বললেন। তারপর অনুরোধ এল কেম্ব্রিজে সিভিল সার্ভিস বোর্ডের সেক্রেটারী স্বর্গতঃ মিঃ রবার্টসের কাছ থেকে। বিভিন্ন দিক থেকে এই সব প্রচেষ্টা আমার কৌতূহল উদ্রেক করল।—কিন্ত সবাচাইতে মজার ছিল শেষ চেষ্টাটি।

কয়েকমাস আগে সিভিল সার্ভিসে শিক্ষানবীশদের কাছে ইণ্ডিয়া অফিস প্রেরিত কতকগুলি মুদ্রিত নির্দেশবলী নিয়ে মিঃ রবার্টসের সংগে আমার ঝগড়া হয়েছিল। এই সব নির্দেশের শিরোনাম ছিল 'ভারতে অশ্বের পরিচর্যা' এবং এতে এই মর্মে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, ভারতীয় সহিস (groom) তার অশ্ব যা খায় সেই একই খাদ্য খেয়ে থাকে।—ভারতীয় বেনেরা (Traders) যে অসাধু তা একরকম প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়ে গেছে, ইত্যাদি। এগুলি পেয়ে স্বভাবতই আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল এবং অন্যান্য সতীর্থ শিক্ষনবীশদের সংগে আলাপ আলোচনা করেছিলাম, তারাও এগুলি পেয়েছিল। আমরা সকলে একমত হয়েছিলাম যে, নির্দেশগুলি ভুল এবং অপমানকর এবং আমাদের মিলিতভাবে একটা প্রতিবাদ জানানো উচিত। লেখার সময় প্রত্যেকেই সরে পড়ার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে নিজের ইচ্ছামতই কাজ করব স্থির করলাম।

আমি সোজা মিঃ রবার্টসের কাছে গেলাম এবং মুদ্রিত নির্দেশবলীতে যে সব ভুলের

কথা ছিল সেগ্‌ুলির প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলাম। তিনি জ্বলে উঠে বললেন, 'দেখ, মিঃ বোস, যদি তুমি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকার না কর, তাহলে আশঙ্কা হয় তোমাকে বিদায় নিতে হবে।' এত সহজে ভ্রূকুটিতে ভয় পাবার পাত্র আমি নই এবং লড়াই-এর জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। তাই শান্তভাবে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, কিন্তু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী বলতে আপনি কি বোঝাতে চান?' মিঃ রবার্টস তৎক্ষণাৎ বুঝলেন যে ভ্রূকুটিতে কাজ হবে না, তাই তাঁর সুর বদলিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি যা বলতে চাইছি তা হল এই যে, দোষ খুঁজে বেড়ানো তোমার উচিত নয়।' আমি জবাব দিলাম যে, দোষ আমি খুঁজে বেড়াইনি, কিন্তু নির্দেশগুলি তো আমার সামনেই রয়েছে। সবশেষে তিনি পথে আসলেন এবং বললেন যে, আমি তাঁকে যা বলেছি সে সম্বন্ধে তিনি ইণ্ডিয়া অফিসের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

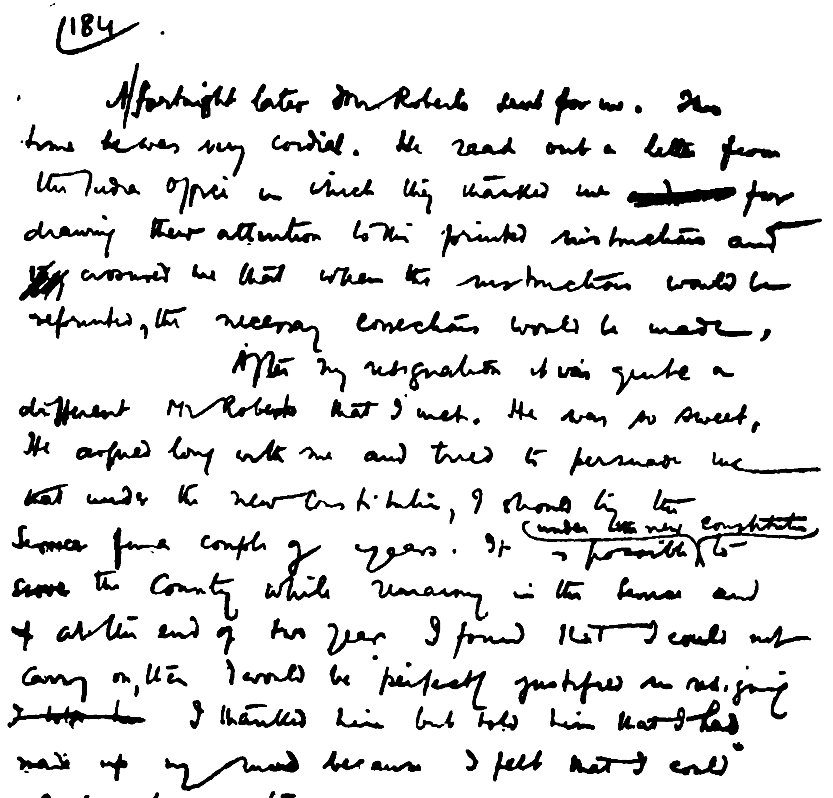
(184)

A fortnight later Mr Roberts sent for me. This time he was very cordial. He read out a letter from the India Office in which they thanked me for drawing their attention to the printed instructions and assured me that when the instructions would be reprinted, the necessary corrections would be made.

After my resignation it was quite a different Mr Roberts that I met. He was so sweet. He argued long with me and tried to persuade me that under the new Constitution, I should try the Service for a couple of years. It (under the new constitution) is possible to serve the country while remaining in the Service and if at the end of two years I found that I could not carry on, then I would be perfectly justified in resigning. I thanked him but told him that I had made up my mind because I felt that I could not serve two masters

একপক্ষকাল পরে মিঃ রবার্টস আমাকে ডেকে পাঠালেন। এবার তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে ব্যবহার করলেন। তিনি ইণ্ডিয়া অফিস প্রেরিত একটি চিঠি পড়ে শোনালেন, যাতে তাঁরা মুদ্রিত নির্দেশগুলির প্রতি তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, যখন ঐ সব নির্দেশ পুনর্মুদ্রিত হবে তখন প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি করে দেওয়া হবে।

আমার পদত্যাগের পর যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, তখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মিঃ রবার্টস। এত মধুর লেগেছিল তাঁর ব্যবহার। তিনি অনেকক্ষণ আমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে নতুন শাসনতন্ত্রে আমার দু-বছর চাকরী করা উচিত। নতুন আইনে চাকরী করেও দেশের সেবা করা সম্ভব এবং দু-বছর পরে যদি আমি দেখি যে পোষাচ্ছে না, তখন পদত্যাগ করা আমার পক্ষে মোটেই অসঙ্গত হবে না। তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম কিন্তু বললাম যে, আমি মনস্থির করে ফেলেছি কারণ আমার বিশ্বাস যে, দু-জন মনিবের সেবা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

পত্রাবলী
১৯১৩-১৯২৭

প্রথম নয়খানি পত্র ১৯১২-১৩ সালে প্রভাবতী বসুকে লিখিত

১ শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায়

পরম পূজনীয়া — কটক
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী — শনিবার
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

আজ নবমী; সুতরাং আপনি এখন দেশে—দেবীর আরাধনায় নিমগ্ন আছেন।

এ বৎসর বোধ হয় পূজা বেশী জাঁকজমকে সম্পন্ন হইবে। কিন্তু মা, জাঁকজমকে প্রয়োজন কি? যাঁহাকে আমরা ডাকি—তাঁহাকে যদি প্রাণ খুলিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকিতে পারি তাহা হইলে যথেষ্ট হইল; আর অধিক কি প্রয়োজন? যে পূজায় আমরা ভক্তি-চন্দন ও প্রেম-পুষ্প ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। জাঁকজমকের সম্মুখে ভক্তি পলায়ন করে! এবার একটা দুঃখ রহিয়া গেল। সেটা বড় বেশী দুঃখ—সাধারণ দুঃখ নহে। এবার দেশে যাইয়া সেই ত্রৈলোক্যপূজ্যা সর্বদুঃখহারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী জগন্মাতা দুর্গাদেবীর সর্বাভরণভূষিতা নানা সাজসজ্জিতা, দেদীপ্যমানা জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলাম না; এবার পুরোহিত মহাশয়ের সেই মধুর, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ বা তাঁহার শঙ্খ ও ঘন্টাধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া শ্রবণশক্তি চরিতার্থ করিতে পারিলাম না; এবার কুসুম চন্দন ও ধূপাদির পবিত্র গন্ধের দ্বারা নাসিকাদ্বয়কে পবিত্র করিতে পারিলাম না; এবার একত্র বসিয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রসনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না; এবার পুরোহিত প্রদত্ত কুসুমরাশির দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়কে ধন্য করিতে পারিলাম না এবং সর্বোপরি "শান্তি জলে"র অভাবে শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না, সবই নিষ্ফল হইল; পঞ্চেন্দ্রিয় নিষ্ফল হইল। কিন্তু যদি দেবীর সর্বত্র বিরাজমানা, অম্বরব্যাপিনী মূর্তি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে মা, সে দুঃখ ঘুচিত—কাষ্ঠপুত্তলিকা দেখিবার ইচ্ছা হইত না; কিন্তু সে আনন্দ, সেইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের কপালে ঘটিয়া থাকে। কাজে কাজেই আমার এই দুঃখ রহিয়া গেল।

বিজয়া দশমীর দিন এখানে পড়িয়া থাকিব কিন্তু মন আপনাদের নিকটেই থাকিবে। এরূপ পুণ্য দিবসে এত আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিলাম। আর উপায় নাই—কল্য রাত্রে আমরা এখান হইতে আপনাদিগকে প্রণাম করিব। আপনি ও বাবা সে প্রণাম গ্রহণ করিবেন ও গুরুজনদিগকে দিবেন।

আমরা সকলে ভাল আছি। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন ও বাবাকে জানাইবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

পুনঃ—সারদা কেমন আছে?

২ শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

পরম পূজনীয়া — কটক
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী — শনিবার
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

আজ সকালে আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, তাহার সঙ্গে মণি-অর্ডারে ৫০ টাকা পাইলাম।

আমি যে পত্র লিখি তাহার উত্তরের জন্য তাড়াতাড়ি করিবেন না—অবকাশ মত উত্তর করিবেন। আপনার যদি পড়িতে কষ্ট হয় তাহা হইলে অন্য কাহার দ্বারা পড়াইয়া লইবেন।

কলাইসুটি জোবরা বাগানে লাগান হইতেছে কিংবা শীঘ্রই হইবে। রঘুয়া আমার নিকট হইতে ৫/৬ দিন পূর্বে কলাইসুটি লইয়া গিয়াছিল। জোবরা বাগানে আমি যাই নাই।

নগেন ঠাকুর এবার পূজা করেন নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি কি সম্পূর্ণ

আরোগ্যলাভ করিয়াছেন? আমি যত পূজা দেখিয়াছি তন্মধ্যে নগেন ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ গুরুদেব মহাশয়ের পূজা সর্বাপেক্ষা ভক্তি আকর্ষণ করে। নগেন ঠাকুরের চণ্ডীপাঠ বড়ই মধুর এবং অভক্তকে ভক্ত করিয়া ফেলে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব মহাশয়ের কোদালিয়া বাটীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমরা দেশে গেলেই সেখানে ছুটিব। দেখা হইলে তাঁহাকে আমার ভক্তি প্রণাম জানাইবেন। বড়দিদির শরীর অসুস্থ হইয়াছে শুনিয়া কষ্ট পাইলাম। তিনি কেমন আছেন। আপনার ডেঙ্গু হইয়াছিল শুনিয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন।

বসুমতীর আপিসে শঙ্করাচার্যের সমুদয় স্তোত্র খুব সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। একটি পুস্তকে তাঁহার সব স্তোত্রই আছে এবং মূল্য কেবল বারো আনা কিংবা ১ টাকা। এ সুযোগ ছাড়িবেন না। কণ্ঠিমামাকে বলিবেন একটি ক্রয় করিয়া আনিতে। পুস্তকটি আপনার নিকট রাখিবেন এবং কটকে আসিবার সময় লইয়া আসিবেন।

মা, আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনি বোধ হয় জানেন যে আমার আমিষ ত্যাগ করিবার বড়ই ইচ্ছা। কিন্তু পাছে কেহ কিছু বলেন বা মনে করেন সে আশঙ্কায় আমি সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিতেছি না। আমি এক মাস পূর্বে মৎস্য ভিন্ন সমুদয় আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ নদাদা আমার পাতে জোর করিয়া মাংস দিলেন। কি করি! অগত্যা খাইলাম কিন্তু বড় অনিচ্ছায়। আমি নিরামিষাশী হইতে চাই কারণ "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" একথা আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রকারেরা বলেন নাই—স্বয়ং ঈশ্বর একথা বলিয়াছেন। আমাদের কি অধিকার আছে যে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করিব? তাহাতে কি ঘোর পাপ হয় না? যাঁহারা বলেন যে মৎস্য না খাইলে চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি হয় তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এরূপ মূর্খ নন যে লোককে দৃষ্টিহীন করিবার জন্য তাঁহারা মৎস্য খাওয়া বারণ করিবেন। আপনাদের এ বিষয়ে কি মত?

আপনাদের বিনা অনুমতিতে আমার কিছু করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা সকলে ভাল আছি, আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

৩ শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায়

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

কটক
শনিবার

মা,

গোপালীর মুখে শুনিলাম আপনি কাশীধামে যান নাই। বাবা একলা গিয়াছেন। বাবার পত্র হইতে জানিলাম যে আল রাজা সময় মত টাকা পাঠান নাই তাই যাওয়া হয় নাই। আপনি যে প্রেসক্রিপসনের কথা বলিয়াছিলেন তাহা কল্য পাঠাইয়া দিয়াছি কিন্তু তাড়াতাড়ির জন্য তাহাতে অধিক কিছু লিখিতে পারি নাই। আমি আপনার ঘরে ২টি নীলরতনবাবুর প্রেস্‌ক্রিপসন পাইলাম কিন্তু কোন্‌টা চাই তাই বুঝিতে না পারিয়া উভয়ই পাঠাইয়া দিলাম। ছোটদাদাকে বলিবেন, তিনি বাছিয়া লইবেন।

দিদির চিঠি শেষ করিয়া কল্য পাঠাইয়া দিয়াছি। লিলি কোথায় এবং কেমন আছে জানিতে উৎসুক হইয়াছি।

আমার অনুরোধে মেজদাদা আমাকে একটি লম্বা চিঠি লিখিয়াছিলেন। আমি কল্য তাহা পাইয়াছি—পাইয়া যে কতদূর আনন্দিত হইলাম তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। আমার অতি সামান্য অনুরোধে তিনি যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আমার কষ্ট হয়। পত্রটি আমি তাঁহার প্রত্যাগমন পর্যন্ত গয়নার মত তুলিয়া রাখিয়া দিব।

আর অধিক কি লিখিব। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সকলে ভাল আছি। শরৎবাবু (জামাইবাবুর ভ্রাতা) এখানে আছেন। বাড়ী ঠিক হইলে বোধ হয় চলিয়া যাইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং মাতাঠাকুরাণী কেমন আছে লিখিবেন। তাঁহাদিগকে আমার ভক্তিপ্রণাম জানাইবেন। তাঁহাদিগকে আমি প্রত্যহ স্মরণ করি। তিনি এখানে যে পুষ্প

চয়ন করিয়া রাখিতেন এবং আমরা গিয়া তাহার সুগন্ধ ঘ্রাণ করিতাম তাহা এখনও যেন দেখিতে পাই। তিনি যেদিন পূজা করিয়া "শান্তিজল" ও পুষ্প বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা এখন যেন মানস-চক্ষে দেখিতে পাই। আমি বড় পাগলের মত লিখিতেছি। আপনার পড়িতে বোধ হয় কষ্ট হইবে।

আমাদের স্কুল বোধ হয় ১৫ তারিখে বন্ধ হইবে—জানি না—এখনও নোটিশ বাহির হয় নাই। আর যাহা কিছু বড়দাদার মুখে শুনিবেন।

আমি ভাল আছি। যখন পুনরায় আমায় দেখিবেন তখন আমাকে এখন অপেক্ষা বলবান ও স্থূল দেখিবেন—আমি আশা করি। যদি তাহা না হয় তাহা আমার দোষ নয়—তাহা গ্রহদোষ। আমি শরীরে যত যত্ন লই তাহা অপরে লয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু আপনি মনে করেন আমি ইচ্ছায় শরীর খারাপ করিতেছি। একমাস পূর্বে যেরূপ ছিলাম তদপেক্ষা ভাল আছি।

প্রত্যহ হারাহারি ৪ টাকা খরচ হইতেছে—কোন দিন ৫ টাকা কোনদিন ৩—এইরূপ। আপনার ৩০ টাকা শেষ হইয়াছে। জগবন্ধু আমাকে বাবার ৩৭৷৷০ টাকা দিয়াছে—আমি কাজে কাজে তাহা খরচ করিতেছি।

এখানে একটু শীত হইতেছে খুব সকালে, কিন্তু এখনও শীতকালের বিলম্ব আছে। এখনও কপি লাগান হয় নাই। ২ টাকার কপির বিচি কেনা হইয়াছে—এখন চারা হইয়াছে।

বৌদিদি মামীমা ও মেজবৌদিদি কোথায় ও কেমন আছেন। তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইবেন। অশোক কেমন আছে—দাঁত কি সমস্ত উঠিয়াছে? এবাটীর কুশল জানিবেন। আশা করি ওখানকারও কুশল। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

৪ শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

কটক
বৃহস্পতিবার

মা,

অনেকদিন হইল আপনাকে কোনও পত্র লিখি নাই তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। নদাদা এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। তাঁহার কি এবার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না?

ভগবানের দয়ার অভাব নাই—দেখিতে বসিলে জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহার দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আর বুঝিব বা কি করিয়া? দুঃখে পড়িলে তাঁহাকে ডাকি—অনেকটা প্রাণ খুলিয়া ডাকি—কিন্তু যেই দুঃখ দূর হইল—যেই সুখের আলোক আসিতে লাগিল—অমনি আমাদের ডাকা বন্ধ হইল আর আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া গেলাম। এইজন্যেই ত কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন, "হে ভগবান! আমাকে সর্বদা বিপদের মধ্যে রাখিও; তাহা হইলে আমি তোমায় সর্বদা প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিব; সুখের সময় তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি—অতএব আমার সুখে প্রয়োজন নাই।"

জন্মমৃত্যু লইয়া এ জীবন—তাহাতে একমাত্র সার জিনিষ—হরিনাম। তাহা না করিতে পারিলে জীবন নিরর্থক। আমাতে পশুতে প্রভেদ এই যে পশুরা ভগবানকে বুঝিতে বা বুঝিয়া ডাকিতে পারে না আর আমরা চেষ্টা করিলে তাহা পারি। তবে এ ভবে আসিয়া যদি ভগবানের নাম না করিতে পারিলাম তবে এখানে আসা আমার বিফল হইল। জ্ঞান বড়, বড় জিনিস—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ধরিবে না—তাই ভক্তি চাই, জ্ঞান এখন চাই না। তর্ক করিতে চাই না—কারণ আমি অজ্ঞ ও অন্ধ। সুতরাং এখন চাই কেবল বিশ্বাস—অন্ধ বিশ্বাস—শুধু "হরি আছেন" এই বিশ্বাস; আর কিছু চাহি না। ভক্তি বিশ্বাস হইতে আসিবে এবং জ্ঞান ভক্তি হইতে আসিবে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—"ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে"—ভক্তি জ্ঞানের জন্য ধাবিত হয়। লেখাপড়ার উদ্দেশ্য—বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জিত করা এবং সদসৎ বিবেচনা শক্তি দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্য সফল হইলে লেখা পড়া সার্থক

হইবে। লেখাপড়া শিখিয়াও যদি কেহ হীনচরিত্র হয় তবে তাহাকে কি পণ্ডিত বলিব? কখনই না। আর যদি কেহ মূর্খ হইয়াও বিবেকাধীন হইয়া চলিতে পারে এবং ভগবদ্-বিশ্বাসী ও ভগবৎ প্রেমিক হইতে পারে তবে তাহাকে বলিব মহাপণ্ডিত। দুই চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়—প্রকৃত জ্ঞান—ঈশ্বরজ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞান—অজ্ঞান। আমি বিদ্বান বা পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করিতে চাহি না! ভগবানের নাম স্মরণে যাহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি। মেথর হইলেও আমি তাহার পদরেণু বক্ষে ধারণ করিতে চাহি। আর একবার "দুর্গা" বা একবার "হরি" বলিলে যাহার ঘর্ম, অশ্রুত্যাগ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ আবির্ভূত হয়, তাহার ত কথাই নাই—সে স্বয়ং ভগবান। তাঁহাদের পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আমরা ত অতি সামান্য তুচ্ছ জিনিষ।

আমরা বৃথা "ধন" "ধন" বলিয়া হাহাকার করি, একবারও ভাবি না, প্রকৃত ধনী কে? যাহার ভগবৎ প্রেম, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি ধন আছে জগতে সেই ত ধনী। তাহার তুলনায় মহারাজাধিরাজরাও দীন ভিখারী। এরূপ অমূল্যধন হারাইয়াও আমরা যে জীবিত আছি—ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়।

আমরা "পরীক্ষা আসিতেছে" বলিয়া ব্যস্ত হই কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না যে জীবনের প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা চলিতেছে। সে পরীক্ষা ঈশ্বরের নিকট, ধর্মের নিকট। লেখাপড়ার পরীক্ষা কি সামান্য পরীক্ষা—তাহা দুইদিনের জন্য। কিন্তু সে সব পরীক্ষা অনন্তকালের জন্য। তাহার ফল জন্মে জন্মে ভোগ করিতে হইবে।

ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়া যিনি আপনার জীবনতরী ভাসাইতে পারেন, তিনিই ধন্য, তাঁহার জীবন সার্থক, তাঁহার মানবজন্ম সফল। কিন্তু হায়! আমরা এ মহা সত্য বুঝিয়াও বুঝি না। আমরা এরূপ অন্ধ, এরূপ অবিশ্বাসী ও এরূপ মূর্খ যে কিছুতেই আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। আমরা মানুষ নহি কলিযুগের রাক্ষস।

তবে আমাদের আশা আছে—ভগবান দয়াময়—তিনি চিরকালই দয়াময়। ভীষণ পাপের তাণ্ডব নৃত্যের ভিতরেও তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়ার আদিও নাই অন্তও নাই।

বৈষ্ণব ধর্মের লোপ হইবার উপক্রম হইলে, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণব ধর্মের অবমাননায় ব্যথিত হইয়া প্রার্থনা করেন, "হে ভগবান রক্ষা কর, এ কলিযুগে আর ধর্ম থাকে না, তুমি আসিয়া উদ্ধার কর।" তখন নারায়ণ চৈতন্যদেবের দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করেন। এই সব দেখিয়া পাপের অন্ধকারের ভিতরেও মাঝে মাঝে সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও ধর্মের আলোক দেখিতে পাইয়া আশা হয় যে, এখনও আমাদের উন্নতি হইতে পারে, তাহা না হইলে কেন তিনি পুনঃ পুনঃ এখানে আসিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন।

আপনি কলিকাতায় আর কতদিন থাকিবেন। আপনারা সকলে কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। আমরা সকলে ভাল আছি। বাবা ভাল আছেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

৫ শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

কটক
রবিবার

মা,

অনেকদিন হইল আপনাকে কোন পত্র দিই নাই তাই আজ অবসর পাইয়া কয়েক পংক্তি লিখিয়া হস্ত ও লেখনী উভয়কে পবিত্র করিতেছি।

আমার হৃদয়কাননে সময়ে সময়ে যে ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হয় তাহার সহিত চোখের অশ্রুজল মিশাইয়া আপনার চরণকমলে উপহার দিই। কিন্তু সে কুসুমের গন্ধে আপনার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হয়, না তাহার তীব্রতায় আপনাকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, তাহা না জানিতে পারায় আমি কতকটা অশান্ত হইয়াছি।

আমার হৃদয়ে সময়ে সময়ে অকালীন মেঘের ন্যায় যে ভাব উদয় হয় তাহা নিকটে কাহাকে বলিব তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া দূরদেশে আপনার নিকট প্রেরণ করি। আপনি কিরূপ ভাবে তাহা গ্রহণ করেন তাহা জানিলে বড় আনন্দিত হই। কিন্তু আপনার নিকট আমার মনোগত ভাব প্রীতিকর হউক বা না হউক হৃদয়ের একমাত্র উপহার ভাবিয়া আমি তাহা প্রেরণ করিতে সাহসী হই।

মা, আপনার মতে আমাদের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমাদের জন্য এত খরচ করিতেছেন—দুইবেলা গাড়ী করিয়া স্কুলে পাঠাইতেছেন এবং পুনরায় বাড়ী ফিরাইয়া আনিতেছেন—দিনে ৪।৫ বার করিয়া আমাদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতেছেন—বস্ত্র পরিচ্ছদে সর্বাঙ্গ আবৃত রাখিতেছেন—দাসদাসী নিযুক্ত করিতেছেন—আমি ভাবি এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত ক্লেশ আমাদের জন্য কেন? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ছাত্রজীবন শেষ করিলে আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে—প্রবেশ করিয়া সারাজীবন গাধার ন্যায় অবিশ্রান্ত ভাবে খাটিতে হইবে এবং তৎপরে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। মা, আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রের কোন বিভাগে দেখিলে আপনি সর্বাপেক্ষা সুখী হইবেন? বড় হইলে আমাদিগকে কোন কার্যে নিযুক্ত দেখিলে আপনি সর্বাধিক আনন্দ লাভ করিবেন—জানি না আপনার মনে ইচ্ছা কি। মা, জজ ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিষ্টার কিংবা অন্য কোনও হাকিমের গদীতে বসিলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—ধনকুবের বলিয়া সংসারী লোকের দ্বারা পূজিত হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—প্রচুর ধনশালী, গাড়ী, ঘোড়া, মোটর প্রভৃতির অধিকারী, নানা দাসদাসীর প্রভু, প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বিপুল জমিদারীর অধিকারী হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—না দরিদ্র হইলেও পণ্ডিতদিগের দ্বারা এবং গুণিজনের দ্বারা "প্রকৃত মানুষ" বলিয়া পূজিত হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে তাহা জানি না। আপনার পুত্রকে কিরূপ দেখিলে আপনার সর্বাধিক আনন্দ হইবে—তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়। দয়াময় ভগবান আমাদিগকে মানবজন্ম—সুস্থ দেহ-বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতি অমূল্য পদার্থ দিয়াছেন—কেন? তাঁহার পূজা এবং তাঁহার সেবারই জন্য অবশ্য তিনি এত দিয়াছেন—কিন্তু মা—আমরা কার্য করি কি? সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারি না। মা, ভাবিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়, ভাবিলে মর্মাহত হইতে হয়—যিনি আমাদের জন্য এত করিতেছেন, যিনি কি সম্পদে বিপদে, কি গৃহে কি অরণ্যে, সর্বদাই আমাদের বন্ধু, যিনি সর্বদা আমাদের হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া আছেন—যিনি আমাদের এত নিকটে আছেন—যিনি আমাদের খুব আপনারই জিনিস, আমরা তাঁহাকে একবারও প্রাণ খুলিয়া ডাকি না। আমরা সংসারের ছার বস্তু লইয়া কত অশ্রুত্যাগ করি কিন্তু একবারও তাঁহার উদ্দেশে একবিন্দু অশ্রুও ফেলি না—মা, আমরা যে পশু অপেক্ষাও অকৃতজ্ঞ ও কঠিনহৃদয়। ধিক্ সেই শিক্ষা—যাহাতে ঈশ্বরের নাম নাই—নিষ্ফল তাহার মানব জন্ম যাহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না! লোকে তৃষ্ণার্ত হইলে পুষ্করিণী বা নদীর জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, কিন্তু তাহাতে কি মানসিক তৃষ্ণা মিটে? কখনই না—মানসিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি কখনও হয় না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন :

"ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।"

ভগবান কলিযুগে একটি নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা অন্য কোনও যুগে ছিল না। সেই নূতন—"বাবু"-সৃষ্টি। আমরাই সেই "বাবু" সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের ঈশ্বরদত্ত পদযান আছে কিন্তু আমরা ২০।২২ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারি না—কারণ আমরা বাবু। আমাদের দুইটি অমূল্য হস্ত আছে—কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমে কুণ্ঠিত হই—আমরা হস্তের উপযুক্ত ব্যবহার করি না—কারণ আমরা "বাবু"। আমাদের এই ঈশ্বরদত্ত সবল দেহ আছে কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে "ছোটলোকের কাজ" বলিয়া ঘৃণা করি কারণ আমরা "বাবুলোক"। আমরা সব কাজে চাকরকে হাঁক মারি—আমাদের হাত পা চালাইতে যে কষ্ট হয়—কারণ আমরা যে "বাবু"। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মিলেও আমরা গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারি না কারণ আমরা "বাবু"। আমরা সামান্য শীতকে এত ভয় করি যে সর্বাঙ্গ বোঝায় চাপাইয়া রাখি কারণ আমরা "বাবু"। আমরা সর্বত্র "বাবু" বলিয়া পরিচয় দিই কারণ আমরা "বাবু"। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা মনুষ্যত্বহীন মনুষ্যরূপধারী পশু। পশু অপেক্ষা আমরা অধম—কারণ আমাদের জ্ঞান ও বিবেক আছে—পশুদিগের তাহাও নাই। জন্মাবধি সুখের এবং বিলাসিতার মধ্যে লালিত-পালিত হওয়াতে আমরা তিলমাত্র কষ্ট-সহিষ্ণু হইতে পারি না—এই কারণে ইন্দ্রিয়গণকে আমরা জয় করিতে পারি না—সারাজীবন

ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া আমরা এক দুর্বহ জীবনভার বহন করি।

আমি প্রায় ভাবি—বাঙ্গালী কবে মানুষ হইবে—কবে ছার টাকার লোভ ছাড়িয়ে উচ্চ বিষয়ে ভাবিতে শিখিবে—কবে সকল বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিবে—কবে একত্র শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে শিখিবে—কবে অন্যান্য জাতির ন্যায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজেকে "মানুষ" বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে। আজকাল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইয়া নাস্তিক ও বিধর্মী হইয়া যায়—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙ্গালীরা বাবুয়ানি ও বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া নিজের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙ্গালীরা নিজের জাতীয় পরিচ্ছদকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে সবল, সুস্থ এবং বলিষ্ঠকায় লোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে কষ্ট হয়। এবং সর্বোপরি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রত্যহ ভগবানের নাম করে এরূপ ভদ্রলোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীরা আজকাল হইয়াছে—বিলাসিতাপ্রিয়, পরচর্চাকারী, কুটিলহৃদয়, পর-সুখদ্বেষী এবং মনুষ্যত্ববিহীন—মা, ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। আমরা পড়িতেছি—সম্মুখে যদি চাকরীর এবং অর্থের লোভ থাকে—তাহা হইলে কি লেখাপড়া—তাহা হইলে কি মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারা যায়? মা বাঙ্গালী কি কখনও মানুষ হইতে পারিবে? আপনার কি মত? মা, আমরা এবং আমাদের দেশ দিন দিন অধঃপতনে যাইতেছে। কে উদ্ধার করিবে? একমাত্র উদ্ধারকর্তা—বঙ্গজননী—বঙ্গমাতা যদি বঙ্গসন্তানকে নূতনভাবে প্রস্তুত করিতে পারেন—তাহা হইলে পুনরায় বাঙ্গালী মানুষ হইবে।

আমরা ভাল আছি। ছোটদাদাকে পত্র দিলাম। বাবা সোমবার গোপণীপালান যাত্রা করিবেন। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম জানিবেন। এবার পাগলের মত অনেক লিখিয়াছি। পড়িতে কষ্ট হয় ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন। ক্ষমা করিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

৬ শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

পরম পূজনীয়া   কটক
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী   রবিবার
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ, মা, ভারতে যাহা চাও সবই আছে—প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি আবার মনোহর শরৎ ও বসন্তকাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি—স্বচ্ছসলিলা, পুণ্যতোয়া গোদাবরী দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে—কি পবিত্র নদী! দেখিবামাত্র বা ভাবিবামাত্র রামায়ণে পঞ্চবটীর কথা মনে পড়ে—তখন মানসনেত্রে দেখি সেই তিনজন—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া, সুখে, মহাসুখে, স্বর্গীয় সুখের সহিত গোদাবরী-তীরে কালহরণ করিতেছেন—সাংসারিক দুঃখের বা চিন্তার ছায়া আর তাঁহাদের প্রসন্ন বদনকমলকে মলিন করিতেছে না—প্রকৃতির উপাসনা ও ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহারা তিনজনে মহা আনন্দে কাল কাটাইতেছেন—আর এদিকে আমরা সাংসারিক দুঃখানলে নিরন্তর পুড়িতেছি। কোথায় সে সুখ, কোথায় সে শান্তি! আমরা শান্তির জন্য হাহাকার করিতেছি! ভগবানের চিন্তন ও পূজন ভিন্ন আর শান্তি নাই। যদি মর্ত্ত্যে কোনও সুখ থাকে তাহা হইলে গৃহে গৃহে গোবিন্দের নামকীর্তন ভিন্ন আর সুখের উপায় নাই। আবার যখন ঊর্ধ্বে দৃষ্টি তুলি, মা, তখন আরও পবিত্র দৃশ্য দেখি। দেখি—পুণ্য-সলিলা জাহ্নবী সলিলভার বহন করিয়া চলিয়াছে—আবার রামায়ণের আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। তখন দেখি বাল্মীকির সেই পবিত্র তপোবন—দিবারাত্র মহর্ষির পবিত্র কণ্ঠোদ্ভূত পূত বেদমন্ত্রে শব্দায়িত—দেখি

প্রাঃ ৬ই পৌষ / সোম — ৭ অগ্রহায়ণ / আমার উত্তর / বাংলা ইংরাজী / দিও / আমাকে / লেখ / সুভাষ /

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় — কটক রবিবার

পরমপূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণকমলেষু—

মা,

ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান— এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতার-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্রা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার-রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই — তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ, মা, ভারতে যা চাও সবই আছে — প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি আবার মনোহর শরৎ ও বসন্ত কাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি — স্বচ্ছসলিলা, পুণ্যতোয়া গোদাবরী দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে — কি পবিত্র নদী! দেখিবামাত্র বা ভাবিবামাত্র

বৃদ্ধ মহর্ষি অজিনাসনে বসিয়া আছেন—তাঁহার পদতলে দুইটি শিষ্য—কুশ ও লব—মহর্ষি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। পবিত্র বেদধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রূর সর্পও নিজের বিষ হারাইয়া, ফণা তুলিয়া নীরবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে—গোকুল গঙ্গায় সলিল পান করিবার জন্য আসিয়াছে—তাহারাও একবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র মন্ত্রধ্বনি শুনিতেছে—শুনিয়া কর্ণদ্বয় সার্থক করিতেছে। নিকটে হরিণ শুইয়া আছে—সমস্তক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া আছে। রামায়ণে সবই পবিত্র—সামান্য তৃণের বর্ণনা পর্যন্তও পবিত্র, কিন্তু হায়! সেই পবিত্রতা আমরা ধর্মত্যাগী বলিয়া আর এখন বুঝিতে পারি না। আর একটি পবিত্র দৃশ্য মনে পড়িতেছে। ত্রিভুবনতারিণী কলুষ-হারিণী ভাগীরথী চলিয়াছেন—তাঁহার তীরে যোগিকুল বসিয়া আছেন—কেহ অর্ধনিমীলিত নেত্রে প্রাতঃসন্ধ্যায় নিমগ্ন—কেহ কাননের পুষ্পরাজি তুলিয়া প্রতিমা গড়িয়া, চন্দন ধূপ প্রভৃতি পবিত্র সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া পূজা করিতেছেন—কেহ মন্ত্রোচ্চারণে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন, কেহ গঙ্গার পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেছেন—কেহ গুন গুন করিয়া গান করিতে করিতে পূজার জন্য বনফুল তুলিতেছেন। সকলই পবিত্র—সকলই নয়ন ও মনের প্রীতিকর। কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিকুল কোথায়? তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই যাগযজ্ঞ, পূজা হোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আমাদের ধর্ম নাই, কিছুই নাই—জাতীয় জীবন পর্যন্তও নাই। আমরা এখন এক দুর্বল শরীর পরদাসত্ব-ব্যবসায়ী, নষ্টধর্ম, পাপিষ্ঠ জাতি! হায়! পরমেশ্বর! সেই ভারতের এখন কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! তুমি কি আমাদের উদ্ধার করিবে না? এ ত তোমারই দেশ—কিন্তু দেখ ভগবান, তোমার দেশের কি অবস্থা! তোমার অবতারগণ যে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা কোথায়? আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যগণ যে জাতি এবং যে ধর্ম গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা এখন ছারখার হইয়াছে। দয়া কর, রক্ষা কর, ওহে দয়াময় হরি!

মা, আমি যখন চিঠি লিখিতে বসি তখন পাগলের চেয়েও পাগল। কি লিখিব ভাবিয়া লিখিতে বসি না এবং কি বা লিখিতে পারি তাহা জানি না। মনে যে ভাবটি আগে আসে তাহাই লিপিবদ্ধ করি—ভাবি না কি লিখিতেছি বা কেন লিখিতেছি। ইচ্ছা হয় তাই লিখি—মন বলে—লেখ—তাই লিখি। যদি কিছু অসংগত লিখিয়া থাকি তবে আমাকে মার্জনা করিবেন।

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় গুরুদেব মহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তির বিষয় যখন ভাবি তখন দুঃখিত হইব কি আনন্দিত হইব তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্য যখন এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন যে কোথায় যায় বা কিরূপ অবস্থা ভোগ করে তাহা আমরা জানি না। তবে চরমদশায় আমাদের জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত বিলীন হইয়া যায়—সেদিন আমাদের পক্ষে মহা আনন্দের দিন—কোনও দুঃখ নাই—কোনও কষ্ট নাই—পুনর্জন্ম কষ্ট আর আমাদের ভোগ করিতে হয় না—তখন আমরা নিত্যানন্দে বিরাজ করি। যখন ভাবি তিনি সেই নিত্যানন্দ ধামে গিয়াছেন—তিনি অমরগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া স্বর্গীয় সুধা পান করিতেছেন তখন আর দুঃখিত হইবার কারণ দেখি না। তিনি যখন সেই সদানন্দপুরে গিয়া মহাসুখে আছেন তখন আমরা যদি তাঁহার সুখেই সুখী হই তবে আমাদের শোকগ্রস্ত হইবার কোনও কারণ নাই। দয়াময় ভগবান যাহা করেন জগতের মঙ্গলের জন্যই করেন। আমরা প্রথমে প্রথমে বুঝিতে পারি নাই কারণ তখন ফল ধরে নাই।। যখন ফল পাকে তখন আমরা হৃদয়ের ভিতরে বুঝিতে পারি "বাস্তবিক দয়াময় হরি যাহা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।" ভগবান যখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমাদের নিকট হইতে তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছেন তখন মিছামিছি আমাদের শোকাকুল হওয়া উচিত নহে—কারণ জিনিষ তাঁহারই—তাঁহার ইচ্ছা হইলে অমনি তিনি কাড়িয়া লইবেন—আমাদের তাহাতে অধিকার কি আছে।

আবার ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যদি তাঁহার বিপথগামী ভ্রাতৃবৃন্দকে ধর্মপথ দেখাইবার জন্য এবং পবিত্র সনাতন ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকেন বা শীঘ্রই করিবেন তবে তাহাতেও আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। যাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, আমরা ত বিরোধী হইতে পারি না। জগতের মঙ্গলই প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর। আমরা ভারতবাসী—অতএব ভারতের মঙ্গলই আমাদের মঙ্গল। তিনি যদি পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমাদের ভ্রাতৃকল্প ভারত সন্তানদিগকে ধর্মনিষ্ঠ করিতে পারেন তাহা হইলে

আমাদের যারপরনাই আনন্দিত হওয়া উচিত। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন :

"দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

আমরা সকলে ভাল আছি। তাঁহার হাতেই আছি—তিনি যেরূপ রাখিয়াছেন, সেইরূপই আছি। আমরা সকলে তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলী—আমাদের ক্ষমতা কতটুকু—সবই তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করে। আমরা বাগানের মালী—বাগানের মালিক তিনি। আমরা বাগানে কাজ করি কিন্তু বাগানের ফলে আমাদের কোনও অধিকার নাই। আমরা বাগানে কাজ করি বাগানে যাহা ফল উৎপন্ন হয় তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিই। কার্যে আমাদের অধিকার আছে—কার্য আমাদের কর্তব্য—কিন্তু ফল তাঁহার—আমাদের নয়। তাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

লিলি এখন কোথায় ও কেমন আছে? জানি না কোথায় আছে তাই পত্র দিলুম না। মামীমা ও বৌদিদিরা কোথায় ও কেমন আছেন? দাদারা কেমন আছেন? অন্যান্য সকলে কেমন আছেন ও আছে? আপনি ও বাবা কেমন আছেন? আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। মেজদাদার খবর কি? ২।৩ মেলে আমি কোনও পত্র পাই নাই। নূতন মামাবাবু কেমন আছেন?

শুনিলাম ছোট মামীমার বড় অসুখ হইয়াছে। তিনি কেমন আছেন? সারদা কি বলে? ইতি—

আপনারই সেবক
সুভাষ

৭

রাঁচি
রবিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু—

মা,

অনেকদিন হইল কলিকাতার কোন সংবাদ পাই নাই—আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন—বোধ হয় সময়াভাবে পত্র দিতে পারেন নাই।

মেজদাদা কি রকম পরীক্ষা দিলেন। আপনি কি আমার চিঠির সমস্তটা পড়িয়াছেন? যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে আমি বড় দুঃখিত হইব।

মা, আমার মনে হয় এ যুগে দুঃখিনী ভারত মাতার কি একজন স্বার্থত্যাগী সন্তান নাই—মা কি প্রকৃতই এত হতভাগ্যা! হায়! কোথায় সেই প্রাচীন যুগ! কোথায় সেই আর্যবীরকুল যাঁহারা ভারতমাতার সেবার জন্য হেলায় এই অমূল্য মানব জীবনটা উৎসর্গ করিতেন।

মা, আপনি ত মা, আপনি কি শুধু আমাদের মা? না মা আপনি ভারতবাসী মাত্রেরই মা—ভারতবাসী যদি আপনার সন্তান হয় তবে সন্তানদের কষ্ট দেখিলে মা'র প্রাণ কি কাঁদিয়া উঠে না? মা'র প্রাণ কি এতটা নিষ্ঠুর? না, কখনই হইতে পারে না—মা ত কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না। তবে সন্তানদের এই শোচনীয় দুরবস্থার সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! মা, আপনি ত ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন—ভারতবাসীর অবস্থা দেখিলে এবং তাহাদের দুরবস্থার কথা ভাবিলে আপনার প্রাণ কি কাঁদে না? আমরা মূর্খ—আমরা স্বার্থপর হইতে পারি কিন্তু মা ত কখনও স্বার্থপর হতে পারেন না—মা'র জীবন যে সন্তানের জন্য! যদি তাহাই হয় তবে সন্তানের কষ্টের সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! তবে কি মা স্বার্থপর! না, না, কখনই হতে পারে না—মা কখনও স্বার্থপর হতে পারে না।

মা, শুধু দেশের কি এরূপ শোচনীয় অবস্থা! দেখুন ভারতের ধর্মের কি অবস্থা! কোথায় সেই পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম, আর কোথায় আমাদের অধঃপতিত ধর্ম! কোথায় সেই পবিত্র আর্যকুল—যাঁহাদের পদধূলি লইয়া পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আর কোথায় আমরা তাঁহাদেরই অধঃপতিত বংশধর! সে পবিত্র সনাতন ধর্ম কি লোপ হইতে চলিল! দেখুন না চারিদিকে নাস্তিকতা অবিশ্বাস এবং ভণ্ডামী—তাই ত লোকেদের এত পাপ,

এত কষ্ট, দেখুন না সেই ধর্মপ্রাণ আর্যজাতির বংশধর এখন কিরূপ বিধর্মী ও নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে! যাঁহার নাম, গুণগান ও ধ্যানই জীবনের একমাত্র কর্তব্য ছিল তাঁহার নাম সমস্ত জীবনে ভক্তির সহিত একবার কয়জন লোক আজকাল ডাকে! মা, এসব দেখিলে এবং ভাবিলে, আপনার প্রাণ কি কাঁদে না, আপনার চক্ষে কি জল আসে না? সত্য সত্যই কি আপনার প্রাণ কাঁদে না—কখনই হইতে পারে না। মা'র প্রাণ ত কখনও নিষ্ঠুর হয় না!

মা, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখুন, আপনার সন্তানদের কি দুরবস্থা! পাপে, তাপে, সর্বপ্রকার কষ্টে, অন্নাভাবে, ভালবাসার অভাবে—এবং হিংসা ও স্বার্থপরতার জন্য এবং সর্বোপরি ধর্মের অভাবের জন্য তাহারা যেন নরকের অগ্নিকুণ্ডে অহোরাত্র জ্বলিতেছে। আর দেখুন, সেই পবিত্র সনাতন ধর্মের কি অবস্থা! দেখুন, সেই পবিত্র ধর্ম এখন লোপ পাইতে চলিল। অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, এবং কুসংস্কারে আমাদের সেই পবিত্র ধর্ম এখন কতদূর অধঃপতিত ও অপভ্রষ্ট হইয়াছে। তার উপর, আজকাল ধর্মের নামেই যত অধর্ম হইতেছে—তীর্থস্থানেই যত পাপ! দেখুন না পুরীর পাণ্ডাদের কি ভীষণ অবস্থা! ছি! ছি!! ছি!!! প্রাচীন কালের সেই পবিত্র ব্রাহ্মণকে দেখুন, আর আধুনিক কালের পাপী ব্রাহ্মণকে দেখুন! আজকাল যেখানে ধর্মের নাম সেইখানেই যত ভণ্ডামী এবং যত অধর্ম।

হায়! হায়!! আমাদের কি অবস্থা! আমাদের ধর্মের কি অবস্থা!

মা, এ সব কথা যখন আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন কি আপনার প্রাণকে আকুল করিয়া ফেলে না? আপনার প্রাণ কি কাঁদে না?

আমাদের দেশের অবস্থা কি দিন দিন এইরূপ অধঃপতিত হইতে থাকিবে—দুঃখিনী ভারতমাতার কোন সন্তান কি নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া মা-এর জন্য নিজের জীবনটা উৎসর্গ করিবে না?

মা, আমরা আর কয়দিন ঘুমাইয়া থাকিব? আর কয়দিন আমরা পুতুল লইয়া খেলিতে থাকিব? দেশের ক্রন্দন কি আমাদের কর্ণে আসছে না? আমাদের লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম কাঁদিতেছে—তাহার ক্রন্দন কি প্রাণকে অস্থির করিতেছে না?

বসিয়া বসিয়া আর কয়দিন দেশের এবং ধর্মের এই অবস্থা দেখিব? আর বসা চলে না—আর ঘুমান চলে না—এখন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে হইবে, কিন্তু হায়! এ স্বার্থপর যুগে নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কয়জন স্বার্থত্যাগী সন্তান মা-এর জন্য কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত? মা, আপনার এ সন্তান কি প্রস্তুত নহে?

৮৪ জনমের পর আমরা এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি—বুদ্ধি, বিবেক, আত্মা প্রভৃতি পাইয়াছি কিন্তু এ সমস্ত পাইয়াও যদি পশুর ন্যায় আহার নিদ্রায় পরিতুষ্ট থাকি—পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব স্বীকার করি—পশুর ন্যায় স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকি—পশুর ন্যায় যদি ধর্মহীন জীবন অতিবাহিত করি তবে কেন এই মনুষ্য জঠরে আমাদের জন্ম? পরের জন্য জীবনই প্রকৃত জীবন!

মা, এসব আপনাকে কেন লিখিতেছি—জানেন? আর কাহাকেই বা বলিব? কে বা শুনিবে? কে বা এ সমস্ত হৃদয়ে পোষণ করিবে? যাহাদের জীবন স্বার্থময়—তাহারা ত এ সমস্ত কথা ভাবিতে পারে না—বা ভাবিবে না—কারণ তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইবে কিন্তু মার জীবন ত স্বার্থময় নহে! মা'র জীবন ত সন্তানদের জন্য—দেশের জন্য! যদি ভারতের ইতিহাস পড়েন ত দেখিবেন কত কত মা, ভারত মাতার সেবার জন্য জীবন যাপন করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সময়ে প্রাণও দিয়াছেন। দেখুন অহল্যাবাঈ, মীরাবাঈ, দুর্গাবতী,—আর কত আছেন—আমার নাম মনে নাই। আমরা মাতৃস্তন্যে পুষ্ট—সুতরাং মাতৃউপদেশ এবং মাতৃশিক্ষা আমাদের যত উপকার ও উন্নতি করিতে পারে—আর কিছুতেই তত হয় না।

মা যদি সন্তানকে বলেন—"তুই স্বার্থ লইয়া বসিয়া থাক"—তবে আর কি! বুঝিব সন্তানই হতভাগ্য! তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এ কলিযুগে ভাল লোকের আর আবির্ভাব নাই। বুঝিতে হইবে ভারতের যাহা কিছু ছিল সবই নষ্ট হইয়াছে—আর কিছুই নাই! আর কিছু হবে না! চারিদিকে নৈরাশ্য! যদি তাহাই হয়—যদি প্রকৃতই আর কোন উন্নতির আশা নাই—যদি বসিয়া বসিয়া কেবল অধঃপতন ও অবনতি দেখিতে হইবে—তবে এত কষ্ট কেন? তবে যদি এ জীবনে আর কিছু করিতে পারিব না—তবে এ জীবনে আর কাজ কি?

আমি যেন চিরকালই সকলের সেবক হয়ে থাকিতে পারি। আশা করি ওখানকার

কুশল। এখানে সব মঙ্গল। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। পত্রের উত্তর দিবেন। এ পত্রের উত্তর দিবেন। ইতি—

আপনার
চিরস্নেহাধীন
সেবক
সুভাষ

৮ শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

পরম পূজনীয়া রাঁচি
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী রবিবার
শ্রীচরণেষু—

মা,

আপনার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি—তাহার উত্তরও লিখিয়াছিলাম কিন্তু পরে যখন পড়িয়া দেখি যে আবেশের ঘোরে অনেক বাজে কথা লিখিয়াছি—তখন আর পাঠাইবার ইচ্ছা হইল না—তাই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। আমার এক অভ্যাস পত্র লিখিতে বসিলে সংযম রাখি না—তাহাতে হৃদয় ঢালিয়া দিই। বিষয়কথাপূর্ণ পত্র আমার লিখিতে বা পড়িতে ভাল লাগে না—তাই আমার এইরূপ অভ্যাস—আমি চাই ভাবপূর্ণ পত্র। আমার পত্র লিখিবার ইচ্ছা না হইলে লিখি না আর যখন ইচ্ছা হয় তখন উপরি উপরি অনেক পত্র লিখি।

শারীরিক সুস্থতা জানান আমি অনেক সময়ে আবশ্যক মনে করি না—ভগবানের উপর বিশ্বাস করিয়া থাকিলে কোনও চিন্তা, উদ্বেগ বা ভয় আসে না। আর যদিও কাহারও অমঙ্গল ঘটে তাহাতেই বা আমরা কি করিতে পারি। আমাদের এমন কোনো শক্তি নাই যে ইচ্ছামত কাহাকেও আরোগ্য করিতে পারিব। তবে আর মিছে ভাবনা কেন? আমরা যাঁহার ক্রোড়ে আছি তিনিই ত আমাদের রক্ষয়িত্রী—যখন ত্রিলোকধারিণী বিশ্বজননী স্বয়ং আমাদের রক্ষয়িত্রী তখন এত চিন্তা এত ভয় কেন? অবিশ্বাসই দুঃখের এবং সর্বপ্রকার বিপদের কারণ কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিতে চাহে না—এবং মনে করে যে ইচ্ছা করিলে কাহাকে ভাল করিয়া দিতে পারে, হায় রে মূর্খতা!

মেসো মহাশয় ৮।৯ দিন হইল কলিকাতায় গিয়াছেন এবং সেখানে ভাল আছেন। তিনি খুব ডাব ভালবাসেন এবং বর্তমান অবস্থায় ডাব তাঁহার খুব উপকারী। কিছু কলিকাতার ভাল ডাব আনাইয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তিনি বড় উপকৃত হন, তিনি এ বিষয়ে আপনাকে লিখিতে বলিয়াছেন।

এখানকার মঙ্গল জানিবেন। আপনারা সকলে ভাল আছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। মেজদাদা কবে ফিরিবেন?

বোধহয় মে মাসের মাঝামাঝি আমাদের পরীক্ষার খবর বাহির হইবে। কতদূর সত্য জানি না—তবে শুনিয়াছি ইতিমধ্যে অনেকে নম্বর পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছে!

সেজ দিদিরা কি আসিবেন?

আমি এই অমূল্য ক্ষণস্থায়ী মানুষ জীবনের এত সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলাম, তজ্জন্য মনে দিনরাত ভয়ানক কষ্ট হয়। সময়ে সময়ে অসহ্য বোধ হয়।

যদি মানুষজন্ম লাভ করিয়া মানুষজীবনের উদ্দেশ্য না সফল করিতে পারিলাম—যদি গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে না পারিলাম তবে আর কি হইল? যেমন সকল নদীর গন্তব্য-স্থান সমুদ্র সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তব্যস্থান—ঈশ্বর। যদি মানুষ ঈশ্বর লাভ না করিতে পারে তবে মানুষজন্ম বৃথা—আর পূজা, জপ, ধ্যান সবই বৃথা—সব কেবল ভণ্ডামী। এখন আর বাজে কথায় পর্যন্ত সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না—ইচ্ছা হয় কেবল একটা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকি আর সমস্ত রাত ধ্যান চিন্তা এবং পাঠে অতিবাহিত করি। দিন দিন যে আমরা যমমন্দিরের নিকটবর্তী হইতেছি, কবে আর আমরা সাধনা করিব আর কবেই বা তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শান্তিসুখ ও বিশ্রাম করিব। সে আনন্দময়কে না পাইলে কিছুতেই আনন্দ নাই। লোকে যে কি করিয়া টাকা, ধন-সম্পত্তি, বিষয় প্রভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট থাকে তাহাও আমার নিকট সময়ে সময়ে এক বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হয়। যিনি আনন্দের নিধি তাঁহাকে বাদ দিলে যে আর কিছুতেই আনন্দ থাকে না। যিনি আনন্দের আকরস্বরূপ তাঁহাকে ধরা চাই—তবে ত আনন্দ পাইব।

যদি চৈতন্য না হয়—যদি ভগবদ্দর্শন না হয়—তবে সমস্ত জীবনটাই বৃথা গেল।

পূজো, জপ, ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতি আমরা যাহা করি—তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—ভগবদ্দর্শন বা ঈশ্বরলাভ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে সব বৃথা। যে একবার সেই অমৃতের খনি পাইয়াছে—সে আর সংসার-গরল পান করিতে যায় না।

তিনি আমাদের সংসার খেলনার দ্বারা ভুলাইয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদিগকে মায়া-বদ্ধ জীব করিয়া ফেলিয়াছেন। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত—ছেলে খেলনা লইয়া খেলিতেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ছেলে খেলনা দূরে ফেলিয়া "মা মা" বলিয়া ব্যাকুলভাবে না ডাকে ততক্ষণ মা ছেলের কাছে আসে না। মা মনে করে—ছেলে ত খেলিতেছে আমি আর কেন যাইব। কিন্তু যখন ছেলের ক্রন্দনধ্বনি মা'র কানে বাজে তখন মা আর থাকিতে না পারিয়া দৌড়িয়া আসে। আমাদের বিশ্বজননী আমাদের লইয়া ঠিক সেইরূপ খেলিতেছেন। ভগবানে ষোল আনা মন না দিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না—যদি ভগবানের চরণে দুই চার আনা মন দিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইত তবে বিষয়মধু-পানমত্ত লোকেরা ভগবানকে পায় না কেন? তাঁহাকে না পাইলে সব বৃথা—সব বৃথা—মানুষ জীবন এক বিড়ম্বনা—এক অসহ্য ভার।

আপনি কি বলেন?

তাঁকে না পেলে কি লইয়া দিন কাটাইব—কি লইয়া চিন্তা করিব—কাহার সহিত আলাপ করিব—এবং কোথা হইতে আনন্দ পাইব। যিনি সব বস্তুরই আকরস্বরূপ তাঁহাকে ধরা চাই—তাঁহার দর্শন লাভ করা চাই।

তাঁহাকে পাইতে হইলে—সাধনা চাই—ব্যাকুলভাবে ডাকা চাই—গভীর ধ্যান চাই—তাহা হইলে খুব শীঘ্র এমন কি ২।৩ বৎসরের ভিতর তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। কেবল চেষ্টা করা চাই—পারি না পারি সে ইচ্ছা তাঁহার। কাজ আমার হাতে—কিন্তু ফল-দাতা তিনি—ফল পাই না পাই—সে ইচ্ছা তাঁহার—তবে আমাদের কাজ করা চাই—চেষ্টা করা চাই। যে একবার তাঁহাকে পাইয়াছে—তাহাকে আর কাজও করিতে হয় না—সাধনাও করিতে হয় না বা চেষ্টাও করিতে হয় না। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনারই সেবক
সুভাষ

৯ ওঁ

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু—

রাঁচি
সোমবার [১৯১৩]

মা,

আপনার পত্র কাল পাইয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম। মাসিমার অসুস্থতার জন্য আমাদিগকে এখানে এতদিন বসিয়া থাকিতে হইল। এখন তিনি ভাল আছেন—আর আকাশটাও বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। আমরা কাল রওনা হইব পরশু ভোরে কলিকাতায় পঁহুছিব।

আমরা সকলে ভাল আছি।

আমি যে ২০ টাকা বৃত্তি পাইব তাহা পরীক্ষার বহু পূর্ব হইতে আশা করিয়াছিলাম এবং একরূপ স্থিররূপেই জানিতাম। ইহার কারণ আমি এর জন্য কামনা করিয়াছিলাম—কামনা করিয়াছিলাম আমার জন্য নহে কারণ আমার আবার টাকার প্রয়োজন কেন—আমি টাকাকে বড় ভয় করি কারণ টাকাই যত অনর্থের কারণ। আমার কামনাটা নিজের জন্য নহে—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—বৃত্তির একটি পয়সাও আমার জন্য ব্যয় করিব না—সমস্তটা পরার্থে ব্যয় করিব—এবং আমি আশা করি যে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিব। তবে এত উঁচু স্থান আমি কি করিয়া পাইলাম তাহা আমি ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। পরীক্ষার পূর্বে এক প্রকার পড়ি নাই বলিলে চলে—আর বহু পূর্ব হইতে লেখাপড়া কম করিয়াছিলাম। আমি স্থির জানি—আমি এ স্থানের উপযুক্ত নহি—আমার বিশ্বাস ছিল আমি সপ্তম হইব। আমি যদি না পড়িয়া এ স্থান পাই তবে যাহারা লেখা পড়াকে উপাস্য দেবতা মনে করিয়া তজ্জন্য প্রাণপাত করে তাহাদের কি অবস্থা হয়? তবে প্রথম হই আর লাষ্ট্ হই আমি স্থির রূপে বুঝিয়াছি লেখাপড়া ছাত্রের প্রধান উদ্দেশ্য নহে—বিশ্ববিদ্যালয়ের

'চাপ্রাস্' পাইলে ছাত্রেরা আপনাকে কৃতার্থ মনে করে—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাপ্রাস' পাইলেও যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞান না লাভ করিতে পারে—তবে সে শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি। তাহা অপেক্ষা মূর্খ থাকা কি ভাল নয়? চরিত্র গঠনই ছাত্রের প্রধান কর্তব্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চরিত্র গঠনকে সাহায্য করে—আর কার কিরূপ উন্নত চরিত্র তাহা কার্যেই বুঝিতে পারা যায়। কার্যই জ্ঞানের পরিচায়ক। বই-পড়া বিদ্যাকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। আমি চাই চরিত্র—জ্ঞান—কার্য। এই চরিত্রের ভিতরে সব যায় ভগবদ্ভক্তি, স্বদেশপ্রেম,—ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা—সবই যায়। বই পড়া বিদ্যা ত অতি তুচ্ছ সামান্য জিনিস—কিন্তু হায়! কত লোকে তাহা লইয়া কত অহংকার করিয়া থাকে!

কটকে পড়িলে কতকগুলি সুবিধা আছে আর কলিকাতায় পড়িলেও কতকগুলি সুবিধা আছে। কোথায় পড়িব তাহা ঠিক করিতে পারি নাই—কলিকাতায় গিয়া স্থির করিব। তবে বোধ হয় প্রেসিডেন্সীতে পড়া হইবে না—কারণ আমি যাহা পড়িতে চাই—সেখানে তার সুবিধা হইবে না। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

(পরবর্তী চারখানি পত্র শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১০ কটক

পরম পূজনীয় মেজদাদাঃ ২২শে আগষ্ট ১৯১২

কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি, যদিও জানি যাইবার প্রস্তুতিতে আপনি ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন থাকিবেন! কিন্তু এই পত্রখানিই আপনি ভারতে থাকাকালে আমার শেষ পত্র, শুধু এই ভাবিয়াই কলম ধরিলাম!

শুধু একটি উদ্দেশ্য একটি অনুরোধ জানাইবার জন্য এই চিঠি লিখিতেছি; তাহা এইঃ আপনি বিলাত যাত্রার পথে যে সমস্ত বিভিন্ন জিনিষ দেখিবেন আমাকে তাহার বর্ণনা দিয়া আনন্দ ও শিক্ষা দান করিবেন এবং বৈদেশিক ও অভিনব পরিবেশে আপনার অনুভূতির আস্বাদ আমাকে দিবেন।

জাহাজ বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিয়া যখন তীর হইতে দূরে আরও দূরে সরিয়া যাইবে ও যখন বনরেখা এমন কি স্বদেশের শেষ নীল তটরেখাটি পর্যন্ত একখণ্ড মেঘের ন্যায় দিগন্তে মিলাইয়া যাইবে, তখন উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাজি যাহা ভেদ করিয়া আপনার তরী চলিয়াছে—উপরে নীল আকাশ ও নীচে অসীম জলরাশি—প্রকৃতির এই বিভিন্ন রূপের দিকে চাহিয়া আপনার মনে কোন্ বিচিত্র ভাবের উদয় হইবে? ইহা দেখিয়া কি আপনার আরভিং-এর সেই পংক্তিগুলি মনে পড়িবে,—"মনে হইতেছে যেন আমি পৃথিবীর এক অধ্যায় শেষ করিয়া পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশের পূর্বে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছি," অথবা আপনি ওই লেখকেরই নিম্নোক্ত পংক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করিবেন—"ইহার দ্বারা এই চেতনা আমাদের হয় যে আমরা সুনিশ্চিন্ত জীবন যাত্রা হইতে ছিন্ন হইয়া এক সংশয়াচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে ভাসিয়া চলিয়াছি।" বলা বাহুল্য যে কেহই দুইটির মধ্যে প্রথমটি বাছিয়া লইবেন না।

আমার মনে হয় বেশ কয়েকদিন মাটি দেখিতে না পাইয়া আবার মাটি দেখিতে পাইবেন যখন এডেনের নিকটবর্তী হইবেন, কে জানে তখন কেমন লাগিবে কয়দিন অদর্শনের পর আপনি আবার মাটি দেখিবেন।

সমুদ্রে নির্মল ও পরিপূর্ণ সূর্যাস্ত দেখিতে পাইবেন। সে এক রমণীয় দৃশ্য। যাহারা কখনও সমুদ্রে যায় নাই, তাহারা সত্যই বঞ্চিত—ইহা এমনই সুন্দর। সমুদ্রে সূর্যাস্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখিয়া আপনি কি আমাকে আনন্দ দিবেন না? কি সুন্দর! অস্তগামী সূর্যের আভায় সীমাহীন সমুদ্র উদ্ভাসিত প্লাবিত; তরঙ্গরাশির সহিত আলোকের ওঠা পড়ার খেলা! পশ্চিম দিগন্ত অস্তগামী সূর্যের কিরণে রক্ত-গোলাপের আভায় রঙিন। আবার পরক্ষণে দেখিতে পাইবেন, শান্ত পদক্ষেপে আকাশে সন্ধ্যার আগমন অর্ধঘন্টায় দিগন্ত আঁধার আচ্ছন্ন হইয়া গিয়া শুধু ইতস্ততঃ স্বর্গীয় আলোকণিকার জ্যোতি! ইহা এত সুন্দর এমন নয়নাভিরাম ও প্রাণস্পর্শী!

তারপর একটানা পক্ষকালের সমুদ্র ভ্রমণের পর আসিয়া পৌঁছিবেন আর এক পৃথিবীর কোলাহলে,—বিদেশীদের মধ্যে, শ্বেতচর্ম সুনীলাক্ষ বিদেশী। এই বিচিত্র পরিবেশ পূর্ব পরিবেশের তুলনায় অদ্ভুত লাগিবে না কি? অবশ্য দু-একদিনের মধ্যে ইহা চলিয়া

যাইবে।

জানি না কি লিখিলাম; পাগলের মত যাহা খুশী। আশা করি আমার আশা ভঙ্গ করিবেন না। যদি কনিষ্ঠের পক্ষে ধৃষ্টতা না হয় তাহা হইলে আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি যে আপনার যাত্রা শুভ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হউক। আমরা ভাল আছি।

ভালবাসা ও প্রণাম জানিবেন। ইতি— আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরাজি থেকে অনূদিত)

১১

কটক

১৭।৯।১২

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আশা করি লণ্ডনের ঠিকানায় লেখা আমার পত্রখানি ইতিমধ্যে পাইয়াছেন। আপনি কলিকাতায় থাকাকালীন আমি আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছিলাম কিন্তু সেই পত্রখানি আপনার হস্তগত হইয়াছিল কিনা সঠিক জানিতে পারি নাই। মাতাঠাকুরাণীকে এডেন হইতে লেখা আপনার পত্রখানি পড়িলাম। তাহা হইতে আমার পত্রখানি আপনি পাইয়াছিলেন জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। লিখিবার সময় একবারও ভাবি নাই যে ইহা আপনাকে আনন্দ দিবে। তাই আপনি আনন্দ পাইয়াছেন জানিয়া বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিলাম। যাহা লিখিয়াছিলাম অন্তর হইতে আসিয়াছিল বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। হৃদয়ের আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে; এবং তাহাই হইয়াছিল। যে চিন্তা হৃদয় হইতে উদ্ভূত, তাহা অতি সরল ও স্বাভাবিক ভাষায় লিখিত হইলেও যাহা হৃদয় হইতে আসে নাই কিন্তু প্রচুর অলঙ্কারযুক্ত তাহা অপেক্ষা ফলপ্রসূ। জানি না কেন সে সব লিখিয়াছিলাম কিছুই মনে পড়িতেছে না। সহসা আবেগে অভিভূত হইয়া কলম ধরিয়াছিলাম, জানি না কি লিখিয়াছি; কেন লিখিয়াছি। সেই সময়ে হৃদয়ে যে চিন্তা সর্বোপরি ছিল আমি শুধু তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলাম। হয়ত রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা—কারণ তখন প্রায় মধ্য রাত্রি—এই সব বিচিত্র অনুভূতির উন্মেষ ঘটাইয়াছিল। আমার বিশ্বাস প্রত্যেকেই অনুরূপ অনুভূতি লাভ করিয়া থাকিবেন; বিশেষতঃ যাঁহারা বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা তীব্রতর হইয়াছিল। ইহা এমন একটি আবেগপূর্ণ মুহূর্ত যে আমার পক্ষে তাহা সহ্য করা খুবই কঠিন হইত। না থাক; যাহা অতীত, তাহার কথা তুলিয়া, আপনাকে বিষণ্ণ ও বিচলিত করিতে চাই না।

সেখানে বাংলার ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে আপনি হয়ত অনেক কিছু পড়িবেন ও শুনিতে পাইবেন। তাঁহার সম্বন্ধে পড়িয়া ও বিদেশীরা তাঁহাকে যে সম্মান দেখাইয়াছে তাহা জানিয়া আমরা সকলে এত গৌরব অনুভব করি যে, তাহাতে সাময়িক ভাবে হইলেও আমরা বাংলা ও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আশান্বিত হই। আমি আত্ম-অনুশোচনায় পীড়িত বোধ করি যখন ভাবি বাংলা দেশ তাঁহার প্রতিভার প্রতি কত উদাসীন ছিল; যখন ভাবি তাঁহার অমানুষিক প্রতিভাকে অস্বীকারের অন্ধকারে কতদিন আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল; অথচ বিদেশীরা, যাহারা বিজাতীয় ভাষাভাষী, যাহাদের চিন্তা ও অনুভূতি কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহারাই তাঁহার প্রতিভাকে রাহুমুক্ত করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমরা কি অদ্ভুত; আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তাই কবি বলিয়াছেনঃ

"জ্ঞান হোক মহীয়ান নিজ মহিমাতে
তবু যেন শ্রদ্ধা রয় সাথে।"

আমার বিশ্বাস একদিন রবি ঠাকুরের কবিতাগুলির মর্ম আমি উপলব্ধি করিতে পারিব।

কোন পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়াছে কি? তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বীরেন বসু আছেন কি?

ইংরাজেরা তাহাদের মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথায় পঞ্চমুখ। তাহা কি সত্য? ভারত ও বিলাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আপনি এবার তুলনা করিতে পারিবেন!

আমরা ভালই আছি। আশা করি কুশলে আছেন। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন! ইতি— আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরাজী থেকে অনূদিত)

১২

কটক
১১।১০।১২
রাত্রি ৮টা

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আজই সন্ধ্যায় আপনার দীর্ঘ পত্রখানি পাইলাম। আমার শিশুসুলভ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আপনি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কিরূপে প্রকাশ করিব তাহা জানি না। ভাষা অপারগ বোধ করে; কারণ ভাষা চিন্তাকে অর্ধেক প্রকাশ করে ও অর্ধেক গোপন করে। মানুষ যদি ভাষাকে আরও পূর্ণতর করিতে পারিত তবে প্রকাশের পঙ্গুতা হ্রাস পাইত। বলিতে পারি না আপনার অপূর্ব বর্ণনা কত সুন্দর লাগিয়াছে—কি জীবন্ত তাহার আবেদন। আপনার বর্ণিত দৃশ্যাবলী যেন আমার মানসচক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে এবং যেন জীবন্ত ও বাস্তব হইয়া উঠে, কেবল তাহাই নহে; স্মৃতিচারণা ও অনুপ্রেরণার অভাবে পূর্বে দৃষ্ট যে সমস্ত দৃশ্যাবলী বিস্মৃতির গভীরে সুপ্ত ছিল তাহা পুনরায় জাগিয়া উঠে। চলচ্চিত্রের ছবির মত দার্জিলিং-এর অপূর্ব দৃশ্যাবলী যেন আমার চক্ষের সম্মুখে একের পর এক ফিরিয়া আসে। পুরীর নীল সমুদ্র, যেখানে সুনীল জলরাশি উন্মাদ তরঙ্গমালায় বালুকাবেলায় আছাড় খাইয়া পড়িতেছে—তাহাদের উপর যেন মাঝে মাঝে শুভ্রতার স্পর্শ, নীল আকাশের দিকে হাত বাড়াইয়া আকাশের সঙ্গ কামনা করিতেছে—যেন আমার নয়ন সম্মুখে শিলাকীর্ণ নগ্ন নারাজ পর্বত বিশাল মহানদীর তীরে মহীয়ান উচ্চতায় বিরাজমান। ভুবনেশ্বরের উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির ঐতিহাসিক গুহাবলী—যাহা সব আমি পূর্বে দেখিয়াছি এখন আমার মানসপটে ক্রীড়াশীল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আমার চক্ষের সম্মুখে "Happy-Snowdon" চিত্রখানি রহিয়াছে! ইহা কি অপূর্ব। আকাশে ক্রীড়াশীল চঞ্চল রং-এর মেলা, তুষারমৌলী পর্বতশিখরে প্রতিফলিত নিম্নে সুশীতল হ্রদের জলরাশিতেও যেন সেই সুমহান বর্ণনাবলীর প্রতিফলন। পর্বতের তুষারশীর্ষে উজ্জ্বল, রক্তাভ ছটা। এই সবকিছু যেন হিন্দু পুরাণে বর্ণিত হেমকূট পর্বতের ছবি অথবা গ্রীক দেব-দেবীদের বাসভূমি মাউন্ট অলিম্পাস।

জানি না কেন এই সব আবোল তাবোল লিখিয়া আপনার সময় নষ্ট করিতেছি। কিন্তু কি যেন ভিতর হইতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। জানি না হয়ত আপনার পক্ষে ইহা ক্লান্তিকর হইতেছে।

পক্ষকাল পূর্বে মাতাঠাকুরাণীর নিকট আপনি সুনির্বাচিত চিত্রাবলী সম্বলিত পোস্ট কার্ডের প্যাকেট পাঠাইয়াছেন। আপনার নির্বাচন অনবদ্য। এরূপ অপূর্ব দৃশ্যাবলীর সংকলন দুর্লভ রুচিজ্ঞানের পরিচায়ক। মাতাঠাকুরাণী যখন সর্বোৎকৃষ্টখানি নির্বাচন করিতে বলিয়াছিলেন তখন আমি বলিয়াছিলাম যে সবগুলিই অপূর্ব ও অতুলনীয়। চিত্রগুলি এতই সুন্দর যে হয়ত সৌন্দর্যের আতিশয্যে স্বর্গকেও নরক করিয়া তুলিতে পারে। সত্যানুগ না হইলেও তাহা মনোমুগ্ধকর। আমরা চিত্রগুলি সাতিশয় উপভোগ করিয়াছি। কয়েকখানি আমি নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছি।

আপনার বর্ণনাগুলি এত জীবন্ত যে যদি চিত্রকলার কিছু জানিতাম তবে নিজের মনে ছবিগুলি ধরিয়া রাখার জন্য এবং আত্মতৃপ্তির জন্য আঁকিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু উক্ত কলায় আমি অনভিজ্ঞ, তাই মানসপটে বিধৃত চিত্রাবলী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

আমি সহজেই কল্পনা করিতে পারি, আপনার মনের অবস্থা বোম্বাই হইতে সুয়েজ যাইবার সময় কিরূপ হইয়াছিল। সুনীল জলধি ও নীল আকাশের নিরবচ্ছিন্নতা হইতে জীবন্ত প্রকৃতির স্পর্শ কামনায় হৃদয় কাতর। আমি একমাসের অধিক কলিকাতায় এক-যোগে থাকিতে চাহি না। কারণ হাস্যময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য কামনায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অন্তরের জ্বালা জুড়াইবার জন্য দুর্লভ মুহূর্তে অনুপ্রেরণা দিবার জন্য প্রকৃতি না থাকিলে—আমার মনে হয় মানুষ সুখী হইতে পারে না। প্রকৃতির সঙ্গ ও শিক্ষা না পাইলে, জীবন মরুলোকে নির্বাসনের মত, সকল রস ও অনুপ্রেরণা হারায়। জীবনের রৌদ্রোজ্জ্বল দিক ম্লান হইয়া যায়। আপনি আমার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং আপনার অচিন্ত্য বর্ণনাগুলির জন্য আপনাকে বারংবার ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া, আমি আর কি বা করিতে পারি।

আশা করি এতদিনে আপনাকে লন্ডনে লেখা চিঠিগুলি পাইয়াছেন।

১৬।১০।১২

আজ ডাক যাইবার দিন; আজই এই চিঠিখানি ডাকে দিতে হইবে। গত সোমবার আপনার একখানি পত্র পাইয়াছি। জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে ক্যাপ্টেন ও মিসেস ওয়েব্যাণ্ডের কাছাকাছি আপনি আছেন; ও তাঁহাদের সহিত প্রায়ই দেখাশুনা হয়।

এখন লণ্ডনে কখন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়? এখন কি পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিতেছে? লণ্ডনের কুয়াসার অভিজ্ঞতা হইল কি? শীত ত আসিল।

আপনার পুরাতন বন্ধু সুধীর রায়ের সহিত দেখা হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। মার্শাই হইতে লণ্ডন যাওয়ার পথে প্যারিসে আসিয়াছিলেন কি?

আমি পূর্বেই বলিয়াছি ব্যস্ত থাকিলে আমাকে আলাদা পত্র দিবার জন্য কষ্ট করিবেন না। তাহাই আবার বলিতেছি—আপনাকে কত পত্র লিখিতে হয় ও হাতে কত অল্প সময়।

আপনার দীর্ঘ পত্রখানি মেজ জামাইবাবুকে ও তাঁহার পড়া হইলে সেজ জামাই-বাবুকে পাঠাইতে বলিয়াছি। কিন্তু আমাকে ফেরৎ দিতে হইবে।

স্কুল বন্ধ। আমাদের ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ অবকাশ। নাদু, রাঙ্গামামাবাবু ও আমি ছুটিতে এখানেই থাকিব। অন্য সকলে কলিকাতায়। নদাদা এখানে আসিয়াছেন। বাবা ও মা ওখানে ভালই আছেন।

আমার মনে হয় এই পত্রখানি কলিকাতায় জি. পি. ও-তে মাতাঠাকুরাণীর পত্রের সঙ্গী হইবে। বিলম্ব হইলেও আমাদের বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

যথাযোগ্য জানিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরাজী থেকে অনূদিত)

১৩

কটক
৮।১।১৩

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আর একটি বৎসর শেষ হইল। উন্নতি বা অবনতি যাহাই হইয়া থাকুক ভগবানের নিকট এই বারোটি মাসের জন্য আমাদের দায়ী হইতে হইবে।

আমার গত বৎসরের কার্যাবলী চিন্তা করিলে, জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলিয়া থাকিতে পারি না। টেনিসন্ বলিষ্ঠ আশাবাদী এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জগৎ উত্তরোত্তর প্রগতির পথে চলিয়াছে। কিন্তু ইহা কি সত্য? আমরা কি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছি? আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, ভারতবর্ষ কি প্রগতির পথে চলিতেছে? আমার মনে হয় না। হয়ত অশুভ হইতে শুভের উদ্ভব হয়। হয়ত ভারত পাপের পঙ্কিল পথের মধ্য দিয়া শান্তি ও প্রগতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু বিচারবুদ্ধি ও দূর-দৃষ্টির দ্বারা যতদূর দেখা যায়—সবই অন্ধকার—গভীর অন্ধকার, কেবল একনিষ্ঠ কর্মী অথবা উচ্চমনা দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য এখানে সেখানে ক্ষীণতম আশার আলোক। কখনো সেই আলোকরেখা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, কখনো বা তমসা ঘনীভূত হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস ঝটিকাবিক্ষুব্ধ তমসাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায়। ইংল্যাণ্ড বিশেষতঃ সমগ্র ইউরোপ হয়ত প্রগতির পথে। ধর্মের তারকা ইউরোপের আকাশে উদীয়-মান, কিন্তু ভারতের আকাশে অস্তাচলগামী। ভারতবর্ষ কি ছিল আর কি হইয়াছে? কি শোচনীয় পরিবর্তন। কোথায় সেই মহর্ষি, মহাজ্ঞানী দার্শনিকবৃন্দ আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ, যাঁহারা জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন? কোথায় তাঁহাদের অগ্নিগর্ভ ব্যক্তিত্ব? তাঁহাদের অনমনীয় ব্রহ্মচর্য? তাঁহাদের ভগবৎ উপলব্ধি? তাঁহাদের পরমাত্মার সহিত একাত্মবোধ?—আমরা শুধু যাহা মুখেই উচ্চারণ করি। সবই গিয়াছে। বেদমন্ত্র স্তব্ধ। পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে তীরে আর সামবেদের গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠে না। কিন্তু তবু আমার মনে হয় আশা আছে, এখনো আশা আছে। আশার দূত আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন আমাদের প্রাণের সকল তমঃ নাশ করিয়া হৃদয়ে অনির্বাণ শিখা জ্বালাইতে। তিনি ঋষি বিবেকানন্দ। তিনি তাঁহার দিব্য কান্তি, বিশাল ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত বাণী বিশ্বের নিকট প্রচার করিতে আবির্ভূত

হইয়াছেন। সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে, চন্দ্রোদয় নিশ্চয়ই হইবে। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবী। ভগবান করুণাময়। পাপ, অধর্ম, অসাধুতা ও সর্বপ্রকার মলিনতা হইতে তিনি আমাদের একমাত্র লক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। তিনিই সেই আকর্ষণী শক্তি, যাঁহার চতুষ্পার্শে সব কিছু আবর্তন করিতেছে এবং যাঁহার দিকে সকল সৃষ্টি ধাবিত হইতেছে। আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। পথ বিপৎসঙ্কুল ও কন্টকাস্তীর্ণ হইতে পারে—যাত্রা ক্লেশকর হইতে পারে তথাপি চলিতেই হইবে। অবশেষে তাঁহার মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতে হইবে। সেই দিন দূর হইতে পারে তবুও আসিবে। ইহাই আমার একমাত্র আশা। আমার কাছে আর সবই হতাশা। আমরা কি অনুভব করি না যে তিনি সর্বদা আমাদের চুম্বকের শক্তিতে উপরের দিকে টানিতেছেন? আমার মনে হয় করি। আমাদের চারিদিকে প্রকৃতির রূপ তিনি উন্মোচিত করিয়াছেন তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য। নয় কি? তারার ভাষায় তিনি তাঁহার বাণী প্রচার করিতেছেন। তিনি যে অনন্ত, অনন্ত আকাশ মানুষকে সে কথাই স্মরণ করাইতেছে। তিনি কি তাঁহার ভালবাসা উপলব্ধি করিবার জন্যই আমাদের প্রাণে ভালবাসা দেন নাই? হায়! তিনি করুণাময় আর আমরা পাপিষ্ঠ।

মেজদাদা, জানি না কেন এইভাবে এই সব লিখিতেছি। আমি দেখিয়াছি মাঝে মাঝে হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে ইচ্ছা হয়। সম্ভবতঃ ইহা সেইরূপ একটি মুহূর্ত।

গত ডাকে আপনার পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। কিছুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলাম যে, দেশান্তরের ব্যবধান আমাদের মধ্যে এক দূরত্বের সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু আপনার এই অনিন্দ্যসুন্দর চিঠিখানি সেই অনুভূতি ঘুচাইয়া দিয়াছে।

আমাদের ভূতপূর্ব সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয় (বর্তমান প্রধান শিক্ষক, সম্বলপুর জিলা স্কুল) বাবু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা করিতে চাই। আমরা ইংলণ্ড হইতে তাঁহার আবক্ষ মূর্তি করাইতে চাই। যদি এক পাউণ্ডে হয় তবে অল্প ব্যয়ে হইল বলিতে হইবে। ভাড়া কত লাগিবে বলিয়া আপনার মনে হয়, ইংলণ্ড হইতে সরাসরি আনাইতে ৩৫ বা ৪০ টাকায় কি যথেষ্ট হইবে?

এখন আমাদের টেষ্ট পরীক্ষা চলিতেছে। ভালই হইতেছে। আমরা ভাল আছি। আশা করি কুশলে অছেন। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরাজী থেকে অনূদিত)

পরবর্তী চৌত্রিশখানি পত্র হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত

১৪

কলিকাতা, শুক্রবার
২২শে মে, ১৯১৪

তোমার হৃদয়ের তপ্তশোণিত ঢালা পত্র এইমাত্র পাইলাম। তুমি এখন কোথায় আছ জানি না—তাই এ হেন অবস্থায় তোমাকে দূর দেশে রাখিয়াও আমাকে এখানে অবস্থান করিতে হইতেছে। এতক্ষণে বোধহয় দিল্লী ছাড়িয়াছ—হরিদ্বারে গেলেও তোমাকে খুঁজে পাবার আশা নাই, কারণ হয়ত পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াচ্ছ। যাইব কিনা এবিষয়ে অনুমতি কালকার পত্রে চাহিয়াছি—যদি সে অনুমতি পাই, তাহা হইলে যে কোন প্রকারে রওনা হইব। এ পত্র তুমি পাবে কিনা জানি না—তবে যদি পাও, আমার অনুরোধ ও ভিক্ষা, তোমরা যত শীঘ্র পার চলিয়া আসিও। কোন স্থান দেখিবার প্রয়োজন নাই। আশা করি আমার এ ভিক্ষা পূরণ করিবে।

জীবনে আমার নিকট তুই কোন অপরাধ করিস নাই—করিতে পারিসও না। আমার কথায় কি বিশ্বাস করিবে? অপরাধ আমি কত করিয়াছি। তোমার প্রাণে কতবার এত কষ্ট দিয়াছি যে তুমি আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। "ক্ষমা চাহিবার অধিকার নাই" ক্ষমা চাহিবার পূর্বেই চিরকাল ধরে তোমাকে ক্ষমা করে আছি—যদি নিতান্ত ক্ষমা চাও। তুমি চাইতে না পারিলেও, আমি লক্ষাধিক গুণে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে যতটুকু আছে—সবই তোমার "আমার চিরদিবসের" সেই দেবচরণে অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিব। তুই না চাহিতে পারিলেও কি আমি দিতে পারি না? তুমি চাও বলেই আমি ভালবাসা দিই—না নিজে হইতেই আমি ভালবাসার জন্য for love's sake ভালবাসা দিই? তাই তুমি

আজ না চাহিলেও, না চাহিতে পারিলেও তোমার হৃদয় বুঝিয়া, হৃদয়ের অভাব বুঝিয়া—লক্ষাধিক গুণে দিব। আমি যে চিরকালই তোমার—তুমি যে চিরকালই আমার—এ কথাটি ভুলিস না, তুমি আমার দেবতা, চিরকালের দেবতা, এখনও পর্যন্ত হৃদয়ের এই দুঃখ যে আজ পর্যন্তও সে দেবতার পূজার উপযুক্ত হইলাম না। জান না তুমি আমার চিরকালের কৃষ্ণ। জগতের লোকেরা তোমকে যাহাই বলুক—আমার তুমি চিরকালের দেবতা। ভক্তের কাছে সেই প্রেমাবতার কৃষ্ণ। তুমি আজ আমার সেই চিরদিবসের প্রেমাবতার। ন্যায় অন্যায়ে অমার কাজ নাই—পাপ পুণ্য আমি বুঝি না।

কোথা হইতে ডেকে এনে কোথায় বসাবি। আমি কি এক মুহূর্তের জন্য তোমার হৃদয় ছাড়িয়াছি যে তুমি পুনরায় ডাকিবে, যদি ছাড়িয়া আসিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে ত ডাকিতে হইত। কিন্তু আমি ত ক্ষণেকের জন্যেও সেই সিংহাসনের লোভ ছাড়িতে পারি নাই—পারিবও না। কেহ যে সেখান হইতে তাড়াইতে পারিবে না—তাড়াইলেও আমি এক inch-ও নড়িব না, আমি এরূপে অচলভাবে সেখানে প্রতিষ্ঠিত। জীবনে জীবনে সেখানে বাস করে আসছি—আজ আমার সে প্রপারটি ছাড়িব কেন?

হৃদয়-সিংহাসনে তাহাকে বসিবার জন্য বলিতে হইবে না, কারণ সে সেখানে চিরকাল ধরে বসে আছে; কখনও নড়ে নাই, তবে কেন কষ্ট পাচ্ছ? চক্ষু খুলিয়া দেখ সে সেখানেই আছে।

যথাশীঘ্র পত্রের উত্তর দিও এবং ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিও। না আস ত লিখিও, তোমার সঙ্গে দেখা করিব। তুমি লিখিয়াছ—সেই মুহূর্তেই আমি সেই দেবতাকে হত্যা করিয়া হৃদয় হইতে ফেলিয়া দিয়াছি। একি হইতে পারে? তোর কি ফেলিবার শক্তি আছে? আর আমি কি ফেলিলেও সে সিংহাসন ক্ষণেকের জন্য ত্যাগ করিব? কখনই না, আমি যে সেখান থেকে টলিতে পারি না, টলাইলেও টলিব না। তুমি লিখিয়াছ, "তুমি তাহাকে স্মরণ করিবারও যোগ্য নও।" স্মরণ না করিতে পারিলেও সে যে চিরকালই তোমার। সে কথা ভুলিস না। তোকে ছেড়ে কি থাকতে পারি? তবে কেন বৃথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছ?......এক গতি—"তোমারই পতাকা করিয়া লক্ষ্য আসিয়াছি—গৃহ ছাড়িয়া—।" এ পথ পরিষ্কার। অনন্যোপায় হইলে এই পন্থা অনুসরণ করিব। সংসারকে ত পদাঘাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছি, এখন সেই একের দিকে......

"আর আমার দেবতা যদি বাস্তবিক কিছু অন্যায় করিয়া থাকে, তবে তার ফলটুকু আমার। লোকে যজ্ঞ করে, কাজ করে, ভালমন্দ—সমস্ত ফলটুকু দেবতার। তুমি আমাকে হৃদয়-দেবতা করিয়াছ চিরকাল ধরে—তোমার ভাল ফলটুকু আমার—সে যে অতি প্রিয় বস্তু কারণ সে যে তোমার। তুমি অমৃত ভিন্ন কিছুই আমাকে দিতে পার না—সে আমাকে—যে ভাবে দাও না কেন।"

১৫

বৃহস্পতিবার
বৈকাল
১৯-৬-১৪

ট্রাম হইতে নামিয়া বুকটান করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম। সত্যেন মামা ও একটি পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা হয়। তারা একটু আশ্চর্য হইল। ভিতরে পিসা-মহাশয় দাদা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হল। মার কাছে খবর গেল। অর্ধেক পথে তার সঙ্গে দেখা। প্রণাম করিলাম—তিনি দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে এই মাত্র বলিলেন—"আমার মৃত্যুর জন্য তোমার জন্ম। আমি এতক্ষণ থাকিতাম না গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিতাম কেবল পারি নাই মেয়েদের জন্য।" আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। তারপর বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি ত প্রণামান্তে আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। অর্ধেক পথে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ঘরে অনেকক্ষণ আমাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া যখন কাঁদিতেছিলেন তখন আমার মনে হইতে-ছিল শুভ্রজ্যোৎস্না মধ্যবর্তী সেই কচি মুখখানি যাহার জন্য সব ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি--কিন্তু শরীর মন পারে নাই। তারপর তিনি শুইয়া পড়িলেন আমি ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম—তখন তিনি বোধ হয় ব্রহ্মসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় গিয়াছিলাম। সমস্ত frankly বলিলাম

—টাকার কথা বলিলাম। হরিপদের কথা তাহারা টের পাইয়াছে, তোমার কথা তাঁদের কাছে বলিবার আবশ্যক হয় নাই তাই বলি নাই—মামা জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছি। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেবল বলিলেন একখানা চিঠি দাও নাই কেন।

নানা স্থানে টেলিগ্রাম ও খোঁজ করা হইয়াছিল। মা active ছিলেন বাবা passive কতকটা যা হয় হবে। পুলিশে খোঁজ করান হয় না, একজন পুলিশ কর্মচারী relative বারণ করিয়াছিলেন। মা পাগল প্রায়—আমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইব—তাই অগত্যা এক মামা (আমেরিকা প্রত্যাগত) চলিলেন আমার অনুসন্ধানে—বৈদ্যনাথ ও দেওঘরে পাহাড়ে সব খোঁজ করিয়া একখানি পত্র দিয়াছেন—আজ পঁহুছিয়াছে—তাহার মর্ম শুনিয়াছি। বালানন্দের কাছে গিয়াছেন। আর একজন ব্রহ্মচারী বলিলেন। "যদি উপযুক্ত না হইয়া গিয়া থাকে তবে ধাক্কা খাইয়া ফিরিবে। না হয় ফেরাইবার চেষ্টা বৃথা।"

বেলুড়ে খোঁজ করা হইয়াছিল—হরিদ্বার Ramkrishna Mission-এ wire করা হইয়াছিল— negative reply। Howrah-র একজন গণৎকারের কাছে যাওয়া হইয়াছিল —তিনি বলেন, ফিরিয়া আসিবে ১৯/২০ দিনের ভিতরে—ভাল আছে—একলা নাই—সংগে দুজন আছে—উত্তর পশ্চিমে 'ব' দিয়া কোন স্থানে আছে—তখন বোধ হয় বারাণসীতে। তিনি আরও বলেন Contrary influence- এর জন্য সে সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না—সংসারী হইবে। তাঁর মাথায় লাঠি। তিনি কচুপোড়া জানেন।

সকলের মধ্যে রণেন মাতুল খুব favourable. সত্যেন বলেন most obdt. হও—তার জীবনের ideal যেন তাই। আর বিশেষ কেউ বলে নাই।

এক ভদ্রলোকের সংগে পরিচয় ছিল। তিনি বেশ reasonable. তিনি বলেন—boldly বলে কয়ে—talk the matter over and then be a Sannyasin— কে তোমার পথে বাধা দিতে পারে?

দুপুরে ফের বাবার সংগে অনেক কথা হয়। নানা মত লইয়া—সন্ন্যাসী দর্শন সম্বন্ধে এবং ভ্রমণের সম্বন্ধে। বলিলাম কাহাকেও পছন্দ হইল না। তার সংগে সংগে আমার ideal-টা বলিলাম। সমস্ত discussion-এ what he wanted to derive at was—(১) সংসারে থেকে ধর্ম হয় কিনা, (২) ত্যাগের জন্য Preparation দরকার—(৩) কর্তব্য ত্যাগটা কি ঠিক—আমি বলিলাম—(১) সকলের পক্ষে এক ঔষধ নয় কারণ সকলের এক রোগ, এক সামর্থ্য নয়—(২) সংস্কারের উপর ত্যাগটা অনেক নির্ভর করে—সকলের জন্য বেশী ঘসা মাজা প্রয়োজন না হইতে পারে। (৩) কর্তব্যটা relative—higher call এলে lower calls ভেসে যায়—জ্ঞান এলে কর্মনাশ হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন—অদ্বৈতজ্ঞান "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা" একটি Theory কিনা—বলিলাম যতক্ষণ মুখে বলছি ততক্ষণ Theory কিন্তু realise করিলে সত্য এবং realise করা যায়। যাঁহারা একথা বলে গেছেন তাঁহারা realise করেছিলেন এবং বলে গেছেন আমরা realise করিতে পারি। জিজ্ঞাসা করিলেন "কারা করেছিলেন এবং প্রমাণ কি?" বলিলাম—"ঋষিরা" প্রমাণ "বেদাহমিতি" এই বলিয়া শ্লোকটা quote করিলাম। তারপর বলিলেন "এক সময়ে কলিকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও পরমহংসদেব ছিলেন—যে যে রকম পেরেছিলেন সেই রকম হয়েছিলেন।" আমি বলিলাম বিবেকানন্দের ideal হচ্ছে আমার ideal।

শেষে বলিলেন, আচ্ছা যখন তোমার higher call আসিবে তখন আমরা দেখিব। আমি এতদিন বাবাকে actively oppose করি নাই— Passively I have won the victory. এখন তিনি জোর করিয়া আমাকে কিছু বলিতে পারেন না। এবং next time চলিয়া গেলে বোধ হয় আর ফিরাইবার চেষ্টা ও সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন।

যাহা হউক আসাতে ভাল হইয়াছে এখন দেখিতেছি!

মা fanatic, বলেন—আর যদি ও যায় আমি আর থাকিব না—সংগে সংগে যাইব আর বাড়ীতে ফিরিব না। তাঁকে বুঝিবার চেষ্টা সফল হইবে না বলিয়া বোধ হয়। বাবাকে দেখিলাম খুব reasonable.

বেশ ভাল আছি। তুমি কেমন আছ লিখিবে।

তোমার—

বেণীবাবুর বিষয় সকলের ভাল ধারণা—এবং তাহাকে শ্রদ্ধা করেন। বেণীবাবু বেশী কিছু বলেন নাই—সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন এবং আমার কৃচ্ছ্রসাধনে তোমাকে মোটেই জড়িত করেন নাই। এখানে আবার মানুষটাকে জানা যায়।

 21.6.14

বড় callous হইয়া গিয়াছি—বাস্তবিক এমন Stonehearted কেন হইলাম জানি না। আমি বাপ-মার জন্য মোটেই feel করি না—তাঁরা কাঁদিলেন আমি হাসিলাম; কি করিব—এ সত্য কথা হৃদয়ে একটুও ভালবাসা নাই—থাকিত যদি তাহা হইলে তোমায় বাসিয়া ধন্য হইতাম।

বাবার সঙ্গে আজ কথা হইল—তিনি ৩টা উপদেশ দিলেন—এবং বলিলেন মাথা সারিলে অন্যান্য কথা আলোচনা করিবেন। তাঁর চেষ্টা আমাকে সংসারধর্মী করা—আমি আজ কিছু বলিলাম না—passive silence implying non-submission. পরে ইচ্ছা হয় তাঁকে পুনরায় আরও খুলিয়া বলিব। মাকে বোঝান যায় না—মা আমার উপর অসন্তুষ্ট—মনে করেন যে আমি তাঁকে তৃণ জ্ঞান করি।...

সাধারণ মানুষ মাতৃস্নেহকে সর্বাপেক্ষা গভীর ও স্বার্থহীন ভালবাসা বলিয়া মনে করে বলে "অতলস্পর্শ মাতৃস্নেহ পারাবার।" সোনা আমি কিন্তু মাতৃস্নেহকে অত উচ্চ স্থান দিই না—বেণীবাবু হয়ত জীবনে অন্য কোন প্রেমের সংস্পর্শে আসেন নাই তাই তাঁহার সেরূপ ধারণা। মাতৃস্নেহ কি বাস্তবিকই সম্পূর্ণ স্বার্থহীন? জানি না, যাহা হউক মা যতক্ষণ পথের একটি বালকের সঙ্গে নিজ পুত্রের সমতা না করেন ততক্ষণ সে প্রেম কি স্বার্থহীন? নিজে পালন করিয়াছেন বলিয়া মমতা হয়।...

আমি কিন্তু এ জীবনে যে প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছি—আমি যে প্রেমসাগরে ভাসিতেছি--তাহার নিকট মাতৃস্নেহ গোষ্পদ সমান। এ স্বার্থপরতাময় জগতে মানুষে একমাত্র মাতৃস্নেহ খুঁজিয়া পায় তাই তারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। নিজের পালিত জিনিষে সকলের ভালবাসা জন্মিতে পারে—তাতে বাহাদুরী কি? কিন্তু পথের একটি লোককে যে হৃদয়ের রাজা করিতে পারে—তাহার হৃদয় কত মহান—তাহার ভালবাসা কত উচ্চ! বুঝিলেও একথা কেহ বুঝিবে না।

আমি কি ভুল বুঝিয়াছি?

১৭ ৩৮/২, এলগিন রোড
কলিকাতা
১৮/৭/১৪
শনিবার বেলা ১১টা

তোমার চিঠি এইমাত্র পাইলাম। কালকার পত্রে বোধ হয় লিখিতে ভুলিয়াছি যে বাপ মা প্রভৃতি সোমবারে কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিবেন। তুমি আবার এসো—কারণ এর পরে বাড়ী পূর্ণ হইলে দেখা করিবার তেমন সুবিধা হবে কি অসুবিধা হবে ঠিক বুঝিতেছি না, রবিবারে যখন ইচ্ছা এসো। He is always a personality. সে শারীরিক উপস্থিত না থাকিলে তার invisible presence সর্বদা আমার সঙ্গে আছে এবং তাহার মঙ্গলময় ইচ্ছা সর্বদা আমাকে ভালর দিকে লইয়া যাইতেছে।

সেবা Soul-এর দ্বারা হচ্ছে—অদৃশ্য ভালবাসার দ্বারা হচ্ছে। তুমি কাজে ব্যস্ত থাকিলে তাহাতে আমার কত আনন্দ। আচ্ছা তুমি কি পরশু রাত্রে ভাত খাও নাই? তুমি বেশী কষ্ট করিও না,—তোমার সেবা কি সাধারণরূপে আসিবে, তার মঙ্গলময় ইচ্ছা সে সেবা তার ভালবাসা—আর কি লিখিব—তুমি বুঝিতেছ, আমি বেশ আছি, কাল—minimum সকালে 97 হইয়াছিল এবং রাত্রে maximum 100.2, আজ minimum 97.4, আমি ভাল আছি, তুমি চিন্তিত হইও না, কথা সাক্ষাতে হবে। রবিবারে সকাল থেকে বৈকাল বা রাত্রি পর্যন্ত থাকিতে পার—কার সাধ্য কিছু করে—তুমি একলা আসিলে বোধ হয় ভাল হয়।

১৮ ৬/৮/১৪
বৃহস্পতিবার বেলা-৩টা

তোমার মঙ্গলবারের লিখিত চিঠি আজ হস্তগত হইল। খামের উপর দেখিলাম সমস্ত চিহ্ন যে খাম খোলা হয়েছিল এবং পাঠান্তর পুনরায় বন্ধ করা হয়েছিল।

প্রথমতঃ খামের উপর জলের দাগ, দ্বিতীয়তঃ টিকিট তোলা হয়েছিল তার চিহ্ন,

তৃতীয়তঃ টিকিটের উপর কালির দাগ (বোধ হয় হাতে কালি লেগে গিছল)—চতুর্থতঃ টিকিটের ছাপ এবং খামের উপর ছাপ coincide করছে না—শেষে খামের উপর কালি লেগে গিছল।... তার উপর বাতি ঘসা হয়েছিল—যাহাতে টের না পাই। এই পাঁচটা প্রমাণ পেয়েছি। তুমি যখন মঙ্গলবারের চিঠি পোস্ট কর তখন খামের উপর কি এইরূপ কোন চিহ্ন ছিল? পত্রপাঠ ইহার উত্তর দিবে। যেন ভুল না হয়।

এ ডাক্তারের advice গ্রাহ্য করি না—কিন্তু ও ডাক্তারের advice সর্বদা শিরোধার্য। তোমার দয়া—সব ভাবেই তোমার দয়া—ইহা যেন চিরকাল বুঝিতে পারি। দাদার সঙ্গে কি বচসা হইল তা প্রায় মনে নাই—তিনি বুঝিলেন he has caught a tartar in me. বলিলাম, "যতদিন তোমাদের কাছে আছি ততদিন তোমরা এ ক্ষমতাটা ব্যবহার করবে, কিন্তু চিরকাল তোমাদের কাছে থাকছি না।" আমার শরীরের কথা বলিলেন, বলিলাম, "তার জন্য আর কেহ দায়ী নহে, আমি দায়ী এবং আমি ভুগিব—আর কেহ ভুগিবে না। তোমার কিছু বলিবার নাই"—আমি ত ভয়ানক চটে গিছলাম—রাগে কাঁপিতেছিলাম—প্রায় ঘন্টা খানিক পরে মনটাকে ঠান্ডা করলাম।...আমার এ হেন শক্তি নাই যে তোমাকে ইচ্ছা হইলেও আর কিছুক্ষণ কাছে রাখি। এ পরাধীন অবস্থায় কি থাকা যায়?

প্রত্যেক পত্রে যেন তোমার শুভ সংবাদ পাই। আমি আগেকার চেয়ে ঢের ভাল feel করছি।

আসিতে কোন বাধা নাই—অবশ্য আসিবে এবং যতক্ষণ ইচ্ছা থাকিবে।

১৯ ২১/৮/১৪

শুক্রবার বেলা ১-৩০

তোমার চিঠি আজ পেয়েছি। কাল কোন চিঠি পাই নাই, সেইজন্য কোন পত্র দিই নাই।

একটা বড় interesting ব্যাপার হয়ে গেল। কাল সন্ধ্যার পর আমি ইচ্ছাপূর্বক ঐ চিঠিখানা টেবিলের উপর রেখে আসি—যাহাতে ওরা পড়ে। কাল রাত্রে সকলে যখন খাবার পর ঐ ঘরে একত্র হয়—তখন যেন চিঠিটা সকলের সম্মুখে খোলা এবং পড়া হয়। আমি উপরে ছিলাম, গোলমাল শুনিয়া কান পাতিলাম; শুনিলাম ঐ বিষয় discussion হচ্ছে। Discussion বড়ই Violent. সকলেই একেবারে ক্রোধান্বিত—আমার কাছে এসে কিন্তু কেউ একটি কথাও বলে নাই। দাদা বুঝি চিঠিটা রেখেছেন। তাহারা যখন Violence-এর highest Pitch- এ তখন শুনিলাম দাদা বলছেন "হেমন্ত রবিবার আসুক। হেমন্তকে দেখিব।" তাহার পর দাদা তাহাদিগকে আরও sober হইতে বলিলেন। তাহারা চুপচাপ করিয়া উপরে আসিল।

যাহা হউক ব্যাপারটা বেশ interesting। প্রথমে মনে করিলাম তোমাকে এখানে আসিতে বারণ করিব, পাছে তোমাকে কেহ কিছু বলে। তারপর ভাবিয়া দেখিলাম যে তুমি যদি রবিবারে এখানে না আস, তাহা হইলে সকলেই আমাদিগকে কাপুরুষ ঠাওরাইবে এবং তাহাদিগকে যে গাল দেওয়া হয়েছিল, সে গালটা উল্টে আমাদের উপর চাপাবে। এ অবস্থায় তোমার এখানে না আসাটা অন্যায় হ'তে পারে। কারণ ভবিষ্যতেও তাহারা আমাদের উপর কাপুরুষ আখ্যা প্রদান করিবে। তাহারা মনে করিবে এবং বলিবে যে এতদিন আসিতেছিল, এবার আর ভয়ে আসিতে সাহস পাইল না—সামনাসামনি বলতে পারে না, কাগজে কাপুরুষের মত লেখা হয়।

আমি জানি যদি কেহ তোমার সঙ্গে কোন বিষয় তর্ক করিতে আসে তাহা হইলে কথায় তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে না; আর এ দেহে যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত আছে কেহ কোন অন্যায় করিয়া পার পাবে না, তাহার জন্য গৃহত্যাগ করিতে হ'লে সে ত কত আনন্দের কথা—। আমি কাল প্রতিজ্ঞা করিলাম— I shall see how I can defend my— যদি দরকার হয়। আমি অনুমান করিতে পারি সেদিন একটু বচসা হতে পারে—দাদা ভদ্রতা করে বলবে। আমার নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং হৃদয়ে অনন্ত শক্তি—দরকার হয় আমি একা বাড়িতে সকলের সঙ্গে লড়িতে পারি। আর আমার শক্তি বেশী এই জন্য যে কাহাকেও তিলমাত্র care করি না- so long I was a sanyasi in disguise—now I am going to be a full-fledged sanyasi. এই বলিয়া গৃহত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিব আনন্দের সহিত।

তুমি রবিবারে এখানে এগারটার থেকে বারোটার মধ্যে আসিও। আমি নীচে তার পূর্ব থেকেই অপেক্ষা করিতে থাকিব। ভাবিবার কিছু দরকার নাই। যাহা করিবার বা

বলিবার আমি করিব। I would have settled up the matter myself— কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ বিষয় আমাকে একটি কথাও কেহ বলিতে আসে নাই। সেদিন আসিলে আমি দেখিব। কিছুক্ষণ পরে আমি তোমার সঙ্গে মেসে যাইব—কারণ অনেকদিন যাওয়া হয় নাই—যাইতে বড় ইচ্ছা করে।

এ ঘটনার বিষয় কাহাকেও বলিও না—চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলো। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই, কারণ—দাদা বলিতেছিলেন যাহারা এত ক্রোধের বশীভূত তাহাদের spiritual culture কি হয় বুঝি না—আমার সম্মুখে বলিলে বুঝিয়ে দিতাম anger এবং resentmentএর ভিতর তফাৎ আছে।

বেশ ভাল আছি—খুব energy. আশা করি তুমি ভালই আছ।

২০

কলিকাতা
শুক্রবার রাত্রি
৩/১০/১৪

সবচেয়ে বড় দান হৃদয় দান। এটি দিলে দেবার আর কিছু বাকি থাকে না। যাকে এই দান করা হয় তার কি কম সৌভাগ্য। তার মত সৌভাগ্যবান বা সুখী আর কে আছে? কিন্তু যে ঐ দান ফিরিয়ে দিতে না পারে তার মত—আর কে আছে? ফল কি? ফল—উভয়ের শান্তি।

* * *

মনে পড়ে একটি চিত্র। কালীমন্দির দক্ষিণেশ্বরে। সম্মুখে খড়্গহস্তা মা কালী, আনন্দময়ী—শিবের আসনের উপর অধিষ্ঠিতা—শতদলবাসিনী—তার সম্মুখে একটি বালক—বালক হইতেও বালপ্রকৃতি—আধ আধ স্বরে কাঁদিতেছে এবং কাকে যেন ডেকে ডেকে বলিতেছে—"মা এই নাও—তোমার ভাল, এই নাও মন্দ। এই তোমার পাপ, এই তোমার পুণ্য।" করালমুখী ভীষণদংষ্ট্রা মা অল্পেতে সন্তুষ্ট নয়—সব গ্রাস করিতে চায়—তাই ভালও চাই মন্দও চাই—পুণ্যও চাই—পাপও চাই। বালককে সবই দিতে হইবে—না দিলে শান্তি নাই—মা-ও ছাড়িবে না।

* * *

বড় কষ্ট—মাকে সবই দিতে হইবে। মা কিছুতেই সন্তুষ্ট না—তাই কাঁদিতেছে এবং বলিতেছে—"এই নাও—এই নাও।" দেখিতে দেখিতে অশ্রুধারা বন্ধ হইল—গণ্ডস্থল ও বক্ষ শুকাইল—হৃদয় জুড়াইল—হৃদয়ে আর কিছু নাই—যেখানে ভীষণ কণ্টক যন্ত্রণা দিতেছিল—তার চিহ্নও নাই—সবই শান্তিময়। হৃদয় মধুতে ভরিয়া গেল—বালক উঠিল—আপনার বলিয়া তার আর কিছু নাই—সব দিয়ে ফেলেছে। বালকটি রামকৃষ্ণ।

২১

কটক
২৭/৩/১৫

তোমার চিঠি এই পেলাম। কি লিখিব? তবে এইটুকু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, যাহা ঘটিয়াছে ভালই হইয়াছে—। তবে এর জন্যই যা দুঃখ হয়—আর কিছু নয়। দেখা যাক কি হয়।

প্রথমতঃ আর ভালবাসা পেতে ইচ্ছা হয় না—জগতের কাছ থেকে তার opposite-টি পেতে ইচ্ছা করি অর্থাৎ নিন্দা, অপবাদ, অপমান, লাঞ্ছনা ইত্যাদি—দ্বিতীয়ত যাহারা কেবল গুণানুসন্ধি তাহাদের ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা না পাওয়াই শ্রেয়স্কর, কারণ পেলে হয়ত কোন না কোনদিন ভাবের পরিবর্তনের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে। তৃতীয়তঃ ভাইদের সম্প্রতি ব্যবহার দেখিয়া জগতের ভালবাসার প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছে—।

আমার অসুখের সময় বাড়িতে যে একটু বচসা হয়েছিল সেই occasion বা connection-এ একজনের কাছে তোমার কিছু নিন্দা শুনিতে হইয়াছিল। তার মুলে আমার কত সাধ ছিল যে এ কর্ণদ্বয় যেন কখনও তোমার নিন্দা অপবাদ না শুনে। কিন্তু যেদিন থেকে বুঝলাম, এ সংসারে থাকিতে গেলে সে আশা দুরাশা মাত্র। কোন লোক তাহা পারে নাই। জগৎ জানে কেবল নিন্দা করিতে; ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্যের জীবনে ইহাই কেবল দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এ বুকটাকে আমার পাষাণ করিতে হইবে।

নিজের নিন্দা—প্রভৃতিতে আনন্দ বই আর কিছু হয় না—অন্ততঃ পূর্বে না হ'লেও এখন সেইরূপ বোধ হচ্ছে—কিন্তু আর একজনের নিন্দা ত সহ্য হয় না, এবং সে যে কষ্ট পাইতেছে, ইহাই একমাত্র দুঃখের বিষয়।

বাস্তবিক একটা ভীষণ সমস্যা। After all, is a breach inevitable? কিন্তু এটা যেন না হয়—তার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মহানের জন্য, বন্ধুর জন্য নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলিতে হইবে—অন্ততঃ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। এমন সুন্দর একটা গঠনের ভিতরে যেন একটা breach না হয়। ভগবান সেইরূপ করুন, সর্বোপরি সুরেশদার পরিশ্রম ও চেষ্টা কৃতকার্য হউক। ব্যাপারটা আমার হাতে নয়। আমাদের হাতে যতটা ততটা আমরা exert করিতে পারি এই পর্যন্ত। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা থাকিলে আমাদের influence তাহাদের উপর কিরূপ হইবে, একবার দাগ পড়িলে সে দাগ কখনও মুছে যায় না। এর পরে একটা সুন্দর reconciliation কি possible? প্রথমতঃ তাহাদের মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছে তাহা অপনোদিত হওয়া দুষ্কর—আর হইলেও সে দাগ আর যাবে না। ভবিষ্যতে আমাদের influence অন্যান্য ভাইদের উপর insalutary হইবার আশঙ্কা থাকিলে বোধ হয় বাধ্য হয়ে অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আর একটা কথা, যেখানে বিশ্বাস একবার টলেছে, ভীষণ ভাবে টলেছে—সেখানে ভবিষ্যতে কি অন্য গাঁথুনী টিকিতে পারিবে?

এখন কথা হচ্ছে এর সম্বন্ধে একটা যা হয় শীঘ্র হয়ে যাক। হয় একূল না হয় ওকূল। মোট কথা আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, যাহাতে মনোমালিন্যটা ঘুচে যায়, কিন্তু এ ব্যাপারটা যতই দিন যাচ্ছে ততই শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ বোধ হয় এ বিষয়ে অনেককে জানান হয়েছে। তাহাতে breach-টা এত widened হয়ে গেছে যে বলবার নয়।

মীমাংসাটা শীঘ্র হয়ে যাওয়া ভাল। কিন্তু সুরেশদা ত' পশ্চিমে যাচ্ছেন, শীঘ্র এখন কি করে হয়? যদি বাধ্য হই, তাহা হইলে আমাদের পৃথক করিতে হইবে। But our best and sincerest wishes will ever be with those whom we love and we shall ever pray. আর আমাদের ideal -টা একই কি না—কেবল একটা personal affair নিয়ে যা মনোমালিন্য—। আমি এত শীঘ্র হঠাৎ যে separation -এর কথা বলিলাম তাহাতে আশ্চর্য হইতে পার—এবং separation-এর কথা কি করে তুলতে পারছি তাহাতে আশ্চর্য হইতে পার। কিন্তু আমার এইরূপ বলিবার বা প্রস্তাব করিবার কারণ (১) অবিশ্বাসের পাত্র হ'য়ে থাকার চেয়ে মরাই ভাল (২) অন্যান্য ভায়েদের উপর যদি আমাদের influence তাহারা insalutary মনে করে তাহা হইলে তাহাদের ক্ষতি না করিয়াই—আমাদের সরে যাওয়া ভাল।

তারপর আমাদের কথা বলিবার কি কিছু প্রয়োজন আছে? Come what may আমি আমার খুঁটি ছাড়িতেছি না। আমি life -এর failure বা success অন্যের চোখ দিয়া measure করি না—নিজের চোখ দিয়ে করি—এবং আরও আমি failure বা success -এর জন্য care করি না—provided I am true to my ideal.

এখন কার কি রকম হৃদয়ের ভাব তাহা ত বলিতে পারি না। It is not impossible that at least some of them may like to eliminate us. তাহারা মনে করিতে পারে যে eliminate করলে হয়তো integrity বজায় থাকিতে পারে। অবশ্য আমি তাহাদের বর্তমান মনের অবস্থার বিষয়ে hypothesis করিতেছি মাত্র। সুরেশদা এখন between the horns of a dilemma— তাঁহার ভিতরের ভাব কি বলা শক্ত—তবে আমার মত এই যে—যদি এটুকু জানিতে পারি যে elimination-ই তাহাদের ইচ্ছা, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পৃথক হওয়া ভাল।

তারপর নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমাকে যতদিন অনুসরণ করিতে পারিব ততদিন 'কা চিন্তা'। আর এখন নিজের উপর বিশ্বাস খুব বেড়েছে। সংসারের স্রোতে ফেলে দিলে ডুবিব না—বা স্রোতে ভেসে যাব না; এতটা বিশ্বাস আছে। I have faith in my intellectual power and I believe I am not narrow-hearted. এখন একটা কিছু করে যেতে পারিব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর তোমায় বলিব কি? আর কিছু নেহাৎ না হয়—I want this consolation only that I have not shrunk from my ideal. আমি তোমাকে কি চক্ষে দেখি এবং একদিকে নিজের supreme self consciousness থাকিলেও তোমার তুলনায় নিজেকে কি চক্ষেই বা দেখি সে বিষয় কিছু বলা বাহুল্য।

দেখ, আমি আবার কি বলিব—'আমার লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা বহিতে তোমার

সুখ'। তোমার ত্যাগের কথা বলিবার চেষ্টা করা কেবল তোমাকে ছোট করা—। নিজের যা কিছু দেবার সব দিয়েছ—তাহাতেও তৃপ্তি হইল না—এখন তার উপর কলঙ্কের ভার আমার জন্য লইলে। জগৎ ভালর দিকটা মোটেই দেখিতে চাহে না—আমার যা কিছু অপরাধ তাহাতে তোমায় দোষী করেছি। তোমার উপর কত নিন্দা আরোপ করেছে। জগৎ যাহার জন্য তোমার নামের উপর কলঙ্ক লেপনের জন্য উদ্যত হইয়াছে—, তাহার সহস্রাংশের একটি দোষে যদি তুমি দোষী হইতে, তাহা হইলে এতদিন ও শরীরে প্রাণ থাকিত না। যাই হোক, আমি এইমাত্র বিশ্বাস অবলম্বন করে রয়েছি যে সত্য একদিন প্রচারিত হইবে।

এপ্রিল মাসটা এখানে থাকিব। মধ্যে পুরী ভুবনেশ্বর যাইতে পারি—এইমাত্র। মে ও June আমি কার্শিয়ং থাকিব। এখন শরীরটা একটু ভাল হয়েছে বোধ হয়। Kurseong-এ দুই মাস থাকিলে শরীরটা খুব ভাল থাকিবে—আমার চেহারায় এখন পূর্বশ্রী ফুটে উঠেছে—, এইরূপ বোধ করি।

বাবার সঙ্গে এপ্রিলের শেষে যাব। বর্ধমান মহারাজার বাড়ি ঠিক হয়েছে। বিলাসিতার মধ্যে এবং বাড়ির বন্ধনের ভিতরে থাকিতে খুব কষ্ট বোধ হইলেও থাকিব। সেখানে খুব extensive study করিব। আমার study চার ভাগে বিভক্ত করিব—

(1) Study of man and man's history.
(2) General Study of the Sciences—first principles.
(3) The Problem of truth—the Goal of human Progress অর্থাৎ Philosophy.
(4) The Greatness of the world.

এ ছাড়া মনে করিতেছি—কলেজের বইগুলি সব একবার শেষ করিব। এখন পড়াতে খুব উৎসাহ। আমি দেখছি এখন সব উল্টা—পরীক্ষা শেষ হইল অমনি পড়ায় খুব চাড় হইল। ইচ্ছা হচ্ছে সব বইগুলি গ্রাস করে ফেলি।

B. A.-তে Philosophy Honours লইব এবং first হইব। এই রকম ইচ্ছা। তারপর সংস্কৃত লইব কি Economics লইব এখন ঠিক করিতে পারিতেছি না—economics-এর একটা জ্ঞান না থাকিলে modern world -এ live করা যায় না। সংস্কৃত নিজে নিজে পড়া যায়। এখন কথা হচ্ছে economics College-এ—যাহা পড়া হয় তাহা প্রকৃত-পক্ষে কতটুকু কাজ দেয়? যাক্ শীঘ্র এ বিষয়ে ঠিক করে ফেলিব। তুমি সুস্থ থাকিলে জার্মানী যাইব। ভবিষ্যতের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিবার জন্য এবং Step by Step কিরকম ভাবে Proceed করিব—তাহা স্থির করিবার জন্য একবার আমাদের দেখা হওয়া দরকার।

শরীরের দিক দিয়ে প্রয়োজন হইলে আমি কলিকাতায় পড়িব না। কলিকাতায় পড়িবার একটা সুবিধা এই যে, ভাল Professor আছে। কটকে পড়িবার সুবিধা এই যে, Climate ভাল—কাজ করিবার সুবিধা কারণ বেশ influence আছে—Public-এর মধ্যে; অন্ততঃ যতদিন বাবা বেঁচে আছেন। দরকার হইলে কটকে বা হাজারিবাগে পড়িতে পারি। হাজারিবাগে Prospectus-এর জন্য লিখেছি, Kurseong থেকে ফিরে এসে যদি দরকার মনে করি তাহা হইলে কলিকাতায় পড়া বন্ধ করিতে পারি। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে আমার ধারগুলি তোমায় শোধ দিতে হইবে—প্রথমতঃ কিছু কিছু সাহায্য করিবে—কারণ আর tuition করিবার সুবিধা হইবে না, দত্তগুপ্তকেও কিছু দিতে হইবে।

২২

কটক
৩/৪/১৫
শনিবার

আমার পত্র দুইখানি পেয়ে থাকিবে। পরশু এবং কাল এক খুব important ঘটনা হয়ে গেছে। এখন সব কথা খুলে লেখা অসম্ভব। তাছাড়া গিরীশ ও সুরেশদা আমায় নিতান্তই অনুরোধ করেছেন কিছুদিন পরে তোমায় বলিতে। এক মাসের মধ্যে যখন কলিকাতায় যাব, তখন দেখা যখন হইবে তখন সব খুলিয়া বলিব। একটা খুব সুন্দর reconciliation হয়ে গেছে—গিরীশদা অনেকটা mediator গোছের হইলেন। সুরেশদা বলিলেন, I thought the relation to be undesirable but not unhealthy. তিনি বলিলেন Purity সম্বন্ধে একতিলও সন্দিহান কখনও আমি হই নাই। তবে তোমাদের

exclusiveness-এর জন্য এবং সকলের নিকট হইতে Complaint পাইবার জন্য আমি খুব ব্যথিত হইয়াছিলাম। তাঁর মনে মনে আমাদের ব্যবহারের জন্য কিরূপ ভাবে কষ্ট দিন দিন Grow করেছিল তাই বলিলেন—আমি যাহা কিছু বলিবার বলিলাম। গিরীশদার বিশ্বাস এবং তাঁহার চরিত্রে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বলিলেন, বাঙ্গাল যদি কিছু সন্দেহ করে থাকে, I will call him a liar to his face. যাহা হউক এখন all's well that ends well করিয়া ফেরা যাক। একটা জিনিষ আমরা ভুল করিয়াছি (এবং পরে এ বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে) আমরা realise করি নাই, আমাদের একটি কথা ও কাজের মূল্য কত বেশী। ভাইদের উপর তাহার কত effect.

সুরেশদা বলিলেন, তোদের public-এর মধ্যে সমানভাবে মিশিতে হইবে, যাহাতে কেহ টের না পায় কে কাকে কত ভালবাসে।

২৩ ১২/৪/১৫

শনিবার

আমি অন্ধ—আমার চোখ খুলে দে। আমি মূক—আমার মুখ খুলে দে—আমি বধির—আমার কান খুলে দে, যেন মর্মে মর্মে তোর ডাক নিয়ত শুনিতে পাই। আমার সংকীর্ণ হৃদয়টাকে বড় করে দে—আমার জ্ঞান প্রস্ফুটিত করে তোল। আমায় ভাল করে দে—তোমার অমৃতময় স্পর্শে আমায় সোনা করে দে। কতদিন ধরে আঁধারের মাঝে আমার জন্য আলো নিয়ে দাঁড়িয়েছ—কিন্তু অন্ধ আমি যে আলো দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। কানে কানে কতবার ডেকে যাচ্ছ, কিন্তু বধির যে সে ডাক শুনিতে পাইতেছে না। আমার এ আঁধার হৃদয় কি কোন দিন তোমার স্নিগ্ধ আলোকে আলো হবে না? Infinite patience নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অসীম তোমার দয়া কিন্তু আমার এ চিরনিদ্রা বুঝি আর ভাঙে না।

কত অপরাধ করেছি—। কত শতবার অবাধ্য হয়েছি—। কিন্তু কি করিব আমি যে অজ্ঞান অবস্থায় করেছি। কুষ্ঠরোগীর ঘার মত কত যুগসঞ্চিত মলিনতা তুমি হৃদয়ের তপ্ত শোণিত দ্বারা নিয়ত ধুইতেছ।

সুরেশদার ধারণা আমার বিষয়ে যে কি রকম তা বলিতে পারি না, কিন্তু তার সঙ্গে তোমার বিষয়ে clashing হইয়া আসিতেছে এবং এবারও হইল। আমি বলিলাম, আমি নিজের এতটা জানি যে, সে চরণের এক ধূলিকণা হইবার যোগ্য নহি, এর চেয়ে দৃঢ় সত্য আমি জানি না। গিরীশদা বলিলেন এ বিষয় মীমাংসা অসম্ভব। বাঙ্গাল বাঙ্গালের ধারণা ছাড়িবে না—তুমিও তোমার নয়। সুরেশদা তোমাকে কোন কোন বিষয়ে আমার ছোট দেখে—যে নিয়ে বহুদিন যাবৎ আমার সঙ্গে একটা মতভেদ চলে আসছে।

যাক সুরেশদার ধারণা ছিল—আমি বোধ হয় তার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়াছি—এবং সে রাগ এখনও বেশ আছে। আমি কিন্তু বলিলাম, জীবনে রাগ করা কাহারও উপর আমার পক্ষে possible নয়। আমার রাগ at least নেকড়ার আগুন। আমি বলিলাম—, ২/৩ occasion-এ একটা রাগ অভিমান দুঃখ মিশ্রিতভাবে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ত ক্ষণিক। বর্তমানের কথা বলিলাম, এখন রাগ ত নাই—কাহারও উপর আমি দোষ দিই না—দোষ দিই আমার ভাগ্যের উপর—আমার দুর্ভাগ্য না হইলে এইরূপ কখনও হইতে পারিত না।

সুরেশদা ও গিরীশদা তোমাকে কিছুদিন না বলিবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন বটে কিন্তু আমি তাহাতে প্রতিশ্রুত হই নাই। তবে পত্রে সব লেখা possible নয়—তাই লিখিতেছি না—গিরীশদা অনুরোধ করেছিলেন কারণ তিনি মনে করেছিলেন, তোমার হয়ত খুব কষ্ট হবে and the shock may be too much for you. তিনি তখন জানিতেন না যে তুমি সব কথাই জান এবং তোমার হৃদয়ের বর্তমান অবস্থার কথা জানিতেন না, আমি সব বলিলাম।

যাক্ একটা ভয়ানক interesting ঘটনা হয়ে গেছে। আমার মুখ দিয়ে শুনিলে full of details পাইবে না, ২/৩ জায়গায় আমার নিজের ভাব এবং attitude বর্ণনা করা আমার পক্ষে possible হইবে না।

আশুদার মুখ দিয়ে অনেক শুনিতে পাইবে আশা করি। আমি মে মাসের গোড়ায় কার্সিয়াং যাব। বিধুর পত্র পেয়েছি। ওরা বোধ হয় Almora যাবে। বেলুড়ের কথা লিখেছে। সেখানে নাকি একটা জীবনের স্রোত এসেছে।

১৮/৭/১৫

আচ্ছা মানুষের পক্ষে কি কোন absolute সত্য লাভ করা সম্ভব? প্রত্যেকে একটা relative সত্যকে নিয়ে তাহার নিজের জীবনে absolute সত্যকে পরিণত করে এবং তাহার মাপকাঠিতে জীবনের সুখ দুঃখ ভালমন্দ বিচার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক life- এর individual philosophy তে হস্তক্ষেপ করিতে বা তাহার বিরুদ্ধে বলিতে কাহারও কোন অধিকার নাই—তবে কথা হচ্ছে—এই philosophyর basis যেন sincere and true হয়—এবং Spencer-এর যা Theory—"he is free to think and act so long as he does not infringe the equal freedom of any other individual".

* * *

আগে intellectual preparation-টা দরকার। তারপর কাজ ও চিন্তা একভাবে চলিবে—শেষে কর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া। প্রথমাবস্থায় ২/১টি make-shift activities চাই—না হইলে কর্মের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

দেখ জীবনের দুইটি দিক আছে—intellect and character, দেশকে শুধু নিজের উদার চরিত্র দিলে হইবে না—একটা intellectual ideal দেওয়া চাই।

* * *

It will not do to know something of everything but to organise them into a systematic whole—and to know everything of something. Simple assimilation will not do—but creative genius is necessary.

আমার intellectual career-এর একটা আভাস তোমায় দিব। আভাস মাত্র এখন মনে ভাসে। Idea টা বড় grand— আমার জীবনে কার্যে পরিণত হইবে কি না বলিতে পারি না—তবে না হইলেও যদি বাস্তবিক ideaটা ভাল হয় তাহা হইলে আর কেহ কার্যে পরিণত করিতে পারে।

২৫

২৭/৭/১৫

আমার এখন কোন বিশেষ কাজ নাই—কেবল Famine Relief fund- এর। আপাততঃ আর সব বন্ধ।

২৬

২৯/৭/১৫

এখন কাজ বিশেষ কিছু করি না। Poor-fund—debating—magazine এখন আরম্ভ হয় নাই। Coaching এক সপ্তাহ হইল—আর করি না। পড়াশুনার ক্ষতি হয়। তবে auxiliary থাকিব—অভাব বা দরকার হইলে পড়াব। College famine fund- এর Secretary করেছে। তার জন্য একটু খাটিতে হইবে। উপস্থিত আর কেহ নাই।

ইচ্ছা, আমি relief-এ যাই—তাহাতে Practical experience হইবে। আর famine-এর experience সব সময় হয় না। Emotions-এর দিক দিয়ে দেখলে আমার যাবার ইচ্ছা—বেশ ইচ্ছা আছে—তবে reasoning-এর দিক দিয়া ইচ্ছা নাই—

(১) শরীর খারাপ হইতে পারে, কারণ না খাটিয়া থাকিতে পারিব না।

(২) College- এর Relief Committee-র কাজ বাদ পড়ে যায়।

(৩) গেলে আমার বোধ হয় College organisation থেকে যাওয়া ভাল—কারণ তাহাতে লিপ্ত হয়েছি।

ভাবিয়া উত্তর দিব বলেছি। খুব সম্ভব না-ই করিব। তোমার মত জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

তবে জগৎটাকে আসলভাবে দেখিবার খুব ইচ্ছা। ইচ্ছাটাকে কিন্তু দমন করিতে হইবে।

২৭

৩৮/২, এলগিন রোড, কলিকাতা
৩১/৮/১৫

আমি যে প্রবন্ধ দিয়েছি তাহাতে আমার attitude indirect ভাবে প্রকাশ করেছি

—I have described it as supreme and sublime indifference, আমি এটা বেশ বুঝিতেছি দিন দিন যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে তারই জন্য আমার শরীর ধারণ and I am not to drift in the current of popular opinion. লোকে ভালমন্দ বলিবে জগতের এটা রীতি but my sublime self-consciousness consists in this that I am not influenced by them. যদি জগতের ব্যবহারে আমার attitude পরিবর্তন অর্থাৎ দুঃখ নৈরাশ্য প্রভৃতি আনে, তাহা হইলে বুঝিব যে আমার দুর্বলতা; কিন্তু যে রকম আকাশের দিকে যার লক্ষ্য, সম্মুখে পর্বত আসছে কি কূপ আসছে তার যেমন জ্ঞান থাকে না—সেই রকম যার একমাত্র লক্ষ্য mission-এর দিকে, আদর্শের দিকে—তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। I must move about with the proud self-consciousness of one imbued with an idea.

যাক আমি এখন বুঝিতেছি যে মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিষ চাই—

(1) Embodiment of the past

(2) Product of the present

(3) Prophet of the future.

(1) I must assimilate the past history in fact all the past civilisation of the world.

(2) I must study myself—study the world around me—both India and abroad and for this foreign travels are necessary.

(3) I must be the prophet of the future. I must discover the laws of progress—the tendency of both the civilisations and therefrom to settle the future goal and progress of mankind. The Philosophy of life will alone help me in this.

(4) This ideal must be realised through a nation—begin with India.

Is not this a grand idea?

* * *

The more we lift our eyes heavenwards the more we shall forget all that was bitter in the Past. The future will dawn upon us in all its glory.

কেমন আছিস সে সম্বন্ধে লিখিসনি কেন? শীঘ্র পত্রের উত্তরে জানাবি কেমন আছিস?

তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে—কবে দেখা হইবে?

২৮ ১৬/৯/১৫

তোমার পত্র পেলাম।

অনেকে জিজ্ঞাসা করে, যখন Philosophy কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না—যখন দর্শন ক্রমবর্ধমান—একজন আসে এক কথা বলে যায়—আর একজন আসে তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তার চেয়ে বড় কথা বলে যায়—এই রকম ভাবে দর্শনের গতি; তখন দর্শনে এবং দার্শনিক চিন্তায় কাজ কি? যখন হিগেলের দর্শন জগতে প্রচারিত হইল, তখন সকলে ভাবিল বুঝি এর উপরে আর কোন কথা কেহ বলিবে না—এটা বুঝি শেষ সিদ্ধান্ত। কিন্তু জগৎ হতভাগা। দর্শনের গতি হিগেলকে ছাড়িয়া চলিয়াছে। তথাপি বাঁচিতে গেলে ও সব প্রশ্ন আসিবেই আসিবে। ফুল ফুটিলে যেমন গন্ধ আপনি আপনি আসে (তার আর প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই) সেই রকম জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ব্যাকুল জিজ্ঞাসা আসে।

দর্শন পড়ে লাভ কি? লাভ এই—নিজের প্রশ্ন—নিজের সন্দেহ ফিরে পাও।...দশটা লোকে কি ভাবে ভেবে গেছে—তা পাও। তার থেকে নিজের চিন্তাপ্রণালী সংযত ও চালিত করিতে পার।

পাগল না হইলে কেহ বড় হইতে পারে না। কিন্তু সকল পাগল বড় হয় না। All mad men do not become great men of genius. কেন? শুধু পাগল হইলে চলে না। আরও কিছু চাই। পাগলামির ভিতর আত্মসংযম হারাইলে কোন প্রশ্নের

মীমাংসা হইতে পারে না। আবেগের ভিতর আত্মস্থ হওয়া চাই। তাহা হইলে (then and only then) জীবনটাকে একটা Constructive basis-এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। Emotion বা আবেগ সংযম করে—দীর্ঘ চিন্তা চাই। আবেগ না থাকিলে চিন্তা অসম্ভব। কিন্তু শুধু আবেগ থাকিলে চিন্তার ফল ফলে না। অনেকে আবেগবান কিন্তু ভাবিতে চায় না—অনেকে ভাবিতে জানে না।—

* * *

...চিন্তার প্রণালী একবার জানিতে পারিলে কোন ভয় নাই—একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুব শক্ত হইলেও অসম্ভব নয়। আমি সেই জন্য বিশ্বাস করি—আমার ব্যাকুলতা—জিজ্ঞাসা—সন্দেহ—এসব will not end in nothing but will bring me something positive.—এবার তোমারও সেই আশা আছে।

If there is an ideal—it can be realised— ইহা আমার বিশ্বাস —for example, if perfection be the ideal; man can become perfect, otherwise, there is no such ideal as perfection.

যাক্ আদর্শ যাহাই হউক না—it can be realised—এই ভিত্তির উপর আমার life-philosophy প্রতিষ্ঠিত।

ব্যস্ত হইলে চলিবে না—। যে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কত লোকে প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছে—সে প্রশ্ন কি একদিনে মীমাংসা হইবে!...

* * *

তবে জীবনের একটি fundamental principle ঠিক না করিলে কাহার উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করিব—বা কি লইয়া চলিব?

Kant-এর Philosophy কি রকম জান? একটা কথা মেনে নেয়—সেটাকে analyse করে—তন্ন তন্ন করে criticise করে তার পরে সেটাকে ত্যাগ করে মহত্তর সত্যে উপস্থিত হয়। তারপর সেটাও analyse করে তন্ন তন্ন করে criticise করে—এবং মহত্তম সত্যে উপনীত হয়।

জীবন সেই রকম। নিজের বর্তমান জীবনকর্ম—সমস্ত harmonise করিবার জন্য একটা philosophy যে রকম করে হউক গঠন কর। তার পরে ঐ অনুসারে জীবন চালাও—এদিকে মনের ভিতরে সেটাকে প্রত্যেক মুহূর্তে ভাঙো এবং গড় —destroy and construct. Life progresses through continual construction and destruction. একটা গড় সেটা ভাঙো—আর একটা গড়—সেটা ভাঙো—গড় and so on... Something cannot come out of nothing. Man proceeds from Truth to higher Truth. We must pass through inconsistencies. They fulfil life.

বেশী আবেগ আসিলে —reason—critical power, analytic and synthetic power কমিয়া যায়। কারণ শুধু cool moments-এ এসব ঠিক ঠিক চালান যায়।......

২০/৯/১৫

শরীরের যে রকম অবস্থা—তাহাতে জীবনে বিশেষ কিছু করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। বিবেকানন্দের ঐ কথাগুলি বড় ঠিক "Iron nerves and a well intelligent brain and the whole world is at your feet."

Change-এ গিয়ে যদি শরীর একেবারে ভাল হয় তাহা হইলে বুঝিবে—জীবন ধারণে লাভ আছে।

২৯ ২৬/৯/১৫

Lodge-টা পড়িলাম। Jesuit movement-এর সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিবার কারণ ঠিক বুঝিলাম না।......

উক্ত সম্প্রদায়ের ভালমন্দ দুই পক্ষই আছে। ভালটা এখনকার কালেও বেশ ভাল চলিবে। কিন্তু মন্দটা বাস্তবিক মন্দ ছিল না—সে যুগের পক্ষে ভালই ছিল—তবে এ যুগের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না।

কারণ কি? মানুষের "স্বাধীনতার" ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা মানে লোকে বুঝিত—আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা—সন্ন্যাস—কাম, লোভ

ইত্যাদির হস্ত হইতে মুক্তি। কিন্তু এই স্বাধীনতার ভিতরে—রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্তি—এ স্বাধীনতাও ছিল। সন্ন্যাসী ইচ্ছা করিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারিত—শাসনপ্রণালী পর্যন্ত পরিবর্তন করিতে পারিত। পাশ্চাত্ত্য জগৎ কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা (problem) সমাধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাহাদের ভিতরে individualism-এর বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সমাজ ও শাসকমণ্ডলীর সহিত ব্যক্তির কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত—সে বিষয়ে তাহারা মাথা ঘামাইতেছে।

এই সংঘর্ষের ফলে adjustment of mutual rights-এর প্রয়োজন হইয়াছে। এখন আমরা দেখিতেছি, সমাজের ভিতরে বা State-এর ভিতরে প্রত্যেকের কিছু কিছু right আছে—তাহার অপব্যবহার না করা বা অতিক্রম না করা পর্যন্ত সে স্বাধীন। সকলে বুঝিতেছে—তাহার মনুষ্যত্ব আছে—দাবী আছে, voice আছে।

আমরা এই democratic যুগে democratic প্রভাবের মধ্যে জন্মিয়াছি। সুতরাং ঐ স্থানে আঘাত করিলে এই যুগে কিছু করা সম্ভবপর নহে।

কিন্তু individualism যে organisation- এর পক্ষে ক্ষতিকর? এর উপায় কি? আবার সামঞ্জস্য। উপায় আছে—ভয় নাই। জার্মানি অনেকটা তাহার মীমাংসা করিতেছে। শান্তির সময়ে সকলে নিজ নিজ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে—(সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে State-এর কোনও হাত নাই)—যেই ডাক আসিল—অমনি সকলে নিজ নিজ স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া সশস্ত্রে নতশিরে উপস্থিত। সব সমবায়ের পক্ষে এই নিয়ম: সাধারণতঃ কার্য নির্বাহের জন্য—সকলের একটা voice আছে।......

Autocracy [র] ফলে, উপযুক্ত লোকের অভাবে কাজের বড় ক্ষতি হয়। Council-এ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে যাহার জ্ঞান, বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অধিক—তাহার কথার মূল্য বেশী হইবে—এবং তাহার কথা লোকে বেশী শুনিবে। তবে তাহার কথা বা উপদেশ সকলে গ্রহণ করিবে—for their intrinsic worth and not because they are coming from him.

Organisation- এর এইরূপ মাপকাঠি হইলে Jesuit সম্প্রদায়কে criticise করা শক্ত নহে। এখন সৌসাদৃশ্য দেখা যাক।

(1) Protestantism—Western civilisation and western influence.
(2) Counter reformation—Indian renaissance in national and spiritual life.
(3) Loyola—began as a man of action ended life as a religious man.
(4) Paris—!
(5) Church—religions and Country.
(6) Chastity—poverty and obedience (absolute)
(7) General—the absolute Commander.
(8) Relief from ordinary duties of life.

প্রত্যেক সম্প্রদায় ও সমবায়ের ইতিহাস একই রকম।

* * *

এদের motto মোটামুটি মন্দ নয়। Chastity and poverty এটা অবশ্য চাই। তার পর obedience- এর কথা পূর্বে বলেছি। এযুগে যে রকম চায়—সে রকমটি হওয়া চাই এবং করা চাই। এইটুকু বাদ দিলে বর্তমানের সঙ্গে সেই অতীতের বেশ একটা মিল আছে। এর প্রতি তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

মঙ্গলবার

তোমার চিঠি কাল পেলাম। শরীর এক রকম ভাল আছে। কোথায় যাব ঠিক নাই—বোধ হয় কার্শিয়াং-এ। কারণ বাবারও সেখানে যাইবার কথা। বাবার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল তবে সারিতে বিলম্ব লাগিবে। কাজ ছেড়ে দিলে ভাল হয় কিন্তু সংসার চলে না—এই মুস্কিল।...

অধিক কি।

৩০ ২৬/৯/১৫

নৈরাশ্যের ছায়া মধ্যে মধ্যে আসিলেও বিদ্যুৎ আলোকের প্রকাশ আপনা আপনি জেগে উঠে। কাহার সাধ্য তাহাকে নিবারণ করে? সেই আলোকই আবার জীবনকে মধুময় করিয়া তুলে—আবার দেখি —Life is worth living.

৩১ ৩/১০/১৫
শনিবার

একদিকে......ব্রহ্মানন্দের কথা মনে পড়ে, অপর দিকে পাশ্চাত্য আদর্শ—Life is activity। একদিকে Silent and peaceful life of an introspective...... **Yogi who has realised the futility of the world.** অপর দিকে পাশ্চাত্যদের প্রকাণ্ড laboratory, তাহাদের বিজ্ঞান দর্শন তাহাদের আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত অদ্ভুত জ্ঞানরাশি। তখন ইচ্ছা করে তাহাদের দেশে গিয়ে ১০/১২ বৎসর ধরে জ্ঞানার্জনে মজে যাই, যে কিছু লাভ করিয়াছে—সেই ত দান করিতে পারে। তখন মনে হয় একবার—তাদের কর্মের স্রোতে ঝাঁপ দিই—তারপর দেখি—সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে সেই স্রোতকে চালিত করিতে পারি কি না।......

৩২ ১৯/১০/১৫

Mr. Sentimentalist,

তোমার পত্র কাল পেয়েছি। আমার ওজন ১ মণ ২১ই সের—আমি ইহাতে আশ্চর্য হইয়াছি—কারণ কটকে আমি ছিলাম ১ মণ ১৬ই সের, যাহা হউক, এখানে একমাস থাকিলে আরও ৫ সের বাড়িতে পারিব আশা করি।

এখানে আসা অবধি সব রকমে ভাল আছি। আমার তাই পাহাড় বড় ভাল লাগে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির দরুন একটু রসভঙ্গ হয়—তা ছাড়া আর অসুবিধা কিছু নাই। খটখটে রৌদ্র আর কুয়াশা (dry fog) এটা এখানকার ideal weather, এ পর্যন্ত পড়াশুনা কিছু করিতে পারি নাই—দেখি অতঃপর ভাল পড়া হয় কি না।

* * *

দেখ পাহাড়গুলি বড় অদ্ভুত জিনিষ, আমার মনে হয় বীর্যবান আর্যদের উপযুক্ত বাসস্থান—এই পর্বত গাত্র। Degenerating plains-এ বাস করা উচিত নয়, অবশ্য একথা বলে কোন লাভ নাই and it cannot be helped—তবে কলিকাতায় দুই কাঠা জমির উপর ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া বাড়ি করা অপেক্ষা পাহাড়ে একটা করা ঢের ভাল। মাংস খেয়ে পাহাড় ডিঙ্গলে আর্যরক্ত যে ভাবে ধমনীতে প্রবাহিত হয় এইরূপ আর কিছুতেই হয় না।

আমাদের এখন সে পবিত্র আর্যরক্ত নাই। কতযুগের পরাধীনতা—কত adulteration...

* * *

পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে এই কথা খুব মনে হয়। চাই শিরায় শিরায় রজোগুণ। চাই লম্ফের দ্বারা পর্বত উল্লঙ্ঘন—যখন আর্যগণ এইরূপ করিত তখনই তাহাদের কণ্ঠ হইতে বেদগান ধ্বনিত হইয়াছিল।

এখন হিন্দুজাতির সেই pristine freshness নাই—সেই youthful vigour নাই—সেই অপূর্ব মনুষ্যত্ব নাই। এসব ফিরিয়া পাইতে গেলে **we must begin from the land of our birth—the sacred Himalayas.** ভারতে যদি কিছু অমূল্য—যদি কিছু ভাল থাকে—যদি কিছু গৌরব করিবার থাকে—সে সবের স্মৃতি হিমাচলের সহিত জড়িত। তাই হিমালয়কে দেখিলে সে সব স্মৃতি ফিরিয়া আসে।......ইতি—

Yours
Rationalist

৩৩ Hawk's nest, Kurseong

21-10-15

বৃহস্পতিবার

তোমার পত্র কাল পেলাম।

* * *

পাহাড়ে তুমি গিয়াছিলে অসুস্থ মনে, সুতরাং ঠিক ঠিক অনুভব করিতে পার নাই, তোমার আর একবার সুস্থ মনে যাওয়া চাই।

পাহাড়ে শারীরিক উদ্যমটা খুব বাড়ে—হৃদয়ে একটা বিমল শান্তি পাওয়া যায় —In the peaceful solitude of the hills, life can be dreamt away—the misty veil hanging about the hills is but the dreamy veil of fair poetry. Pope না কে বলেছিল—

"Thus let me live unseen unknown etc. etc. Thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie."

কথাগুলির Spirit পাহাড়ে এলে বেশ বোঝা যায়, তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে জীবনের একটা দিক কেবল বেশ ফুটে উঠে—আর একটা দিক—অর্থাৎ উন্মত্ত, অবিরাম উদ্যম ও চেষ্টা—যেটা কলিকাতায় দেখিতে পাওয়া যায়—যেটা প্রসুপ্ত থাকে। কলিকাতায় আমার মনটা ক্রমাগত ব্যাপৃত থাকে—কোন না কোন কর্মে। The mind is as it were forced to work—seriousness of life—complexity and variety of life, বেশ অনুভব করা যায়—life problems গুলি যেন মনকে চেপে ধরে। কিন্তু এখানে এসে একটু Lotus-Eater হওয়া যায়—Why should life all labour be?

* * *

Yours

Rationalist

৩৪ 26-10-15

* * *

আমার চিন্তার মধ্যে বেশীর ভাগ নিজের কথা ভাবি। দেখে অবাক হই—মনুষ্য জীবনে কত প্রকার conflicting desires and motives জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। কত বাসনা কোথা হইতে আসে আবার কিছুদিন পরে কোথায় চলিয়া যায়। সে সব বাসনা কেন আসিল—কোথা হইতে আসিল—খুঁজিয়া পাই না। জীবনের প্রথম অংক—সম্পূর্ণ irrational. আমরা গর্ব করি মানুষ বড় rational—কিন্তু man is more irrational than rational. Man acts by instinct and sentiment like animals than by reason. জীবনের অনেক কাজের কোন কারণ বা অর্থ খুঁজিয়া পাই না। কি আশ্চর্য!

* * *

আজকে অনেকদিনকার একটা সন্দেহের মীমাংসা হয়ে গেল। আজকে মন্দিরে বসে ভাবিতে ভাবিতে মীমাংসা মনে উপস্থিত হইল।

* * *

তোমার

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক

৩৫

29-10-15

Jesuit দের ইতিহাস মুখে মুখে মোটামুটি এক রকম জানিয়া লইয়াছি। পত্রে সব লেখা সুবিধা হইবে না—অতএব মুখে বলিব। তাহাদের bitter complaint এই যে বর্তমান ইতিহাসে তাহাদের খুব খারাপ স্থান দেওয়া হইয়াছে—কারণ অধিকাংশ ঐতিহাসিক Protestant এবং রাজবংশও Protestant. History of Philosophy-তেও তাহাদের কোন স্থান দেওয়া হয় নাই। আমরা যে বইটা পড়ি Schwegler's History of Philosophy তাহাতে medieval Philosophy-টা এক রকম বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আমার ইচ্ছা ছিল—medieval or scholastic philosophy অর্থাৎ Theology টা কিছু শিখিয়া লই—কিন্তু যখন শুনিলাম যে তাহারা এখানে ৪ বৎসর Theology পড়িয়া তারপর D. D. title গ্রহণ করে—তখন বিরত হইলাম। তাছাড়া সময়াভাবে এখন সুবিধা হইবে না।

Jesuits-রা বলে যে middle ages-এ দর্শন যাহা ছিল তাহা কেবল Theology এবং সাহিত্য চর্চা ও শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে Jesuits অগ্রগণ্য ছিল। তাহাদের উপর সমস্ত ইয়োরোপের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল।

তাহাদের doctrine এবং forms বড় dogmatic—পরে বলিব। কিন্তু তাহাদের organisation একদিক দিয়ে বড় সুন্দর। Founder-এর পূজা করে না—এবং গোঁড়ামি ঢোকে নাই—তাহাদের গোঁড়ামির হ্রাস বৃদ্ধি নাই—সমস্ত defined. Defined Doctrines যে মানিবে না তাহার স্থান নাই।

Yours
Rationalist

৩৬

Vishram Kutir
Kurseong
৭/১১/১৫

কাববরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত হইলাম কারণ তুমি আমাকে দুষ্টু বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছ। তুমি ত জানই আমি চিরকালই সেই লক্ষ্মীছেলে—আমার দ্বারা কি কোন প্রকার দুষ্টামি সম্ভবে? অতএব তোমার এ অভিযোগের অর্থ কি? যে চিরকাল লক্ষ্মীছেলে সে কি কোন দিন কোন দুষ্টামি করতে পারে? অতএব আমি দুষ্টু হইতে পারি না—এবং আমার দুষ্টামি অসম্ভব।

আমি ভাবুকও নহি, কবিও নহি, সুতরাং কাব্যের রস বা কবিতার ভাব কি বুঝিব? তোমার চতুষ্পাদবিশিষ্ট—অনন্ত ভাবময়ী মহতী কবিতার রস গ্রহণে অসমর্থ হইয়া আমি তাহার বহিরাবরণ লইয়া টানাটানি করিয়াছি, যাহারা স্থূলদৃষ্টি ও রসবর্জিত তাহারা দেখে শুধু বাল্মীকির বল্মীক, মধুসূদনের অট্টহাস্যময়ী ভগ্নপদী কবিতা, রবীন্দ্রনাথের "কলকেত্তী" ভাষা ও অবনীন্দ্রনাথের হাড়কণ্ঠা। সুতরাং সাদৃশ পাঠক যে তোমার ভাবময়ী কবিতার ছন্দোদোষ শুধু খুঁজিয়া বেড়াইবে।...

তবে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা হইলে দায়ী আমার স্থূলবুদ্ধি বিচার-শক্তি এবং want of appreciative faculty এবং এ মানসিক দৈন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এ ধাম ত্যাগ করেছেন। তাঁহার সঙ্গে কিছু কিছু কথা হয়েছে—পরে বলিব।

প্রবন্ধ লেখা বা নিজের জীবন সম্বন্ধে কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিলে ত চলিবে না। নিজের যাহা বলার আছে—বলে যাবে—তাতে কার কি?

আমি যে প্রবন্ধ দিয়াছি—তাহা কেন দিয়াছি এবং কি spirit-এ দিয়াছি, তাহা না বুঝিতে পারিলে প্রবন্ধটি অর্থহীন এবং কেহ কেহ যে সেইরূপ মনে করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু তাহাতে কি এসে যায়?

একজন এইরূপ সমাজে বা organisation-এ হয়ত খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিবে কিন্তু অন্য প্রকার—দলে হয়ত তার স্থান সব চেয়ে নীচে—আমি একথা বেশ বুঝিতেছি। যার যে রকম idea এবং মানুষের Estimate তাহার বিচার তদ্রূপ।

* * *

সুতরাং কাহারও appreciation or non-appreciation-এ কি আসিয়া যায়—হ্যাঁ, আপনার প্রদীপ আপনি হও—ঠিক কথা বলেছ।

ইতি—
বুদ্ধিহীন দীন
পাঠক।

৩৭

Vishram Kutir
Kurseong
১৭ই নভেম্বর, (১৯১৫)

বুদ্ধদেবের উপদেশ খুব ভাল লাগিবার কথা—তবে সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেই সুখী হইব। করিবে কি?

* * *

জীবন সমস্যার মীমাংসা অনেকটা ঠিক করিয়াছি। আজ হঠাৎ বেশ একটা মীমাংসা হইয়া গেল। Intellectually solve করিয়াছি—main principles ঠিক করিয়াছি তবে কয়েকটা minor details ঠিক করি নাই। I now want the iron will to carry out the plan into systematic details. আমার ভিতরে system-এর অভাব—systematically কাজ করিতে পারি না—অভ্যাস দ্বারা এটা ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

* * *

কাল সকালে খুব সম্ভব দার্জিলিঙ যাইতেছি—তথা হইতে সিঞ্চল পাহাড় যাইবার ইচ্ছা—সিঞ্চল (Sinchal) পাহাড় থেকে পরিষ্কার আকাশে Mt. Everest দেখা যায়। ২/৩ দিনের ভিতরে এখানে ফিরিব।

৩৮

Craig Mount
Darjeeling
শনিবার
২০/১১/১৫

এখানে পরশুদিন আসিয়াছি। এক হিসাবে কার্সিয়াং-এর চেয়ে এ স্থানটি ভাল। খাবার-দাবার ভাল পাওয়া যায় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর পাওয়া যায়। তা ছাড়া দেখিবার কয়েকটি জিনিষ আছে। Observatory Hill, Botanical Gardens, Museum, Race Course, গোরাদের Barracks এবং Mount Sinchal গিয়াছিলাম। Mt. Sinchal থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ত দেখাই যায়—তা ছাড়া Everest ও দেখিলাম। সিঞ্চল প্রায় ৮৪০০ ফুট উচ্চ—সেখানে আজ সকালে গিয়াছিলাম। প্রায় ছয় মাইল Uphill. ভাগ্যচক্রে আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং Everest দেখা গেল।

তবে এ সহরটা হচ্ছে—"Calcutta transferred to the hills" এই যা দোষ। এখন নির্জন—লোকেরা নেমে গেছে—তাই বেশ লাগছে।

বারান্দা থেকে পরিষ্কার Snowview পাওয়া যায়। চারিদিকে পাহাড়, খালি পাহাড়—আর অভ্রভেদী হিমশিখর শুভ্রতুষারকিরীটী কাঞ্চনজঙ্ঘা। কত সুন্দর এ স্থান! ভাবিতে গেলে চোখে জল আসে। গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শুভ্রতুষার-ময় গিরিমালা—তরঙ্গায়িত আকাশপৃষ্ঠে। বহুদূরে পর্বতগাত্রে লামাদের বৌদ্ধ মঠ আছে, Extreme individualistic life যাপন করিতে গেলে পরিব্রাজকের জীবনের মত এত আনন্দময় জীবন নাই। ইচ্ছা করে পাহাড় দিয়ে সিকিম নেপাল চলিয়া যাইতে। তিব্বত যাইবার পথ আছে। সেখান দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যও চলে।

কিন্তু পরিব্রাজকের জীবন যাপন বর্তমান যুগে বঙ্গীয় যুবকের সাজে না। তার স্কন্ধে গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে।

কার্সিয়ং-এ এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন enjoy করিতেছেন?" ভদ্রতার খাতিরে আমি উত্তর করিলাম "বেশ ভালই।" কিন্তু নিজ মনে হইল যে enjoyment-এর কাল গিয়াছে। মনে আছে ৮ বৎসর পূর্বে যখন পূজার ছুটিতে—প্রথমবার দার্জিলিঙ আসি তখন কি আনন্দ! আমরা বাড়িতে একরকম বাঁধা থাকিতাম তাই বাড়ি ছাড়িব ভাবিয়া কি আনন্দ! তখন এসেছিলাম অবশ্য enjoyment-এর জন্য। কিন্তু আজ আমার কি পরিবর্তন! তখন boyish emotion-এর বশবর্তী হইয়া বলিয়াছিলাম—"জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন হইবে—যেদিন independent হইব—এবং তারপর সবচেয়ে আনন্দ হইবে যেদিন দার্জিলিঙ যাইব।"

কিন্তু আজ জীবন আমার enjoyment-এর জন্য নহে। অবশ্য আমার জীবন নিরানন্দ নহে কিন্তু আমার জীবন enjoyment-এর জন্য নহে—my life is a mission —a duty. ভদ্রলোকটি বোধ হয় enjoy করিবার জন্য কার্সিয়ং এসেছিলেন কিন্তু আমি জানি আমি এসেছি physical and moral improvement-এর জন্য। এ পাহাড় ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। অবশ্য বঙ্গদেশের অন্যান্য আকর্ষণ আছে—কিন্তু তা ছাড়া এ "পাহাড়ী জঙ্গলী" দেশ অতুলনীয়। বাস্তবিক হিমাচল প্রদেশ দেবতার বাসস্থান—স্বর্গ। আমাদের এক অজ্ঞ পাচক ঠাকুর কার্সিয়ং-এ কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ দিকে স্বর্গ।" সকলে তার কথা শুনিয়া হাসিল। আমি কিন্তু মনে করিলাম তার কথা metaphorically সত্য।

যাক্—বলিতে গেলে কথার শেষ হইবে না।

আমি এখানে এসে এক বড়লোক আত্মীয়ের কাছে আছি, ওঁরা খুব যত্ন করিতেছেন—আশাতীত যত্ন। আমি এবং এক মাতুল এখানে আসিয়াছি। আমার পাগলামির কথা এখানে সকলে জানে এবং এবার আসাতে আরও কিছু জানিল।

যাক্—আমার কথা অনেক লিখিলাম। কাল কার্সিয়ং যাব—পরশু কলিকাতায় রওনা হইব। পরশুদিন ১১টায় শিয়ালদহে পঁহুছিব—সেইদিনই কলেজ করিবার চেষ্টা করিব।

তোমার সঙ্গে দেখা হইলে তোমার উপর বিচার বসিবে। শরীর অবহেলার কারণ investigate করিতে হইবে।

তোমার পত্র পাই—কিন্তু তোমার সম্বন্ধে বড় একটা কথা থাকে না। তারও বিচার হইবে।

৩৯ বুধবার রাত্রি
৮-১২-১৫

আজ University Institute-এ জগদীশচন্দ্রের অভ্যর্থনার জন্য একটি সভা হইয়াছিল। আমি বড় আশা করিয়া গিয়াছিলাম জগদীশের মুখের দুই চারিটি কথা শুনিব—"Just to see him and to hear him speak." কি জানি কেন, শৈশব হইতে জগদীশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ এই দুইজনের প্রতি একটা প্রগাঢ় ভক্তি আছে। তাঁহাদের ছবি ও তাঁহাদের সম্বন্ধে ২/৪টি কিংবদন্তী শুনা অবধি বড় আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সভার উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য "to honour him by a reception" কিন্তু বাঙ্গালী এবং সর্বোপরি বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ তাহাকে যে কি ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত আজ করেছে তাহা স্বদেশভক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও হৃদয় বোধ হয় বুঝিবে না। Entertainment-এর মধ্যে গান, দেশীয় বাদ্য, কবিতা পাঠ প্রভৃতি বেশ ভালই ছিল কিন্তু তার মধ্যে English Theatre—actors রা ছাত্র—বিষয় কি রকম বুঝিতেই পারিতেছ—তারপর শেষে—God save the King! যখন Programme-এ দেখিলাম—acting হইবে তখন একবার মনে হইল চলিয়া আসি—কিন্তু তাঁর কথা শুনিবার লোভে—acting-এর সময়ে নিদ্রার সাহায্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলাম। উচ্চহাস্যকারী যুবকবৃন্দের মধ্যে Stern Puritan-এর মত চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম, কিন্তু সভাভঙ্গ হইতে চলিল—আমার আশাও পূরণ হইল না। ভগ্নাশা হইয়া ফিরিলাম—এবং ভাবিতে লাগিলাম যে যতদিন আমাদের মহাপুরুষ (greatmen)দের আমরা উপযুক্ত ভাবে সম্মান করিতে না শিখি ততদিন এ বাঙ্গালীর—এ ভারতের উদ্ধার নাই। থিয়েটার দিয়া আবার অভিনন্দন! ছি! ছি! হায় ভারত! হায় বাঙ্গালী, তোমার কি এতদূর অধঃপতন হইয়াছে?

এ ঘটনাটি আমায় বড় স্পর্শ করেছে। পূজ্যপাদ ধর্মপাল একটি কথা বলেছিলেন সভায় বসে আমার বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। So long as men run after sensual pleasure India will not rise. তাঁর কথা ঠিক মনে নাই। তবে ভাবার্থ এই। আমি দেখিলাম sensual pleasure বাঙ্গালীর হাড়ে হাড়ে প্রবাহিত—আর ইহাই মস্তিষ্কবান বাঙ্গালীর দুর্বলতার প্রধান কারণ।

এর উপায় কি? আমার মনে হয় Counteract করিবার জন্য একদল কঠোর "Puritanic principles" বিশিষ্ট যুবকবৃন্দ চাই। দেশের লোকেদের চোখ খুলে দেওয়া চাই। বাস্তবিক রামকৃষ্ণ জাতীয় চরিত্রের মূল ধরেছিলেন।

জানি না জগদীশচন্দ্র এই অভ্যর্থনা কি ভাবে নিয়েছিলেন। স্বদেশভক্ত জগদীশচন্দ্র

দেশের দান দুই হাত পাতিয়া অবশ্য লইবেন—ছাইভস্মই দিক আর ফুলচন্দনই দিক। কিন্তু এই অভ্যর্থনাতে তিনি যে হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছেন তার কোন সন্দেহ নাই।

আমি "আগামী সোমবারে পাঠ্য" একটি প্রবন্ধ লিখিতেছি—আমাদের Debating Club-এর জন্য—বিষয় "The civilisation of India in the Vedic and Pouranic Age." তুমি যদি ২/১টি বই এর মধ্যে পাঠাতে পার বা নাম প্রভৃতি hints বা তোমার notes পাঠাইতে পার তাহা হইলে ভাল হয়।

* * *

৪০ রবিবার

১৯/১২/১৫

আমি আজকাল বড় rational এবং intellectual হয়ে গেছি—sentiment সব প্রায় মরিয়া গেছে—একটা stoic sternness আসিতেছে। জীবনের আদর্শ দিন দিন ভাল করিয়া বুঝিতেছি—কিন্তু করিবার উপযুক্ত শক্তি নাই।

* * *

আবরণ ত্যাগ না করিলে জগতে কাহারও সঙ্গে মেশা যায় না। আমি কি সর্বাভরণ ত্যাগ করিতে পরিয়াছি?

৪১ শুক্রবার

২৭/১২/১৫

আবার সেই December আসিয়াছে এবং সেই জানুয়ারী আসিতেছে। দুই বৎসর পূর্বে আমরা এখন শান্তিপুরে। আর শান্তিপুরের সেই সন্ন্যাসীর দল ও তাহাদের মধুময় স্মৃতি।

* * *

ভারতের প্রায় সবই গিয়াছে বটে, ভারতবাসী প্রায় অন্তঃসারবিহীন হইয়াছে কিন্তু "তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না"—তা বলে হতাশ হ'লে চলবে না—ও যে কবি বলেছে—"আবার তোরা মানুষ হ," হ্যাঁ, আবার মানুষ হইতে হইবে। ভারতের শ্যামলক্ষেত্রে এখন শ্মশানচারী ভূতগণের অস্থিসমন্বিত জীর্ণবিশেষ ভ্রমণ করিতেছে—চারিদিকে নৈরাশ্য—মৃত্যু, ভোগ-বিলাস, রোগ, শোকের কুরুক্ষেত্র—"কি ঘোর দুঃখরাশি ভারত গগন ব্যাপিয়া।" কিন্তু এই নৈরাশ্য—নিস্তব্ধতা—এই দুঃখ-দারিদ্র্য—অনশন—অর্ধাশনের হাহাকার ও এই বিলাস-বিভবের আস্ফালন রব ভেদ করিয়া আবার ভারতের সেই জাতীয় গান গাহিতে হইবে। সেটা কি—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।

৪২ বুধবার রাত্রি

২-২-১৬

শরীরের যত্ন লইবে। উপযুক্ত ব্যায়াম ও প্রাতর্ভ্রমণ করিবে—দুধ ডিম খাবে—বেশী পরিশ্রম করিবে না। জীবনটা পড়িয়া আছে—এখন বোকামি করিয়া সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করার ছুতোতে অতিরিক্ত শ্রমের কোন প্রয়োজন নাই।

সুরেশদা কাল চলিয়া গিয়াছেন—তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিলেন। বিশেষ কাজ থাকায় কালই যাইতে হইল। মেস পরিবর্তন হইয়াছে—২/১১ ছাড়িয়া এখন ৪৫/১ Amherst St. বাড়িটা বড় damp বলিয়া ছাড়িতে হইল। কলিকাতার মেসে ২/১ জন বাদে প্রায়ই সকলেরই pharyngites হইবার যোগাড়। সুরেশদা আশঙ্কা করেন তোমার pharyngites (বানান ঠিক জানি না)-এর লক্ষণ। গলা থেকে কি আর রক্ত পড়ে? ইহার এবং আমাশার জন্য চিকিৎসা করিবে—আমার অনুরোধ। জ্ঞানদা কিংবা অন্য কাহাকেও দেখাইতে পার—প্রয়োজন মত ঔষধ সেবন করিবে—এটা অবহেলা করিবে না।

তোমার শরীরের অসুস্থতার সংবাদ অরবিন্দের মুখে সর্বত্র প্রচার হইয়াছে—অনেকে তোমার সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। যদি অরবিন্দকে জব্দ করিতে চাও এবং নিজে লজ্জায় না পড়িতে চাও—তাহা হইলে ইতিমধ্যে শরীর সারাইয়া রাখ—তাহা হইলে

যখন কেহ দেখিতে আসিবে তখন তোমার অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিবে।

শুনিলাম সুরেশদার pharyngites হইয়াছে। বিধু একথা বলিতেছিল। যাহা হউক, একথা বেশ সপ্রমাণ হইয়াছে যে অস্বাস্থ্যকর স্থানে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে অতি সবল দেহও শীঘ্র টলিয়া পড়ে।

তোমার মনের শক্তি দ্বারা শারীরিক রোগ চাপিবার কদভ্যাস আছে। এই করিয়া তোমার সেবার ভয়ানক অসুখ হয়। এবারও মনোযোগ না দিলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ যে সময় থাকিতে শরীরের যত্ন করিবে। অধিক কি লিখিব।

৪৩

৩৮/২, এলগিন রোড
কলিকাতা
২৯/২/১৬

হেমন্তকুমার,

তোমাকে মধ্যে যে ২। ১ দিন পত্র দিই নাই, তার কারণ এই যে বিশেষ কোন সংবাদ ছিল না। আমার সম্বন্ধে চঞ্চল বা ব্যস্ত হইলে চলিবে না। ধীরভাবে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

Syndicate-এ আবেদন করার দরুন তারা এখন আমার বিষয়ে কোন হুকুম জাহির করিবে না—বোধ করি Committee-র report প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। আজ Committee-তে দরখাস্ত করিলাম, যাহাতে উহারা আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করে এবং পুনর্বিচার করেন। Committee এখন প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছে। আমার মনে হয় আরও ৩। ৪ দিন প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে তারপর ছেলেদের ডাকিবে। তখন আমরা গিয়ে সাক্ষ্য দিব। Committee-র scope খুব বিস্তৃত। তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত করিবে।

(1) Relation between European & Indian Professors in Presidency College.

(2) Relation between European Professors and Indian Students.

(3) Relation between Indian Professors and Indian Students.

(4) Cause of indiscipline leading on to the Strike.

(5) Ditto leading on to assault.

Committee-র recommendation-এর উপর গভর্ণমেন্ট বোধ হয় Presidency Collegeকে একবার সুসংস্কার এবং প্রয়োজন মত নূতন নিয়মে চালাইতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে ভবিষ্যতে কোন রকম গণ্ডগোল না হয়। সুতরাং বুঝিতেছ ব্যাপারটা বড় গুরুতর। আশুবাবু আছেন, আমাদের বিশ্বাস ছেলেদের Rights Suffer করিবে না। Committee যদি আমাদের নির্দোষী বলে কিংবা benefit of doubt দেয় তাহা হইলে আমরা Syndicate-এ application করিব যাহাতে আমাদিগকে Students of Presidency College বলিয়া re-instate করা হয়। যদি re-instate না করে তাহা হইলে transfer চাহিব। Transfer-এর অনুমতি পাইলে অনায়াসে অন্য কলেজে ভর্তি হইতে পারিব। যদি সে অনুমতি না পাই তাহা হইলে আমি practically rusticated হইব। তবে এ রকম rustication এক বৎসরের বেশী করে না। খুব বেশী অপরাধ করিলে একেবারে rustication for life দণ্ড দেয়, সে অবস্থায় পড়াশুনার "ইতি"।

যাক আমার অনেক সুবিধা। ভাল ছেলে বলে সুখ্যাতি আছে—বড়লোকের মহলে অন্ততঃ নামে আমাকে চেনে—আমি নির্দোষী বলিয়া Public-এর মধ্যে vast majority-র ধারণা—আশুবাবু নিজে আমার কথা জানেন—আমার বিরুদ্ধে চাপরাশীর যে সাক্ষ্য তাহা বড় weak—সুতরাং, আমার নির্দোষী বলিয়া খালাস হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অন্ততঃ transfer পাব বলিয়া বিশ্বাস করি।

শেষে কিছু না হয় ত Law suit আনা যাইতে পারে।

৪৪ ৩৮/২, এলগিন রোড
কলিকাতা
৬/৩/১৬
সোমবার

হেমন্ত,

তোমার চিঠি না পাওয়ার জন্য চিন্তিত আছি। আমার পত্র পাও নাই কি? আমাদের পত্র intercepted হইতেছে। আমার শেষ পত্র বোধ হয় Committee-র সম্মুখে সাক্ষী দেওয়ার পরের দিন লিখেছি। শুনিয়া থাকিবে যে হোস্টেল বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কলেজ খুব সম্ভব ছুটির এদিকে খুলিবে না। আমাদের উপর Committee-র attitude ভাল বলিয়া মনে হয় এবং আশা করি নির্দোষ সাব্যস্ত না করিলেও benefit of doubt দিবে। যাক্—এখন কেবল অপেক্ষা করিতে হইবে। আমার চিঠিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলে বোধ হয় ভাল হইবে।

ওখানকার খবর দিও। বেণীবাবুর সঙ্গে একদিন কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি ছেলেদের খুব গালাগালি করিলেন। এবং জেম্‌স সাহেবের সহিত খুব সহানুভূতি করিলেন।

তোমার শরীর কেমন? কেমন আছ লিখিবে। আশা করি, উপযুক্ত যত্ন লইতেছ এবং আমাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হইবে না। শীঘ্র উত্তর দিও।

ইতি—
তোমার
সুভাষচন্দ্র

৪/৭/১৬
৪৫ মঙ্গলবার

তোমাকে যখন ছেড়ে আসি তখন বুঝেছিলাম তোমার মনের অবস্থা ভাল নয়। তবুও আসিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এ কয়দিন যাবৎ তোমাকে পত্র দিই নাই—কিন্তু তা বলে তোমারও কি পত্র দিতে নাই? ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে পর দিন প্রাতে দেখা করা—কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ তাহা পারি নাই। যাহা হউক তুমি কেমন আছ বিস্তৃত ভাবে জানাবে। তোমার শরীর দেখে কে কি বলেছে শুনিতে ইচ্ছা করি।

আমার পড়াশুনা বন্ধ হইবে এইরূপ মনে হইতেছে—আমি একটি ভীষণ সমস্যার সম্মুখে উপস্থিত। এতদিন ধরে এর তার সাহায্য চেয়েছিলাম এবং মত জানতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি যে মীমাংসা প্রধানতঃ আমার উপরই নির্ভর করিতেছে। তা ছাড়া এখন মনের অবস্থা আমার ভাল নয়—বাঁচি কি মরি জানি না—তবে দেখছি আমার Life-এর Experience এই যে "আশা" জিনিষটা আমাকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখে—কখনও জীবনের দিকে বিমুখ হইতে দেয় না। জানি না—এটা কুহকিনী কি না। আমার এ বিপদের সময়ে তুমি কি পশ্চাৎপদ হইবে?

যে সমস্যা আমার নিকট উপস্থিত—তাহা যে এত ভীষণ হইবে তাহা কোন দিন ভাবি নাই।

অধিক কি লিখিব। বিস্তৃত পত্র দিও। ওখানকার খবর কি?

৪৬ শুক্রবার
(১৯১৭)

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করেছি—তিনি ভাল Seat এখনও খুঁজে পান নাই। নূতন mess University করিতে পারে এরূপ আশা আছে। তার জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় দেখি না। অতুলবাবু যে সব সন্ধান পেয়েছেন—সেগুলি মোটেই সুবিধাজনক নহে—দেখা যাক্ কি হয়। শম্ভু চাটার্জি স্ট্রীটে যে মেস আছে—তাতে দ্বিতলে একটা Seat আছে—কিন্তু ভাল আলো-হাওয়া প্রবেশ করে না। সেজন্য সেটা নেওয়া যায় না।

আমি স্কটিশ চার্চে 3rd year-এ প্রবেশ লাভ করেছি।

আমি তোমার পত্রের তাৎপর্য বুঝিলাম না। আমি গরীবের ঘরে জন্মাই নাই। একথা ঠিক—কিন্তু তার জন্য কি আমি দায়ী? তার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করিতে হইবে? আমরা যেরূপ সাংসারিক অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি—সে অবস্থার full advantage নেওয়া ভিন্ন আমাদের অন্য কোন উপায় দেখি না। তবে যাহারা রীতিমত সন্ন্যাসী তাদের আলাদা কথা। আমি তাহা নই।

তারপর আমি ত নিজের কোন পরিবর্তন দেখিতেছি না। বাহিরে কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকিতে পারে সেটা necessity-র দরুন কিন্তু ভিতরে ত কিছু হয় নাই। তবে যৌবনের উদ্দামভাব যেন স্থির হয়ে আসছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তটা ধৈর্য অবলম্বন করে। আমার বোধ হয় তাহাই হয়েছে। যৌবনে যে সব ভাব—সব বাধা-বিঘ্ন চূর্ণ করে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহে—সে সব ভাবগুলি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জমাট বেঁধে যায়।

তবে একটা কথা—মানুষ যদি মনে করে যে আর একজনের ভিতরে ভাবের পরিবর্তন হয়েছে—তাহা হইলে হাজারই explain করুক বা বোঝাক—সে কখনও Convinced হবে না যে তার ভাবের পরিবর্তন হয় নাই। মানুষ যদি এরূপ স্থলে বেশী চেষ্টা করে নিজেকে explain করিতে তাহা হইলে লোকের বিপরীত Conviction -ই বদ্ধমূল হয়। যাক্—

যদি কেহ মনে করে যে আমার ভাবের পরিবর্তন হয়েছে বা I am not what I was— তবে সেটা আমার পক্ষে বড় দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের কথা। তুমি ইহা মনে করিবে ইহা আমি ভাবি নাই।

আমরা যেরূপ দিনকালে এবং যেরূপ জগতে বাস করিতেছি তাহাতে Sentiment-গুলি অবাধে না ঢালিয়া দিয়া পুরিয়া রাখিতে হইতেছে। The whole of nature is forcing us into this.

আসল কথা হচ্ছে—ব্যাধিটা তোমারই আর কাহারও নয়—সেটা হচ্ছে আমি যাহা বহু কাল হইতে বলিয়া আসিতেছি এবং যাহা সংশোধন করবারও অল্পাধিক চেষ্টা করিয়াছি—মানসিক বিকার। এটির যতদিন আরোগ্য না হচ্ছে—ততদিন জগৎটা—শুধু আমি কেন—বিকারগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইবে।

তুমি কি Presy. College থেকে কোন উত্তর পেয়েছ?

ইতি—
সুভাষ

৪৭

Y. M. C. A.
Calcutta University Infantry
Shooting Camp
Belghurria, E.B.Rly.
৫।৪।১৮

তোমার পত্র পেয়েছি। আমি Univ. Institute-এ সেদিন যাই নাই। কারণ সেদিন Camp-এ যাবার কথা ছিল—ডাক্তারের অমতে ......Camp-এ যেতে পারি নাই। আমরা পরশু এবং সম্ভবতঃ ২/৩ সপ্তাহ এখানে আছি। আজ rifle practice আরম্ভ হইল। বেশ interesting লাগিতেছে। আমরা ২৪শে এপ্রিলের পূর্বে ছুটি পাইব বলিয়া বিশ্বাস করি না। সুতরাং তোমার কথিত দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক অধিবেশনে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইতে পারিব না।

আমার শরীর ভালই আছে। এখানকার অন্যান্য খবর ভালই। তোমার শরীর কেমন আছে?

৪৮ ভোলানাথ রায়কে লিখিত

৩৮/২ এলগিন রোড
১২. ৪. ১৯

প্রিয় ভোলানাথ বাবু,

পরীক্ষায় আমি কেমন করেছি, সে বিষয়ে আগেই আপনাকে অবহিত করা আমার উচিত ছিল। সে যাই হোক, একেবারে না হওয়ার চাইতে দেরী হওয়া ভাল।

প্রথম চারটি পেপারে আমি ভাল করেছি। কিন্তু শেষ দুটিতে তেমন সন্তোষজনক ফল লাভ করতে সমর্থ হইনি (দর্শনের ইতিহাস এবং প্রবন্ধে)। প্রশ্নগুলি ঠিক মনোমত ছিল না। পরীক্ষার হলে, আপনার সাহায্যপূর্ণ পরামর্শগুলি যে আমার কাছে প্রভূত মূল্যবান ছিল, আপনার কাছে সে কথার উল্লেখ নেহাতই অপ্রয়োজনীয়। আপনার প্রবন্ধ (ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্র), আমি যথাসময়ে পেয়েছি। রাজেনবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি পোস্ট করে আমাকে এটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার কাজ হয়ে গেছে সুতরাং আমি পুনরায় এটি তাঁকে ফেরৎ পাঠাচ্ছি।

আশা করি ভাল আছেন। এখানে আমরাও বেশ বহাল তবিয়তে।

আপনার
স্নেহের সুভাষ

পুনশ্চ : নীতিশাস্ত্র ও ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক, নীতিশাস্ত্র পেপারের একটি প্রশ্ন ছিল।

এস. সি. বোস

(ইংরাজি থেকে অনূদিত)

পরবর্তী দুইখানি চিঠি হেমন্তকুমার সরকারকে' লিখিত

৪৯

কলিকাতা
মঙ্গলবার
৩০।৪।১৯

হেমন্ত,

তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। গত শুক্রবার আমরা সকলে বাড়ি ফিরিয়াছি। শরীর ভালই আছে। বোধ হয় vacation- এর মধ্যে আর কোন কাজ পড়িবে না—কারণ ছুটির মধ্যে কলকাতায় খুব অল্প লোকই থাকিবে। তবে ছুটির পর কি হইবে বলিতে পারি না। বোধ হয় দিল্লীর মহাসভা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। Capt Gray আগামী ১লা মে হইতে General I. D. F.-এর ভার লইবেন। তাহাদের training শেষ হইলে উনি recruiting-এর জন্য বহির্গত হইবেন। অবশ্য তাহাদের training শেষ হইতে এখনও দেড় মাস বিলম্ব আছে।

আমাদের experience টা মোটের উপর খুব pleasant এবং যাহা শিখিয়াছি তাহার দ্বারা সকলেই যে কিছু উপকার পেয়েছি, তার কোন সন্দেহ নাই। তবে তিন মাসের training-এর effect তত lasting হইতে পারে না এবং কোন জিনিষের লাভালাভ পাত্রাপাত্রের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

আমাদের experience-এর ভিতর romance বিশেষ কিছুই নাই, সেই জন্য কলকাতায় থাকিতে মধ্যে মধ্যে monotonous বোধ হইত। কিন্তু বেলঘরে থাকিতে যখন ঝড়বৃষ্টিতে তাম্বু ভাসিয়া গিয়াছিল এবং পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৪॥টা পর্যন্ত Continual firing চলিয়াছিল, তখন কতকটা field service- এর মত বোধ হইয়াছিল। তার পর পায়খানা প্রস্তুত করা, দূরবর্তী গ্রাম হইতে পানীয় আহরণ করা, রাত্রিতে "শান্ত্রী" পাহারা দেওয়া এবং সর্বোপরি night operationগুলি জীবনটাকে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর বেলঘরে থাকিতে যে shooting competition হইয়াছিল—তাহাতে British instructor- রা ছেলেদের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল। শেষ কয়দিন Camp life খুব decent বোধ হইয়াছিল, তার প্রতি বেশ মায়া জন্মেছিল এবং Camp ছাড়িতে অল্পাধিক কষ্ট সকলেরই হইয়াছিল।

কাল নীলমণি ও মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। আজ আবার দেখা হইতে পারে। শুনিলাম তুমি নাকি এত পড়াশুনা করিতেছ যে কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার অবসর হয় না। তোমার বোলপুর যাওয়ার কি হইল? ছুটিটা কি গোয়াড়িতে থাকিবে, না অন্যত্র কোথাও কোথাও যাইবে? তোমার শরীরের সংবাদটা চাই।

আমি বোধ হয় কলিকাতায়ই থাকিব। তবে এক এক বার ইচ্ছা হচ্ছে পুরীর দিকে যেতে। তোমাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা আছে।

আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে। পড়াশুনা এখনও আরম্ভ করি নাই। কলেজের Magazine-এর জন্য Camp life সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিব। সেটা সম্পূর্ণ হইলে তোমাকে দেখাইব। শীঘ্রই পত্রোত্তর দিও।

সুভাষ

পুনঃ—তুমি আমার উন্নতি সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ—উন্নতি আমার কিছু হয় নাই—শেষ পর্যন্ত আমি private ছিলাম। তাহার একটা কারণ এই যে Capt. Gray-র আদেশে N.C.O.দের stripes কেড়ে নেওয়া হয় এবং nomination-এর পরিবর্তে by vote একটা fresh election হয়। সে সময়ে আমি (sick) absent ছিলাম। সুতরাং সমস্ত Posts filled up হয়ে যায়।

৫০ ৩৮/২, এলগিন রোড
কলিকাতা
২৬।৮।১৯

আমি একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছি। কাল বাড়ি থেকে একটা Offer পেয়েছি—বিলাত যাত্রার জন্য। আমাকে এখনই বিলাত যাত্রা করিতে হইবে—বিলাতে পৌঁছিয়া এখন কোনও ভাল ইউনিভার্সিটিতে স্থান পাওয়ার আশা নাই। সকলের ইচ্ছা আমি কয়েক মাস পড়িয়া Civil Service পরীক্ষায় appear হই। আমি ভাবিয়া দেখিলাম Civil Service পরীক্ষায় পাশ করিবার আশা নাই। সকলের মত যে আমি পরীক্ষায় ফেল হইলে আগামী অক্টোবরে কেম্ব্রিজে বা লণ্ডনে প্রবিষ্ট হইব। আমার নিজের Primary ইচ্ছা বিলাতে University Degree লাভ করা কারণ তাহা না হইলে Education Line- এ সুবিধা করিতে পারিব না। যদি আমি এখন বলি Civil Service পড়িতে যাইব না—তাহা হইলে এখনকার মত (এবং চিরকালের মত) বিলাত যাত্রা প্রস্তাব তোলা থাকিবে। ভবিষ্যতে আর ঘটিয়া উঠিবে কি না জানি না। এরূপ অবস্থায় আমার কি এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা উচিত? তবে একটা গুরুতর মুস্কিল এই—যদি Civil Service পরীক্ষায় পাশ হইয়া যাই। তাহা হইলে আমি উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইব। বাবা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কালই প্রস্তাবটা তোলেন এবং কালকের মধ্যে একটা মত দিতে হইয়াছে। বাবা কালই কটক চলিয়া গেছেন, আমি বিলাত যাত্রায় রাজী হইয়াছি। তবে কর্তব্যাকর্তব্য ঠিক বুঝিতেছি না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। তুমি যদি শীঘ্র একবার কলিকাতায় আসিতে পার ত বড় ভাল হয়। শুনিলাম তুমি ৪ঠা আসিবে। কিন্তু তাতে বড় বিলম্ব হয়।

শ্রীভোলানাথ রায়কে লিখিত

৫১ ৩৮/২, এলগিন রোড
১-৯-১৯

প্রিয় ভোলানাথ বাবু,

২০শে আগষ্ট আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনাকে দেবার জন্য Schwegler-এর বইটি আমার এক বন্ধুকে দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে এমন ঘটনা ঘটল, যে আমাকে বইটি আবার ফেরৎ নিয়ে নিতে হয়। আপনি একথা শুনে নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন যে ১১ই সেপ্টেম্বর খিদিরপুর ডক থেকে জাহাজে বিলেতে পাড়ি দিচ্ছি। আই সি এস্ পরীক্ষায় একবার চেষ্টা করব বলে আশা করছি, এবং তাতে অকৃতকার্য হলে কেম্ব্রিজে যাব। ১৯২০ সালের অক্টোবরের আগে অবশ্যই আমি কেম্ব্রিজে যাব না। বর্তমানে লণ্ডনেই থাকব। আই সি এস পরীক্ষা ও কেম্ব্রিজ উভয় ক্ষেত্রেই যেহেতু দর্শন নেব বলে ঠিক করেছি, তাই দর্শন সম্বন্ধীয় বইগুলি সঙ্গে নেওয়াই সঙ্গত মনে করছি। যদি সম্ভব হয়, যাত্রাকালে জাহাজেও কিছু পড়াশুনার ইচ্ছা আছে। দেশ-ত্যাগের আগে আপনার সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য কি আমার হবে না? আমি আজ কলেজে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনাকে খুঁজে পাইনি।

ভালবাসা জানবেন,

আপনার
স্নেহভাজন
সুভাষ

(ইংরাজী থেকে অনূদিত)

পরবর্তী দুইখানি পত্র হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত

৫২ ৩৮/২, এলগিন রোড
কলিকাতা
৩-৯-১৯

এ কয়দিন মানসিক তুফানের মধ্যে দিয়া কাটিয়াছে। অনেক সংগ্রামের পর যাত্রা করিবার বিষয়ে মত দিয়াছিলাম—তবু মনকে আশ্বস্ত করিতে পারি নাই যে আমার বিবেচনা ঠিক হইয়াছে। যাহা হউক তোমার পত্র পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম।

ভয়ানক ব্যস্ত থাকায় কাল পত্র দিতে পারি নাই। আমি ১১ই সেপ্টেম্বর প্রাতে কলিকাতা হইতে জাহাজে রওনা হইতেছি—যদি অবশ্য এর মধ্যে সমস্ত জোগাড় ও বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারি।

Letters of introduction দরকার হইবে কিনা তাহা সাক্ষাতে তোমার সঙ্গে ঠিক করিব। লেখাপড়া সম্বন্ধেও তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিবার দরকার আছে। যাহা হউক তুমি এখানে আসিলে সে সব ঠিক হইবে। তোমার তাড়াতাড়ি করিয়া আসিবার দরকার নাই, কারণ আমি ২/৩ দিন পায়ের উপরই থাকিব। তারপরে আশা করি, অবসর পাব। তোমার পরীক্ষা নিকটবর্তী হওয়ার জন্য একটু অসুবিধা হইল।

৫৩ 8 Glenmore Road
Belsize Park
London N.W. 3.
Undated (1919)

হেমন্ত,

তোমাকে একটা বিস্তৃত পত্র লিখিতেছি—সেটা সম্পূর্ণ হয় নাই। এ পত্রে তোমাকে শুধু আমার পঁহুছান সংবাদ এবং ঠিকানা দিলাম। এখন বড় ব্যস্ত আছি—কারণ কোথায় পড়িব ঠিক করিতে পারি নাই। আগামী মেলে তোমাকে বিস্তৃত পত্র দিব। আমার বড় দাদাও এই বাড়িতে আছেন। আমি ২০শে অক্টোবর লন্ডনে এসে পঁহুছিয়াছি। প্রমথকে খবর দিও যে যুগলদা এখনও Marseilles-এ আছেন। তিনি November or December মাসে তাঁর regiment-এর সহিত India যাবেন। সেখানে তাঁহারা বোধ হয় April 1920 -তে demobilised হইবেন। ধীরেনের পিতা Mr. M. M. Dhar- এর নিকট হইতে আমি এই সংবাদ পাইলাম। আমি নিজে যুগলদাকে লিখিয়া খবর আনাইব এবং তোমাদের জানাইব।

Bharat Ch. Dhar মহাশয়ের পুত্রও এই বাড়িতে আছেন। তিনি London- এ B' Com. পড়িবার জন্য আসিয়াছেন। এখন এখানে বড় শীত লাগিতেছে। এখন তবে আসি।...তাড়াতাড়িতে আর লিখিতে পারিলাম না।

ইতি—
তোমার সুভাষ

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে লিখিত

৫৪

ভারত মহাসাগরে, এস. এস. সিটি অফ ক্যালকাটা
২০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯

প্রিয় মহাশয়,

আমার জন্য আপনি যা করেছেন, তার পরেও কলকাতা ত্যাগের আগে আপনার সঙ্গে একবার দেখা না করে আসাটা আমার পক্ষে নিঃসন্দেহে অকৃতজ্ঞতা ও অভদ্রতার কাজ হয়েছে। কিন্তু আশা করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, একথা চিন্তা করে যে, আমার যাত্রার অব্যবহিত আগে আমি স্বভাবতই খুব ব্যস্ত ছিলাম। দেশ-ত্যাগের আগে আপনাকে আমি চিঠি লিখতে পারতাম। কিন্তু শেষ সময় পর্যন্ত আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব, এমন আশা করেছিলাম। যখন তাতেও ব্যর্থ হলাম, আপনাকে চিঠি লেখার আর সময় ছিল না। আমার খুবই দরকারের জিনিস সার্টিফিকেট ও পাসপোর্টের ব্যাপারে কি হল সে কথা জানতে আপনি নিশ্চয়ই খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং আপনাকে

সেই মানসিক উদ্বেগে রাখাটা আমার পক্ষে নিতান্তই অন্যায় হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য। কেন না, সে সময়ে আমার লেখা কয়েকটি লাইন আপনার কাছে এই উদ্বিগ্ন অবস্থায় যথেষ্ট অভ্যর্থনার সামগ্রী হত। এত দেরী হওয়া সত্ত্বেও আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে আমি সময় মত কমিশনারের কাছ থেকে আমার বয়সের সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম। ব্যক্তিগত সচিব এফ. এন. মুখার্জি মহাশয় আমার উপর খুবই সহৃদয় ছিলেন এবং যাতে আমি সার্টিফিকেটটি তাড়াতাড়ি পাই সে ব্যাপারে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে যদি তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার সুযোগ হয়, আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাঁকে জানাবেন। আমার পাসপোর্টও আমি ঠিক সময়ে পেয়েছিলাম এবং সেজন্য সহকারী কমিশনার মিঃ ইউ. এন. বোস এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সেই সংকট-কালে তাঁরা যে কতখানি সাহায্য করেছিলেন তা বলতে পারি না।

ছাড়ার সময় থেকে এখন পর্যন্ত 'সী-সিক্‌নেসে' আমি আক্রান্ত হইনি। জাহাজে আমরা জনা-বারো বাঙালী ছাত্র ছিলাম, সকলেই একে অন্যের বন্ধু হয়ে উঠেছি। তাদের সঙ্গী না পেলে হয়ত আমি একাকী বোধ করতাম, অস্বস্তিতেও ভুগতাম।

আজই কলম্বো পেঁছব। লন্ডন পেঁছতে মোটের উপর আমাদের দিন তিরিশেক সময় লাগবে। লন্ডন পেঁছে আপনাকে আবার চিঠি লেখার আশা রাখি।

জাহাজে ভালোই কাটছে। আপনার শারীরিক কুশল আশা করি। শেষ করার আগে, আবার আপনাকে আমার উষ্ণ কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আপনার স্নেহের
সুভাষচন্দ্র বসু

পুনশ্চ : এই চিঠি আপনার হাতে পেঁছল কিনা সে কথা জানতে আমি উদ্‌গ্রীব রইলাম। পারলে অনুগ্রহ করে সময় ও সুবিধামত আমাকে এক লাইন লিখবেন। এখনকার মত আমার ঠিকানা :

C/o Thomas Cook and Sons
Ludgate Circus
London E. C.

সুভাষ

(ইংরাজী থেকে অনূদিত)

হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত

৫৫

Fitz William Hall
Cambridge
১২।১১।১৯

যাহাদের নিকট হইতে পত্র আশা করিতে পারি নাই, তাহারা পত্র দিয়াছে অথচ তোমার নিকট হইতে কোন পত্র পাইলাম না। যাই হউক, আশা করি ভবিষ্যতে পত্র দিবে।

শেষ পত্রে তোমাকে লিখেছিলাম যে আমি Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছি এবং সেখানে আসিয়াছি। জনৈক বন্ধুর সাহায্যে কতকটা বি. এ-র result-এর দরুন এবং কতকটা I.D.F. Service-এর দরুন স্থান পাইতে সমর্থ হইয়াছি। থাকিবার স্থানের অভাব সত্ত্বেও সৌভাগ্যবশতঃ বাসস্থানও পাইয়াছি।

আমার মতলব আগামী বৎসর Civil Service পরীক্ষা দেওয়া এবং পাশ করি বা ফেল করি ১৯২১ সালের মে মাসে Moral Science Tripos-এর পরীক্ষা দেওয়া।

এখানকার degree আমাকে লইতে হইবেই, কারণ ভবিষ্যতে আমার বিশেষ কাজে লাগিবে।

এখানে ভারতবাসীদের একটা সমিতি আছে—নাম "Indian Majlis". সাপ্তাহিক অধিবেশন হয় এবং মধ্যে মধ্যে বাহির হইতেও বক্তারা আসেন। Mrs. Sarojini Naidu একবার বক্তৃতা করিয়াছেন—"Kingdom of youth" সম্বন্ধে।—Mr. Andrews বক্তৃতা করেন Indentured Labour System সম্বন্ধে এবং Fiji Island-বাসী ভারতীয়দের কি কি অভাব বর্তমান আছে। আমার আসিবার পূর্বে তিলক মহারাজ এখানে আসিয়াছিলেন। ইন্ডিয়া অফিস থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল বাধা দিতে, কিন্তু পারে নাই। এখান-

কার ভারতবাসীদের সুরটা বড় চড়া এবং তাঁহার নরম বক্তৃতা শুনিয়া সকলে প্রতিবাদ করিয়াছিল।

গত দুই দিন বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক এখানকার জলবায়ু লোকদের উদ্যমশীল করে তোলে। এখানকার activity দেখে প্রাণে বড় আনন্দ হয়। প্রত্যেক লোকের ভিতরে সময়জ্ঞানটা বড় আছে এবং সব কাজে method আছে। আমার সব চেয়ে বেশী সুখ হয় যখন দেখি যে সাদা চামড়ায় আমার সেবা করিতেছে এবং জুতা সাফ করিতেছে। এখানকার ছাত্রদের একটা status আছে—এবং Professor দের ব্যবহার অন্য রকম। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেক দোষ আছে—কিন্তু অনেক বিষয়ে এদের গুণাবলী দেখে মাথা নত হয়। তুমি কেমন আছ? পরীক্ষার ফল কি হইল? অতঃপর কি করিবে জানিবার জন্য চিন্তিত আছি। বিস্তৃত পত্র দিও। সুনীতিবাবু লণ্ডনে research করিতেছেন। আমি ভাল আছি। যুগলদা France-এ আছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে লিখিত

৫৬

ফিট্‌সউইলিয়াম হল
কেম্ব্রিজ
১৯-১১-১৯১৯

প্রিয় মহাশয়,

লণ্ডনে আসার পথে কোন একটি বন্দরে আপনাকে একটি চিঠি পোস্ট করেছিলাম। আশা করি চিঠিটি যথাসময়ে পেয়েছিলেন।

আপনি আমার জন্যে যা করেছেন, তার পরেও কলকাতা ত্যাগের পূর্বে আপনার সংগে দেখা করে বিদায় না নেওয়া আমার পক্ষে খুবই অদ্ভুত কাজ হয়েছে। আমি আপনার কাছে আরেকবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি, এবং আমি আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন এই কথা চিন্তা করে যে, সেই সময়ে আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম। শেষ দিন পর্যন্ত আমি আশা করছিলাম যে সময় করে আপনার সংগে দেখা করতে পারব—কিন্তু পারলাম না।

কিছুটা দীর্ঘ ও একঘেয়ে হওয়া সত্ত্বেও আমার যাত্রা মনোরম হয়েছিল। ২০শে অক্টোবর আমি লণ্ডন পৌঁছাই এবং সেখানে কিছুদিন আমার দাদার সংগে থাকি। লণ্ডনে বহু ব্যক্তি আমায় উপদেশ দেন লণ্ডন ও কেম্ব্রিজের মধ্যে কেম্ব্রিজ বেছে নিতে, তাই আমি এখানে চলে আসি। ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে আই. সি. এস্‌ পরীক্ষায় বসার এবং ১৯২১ সালে Moral Sciences Tripos নেওয়ার অভিপ্রায় আমার আছে।

আমি বেশ ভালো আছি এবং এখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। আপনার শারীরিক কুশল আশা করি। আমার গভীর প্রীতি জানবেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষচন্দ্র বসু

(ইংরাজী থেকে অনূদিত)

পরবর্তী ছয়খানি পত্র হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত

৫৭

Fitz William Hall
Cambridge
7. 1. 20

হেমন্ত,

তোমার পত্র (২৭শে নভেম্বরের) কয়েকদিন হ'ল পাইলাম। এতদিন পত্র দাও নাই কেন?

*　　　*　　　*

আমার কেম্ব্রিজে আসার সংবাদ আমার পত্রেই এতদিনে পেয়েছ। এইখানেই পড়াশুনার সুবিধা দেখিলাম—সেইজন্য আসা স্থির করিলাম। স্থান পাওয়াটা সৌভাগ্যবশতঃ

ঘটিয়াছে—কতকটা আমার University result-এর জন্য—এবং সর্বোপরি অনেক বন্ধুর সাহায্যের জন্য।

* * *

প্রফুল্ল এখন কি করিবে? ভারতবর্ষে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আমাকে পাঠাইও।

প্রফুল্লদা এখন প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করছেন না অন্যত্র বদলী হয়েছেন? সুরেশদার সঙ্গে যা কথা হয়েছিল সমস্ত লিখিও। উনি যে স্কুল করবেন বলেছেন তা চাকুরি হইতে রেহাই পাইলে ত। যুগলদা মাসখানেক পূর্বে লিখেছিলেন যে শীঘ্র ছাড়ান পাবেন। কিন্তু সে শীঘ্রতার কোন লক্ষণ দেখছি না।

সুরেশদা ত আমাকে একরকম পরিত্যাগই করেছেন। আমি যদি চাকরিতে না প্রবেশ করি তাহা হইলে তাঁদের সঙ্গে পুনর্মিলন হইতে পারে। আমি চাকরি করি বা না করি তাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কি করে ঘুচিতে পারে তাহা আমি বুঝি না। এইরূপ দোকানদারী ভাব কি প্রকৃত ভাব? যাহা হউক—আমার ইচ্ছা কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিব না—নিজের কর্তব্য করে যাব—তাহাতে পাঁচজনের সঙ্গলাভ করিব—খুবই ভাল—না করি কোন ক্ষতি নাই।

সুনীতিবাবুকে লণ্ডনে দেখিলাম।

বেণীবাবুর খবর কি? দেশের বিস্তৃত খবর লিখিও—এবং তোমার চিন্তারাশি কিছু কিছু জানাইও।

তোমার পত্রের মধ্যে অন্তশ্চারিণী বেদনার করুণধ্বনি উপলব্ধি করিলাম। কেন এ বেদনা?

আমি ভালই আছি। প্রমথ, হেমেন্দু কি চারুর সঙ্গে দেখা হইলে পত্র দিতে বলিও। প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হইলে বলিও তার পত্র পেয়েছি। আগামী মেলে উত্তর দিব। ইতি—

তোমার

সুভাষ

৫৮

Cambridge

সোমবার

১৯শে জানুয়ারী (১৯২০)

হেমন্ত,

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হইলাম। আমার মনে হয় তুমি একসঙ্গে বড় বেশী কাজ হাতে নিয়েছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কাজে মানুষের যথেষ্ট শক্তি ব্যয় হয়—তার উপরে দোকান এবং তার উপরে আরও কত কি! তুমি যখন বুঝিতে পারিতেছ যে শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে—তখন এইরূপ আচরণের কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষ যে যাহারা কোন কাজ করে না তাহারা কিছুই করে না আর যাহারা করে তাহারা বড় বেশী করিতে চেষ্টা করে এবং একদিনের ভিতরে সব কাজ করিতে গিয়া শরীর এবং সব হারাইয়া বসে। তোমার যখন পূর্বেকার প্রস্তাব ছিল P. R. S.-এর জন্য চেষ্টা করা এবং তৎসঙ্গে শিক্ষকতা করা তখন বোধ হয় দোকানের ব্যাপারে হাত না দিলেই ভাল করিতে। মানুষ যদি কোন স্থায়ী কাজ করিতে বাসনা করে তাহা হইলে তাহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে—২/১ বৎসরে তাহা সম্ভবপর নয়। অতএব তোমার যদি কোন বাসনা থাকে দেশের জন্য কোন স্থায়ী কাজ করিতে—তবে তোমার এরূপ ভাবে কাজ করা উচিত—যাহাতে বহু বৎসর ধরিয়া কাজ করিবার শক্তি থাকিবে। অবশ্য কোন্ দিন কাহার যাবার ডাক আসিবে কেহ বলিতে পারে না—কিন্তু তা বলে আগে থেকে গলায় ছুরি দিয়ে কোন লাভ নাই বা অতিশয় পরিশ্রম করিয়া শরীর নষ্ট করে কোন লাভ নাই। আমার লেখা বড় কড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ভুল বুঝিবে না। দুঃখের বিষয় তুমি বড় বেশী কাজ হাতে নাও এবং সময়ে সময়ে শরীর সমর্থ না হইলেও মনের জোরের দ্বারা সম্পন্ন কর। এরূপ অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

বুধবার, ২১শে জানুয়ারী

তোমার পরীক্ষার বিস্তৃত খবর পেয়ে সুখী হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ কাজ পেয়েছ শুনে আরও আনন্দিত হইলাম। তুমি ঐ সব কাজে কৃতিত্ব লাভ করিতে

পারিবে আমার বিশ্বাস—তবে আমার একমাত্র আশঙ্কা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য।

এ দেশের "নেটিভদের" কতগুলি গুণ আছে যার জন্য এত বড় হতে পেরেছে। প্রথমতঃ—এরা ঘড়ির মত ঠিক সময়ে সব কাজ করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ এদের একটা robust optimism আছে—আমরা জীবনের দুঃখের বিষয় বেশী ভাবি, এরা জীবনের সুখের এবং আলোর বিষয় বেশী ভাবে। তারপর এদের strong common sense আছে —এবং নিজের জাতীয় স্বার্থ খুব ভাল বুঝে। এখন মোটের উপর দাঁড়িয়েছে আমাদের জলবায়ুর দোষ—আমাদের দেশের হাওয়াটা বদলাইতে হইবে।

তোমার নিজের বিষয় এবং শরীরের বিষয় অযত্নের প্রধান কারণ দাঁড়িয়েছে—ঐ প্রাচ্যদেশের ঔদাসীন্য। "কি হবে শরীরের যত্ন নিয়ে, দু দিনের শরীর দু দিন পরে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে!" এরূপ ঔদাসীন্য কর্মবীরের পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। তোমার একটু প্রতীচ্যের হাওয়া দরকার তবে যদি robust optimism আসে।

বেণীবাবুকে একখানা পত্র দিয়েছি। দত্তগুপ্ত মহাশয়কে এখনও দিই নাই।

* * *

আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই। নিজ অবহেলার জন্য যদি অল্প বয়সে তোমার শরীর নষ্ট হয়—সে অপরাধ তোমারই। অনেক ঘটনার উপর মানুষের হাত থাকে না—কিন্তু তাহা ছাড়া শরীরের অযত্ন করা একটা অপরাধ—সে অপরাধ শুধু নিজের কাছে নয়—পাঁচ জনের কাছে এবং সর্বোপরি দেশের কাছে। আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের শারীরিক সামর্থ্য যদি অল্প বয়সে নষ্ট হয়—তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাহাদের আদর্শের ভিতরে একটা গলদ বা সঙ্কীর্ণতা রয়ে গেছে। তোমার শরীর তোমার নয়—তুমি trustee মাত্র। এইজন্য আমি এত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছি। আমার বিশ্বাস তুমি সে trust অবহেলা করিবে না।

আমার বিস্তৃত পত্র লেখা হয়ে উঠে নাই—বোধ হয় হয়ে উঠবে না। আমার ভুল হয়েছে যে জাহাজে মনে করেছিলাম যে বিলাতে পঁহুছিয়া সময়মত বিস্তৃত পত্র লিখিব। সে সময় আজকাল পাওয়া বড় মুস্কিল।

এখনও বুঝিতে পারি নাই—আমি আদর্শভ্রষ্ট হয়েছি কি না। আমি আত্মপ্রতারণা করিয়া নিজেকে বুঝাইতে চাহি না যে Civil Service-এর জন্য পড়াটা ভাল। চিরকাল ঐ জিনিষটাকে ঘৃণা করিতাম—এখনও বোধ হয় করি—এ অবস্থায় Civil Service-এর জন্য চেষ্টা করা আমার দুর্বলতার নিদর্শন অথবা কোন দূরবর্তী মঙ্গলের সূচক তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমার হিতৈষীরা আমার সম্বন্ধে কোনও hasty opinion না form করেন।

অনেক ঘটনার শেষে এসে না পৌঁছালে তার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। আমার সম্বন্ধেও কি তাহা হইতে পারে না? ইতি—

সুভাষ

৫৯

কেম্ব্রিজ
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২০

হেমন্ত,

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হইলাম। দেশের প্রায় সব কাগজ এবং প্রধান মাসিকপত্র এখানে আসে। তবে পড়িবার সময় নাই—বন্ধুদের মুখে দেশের সব খবর শুনিতে পাই।

প্রফুল্লের কথা শুনে সুখী হইলাম। সুহৃৎ nomination পেয়েছে—এটা কি পাকা খবর?

* * *

তোমার বিস্তৃত পত্র মনের মধ্যে আছে—কতকটা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল কতকটা ভ্রমণ বৃত্তান্তের মত করিতে। সময়াভাবে আর আপাততঃ হয়ে উঠবে না।

তুমি কত কাজ এক সঙ্গে ঘাড়ে নেবে? দোকান, শিক্ষকতা, অধ্যয়ন, নৈশবিদ্যালয়—আরও কত কি। পরিণাম কি? অল্প সময়ের মধ্যে শরীর নষ্ট করে অকর্মণ্য হওয়া। আমাদের দেশের জলবায়ুর এমন দোষ যে moderation এবং enthusiasm-এর মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারি না। যেখানে enthusiasm আছে সেখানে moderation নাই আর যেখানে moderation আছে সেখানে enthusiasm নাই—এবং প্রাণ নাই। তুমি নিজেকে

হাজারই practical মনে কর—এ বিষয়ে practical হওয়ার শিক্ষা এখনও সমাপ্ত করিতে পার নাই।

এখন কেমন আছ? আমি ভালই আছি। দত্তগুপ্তকে এখনও পত্র দিই নাই—বোধ হয় আসছে মেলে দিব। ইতি—

সুভাষ

৬০

Fitz William Hall
Cambridge
২রা মার্চ, ১৯২০

হেমন্ত,

কয়েকদিন হইল তোমার পত্র পাই নাই বা তোমাকে পত্র দিই নাই। যখন সময় কম থাকে তখন শুধু তাদেরই লেখা যায়, যাহাদিগকে দুই লাইনে লেখা যাইতে পারে।

সেদিন "ভারতীয় মজলিসের" বাৎসরিক ভোজ হইয়া গেল। Mr. Horniman আমাদের অতিথি (Guest) হয়ে এসেছিলেন। ওখানকার বিদেশী বন্ধুরাও কেহ কেহ এসেছিলেন। মিসেস রায় গত রবিবারের মজলিসের সভায় Rights of the Indian mother সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বাস্তবিক কবে আবার ভারত রমণীবৃন্দ সমাজের শিক্ষাদাত্রীরূপে আসন গ্রহণ করিবেন? না জাগিলে ভারত মহিলা, ভারত কভু জাগিবে না। যেদিন Mrs. Sarojini Naidu এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেদিন আনন্দে বুক দশহাত ফুলে উঠেছিল—সেদিন দেখিলাম, ভারত রমণীর আজও এমন শিক্ষাদীক্ষা, গুণ, চরিত্র আছে যে পাশ্চাত্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় দিতে পারেন। তারপর লন্ডনে ডাক্তার মৃগেন মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়। দেখলুম ডাক্তার মিত্র moderate in politics কিন্তু মিসেস মিত্র extremist. আনন্দে বুক দশহাত ফুলে উঠল। তারপর "গিরীশদার মা"—মিসেস ধরের সঙ্গে আলাপ হয়—তিনিও extremist. এসব দেখে মনে হয় যে, যে দেশে রমণীর আদর্শ এত উচ্চে সে দেশের উন্নতি না হয়ে পারে না। এদেশে যে সকল ভারতীয় মহিলারা আসেন—আমার বিশ্বাস তাঁদের প্রাণে গভীর স্বদেশ-প্রেমের উদ্রেক হয়, কারণ, মাতৃহৃদয় বড় কোমল ও গভীর।

যাক্, বাজে বক্‌ছি। গিরীশদার সঙ্গে দেখা হয়? তিনি কোথায় ও কেমন আছেন? দেখা হইলে পত্র দিতে বলিও। দোকানের অন্যান্য খবর কি? জগদীশবাবু F. R. S. হয়েছেন শুনছি। তাঁহাকে labour leader-রা বলেছিলেন— "The country which can tolerate Amritsar massacres deserves it". Horniman বাস্তবিক ভারতের বন্ধু। তিনি তাঁর Land of adoption-এ ফিরিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত। Passage পাচ্ছেন না।

* * *

কোন্‌দিকে ভেসে যাচ্ছি জানি না। কোন্ তীরে গিয়ে উঠব তাও জানি না। তবে বিশ্বাস করি তোমাদের ভালবাসা ও আশীর্বাদ না হারাইলে পথভ্রষ্ট হইব না।

হাতের লেখা বোধ হয় দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আজ এই পর্যন্ত, যাক, ওখানকার খবর লিখিও।

৬১

Cambridge
১০ই মার্চ (১৯২০)

হেমন্ত,

তোমার বিস্তৃত পত্র পেয়েছি। কয়েকবার না পড়ে এর উত্তর দিতে পারিব না। সেই জন্য এই মেলে এর উত্তর দিলাম না—শুধু কাজের কথা লিখিলাম।

১। খরচের কথা

প্রথম চোটে কাপড়-জামা এবং জিনিষপত্রের জন্য যে খরচ হবে সেটা বাদ দিলে আমার বোধ হয় £ 250/- তে চলিতে পারে। তুমি বোধ হয় ordinary student হইয়া ভর্তি হইবে না—সুতরাং lecture fees টা বাদ যাবে। Ordinary student-এর পক্ষে চালান বড় শক্ত—কিন্তু আমার বোধ হয় research student- এর কোন কষ্ট হইবে না। এখানে

বৎসরে তিনটা term

অনেক ভাবিয়া মনে হইতেছে যে বলা বড় শক্ত £ 250/- তে চলিবে কি না। এখানে boarding lodging ইত্যাদির জন্য চারি সপ্তাহে (একমাস বলিতে পার) ১৫ থেকে ১৬ পাউণ্ডের কমে হওয়া অসম্ভব। কোনও কোনও কলেজে অনেক বেশী খরচ পড়ে। তারপর University fees এবং বই কেনা, তোমার একটা সুবিধা হইবে যে Ordinary student- এর অপেক্ষা lecture fees কম পড়িবে। এখানে সব University Charges,- term- এর শেষে bill রূপে আসে। বৎসরে তিনটা term, terminal bill -টা বেশ মোটা রকম আসে এবং কোন কোন কলেজের bill বেশী রকম মোটা। term- এর মধ্যে তোমার মাসিক ২১ পাউণ্ডে চলা অসম্ভব। তবে একটা ভরসা যে term-এ মাত্র ছয় মাস যায়। বাকী ছয় মাসে খাওয়া-পরা ছাড়া অন্য কোন খরচ নাই। সুতরাং ঐ সময়ে মাসে ১৫ পাউণ্ডের বেশী খরচ হওয়া উচিত নয়। অতএব বৎসরের শেষে হয়ত £ 250/- তে কুলাইতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমার নিজের বোধ হয় যে তোমার আরও কিছু টাকার সংস্থান করা উচিত—যাহাতে দরকারের সময়ে কাজে লাগিতে পারে। হয়ত হেমবাবু (দত্তগুপ্ত) তোমাকে কিছু ধার দিতে রাজী হইবেন। ঐ টাকাটা fixed deposit- এ তোমার নামে থাকিবে। যদি দরকার না হয়, উনি interst শুদ্ধ ট.কাটা ফেরৎ পাইবেন।—আর যদি খরচ হয় তাহা হইলে তুমি পরে উপার্জন করে শোধ দিবে।

তুমি বৃত্তি থেকে initial outfit- এর জন্য যাহা পাইবে তাহাতে বোধ হয় সব খরচ কুলাইবে না।

২। পড়া সম্বন্ধে

বিলাতে পড়া বিষয়ে তিনটা উপায় আছে—London D. Litt. কিংবা Oxford degree কিংবা Cambridge. Oxford- এর কথা আমি বিশেষ জানি না—খোঁজ করিয়া জানাইব। Cambridge- এ এখন শুধু B. A. Degree আছে, সে Degree তুমি ordinary student রূপে পরীক্ষা দিয়া পাইতে পার কিংবা research student রূপে thesis submit করিয়া পাইতে পার। তুমি অবশ্য research student হইবে। এই বৎসর থেকে একটা নূতন প্রস্তাব হচ্ছে Cambridge- এ Ph. D. খোলা। বোধ হয়, October term- এর পূর্বে এর সব বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। Dr. Taraporewalla বোধ হয় তোমাকে বলিতে পারিবেন—London, Oxford এবং Cambridge- এর মধ্যে কোন্ স্থান তোমার কাজের পক্ষে সুবিধাজনক। খরচ হিসাবে লণ্ডন সব চেয়ে সুবিধা তবে London University- তে অনেক সময় M. A. Examination থেকে exempt করে না এবং M. A. Examination দেওয়া একটা হাঙ্গামের বিষয়। সুনীতিবাবুকে exempt করেছিল কিন্তু সুশীল দেকে exempt করিতে চাহে নাই। London- এর atmosphere লেখাপড়ার পক্ষে মোটেই ভাল নয়। আমার নিজের মনে হয় Cambridge কিংবা Oxford- এর Ph. D.- র জন্য পড়া সবচেয়ে ভাল এবং আশা করি October- এর পূর্বে Ph. D.- র বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে।

তুমি যখন Govt. Scholar তখন Prof. Cozajee- র দ্বারা তিন জায়গায়ই দরখাস্ত করিবে। Oxford এবং Cambridge- এ আজকাল admission পাওয়া শক্ত তবে আশা করি research student- এর পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। সুনীতিবাবু তোমাকে বলিতে পারিবেন—লণ্ডনে থেকে ও'র কি সুবিধা এবং কি কি অসুবিধা হইয়াছে।

Michaelmas term যখন October- এর গোড়ায় আরম্ভ হচ্ছে তখন বেশী আগে এসে বিশেষ লাভ নাই। এখানে June- এর পরে Long vacation— সুতরাং যখন April term- এ তোমার আসা সম্ভব নয় তখন একেবারে October term- এর জন্য আসাই ভাল। আজ এই পর্যন্ত থাক। ইতি—

সুভাষ

৬২

কেম্ব্রিজ

২৩।৩।২০

তুমি স্টেট্ স্কলারসিপ পেয়ে এখানে আসছ, শুনে সুখী হলাম। কোথায় ভর্তি হইবে -সে সম্বন্ধে যা হউক শীঘ্র একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তোমার এখানে দরখাস্ত

করা উচিত। তারপর টাকার সম্বন্ধে। তোমাকে Scholarship বাদে বাৎসরিক £50/- এর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। হয়ত দরকার না হইতে পারে—কিন্তু খুব সম্ভব দরকার হইবে। তারপর outfits- এর কথা। শুনিলাম Govt. Scholarship-এ outfits- এর জন্য কিছু দেয় না। আমার মনে হয় সবশুদ্ধ Outfits-এ প্রায় ১০০০ৎ টাকা পড়িবে—অবশ্য সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে।

তোমার প্রেরিত এম. এ-র তালিকা যথাসময়ে পেয়েছিলাম।

তোমার দীর্ঘ পত্রে অনেক সত্য কথা আছে। তবে দুইটা বিষয়ে ঠিক বল নাই। আমাকে সন্ন্যাসী বললে আমি এখনও চটি না। আমি এখন সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য হইতে পারি—কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলে আমি এখন পূর্বের ন্যায় গৌরব অনুভব করি।

দ্বিতীয়তঃ আমি কাহাকেও বলি নাই, I. C. S. পাশ করিয়া বাংলা দেশে ফিরিব না।

তোমার পত্রের মোটের উপর সবই অনুমোদন করি। উত্তর দিতে গেলে প্রকাণ্ড উত্তর হয়ে যায়। তুমি যখন আসছ, তখন সাক্ষাতে সব কথা এবং বুঝাপড়া হইবে। এখন থাক।

আমি ভালই আছি। তুমি কেমন আছ? ইতি—

(শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত)

৬৩

কেম্ব্রিজ
২৩শে মার্চ (১৯২০)

চারু,

তোমার পত্র পেয়ে এবং পরীক্ষার ফল জেনে সুখী হলাম। তুমি এখন জীবনের পরীক্ষার ভিতরে প্রবেশ করিতেছ—আশা করি তুমি সব পরীক্ষাতেও সমানভাবে কৃতকার্য হইবে।

আমি এ পর্যন্ত বেশী লোকের সঙ্গে মিশিবার অবসর পাই নাই—আশা করি "আগস্টের" পরীক্ষার পর যথেষ্ট সময় পাইব।

নীলমণি, সত্যেন ধর প্রভৃতি ভাল আছে, প্রাণকৃষ্ণ পারিজা এখানে বেশ ভাল research করছে—Botany সম্বন্ধে।

তোমার কি বিদেশে আসবার কোন আশা নাই?

ভারতবর্ষের সব খবরই আমরা এখানে পাই—এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনাও যথেষ্ট হয়। যে নিজের দেশের কথা কখনও ভাবে নাই—সেও এখানে এসে না ভেবে পারে না।

আমার একটা নালিশ আছে। তুমি আমার সব পত্রের উত্তর দাও নাই। আর আমার পত্র না পেলেও কি তোমার পত্র দেওয়া উচিত নয়?

তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে। Dr. Ward- এর Psychology সম্বন্ধে Dr. P. K. Roy যে-সব Pamphlets লিখেছেন আমার সেগুলি চাই। তাছাড়া তোমার M. A.-র Psychology-র Note চাই। আমার এখন বই পড়িবার সময় নাই।—সুতরাং নোটের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

এখানে এসে এবং এখনকার লোকজন ও কার্য-প্রণালী দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশে দুইটি জিনিস খুব বেশী রকম ভাবে চাই—(১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার—(২) Labour Movement.

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে ভারতের উন্নতি চাষা, ধোপা, মুচি, মেথরের দ্বারাই হইবে। কথাগুলি বড় ঠিক। পাশ্চাত্ত্য জগৎ দেখাইয়াছে —"Power of the people" কি করিতে পারে। তার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—The first socialist republic in the world অর্থাৎ Russia। ভারতের উন্নতি যদি কোনদিন হয়—সেটা আসবে ঐ "Power of the People"- এর ভিতর দিয়া।

আধুনিক জগতে যে সব দেশ উন্নত হইয়াছে সে সব দেশে ঐ "Power of the People"- এর জাগরণ হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ "বর্তমান ভারতে" বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন বর্ণের আধিপত্যের দিন গেছে। পাশ্চাত্ত্য জাতের বৈশ্য বর্ণ হচ্ছে—Capitalists and Industrialists, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। Labour Party হচ্ছে ভারতের

শূদ্র বা অস্পৃশ্য জাতি। এরা এতদিন ধরে শুধু কষ্ট করে এসেছে। তাদের শক্তি এবং তাদের ত্যাগের দ্বারা ভারতের উন্নতি হইবে। সেইজন্য আমাদের এখন চাই Mass Education and Labour Organisation.

আজ এই পর্যন্ত থাক, সময় নাই। বইগুলি অবশ্য অবশ্য পাঠাইও, ভালই আছি! আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি—

তোমাদের
সুভাষ

(পরবর্তী তিনখানি পত্র শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

৬৪

Leigh-On-Sea

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

অভিনন্দন বয়ে আনা টেলিগ্রামটি পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আই, সি, এস, পরীক্ষায় পাশ করে আমি যথার্থই কিছু লাভ করলাম কিনা জানিনে, তবে এই সংবাদ এত লোককে খুশী করেছে বিশেষত এই দুঃসময়ে বাবা-মাকে আনন্দ দিয়েছে ভেবে প্রীত হয়েছি।

মিঃ বেট্সের পরিবারের পেয়িং গেস্ট হয়ে আমি এখানে আছি। মিঃ বেট্স সর্বোৎকৃষ্ট ইংরেজ চরিত্রের উদাহরণ। ভদ্রলোক শিক্ষিত, দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং মানসিকতা স্বদেশিকতার কুসংস্কার মুক্ত। সাধারণ একজন ইংরেজের সঙ্গে তাঁর আদৌ কোন মিল নেই—তাঁরা গর্বিত, উগ্র, এবং আত্মাভিমানী, এবং তাঁদের কাছে যা কিছুই অ-ইংরেজ তা-ই খারাপ। রাশিয়া, পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, আয়ারল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশেও মিঃ বেট্সের বন্ধু-বান্ধব আছেন। রুশ, আইরিশ ও ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ আছে, এবং রমেশ দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের লেখার তিনি একজন ভক্ত।

আমি তাঁকে এমন একটা কিছু উপহার দেওয়ার কথা চিন্তা করছি, যা হবে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির একটি প্রতীক। আমার মনে হয় যে তাজমহলের একটা ক্ষুদ্র নকশা তাঁকে দিতে পারলে ভাল হয়। নিঃসন্দেহে তাজমহল আমাদের শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন-গুলির একটি; এবং এই ধরণের একটি উপহার তিনি সানন্দে গ্রহণ করবেন বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এই ধরণের একটি সূক্ষ্ম জিনিস পাঠানোর অসুবিধে হল, এটিকে এমন ভাবে মোড়কে মুড়ে দিতে হবে যাতে কোনরকম ক্ষতির আশংকা না থাকে। তাজমহলের ক্ষুদ্র নকশা কলকাতায় কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু না পাওয়া গেলে আপনি কি জয়পুর আর্ট স্কুলে একটির অর্ডার দিতে পারেন? এটির মূল্য সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই, বড়দাদা বললেন যে কুড়ি-তিরিশ টাকার বেশী নয়। দাম যদি খুব বেশী না হয়; অর্থাৎ চল্লিশ টাকার মধ্যে হয়, তাহলে কি আপনি মিঃ বেট্সকে পাঠানোর জন্য একটির অর্ডার দিতে পারেন? সব চেয়ে ভাল হবে যদি আমার কাছে পাঠানোর পরিবর্তে জিনিসটি সরাসরি মিঃ বেট্সের কাছে পাঠানো হয়। রাস্তায় কোন ক্ষতি হবে না, এই গ্যারান্টি যদি দোকানদার না দিতে পারেন, তাহলে এইরকম একটি জিনিস পাঠানো যুক্তিযুক্ত হবে না।

আমাদের কাছে যে মার্ক-শিট পাঠানো হয়েছে তার একটি কপি আমি বাবাকে পাঠিয়েছি। কাজ হয়ে গেলে, আপনাকে সেটি পাঠিয়ে দিতে লিখেছি।

২৪ তারিখে আমি লন্ডনে ফিরে যাচ্ছি। ৭ই অক্টোবর নাগাদ আমি কেম্ব্রিজে ফিরে যাব। আমার বর্তমান পরিকল্পনা হল আগামী মে অথবা জুন মাসে ময়্যাল সায়েন্স ট্রাইপোস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া। আই, সি, এসের শেষ পরীক্ষায়, হিন্দুস্থানী পাঠের জন্যও আমাকে প্রস্তুত হতে হবে। পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করার জন্য আমি প্রচুর অভিনন্দন পাচ্ছি। কিন্তু আমি একথা বলতে পারি না যে আই, সি, এস চাকরীতে প্রবেশ করার কথা ভেবে আমি পুলকিত। আমাকে যদি আই, সি, এসের চাকরীতে যোগদান করতেই হয়, তাহলে যতখানি অনিচ্ছাসহকারে এই পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা শুরু করে-ছিলেম, ততখানি অনিচ্ছাসত্ত্বেও করব। চাকরী জীবনে একটি মোটা টাকা এবং পরবর্তী জীবনে একটা ভাল পেন্সন আমি নিশ্চয়ই পাব। ক্রীতদাসত্বের বশ্যতা স্বীকার করে থাকলে

আমি সম্ভবত একজন কমিশনারও হতে পারি। গোলামীর মনোভাবের সঙ্গে অন্যান্য গুণ যুক্ত হলে, একজনের পক্ষে কোন প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য-সচিব পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও চাকরীই কি আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ কথা? সিভিল সার্ভিস একজনের জীবনে যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারে, কিন্তু এই প্রাপ্তি কি সত্তার বিনিময়ে নয়? একজনের জীবনের উচ্চতম আদর্শ, এবং আই, সি, এস চাকরী গ্রহণ করলে একজনকে যে সব সর্তাবলীর অধীনতা স্বীকার করতে হয়,—এই দুটিকে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করা আমার মতে ভন্ডামি।

সাধারণ মানুষের চোখে যা সুসম্ভাবনাময় ভবিষ্যত, তার প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থেকে আমার মানসিক অবস্থা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারবেন। এই ধরণের চাকরী গ্রহণ করার স্বপক্ষে অনেক কিছু বলা যেতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—অর্থাৎ অন্ন সংস্থানের সমস্যা—এই চাকরী করলে চিরদিনের জন্য তার সমাধান হয়ে যাবে। জীবনে সফল বা বিফল হওয়ার কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন তাকে হতে হবে না। আমার মতন মানসিকতার একজন মানুষ, যে অদ্ভুত বলা চলে এমন আদর্শে প্রতিপালিত—তার কাছে সামান্যতম প্রতিরোধের জীবন সর্বোত্তম নয়। সংগ্রামহীন, ঝুঁকিহীন জীবন তার অর্ধেক মাধুর্য হারায়। অন্তরে যার জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যভোগের আশা নেই, জীবনের অনিশ্চয়তা তার কাছে কোন আতঙ্ক নয়। সিভিল সার্ভিসের শৃঙ্খলে বদ্ধ থেকে একজনের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ও পরিপূর্ণভাবে দেশের সেবা করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে, জাতীয় এবং আধ্যাত্মিক বাসনার সঙ্গে সিভিল সার্ভিসের শর্তাবলীর অধীনতা স্বীকার সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আমার ইচ্ছে যখন আমার নিজস্ব নয়, তখন এইভাবে কথা বলা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় আমি জানি। আমি নিশ্চিত যে সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে আপনার কোন মোহ নেই। কিন্তু সিভিল সার্ভিসে যোগদানে আমার অনিচ্ছার বাবা নিশ্চিতভাবে বিরোধিতা করবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, জীবনে আমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে তিনি আগ্রহী। তাছাড়া অন্য কোন ভাবে ভবিষ্যত কর্মজীবনের প্রস্তুতি যদি আমাকে চালাতে হয়, তাহলে আপনার কাঁধে আগে থেকেই যে আর্থিক বোঝা রয়েছে, তা অনেকাংশে বাড়বে এবং সেই বোঝার অর্থ আপনার কাছে কি, সেকথা বুঝতে পারব না, আমি এমন হৃদয়হীন নই। সুতরাং মানসিক ও আর্থিক কারণের জন্য আমার ইচ্ছেকে আমি মোটেই নিজস্ব বলতে পারি না। কিন্তু বিন্দুমাত্র সংশয় না রেখে আমি একথা বলতে পারি যে আমার যদি বাছাই করার উপায় থাকত—তাহলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদানে আমি হতাম সর্বশেষ ব্যক্তি।

সিভিল সার্ভিস বর্জন না করে, একজনের উচিত এতে প্রবেশ করা এবং এই চাকরীর অশুভ জিনিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা—যদি আপনি একথা বলেন হয়ত তা খুব ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু, যদি আমি তা-ই করি তাহলে যে কোনদিন আমার অবস্থা এমন অসহ্য হয়ে উঠতে পারে যে পদত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় নেই। আজ থেকে পাঁচ কিংবা দশ বছর পরে যদি এই সংকট দেখা দেয়, তাহলে জীবনে নতুন কোন রাস্তা করে নেওয়ার মতন সন্তোষজনক অবস্থায় আমি আর থাকব না। অন্যদিকে আজ, অন্য জীবন বেছে নেওয়ার মতন পর্যাপ্ত সময় আমার আছে।

দোষদর্শী কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, চাকরীর গদীতে নিরাপদ হওয়ামাত্র আমার সমস্ত 'তেজ' নিমেষে উবে যাবে। কিন্তু এই ধরণের নিস্তেজকারী প্রভাবের কাছে বশ্যতা স্বীকার করব না, যে বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি বিবাহ করব না। অতএব কোন বিশেষ কর্মপন্থা যদি সর্বাপেক্ষা খাঁটি বলে আমি মনে করি, তবে সে পথ অবলম্বন করায় জাগতিক দূরদর্শিতার সম্ভাবনা আমাকে বিলম্বিত করে দেবে না।

আমার গঠন যেরকম, তাতে আমার গভীর সন্দেহ আছে যে সিভিল সার্ভিসের পক্ষে আমি উপযুক্ত লোক কি না। আমার কিন্তু মনে হয় যে যৎসামান্য ক্ষমতার আমি অধিকারী, তা আমার নিজের এবং দেশের ভালোর জন্য অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে ব্যবহার করা যেত।

এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে আমি আগ্রহী। এই বিষয়ে আমি বাবাকে কিছু লিখিনি—জানি না সত্যিই কেন। তাঁর মতামতটাও আমি জানতে উৎসুক।

যদি আপনাকে আবার বিরক্ত করতে আসে তবে আপনি তাদের সোজা পিট্‌টান দিতে বলবেন।

আমি এখানে ভাল আছি। আপনারা সকলে কেমন আছেন? বাবা-মা এখন কোথায়?

আপনার স্নেহের

সুভাষ

৬৫

২৬শে জানুয়ারী
১৯২১

...আপনি বলতে পারেন যে এই কুৎসিত ব্যবস্থাকে পরিহার না করে এর ভিতরে প্রবেশ করে, এর সংগে সংগ্রাম করাই আমার কর্তব্য। কিন্তু সে সংগ্রাম করতে হবে একাকী কর্তৃপক্ষের হুমকি ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী সহ্য করে, উন্নতির পথ বন্ধ করে। চাকরীর মধ্যে থেকে এইভাবে যেটুকু উপকার করা যায় সেটুকু বাইরে থেকে যা করা যায়, তার তুলনায় যৎসামান্য। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্যই সার্ভিসের আওতায় অনেক কাজ করে-ছিলেন, তবু আমার মনে হয় আমলাতন্ত্রের বাইরে থাকলে তাঁর কাজ দেশের পক্ষে অনেক বেশী মংগলজনক হত। তাছাড়া এক্ষেত্রে প্রকৃত প্রশ্নটি নীতিগত। নীতি অনুসারেই আমি এই শাসনযন্ত্রের অংশ হওয়ার কথা চিন্তা করতে পারি না। গোঁড়ামিতে স্বার্থান্ধ শক্তিতে হৃদয়হীনতায় সরকারী মার-প্যাঁচের জটিলতায় এই শাসনযন্ত্র বিকল। এর প্রয়োজনের দিন বিগত।

আমি এখন এই দুইপথের সংযোগস্থলে উপস্থিত এবং কোন মধ্যপথ আশ্রয় করবার কোন উপায় নেই। হয় আমাকে এই জঘন্য চাকরীর মায়া ত্যাগ করে সর্বান্তঃকরণে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে, নতুবা সমস্ত আদর্শ আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে হবে...আমি জানি আমার এই বিপজ্জনক হঠকারিতায় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই তুমুল সোরগোল তুলবে।...কিন্তু তাঁদের মতামতে, নিন্দায়, বা প্রশংসায় আমার কিছুই যায় আসে না। কিন্তু আপনার আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে তাই আপনার কাছে আবেদন করছি। পাঁচ বছর আগে এই সময়ে আমার পক্ষে বিপর্যয়কারী একটি ঘটনায় আপনার নৈতিক সমর্থন পেয়েছিলাম। এক বছরের জন্য সেই সময় আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বোধ হয়েছিল। তবু আমি তার সমস্ত পরিণাম নির্ভয়ে, মাথা পেতে নিয়েছিলাম। কখনও নিজের কাছে অভিযোগ করিনি এবং সে ত্যাগ স্বীকার করতে পেরেছিলাম বলে আজও গর্ব অনুভব করি। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করে মনে বল পাচ্ছি।

আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হচ্ছে যে ভবিষ্যতে আত্মত্যাগের যে কোনও আহ্বানকে আমি দৃঢ়তা সাহস এবং ধৈর্যের সংগে গ্রহণ করব। পাঁচ বছর আগে আপনি স্বেচ্ছায় এবং মহৎভাবে আমাকে যে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন, আজও তার ব্যতিক্রম হবে না, এমন আশা কি সত্যিই দুরাশা?...

এবার বাবাকে তাঁর সম্মতি ভিক্ষা করে আলাদা ভাবে লিখলাম। আশা করি আপনি যদি আমার সংগে একমত হন তাহলে বাবাকেও তাতে সম্মত করবার চেষ্টা চালাবেন। আমার স্থির বিশ্বাস. এ বিষয়ে আপনার মতের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

(ইংরাজী থেকে অনুদিত)

৬৬

কেম্ব্রিজ
১৬. ২. ২১

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

শিলঙে তোলা ছবিগুলির কয়েকটির কপি পাওয়ার আশায় আছি। মনে হয় তারা এখন পৌঁছনোর পথে।

সরোজবাবু কি তাঁর নিজের একটি ফার্ম করেছেন? আমাকে তিনি যে চিঠি লিখেছেন, তা থেকে একথাই মনে হয়।

আপনার ২০শে জানুয়ারীর চিঠি আমি গত শনিবার পেয়েছি। ছেলেমেয়েরা কেমন আছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। আমি শুনলাম, অশোকের নাকি সম্প্রতি উন্নতি হয়েছে। বোলপুর ইস্কুল সম্বন্ধে আমি যা জানি তা থেকে মনে হয় যে বিমলকে সেখানে পাঠানোর

সিদ্ধান্ত খুব সঠিক। আশা করি বড়দিদি এ প্রস্তাবে সম্মতি দেবেন।

আপনি হয়ত ইতিমধ্যেই আমার সেই 'বিস্ফোরক' চিঠিটি পেয়েছেন। সেই চিঠিতে আমার পরিকল্পনার যে ছক এঁকেছি, পরবর্তী চিন্তা তাকে আরও দৃঢ় করেছে। সামাজিক বিরোধিতা বলা যায় এর একমাত্র অসুবিধা। পার্থিব কোন মানুষ আমার এই দুঃসাহসিক উদ্যমের অনুমোদন করবে না। সাধারণ মানুষের সেই আদর্শবোধের অভাব, একমাত্র যে আদর্শ, সাধারণ জীবন থেকে স্বতন্ত্র অন্য কিছু ভাবতে শেখায়। আমি নিশ্চিত যে আপনি আমাকে সমর্থন করবেন। যদি চিত্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে সব কিছু বর্জন করে, জীবনের সব রকম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে আমার মতন একজন যুবক, জাগতিক কোন দুশ্চিন্তা যাকে বিড়ম্বিত করে না, তার পক্ষে এ কাজ আরও বেশী করে করা সম্ভব। এই চাকরী বর্জন করলে অন্নসংস্থান করার মতন চাকরীর আমার অভাব হবে না। শিক্ষকতা, সমাজসেবা, সমবায় ঋণদান, সাংবাদিকতা, পল্লীসংগঠন—হাজারো উৎসাহী যুবককে ব্যস্ত রাখার জন্য এমন আরও কত কাজ আছে। ব্যক্তিগতভাবে, এই মুহূর্তে আমি শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতা করতে আগ্রহী। জাতীয় কলেজে এবং নতুন কাগজ 'স্বরাজে' আমার কাজকর্মের প্রচুর সুবিধে আছে।

হয় জাতীয় কলেজের একজন অধ্যাপক হিসাবে, কিংবা যে কোন জাতীয়তাবাদী পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য হয়ে, কিংবা দুভাবেই আমি জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট অর্থ আয় করতে পারব বলে আশা করি। আমার চাহিদা অত্যল্প এবং অল্পেতেই আমি সন্তুষ্ট।

কয়েক মাস আগে আমি যখন বর্তমানে এই চাকরী গ্রহণ করার কথা চিন্তা করছিলাম, আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার জন্য যত টাকা খরচ হয়েছে, মোটামুটি সমপরিমাণ টাকা সঞ্চয় করে তারপর চাকরী থেকে পদত্যাগ করে জনকল্যাণমূলক কাজে যোগদান করা। সেই টাকা আমি গোপালি কিংবা সতীর কিংবা বড় দিদির কোন ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের জন্য সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। আমি অনুভব করেছিলাম (এবং এখনও করি) যে পরিবারের পরিজনের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে—বিশেষত আমি নিজে যখন বিদেশে অধ্যয়নের সুযোগ ভোগ করেছি। কিন্তু সন্দেহ হয়, আমার কাঁধের উপর যে নৈতিক কর্তব্য আছে, তা পালনের পক্ষে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায় কি না। আমি আরও চিন্তা করে দেখেছি যে যদি আমি এই চাকরীতে টিঁকে থেকে কেবলমাত্র অর্থ সঞ্চয় করি, তাহলে আমি যতটা ভাল করতে পারব, এই চাকরী থেকে পদত্যাগ করলে তার চাইতে অনেক বেশী ভাল করতে পারব। চাকরী থেকে পদত্যাগ করে না চাকরীতে যোগদান করে—কিভাবে আমি আমার নৈতিক দায়িত্ব ভালভাবে পালন করতে পারি, সে বিষয়ে আপনি সিদ্ধান্ত দিন। ব্যক্তিগতভাবে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এই চাকরীতে যোগ না দিলে আমি অনেক বেশী কিছু করতে পারব। আত্মত্যাগ দিয়ে জীবন আরম্ভ, সরল জীবন, উঁচু চিন্তা, দেশের কাজে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ—আমার কল্পনা ও অনুরাগের কাছে এগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তদুপরি, একটি বিদেশী আমলাতন্ত্রের অধীনতা স্বীকার করার নীতিরই আমি ঘোরতর বিরোধী। অরবিন্দ ঘোষের কর্মপন্থা আমার কাছে বেশী মহৎ, বেশী অনুপ্রেরণাদায়ক, বেশী উন্নত, অধিকতর স্বার্থত্যাগী, যদিও তা রমেশ দত্তের কর্মপথের চেয়ে বেশী কণ্টকিত।

দারিদ্র্য ও সেবার শপথ নেওয়ার অনুমতি চেয়ে আমি বাবা-মাকে লিখেছি। যন্ত্রণাভোগ এই পথের অন্তিম পরিণতি, একথা ভেবে তাঁরা হয়ত ভয় পেতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি যন্ত্রণাভোগে ভীত নই—সত্যি কথা বলতে কি, এর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চাইতে তাকে সাদরে বরণ করাই আমার অভিপ্রায়।

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। আপনারা সকলে কেমন আছেন?

কোন সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত আমি বিষয়টিকে গোপন রাখব।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

পুঃ—পদত্যাগ করলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি বাড়ি ফিরব। জুন মাসের গোড়ার দিকে পরীক্ষা হবে, আর এক পক্ষ কালের মধ্যেই তার ফল বেরিয়ে যাবে। সুতরাং, বড়দাদার সঙ্গে আমি জুনেই ফিরতে পারি। রাহা খরচের সব টাকা আমাকে অবশ্য সেই সময়ের মধ্যে

ইণ্ডিয়া আফিসকে ফেরৎ দিতে হবে। মার্চ মাসের শেষাশেষি এই ভাতার দ্বিতীয় কিস্তি (৫০ পাউণ্ড) এবং জুন মাসের শেষে তৃতীয় কিস্তি পাব।

স. চ. ব।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত

৬৭

The Union Society
Cambridge
১৬ই ফেব্রুয়ারী। (১৯২১)

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

আপনি আমাকে বোধ হয় চিনেন না—কিন্তু আমার পরিচয় দিলে বোধ হয় চিনিতে পারিবেন। আপনাকে আমি খুব প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে এই পত্র লিখিতেছি—কিন্তু কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে আমাকে নিজের sincerity আগে প্রমাণ করিতে হইবে। সেই জন্য প্রথমে নিজের পরিচয় দিতেছি।

আমার পিতা শ্রীজানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানকার গভর্ণমেন্ট প্লিডার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টের barrister। আপনি আমার পিতাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন এবং আমার দাদাকে নিশ্চয়ই চেনেন।

পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম। ১৯১৬ সালের গোলমালের সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে expelled হই। দুই বৎসর নষ্ট হইবার পর আমি কলেজে পড়িবার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাশ করি এবং Honours-এর প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এখানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে আমি Civil Service পরীক্ষা পাশ করি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করি। এই বৎসর জুন মাসে আমি Moral Science Tripos পরীক্ষা দিব। সেই মাসে আমি এখানকার B. A. Degree পাইব।

এখন কাজের কথা বলি। সরকারী চাকুরী করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। আমি বাড়িতে লিখিয়াছি বাবাকে এবং দাদাকে যে, আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিতে চাই। আমি এখনও উত্তর পাই নাই। তাঁদের অনুমতি পাইতে হইলে, আমাকে দেখাইতে হইবে আমি চাকুরী ছাড়িবার পর কি tangible কাজ করিতে চাই। আমি অবশ্য জানি যে, চাকুরী ছাড়িয়া আমি যদি কোমর বাঁধিয়া দেশের কাজে অবতীর্ণ হই তাহা হইলে করিবার আমার অনেক আছে—যথা, জাতীয় কলেজে শিক্ষকতা, পুস্তক ও খবর কাগজ প্রণয়ন ও প্রকাশ, গ্রাম্য সমিতি স্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি। কিন্তু আমি যদি এখন বাড়িতে দেখাইতে পারি আমি কি tangible কাজ করিতে ইচ্ছা করি—তাহা হইলে বোধ হয় চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে অনুমতি সহজে পাইব। আমি যদি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া চাকুরী ছাড়িতে পারি তাহা হইলে বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই।

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি সব চেয়ে ভাল জানেন। শুনিলাম আপনারা কলিকাতায় এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ইংরাজী ও বাংলায় "স্বরাজ" পত্রিকা বাহির করিতে চান। আমি আরও শুনিলাম বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে গ্রাম্য সমিতি প্রভৃতিও স্থাপন করা হইয়াছে।

আমি জানিতে ইচ্ছা করি আপনারা আমাকে এই স্বদেশ সেবার যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছু নাই—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যৌবনোচিত উৎসাহ আমার আছে। আমি অবিবাহিত। লেখাপড়ার মধ্যে আমি Philosophyটা একটু পড়েছি কারণ কলিকাতায় আমার ঐ বিষয়ে Honours ছিল এবং এখানেও আমি ঐ বিষয়ে Tripos পড়িতেছি। Civil Service পরীক্ষার কৃপায় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা খানিকটা হইয়াছে—যেমন Economics, Political Science, English and European History, English Law, Sanskrit, Geography ইত্যাদি।

আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যদি নিজে এই কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমি এখানকার ২/১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকে এই কাজে টানিতে পারিব। কিন্তু আমি নিজে

যতক্ষণ এই কাজে না নামিতেছি, ততক্ষণ কাহাকেও টানিতে পারিতেছি না।

এখন আমাদের দেশে কোন্ কোন্ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার সুবিধা আছে তাহা এখান থেকে বুঝিতে পারিতেছি না। তবে আমার মনে হইতেছে যে, দেশে ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকায় লেখা—এই দুই কাজে হাত দিতে পারিব। আমার ইচ্ছা —Clear-Cut Plans লইয়া চাকুরী ছাড়িতে। তাহা করিতে পারিলে চাকুরী ছাড়ার পর আমাকে চিন্তায় সময় ব্যয় করিতে হইবে না এবং আমি চাকুরী ছাড়ার সংগে সংগে কর্মক্ষেত্রে নামিতে পারিব।

আপনি আজ বাংগলা দেশে স্বদেশ সেবা যজ্ঞে প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তার তরংগ চিঠি ও খবরকাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শুনা গিয়াছে। Oxford থেকে একজন মাদ্রাজী ছাত্র তার লেখাপড়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে—সেখানে গিয়া কাজ আরম্ভ করিবার জন্য। Cambridge-এ এ-পর্যন্ত কাজ কিছু হয় নাই যদিও "অসহযোগিতা" সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশী রকম চলিতেছে। আমার বিশ্বাস, যদি কেহ পথ দেখাইতে পারে তাহা হইলে সেই পথ অনুসরণ করিবার লোক এখানে আছে।

আপনি বাংগলাদেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।

আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য—শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপনি আমাকে এই বিপুল সেবা যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমি তাহা জানিতে পারিলে বাড়িতে—বাবাকে এবং দাদাকে সেইরূপ লিখিতে পারিব এবং নিজের মনকেও সেইভাবে প্রস্তুত করিতে পারিব।

আমি এখন একরকম সরকারী চাকর। কারণ আমি এখন I. C. S. Probationer। আপনাকে চিঠি লিখিতে সাহস করিলাম না পাছে চিঠি Censored হয়। আমার জনৈক বিশ্বাসী বন্ধু শ্রীপ্রমথনাথ সরকারকে আমি এই চিঠি পাঠাইতেছি—তিনি আপনার হাতে এই চিঠি দিয়া আসিবেন। আমি যখনই আপনাকে পত্র দিব—তখন এই ভাবেই দিব। আপনি অবশ্য আমাকে চিঠি লিখিতে পারেন কারণ এখানে চিঠি Censored হইবার ভয় নাই।

আমার এখনকার মতলব সম্বন্ধে আমি কাহাকেও জানাই নাই—শুধু বাড়িতে বাবাকে এবং দাদাকে লিখিয়াছি। আমি এখন সরকারী চাকর—সুতরাং আশা করি যে আমি যে পর্যন্ত চাকুরী না ছাড়িতেছি সে-পর্যন্ত আপনি কাহাকেও এ বিষয়ে কিছু বলিবেন না। আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।

আমার নিজের মনে হয় যে, আপনি যদি "স্বরাজ" পত্রিকা ইংরাজীতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমি সেই পত্রিকার Sub-editorial Staff-এ কাজ করিতে পারি। তা ছাড়া "জাতীয় কলেজের" নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে পারি।

কংগ্রেসের বিষয়ে আমার মনে অনেক প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী আড্ডা চাই। তার জন্য একটা বাড়ি করা চাই। সেখানে একদল Research Student থাকিবেন—যাঁহারা আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবেন। আমি যতদূর জানি Indian Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও definite policy নাই। তারপর Native States দের প্রতি কংগ্রেসের কিরূপ attitude হওয়া উচিত তাহা বোধ হয় স্থির করা হয় নাই। Franchise (for men and women) সম্বন্ধে কংগ্রেসের কি রকম মত তাহাও বোধ হয় জানা নাই। তারপর Depressed Classes দের লইয়া আমাদের কি করা উচিত তাহাও বোধ হয় কংগ্রেস ঠিক করে নাই। এই বিষয়ে (অর্থাৎ Depressed Classes সম্বন্ধে) কোন কাজ না করার দরুন মাদ্রাজে আজ সব Non-Brahmin-রা Pro-Government এবং anti-nationalist হইয়াছে।

আমার নিজের মনে হয় যে Congress-এর একটা Permanent Staff রাখা দরকার। ইহারা এক একটা সমস্যা (Problem) লইয়া গবেষণা করিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে

up-to-date facts and figures সংগ্রহ করিবে। এই সব facts and figures সংগৃহীত হইলে Congress Committee প্রত্যেক বিষয়ে (Problem-এ) একটা Policy formulate করিবে। আজ অনেক জাতীয় Problem সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন definite policy নাই। আমার সেই জন্য মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী বাড়ি চাই এবং স্থায়ী Staff of research Students চাই।

তা ছাড়া Congress-এর একটা Intelligence Department খোলা দরকার। Intelligence Department-এ দেশের সম্বন্ধে up-to-date সব খবর facts and figures যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। Propaganda Department থেকে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া Propaganda Department থেকে এক একটি বই প্রকাশিত হইবে। সেই পুস্তকে কংগ্রেসের Policy বুঝান হইবে এবং কি কি কারণের নিমিত্ত কংগ্রেসের এইরূপ Policy হইয়াছে তাহাও লেখা থাকিবে। আমি অনেক লিখিয়া ফেলিলাম। আপনার কাছে এই সব কথা পুরাতন। আমার কাছে খুব নূতন বলিয়া মনে হইতেছে বলিয়া আমি না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে যে কংগ্রেস সংক্রান্ত বিপুল কাজ আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে। আপনারা ইচ্ছা করিলে আমি এ বিষয়েও বোধ হয় কিছু করিতে পারিব।

আপনার মতের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। আপনি কি কি কাজে আমাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহা জানিবার জন্য আমি ব্যগ্র আছি। যদি আপনাদের অভিপ্রায় থাকে কাহাকেও বিলাতে পাঠাইতে Journalism শিখিতে তাহা হইলে আমি সে কাজের ভার লইতে পারি। আমাকে যদি সে ভার দেন তাহা হইলে passage এবং outfit-এর খরচ বাঁচিয়া যাইবে। অবশ্য এ কাজের ভার লইবার পূর্বে আমি চাকুরী ত্যাগ করিব, অবশ্য আমার থাকা ও খাওয়ার খরচ দিবেন—কারণ চাকুরী ছাড়ার পর বাড়ি থেকে টাকা লওয়া বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

আমার নিজের ইচ্ছা যে যদি চাকুরী ছাড়ি তাহা হইলে জুন মাসেই রওনা হইব। তবে প্রয়োজন হইলে আমি নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।

আমার বহুভাষিতা ক্ষমা করিবেন। আশা করি যথাশীঘ্র উত্তর দিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি—
প্রণত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

আমার ঠিকানা—
Fitz William Hall
Cambridge.

শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

৬৮

কেম্ব্রিজ
২৩. ২. ২১

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

গত ডাক পর্যন্ত আপনার কোন চিঠি নেই। মনে হয় আপনি এখন সাতিশয় ব্যস্ত।

সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে পরিবর্তে জনসেবামূলক কাজে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে আমি ইতিমধ্যেই আপনাকে একাধিক চিঠি লিখেছি। আমার এই ইচ্ছার আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছি এবং তা গভীরভাবে চিন্তা করেছি। মানসিক উত্তেজনার মুহূর্তে আমি যে এ সিদ্ধান্তে আসিনি, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এক দিক থেকে সিদ্ধান্তটি নৈরাশ্যজনক মনে হতে পারে, কিন্তু এটি আমার জীবন সম্পর্কিত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত। আই-সি-এস পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর থেকেই আমি মনকে প্রশ্ন করছি কিভাবে আমি আমার দেশের বেশী উপকারে আসতে পারি; চাকরী গ্রহণ করে না বর্জন করে। এ বিষয়ে আমি এখন স্থিরনিশ্চিত যে, আমলাতন্ত্রের একজন সভ্য না হয়ে জনগণের একজন হলে আমি আরও ভালভাবে দেশসেবা করতে পারব। একথা স্বীকার্য যে চাকরীতে প্রবেশ করেও একজনের পক্ষে কিছু কিছু ভাল

কাজ করা সম্ভব; কিন্তু আমলাতন্ত্রের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে যে কাজ করা চলে, তার সঙ্গে এর তুলনা করা যায় না। তাছাড়া, আগের একটা চিঠিতে যেমন লিখেছি, এ ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হল নীতিগত এবং একটি বিদেশী আমলাতন্ত্রের সেবা করার নীতির সঙ্গে আমি কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি না। তাছাড়া, জনগণের সেবার জন্য প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপ হল যাবতীয় জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ—এবং জাতীয় স্বার্থে সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ।

একজন আই-সি-এসকে যে সব শর্তের অধীন হয়ে বাঁচতে হয় এবং কাজ করতে হয়, আপনি জানেন সেগুলি আমার মানসিকতা, শিক্ষা ও জীবন সম্পর্কে আমার সাধারণ দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এমতাবস্থায়, যে শর্তাবলীর মধ্যে থেকে কাজ করলে আমি যারপরনাই দুর্দশায় পড়ব, সেই সব শর্তাবলী গ্রহণ করা চূড়ান্ত অযৌক্তিক কাজ হবে। অন্যদিকে, ত্যাগ, কষ্টস্বীকার এমনকি দারিদ্র্যের জীবনও আমার কাছে সর্বাংশে শ্রেয়; যদি তা দেশের জাতীয় স্বার্থে হয়।

জীবনের অনিশ্চয়তায় আমি ভীত নই, একথা আমি এর আগে একাধিকবার বলেছি। আমি যে নিজে থেকেই আমার জীবনে আর্থিক দৈন্যদশা ও শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ডেকে আনছি, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী—আমার কাজের যে কোন প্রতিকূল ফলাফলের জন্য আমি প্রস্তুত।

অরবিন্দ ঘোষের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমার দৃষ্টিপথে বিশালাকারে প্রতিভাত হয়। সেই দৃষ্টান্ত থেকে আমি অনুভব করি যে তাঁর মত আমিও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আমার অবস্থাও এক্ষেত্রে সহায়ক। আমাদের পরিবার মোটামুটি স্বচ্ছল (বড় দিদি এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা ছাড়া); এবং আমার কোন জরুরী সামাজিক দায়িত্ব নেই। আমার বিশ্বাস আমার মনের গঠন একজন তপস্বীর মতন, এবং তা আমাকে ভবিষ্যতে যে কোন দুর্ভাগ্য ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করার শক্তি যোগাবে। সর্বোপরি, আমি অবিবাহিত, এবং তাই থাকব আশা করি। এমন সহজ অবস্থার কথা কে আশা করতে পারে?

সম্ভব হলে বড়দাদাকে সঙ্গে নিয়ে, ডিগ্রী পাওয়ার পর, জুনে বাড়ি ফিরব ভাবছি। কলকাতায় ফিরে ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনা করা আমার ইচ্ছে। এর সঙ্গে কলকাতার জাতীয়তাবাদী কোন দৈনিক কাগজে নিযুক্ত হবার ইচ্ছেও আছে। আমার মনে এছাড়া আরো অনেক পরিকল্পনা আছে—যেমন, সমাজসেবা, জনশিক্ষা, সমবায় ঋণদান সমিতি, এবং জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বিষয়ে একটি গবেষণা-বিভাগের আয়োজন। অর্থ ও জনবল হলে, এই পরিকল্পনাগুলি পরে হাতে নেব। সে যাই হোক, কলকাতায় ফিরে ব্যস্ত থাকার মতন আমি পর্যাপ্ত কাজ পাব।

এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে আপনি আমার প্রস্তাবের সন্তোষজনক উত্তর দেবেন। একমাত্র অসুবিধে হল, আমাদের পরিবারের প্রায় কেউই আমার এই অদ্ভুত প্রস্তাব অনুমোদন করবেন না। সর্বত্র ভীষণ সোরগোল পড়ে যাবে, তবে সত্যের পথে অবিচল থাকলে তাতে শঙ্কিত হবার কিছু নেই।

অনুরোধ উপরোধ ছাড়াই আমার জন্য যতটুকু করতে পারেন, এবং আমি আপনার কাছে যতটুকু আশা করতে পারি, আপনি তা-ই করেছেন। আমার মনে হয় যে একধরনের নৈতিক দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়েছে, যদিও সে দায়িত্বের অর্থ বা ব্যাপকতা আমি যথেষ্ট বুঝতে পারছি না। এর ফলে আমার মনে হচ্ছে যে পদত্যাগ বিষয়ে আমার প্রস্তাব নির্দ্বিধায় নির্দয়। এই প্রস্তাবের অর্থ হল এই যে, আমার জন্য যে দশ-হাজার টাকা খরচ হয়েছে তা কোন রকমভাবে ফল দেবাব নয়। কিন্তু আমার পদত্যাগের প্রস্তাবে আপনাকে যখন সম্মতি দানে অনুরোধ করি তখন তা ব্যক্তিগত অনুগ্রহের জন্য করি না; করি আমাদের হতভাগ্য দেশের জন্য, যার এখন একনিষ্ঠ সেবকের অত্যন্ত প্রয়োজন। কোন রকম ফল পাওয়ার আশা না করে আপনাকে মনে করতে হবে, যে অর্থ আপনি আমার জন্য ব্যয় করেছেন তা হল মাতৃ-চরণে পূজার্পণ।

আমার পদত্যাগের বিষয়ে আপনাকে আমি এই শেষ চিঠি লিখছি। বাবা-মাকেও আমি একই অনুরোধ করছি। আমি জানি যে আপনার সম্মতি পাব। এর পরের উপরের পরীক্ষা ২৩শে এপ্রিল বা তার কাছাকাছি শুরু হবে। সেই তারিখের আগেই আমি এ চিঠির উত্তর পাব আশা করি এবং খুব সম্ভবত সেই পরীক্ষায় আমাকে আর বসতে হবে না।

এই প্রস্তাব করতে আমার যতখানি মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়েছে, সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে আপনার আরও বেশী শক্তির প্রয়োজন। তবে আমি নিশ্চিত ভাবে একথা জানি

যে আপনি ততখানি মানসিক শক্তির অধিকারী। আমার প্রস্তাবের মর্ম সম্পর্কে আপনি দৃঢ় প্রত্যয়ী হলে আশা করব সম্মতি দান উহ্য রাখার জন্য আপনি কোন বিষয় বিবেচনা করতে বলবেন না।

অরবিন্দ ঘোষ আমার আধ্যাত্মিক গুরু। তাঁর কাছে এবং তাঁর উদ্দেশ্যর কাছে আমি আমার জীবন ও সত্তা সমর্পণ করেছি। আমার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত এবং অপরিবর্তনীয়, কিন্তু আমার ভবিষ্যত বর্তমানে আপনার হাতে।

পরিবর্তে কি আপনার আশীর্বাদ আমি আশা করতে পারি না? আমার এই নতুন ও বিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রায় আমি কি আপনার শুভকামনা পাব না?

আপনার স্নেহের
সুভাষ

পুঃ—আপনার ২ তারিখের চিঠি পেয়ে আপনারা সকলে ভাল আছেন জেনে সুখী হলাম। আমরা এখানে বেশ ভালই আছি। আপনাদের সকলের কি খবর?

সুভাষ

(ইংরাজী থেকে অনূদিত)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত

৬৯

The Union Society
Cambridge
২রা মার্চ, ১৯২১

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

কয়েকদিন পূর্বে আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছি—আশা করি যথাসময়ে তাহা পাইয়াছেন।

আপনি বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমি চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে এক রকম কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমি কি কি কাজের জন্য উপযুক্ত হইতে পারি তাহা আপনাকে পূর্বপত্রে জানাইয়াছি। দেশে এখন কি রকম কাজের সুবিধা আছে তাহা এখান হইতে ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আছেন—সুতরাং আপনারা খুব ভাল রকম জানেন কি রকম কাজের সুবিধা এখন আছে এবং এখন কি রকম কর্মী লোকের দরকার।

আমার এই অনুরোধ যে, যে পর্যন্ত আমার চাকুরী ছাড়ার খবর না পাইতেছেন, সে পর্যন্ত যেন এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলেন। চাকুরী ছাড়িলে আমি জুন মাসের শেষে দেশে ফিরিতে ইচ্ছা করি অবশ্য যদি সময় মত Passage পাই। দেশে ফিরিলে কি রকম কাজে হাত দিতে পারিব তাহা জানিবার জন্য উৎসুক আছি—কারণ মনটাকে সেইভাবে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি। তা ছাড়া দেশে গিয়ে যে রকম কাজ আরম্ভ করিব, তদুপযোগী লেখাপড়া এখানে থাকিতে করাও সম্ভব। আশা করি, আপনি যতশীঘ্র পারেন এ বিষয়ে একটা উত্তর দিবেন।

আমার নিজের কতকগুলি মতলব মনে আসিতেছে—আপনাকে তাহা জানাইতেছি।

(১) "জাতীয় কলেজে" আমি শিক্ষকতা করিতে পারি।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র আমার যৎকিঞ্চিৎ পড়া আছে।

(২) আপনারা যদি কোন দৈনিক খবরের কাগজ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি Sub-Editorial Staff-এ কাজ করিতে পারি।

(৩) আপনারা যদি 'কংগ্রেসের' সংক্রান্ত একটা research department খোলেন, তাহা হইলে আমি তাহাতেও কাজ করিতে পারি। আমার গত পত্রে আমি এ সম্বন্ধে খানিকটা লিখিয়াছি। আমার মনে হয়, একদল research students আমাদের চাই। তাহারা জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া সেই সম্বন্ধে facts সংগ্রহ করিবে। কংগ্রেস তারপর একটা Committee নিযুক্ত করিবে—এই Committee সেই সব facts বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে কংগ্রেসের একটা policy ঠিক করিবে।

Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের Congress-এর কোন বিশিষ্ট Policy নাই, তারপর Labour and factory legislation সম্বন্ধেও কংগ্রেসের কোন

বিশিষ্ট Policy নাই। তারপর Vagrancy and Poor Relief সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও বিশিষ্ট Policy নাই, তারপর 'স্বরাজ' পাইলে আমাদের Constitution কি রকম হইবে, সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট Policy নাই। আমার নিজের মনে হয় যে, Congress-League Scheme একেবারে পুরানো হয়ে গেছে। স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের এখন ভারতের Constitution তৈয়ারী করিতে হইবে।

আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে Congress এখন existing order ভাঙ্গিতে ব্যস্ত। সুতরাং ভাঙ্গার কার্য সম্পূর্ণ না হইলে Constructive কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে-কোন সমস্যা সম্বন্ধে একটা Policy ঠিক করিতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি Complete Programme প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা 'স্বরাজ' পাইব সেইদিন কোন বিষয়ে কোন Policy-র জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না।

তারপর কংগ্রেসের একটা Intelligence Department চাই—যেখানে দেশের সব খবর পাওয়া যেতে পারে। এই Department থেকে ছোট ছোট বই প্রকাশ করা দরকার। এক একটা বইতে এক একটা বিষয় থাকিবে—যথা গত দশ বৎসরের মধ্যে কত জন্ম এবং কত মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ রোগে কত মৃত্যু হইয়াছে।

তারপর, গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষের অবস্থা—আয় ও ব্যয় (Revenue and Expenditure) কত হইয়াছে—কোন্ কোন্ দিক থেকে আয় হইয়াছে—এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যয় হইয়াছে তাহা আর একটা বইতে প্রকাশিত হইবে। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবনের সব দিককার খবর ক্ষুদ্র পুস্তকের ভিতর দিয়া দেশময় প্রচার করিতে হইবে।

(৪) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়া কাজ করিবার অনেক সুবিধা আছে। এই কাজের সঙ্গে Co-operative Banks প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক।

(৫) Social Service.

আমার নিজের মনে হচ্ছে যে, এই কয় বিষয়ে কাজ করিবার সুবিধা আছে। কিন্তু আপনাকে বিবেচনা করিতে হইবে, আপনি আমাকে কোন্ বিভাগে চান। তবে শিক্ষকতা এবং Journalism বোধ হয় আমার মনের মত কাজ হইবে। এই নিয়ে আমি এখন আরম্ভ করিতে পারি, তারপর সুবিধা মত অন্য কাজেও হাত দিতে পারি। আমার পক্ষে চাকুরী ছাড়া মানে দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করা সুতরাং বেতন সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না, খাওয়া-পরা চলিলেই আমার যথেষ্ট হইবে।

আমি যদি বদ্ধপরিকর হইয়া কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমার বিশ্বাস আমি আমার সঙ্গে এখানকার ২/১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকেও এই কাজে টানিতে পারিব।

স্বদেশ সেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আপনি তাহাতে বঙ্গদেশের প্রধান পুরোহিত। আমার যাহা বক্তব্য আমি তাহা শেষ করিয়াছি—এখন আপনি আমাকে আপনার বিপুল কাজের মধ্যে স্থান দিন।

আমি চাকরী ছাড়িলেই এখানে পাঁচজনে জিজ্ঞাসা করিবে আমি দেশে ফিরিয়া কি কাজ করিব। সুতরাং নিজের সন্তোষের জন্য এবং পাঁচজনের কাছে Self-justification-এর জন্য আমি জানিতে উৎসুক আপনি আমাকে কি কাজ দিতে পারেন।

আশা করি আপনি এসব কথা আপাততঃ গোপন রাখিবেন।

আপনি আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি—
বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

৭০

অক্সফোর্ড
৬ই এপ্রিল, '২১

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ১২ই মার্চের চিঠি যথাসময়ে হাতে পৌঁছেছে। এই চিঠিতে যে ভাবপ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে তা আমাকে অত্যন্ত অভিভূত করেছে। আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে না হলেও

বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে আপনি একমত জেনে সন্তুষ্ট হলাম।

গত আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ থেকে একটি চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে। তা হল কিভাবে বাবা-মা-এর প্রতি এবং আমার নিজের প্রতি কর্তব্যপালনে, একটা সমন্বয় সাধন করা যায়। শুরু থেকেই লক্ষ্য করেছি যে বাবা আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন, এমনকি আমার অভিপ্রায় তাঁর কাছে নিতান্ত অযৌক্তিক ঠেকেছে। সুতরাং ভয় পেয়ে—বাবাকে দুঃখ দেবার চিন্তায় কম্পিত হয়েই আমি আপনাকে আমার ইচ্ছের কথা বাবাকে জানাতে বলেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, সরাসরি ভাবে তাঁকে লেখার মতন মানসিক ক্ষমতা আমার তখন ছিল না। সে গত সেপ্টেম্বর মাসের কথা, এবং সে চেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে আপনি ভালভাবেই অবহিত আছেন।

তখন থেকে আমার মনের ভিতর এক ঝড় বয়ে চলেছে—সম্পৃক্ত বিষয়গুলি বিচার করলে যে ঝড় অত্যন্ত তিক্ত ও পীড়াদায়ক। মনের বিরোধ মেটাতে আমি সক্ষম হই নি। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যদিকে অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে আমরা যারা বড় হয়েছি—দুর্ভাগ্যজনকভাবেই হোক আর সৌভাগ্যজনকভাবেই হোক তাদের মানসিকতা এই রকম দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মতামতের মধ্যস্থ কোন কিছুকে গ্রহণযোগ্য মনে করে না। এমনও হওয়া সম্ভব যে এতকাল আমি এক ভ্রান্ত দর্শনে মনকে প্রতিপালিত করেছি। কিন্তু যুব-মানসের একটি বৈশিষ্ট্য হল সে অন্যের চাইতে নিজের সম্পর্কে বেশী আস্থাশীল। সম্ভবত, তা দুর্ভাগ্যজনক, তবু তা-ই সত্যি।

আপনি ভাল জানেন যে অতীতে আমি শুধু বাবা-মার নয় অন্য অনেকের এমনকি আপনারও গভীর দুঃখের কারণ হয়েছি। সেজন্য আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করি নি, ভবিষ্যতেও করব না। মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা আমি নিয়ন্ত্রিত ছিলাম বলে, জ্ঞানগতভাবে ও নৈতিকভাবে বিদ্রোহ করা ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। তখন আমার একমাত্র ইচ্ছা ছিল সেই পরিমাণ স্বাধীনতা অর্জন, যতখানি স্বাধীনতা আমার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী চরিত্র গঠনের জন্য এবং নিজস্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী ভাগ্য গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন।

তারপর অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। একটির পর একটি পারিবারিক মৃত্যুর শোক আমাদের আঘাত হেনেছে। কয়েকবছর আগে বাবা-মার স্বাস্থ্যের অবস্থা যেমন ছিল, এখন আর তেমনটি নেই। বর্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তাঁদের গভীর দুঃখের কারণ হওয়া আমার পক্ষে অতীব যন্ত্রণাদায়ক হবে—অতিশয় নির্মম। তাঁদের এত দুশ্চিন্তা ও দুঃখের কারণ হওয়ার জন্য, পরবর্তী জীবনে আমি নিজেকে ক্ষমা করে দিতে পারব না, জানি। কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমি কি আমার মতামত থেকে ভ্রষ্ট হব?

আমি উপলব্ধি করি যে আমাদের মোটামুটি শান্ত পরিবারে এতাবৎকাল অশান্তির সৃষ্টি আমিই করেছি। এর কারণ হল এই যে কতকগুলি ধারণা আমাকে পেয়ে বসেছে, এবং যে ধারণাগুলি দুর্ভাগ্যজনকভাবে অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

বাবার ধারণা যে, নতুন শাসনতন্ত্রের অভ্যন্তরে, একজন উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারীর জীবন খুব অস্বস্তিকর মনে হওয়ার কথা নয়, এবং দশ-বছরের মধ্যেই আমরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাব। কিন্তু নতুন শাসনতন্ত্রের অভ্যন্তরে আমার জীবন স্বস্তিকর না অস্বস্তিকর হবে, আমার প্রশ্ন তা নয়। তাছাড়া আমি যদি এই চাকরীতে যোগও দিই, কিছু উপযোগী কাজও করতে পারব বলে মনে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হল নীতির। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি একটি বিদেশী শাসনযন্ত্রের আনুগত্য স্বীকার করা আমাদের উচিত হবে, কিংবা এক মুষ্টি অন্নের জন্য আত্ম-বিক্রয়? যাঁরা আগে থেকেই এ চাকরীতে বহাল রয়েছেন, কিংবা যাঁদের পক্ষে এ চাকরী ছাড়া সম্ভব নয়, তাঁরা এ কাজ করতে পারেন। কিন্তু, অনেক দিক থেকে সুবিধেজনক অবস্থায় দাঁড়িয়েও কি এক্ষুনি বশ্যতা স্বীকার করা আমার উচিত হবে? যেদিন আমি চুক্তিপত্রে সই করব, সেই দিন থেকেই আমি আর স্বাধীন মানুষ থাকব না।

দশবছরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনাধিকার পাব বলে আমি বিশ্বাস করি; এবং সুনিশ্চিত-ভাবে তারও আগে, যদি আমরা তার মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি। সেই মূল্য ত্যাগে, কষ্ট-স্বীকারে। কেবলমাত্র ত্যাগে এবং কষ্টস্বীকারের ভিত্তিভূমিতেই আমরা আমাদের জাতীয় সৌধ নির্মাণ করতে পারি। আমরা সবাই যদি চাকরীতে বাঁধা পড়ি কিংবা কেবলই নিজের নিজের স্বার্থরক্ষা করি, পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও স্বায়ত্তশাসন আমাদের করায়ত্ত হবে বলে আমার মনে হয় না। প্রতিটি পরিবার এমন কি প্রত্যেকটি ব্যক্তির এখন মায়ের পদমূলে

তার উপহার অর্পণ করার সময় এসেছে।

অন্য কেউ যদি এগিয়ে আসতেন, সেক্ষেত্রে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া কিংবা অপেক্ষা করার আমার কারণ থাকত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কেউই এখনও এগিয়ে আসেন নি, অথচ বহুমূল্য সময় বয়ে যাচ্ছে। সিভিল সার্ভিসের চাকরীতে যত বিরোধিতা প্রদর্শনই করা হোক না কেন, এতৎসত্ত্বেও এ কথা সত্যি যে এখনও পর্যন্ত একজনও চাকরী ছেড়ে দিয়ে গণ-আন্দোলনে যোগ দেবার সাহস দেখিয়ে উঠতে পারেন নি। ভারতবর্ষেও এই আহ্বান পৌঁছেছে কিন্তু এখনও সাড়া মেলে নি। দৃষ্টি আরো প্রসারিত করে বলতে পারি যে ভারতবর্ষে সমগ্র ব্রিটিশ শাসনকালে একজন ব্যক্তিও দেশসেবার ইচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিভিল সার্ভিসের চাকরী বর্জন করেন নি। এখন ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অন্যান্য চাকুরীয়াদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপনের সময় এসেছে। যদি চাকুরীয়ারা তাদের আনুগত্য অস্বীকার করেন কিংবা এমনকি অস্বীকার করার ইচ্ছেও পোষণ করেন—তাহলে, কেবলমাত্র তাহলেই, আমলাতন্ত্রের যন্ত্র ভেঙ্গে পড়বে।

সুতরাং এই ত্যাগ স্বীকার থেকে কি করে নিজেকে নিবারিত করব আমার জানা নেই। এই ত্যাগের অর্থ কি আমি জানি। এর অর্থ দারিদ্র্য, যন্ত্রণাভোগ, কঠোর পরিশ্রম, এবং সম্ভবত আরও অনেক কষ্টস্বীকার, যার সম্বন্ধে আমার পরিষ্কার করে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ সেগুলি যে কি তা আপনি ভালই বুঝতে পারছেন। কিন্তু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে—সচেতনভাবে এবং সুচিন্তিত ভাবে।

বাবার ধারণা, তথাকথিত নেতৃবর্গের অধিকাংশই স্বার্থত্যাগী নন। কিন্তু আমাকে স্বার্থত্যাগ থেকে বিরত করার কি এটা কোন কারণ? যদি কেউ স্বার্থত্যাগী হতে চায়, তবে অনিবার্যভাবেই সে তার পরিবারের দুর্দশা ও দুশ্চিন্তার কারণ হবে। আমরা নিজেরা আত্মত্যাগে প্রস্তুত না হয়ে, অন্য ব্যক্তি আত্মত্যাগী নয়—এমন অভিযোগ আনতে পারি না।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমার ক্ষুদ্র উপহার সঙ্গে নিয়ে, আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমাকে এগিয়ে আসতেই হবে এবং যেহেতু এই ত্যাগস্বীকার অবশ্যম্ভাবী সেই হেতু তাকে হাসিমুখে মেনে নেওয়াই শ্রেয়। বাবার ভয় যে এইভাবে আমি হয়ত আমার কর্মজীবনে সর্বনাশ এবং ভবিষ্যত জীবনে অবর্ণনীয় যন্ত্রণাভোগ ডেকে আনছি। কিন্তু যেদিন আমি পদত্যাগ করব, সেই দিনটি যে আমার জীবনের সবচাইতে গর্বের, সুখের সময়—একথা যে কি করে তাঁকে বোঝাব আমি বুঝতে পারছি না।

বাবা আমাকে এই ত্যাগস্বীকার করা থেকে রক্ষা করতে চান। যে আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসার টানে তিনি আমার নিজেরই স্বার্থে আমাকে একাজ থেকে নিরস্ত করতে চান, তা বুঝতে পারব না আমি এমন নির্মম নই। স্বভাবতই তিনি আশঙ্কা করছেন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমি হয়ত একটু তাড়াতাড়ি করে ফেলছি কিংবা যুবমনের প্রবল উত্তেজনায়, অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে পড়েছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত যে ত্যাগস্বীকার করতেই হবে—অন্তত কাউকে না কাউকে।

দেশে ফিরে পদত্যাগ করার যে প্রস্তাব আপনি রেখেছেন তা অত্যন্ত সুবিবেচনাপ্রসূত, কিন্তু এর বিরুদ্ধে দু-একটি যুক্তি দেখানো যেতে পারে। প্রথমত, দাসত্বের প্রতীক চুক্তিপত্রে সই করা আমার পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। দ্বিতীয়ত, আমি যদি চাকরী গ্রহণ করি তাহলে প্রচলিত নিয়মানুসারে ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসের আগে আমার দেশে ফেরা সম্ভব নয়। যদি এখন পদত্যাগ করি, হয়ত জুলাইতেই ফিরতে পারব। ছয় মাসে, গঙ্গার জল অনেক দূর বইতে পারে। যথাসময়ে যথেষ্ট সাড়া না পেলে হয়ত সমস্ত আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়বে, এবং সাড়া মিলতে যদি অনেক দেরী হয়ে যায় তাহলে আন্দোলনে হয়ত কোন ফল হবে না। আমার বিশ্বাস, এই রকম একটি আন্দোলন গড়ে উঠতে আরো কয়েক বছর সময় লাগবে, এবং তাই আমার মনে হয় যে বর্তমান আন্দোলনের স্রোতে গা ভাসানো অবশ্য আবশ্যক। আমাকে যদি পদত্যাগ করতে হয়, তাহলে কাল-ই করি আর একবছর পরেই করি, তাতে আমার কিংবা আমাদের কারুর কিছু যায় আসে না। কিন্তু পদত্যাগে দেরী করলে, হয়ত অন্যদিকে আন্দোলনের উপর তার প্রতিকূল প্রভাব পড়বে। আমি ভালই জানি যে এ আন্দোলনে আমি সামান্য সাহায্য করার চাইতে বেশী কিছু করতে সক্ষম নই। কিন্তু আমার কর্তব্য সম্পন্ন করে যদি আমি সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি, তবে তা-ও খুব বড় ব্যাপার হবে।

বাঙলাদেশের অবস্থা ও তার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করেই আমার বাড়ি ফেরার

ন-ক্ষণ ঠিক করতে হবে। আমি যে কাজ করি, তার বাইরেও আমাদের জাতীয় জীবনের বহুবিধ সমস্যার বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য আমাকে সময় দিতে হবে। এই সব সমস্যা সম্পর্কে সুগভীর অধ্যয়নই কেবলমাত্র একজন মানুষকে বুদ্ধিমানের মতন সেবা করার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে।

বছর দুয়েকের চাকরী—বিশেষত লর্ড সিনহার শাসনে—আমাকে ভবিষ্যত জীবনে সাহায্য করবে না। ডিস্ট্রিক্ট অফিসার হিসাবে দু-বছরের কাজ অবশ্যই মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পক্ষে সহায়ক হবে। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট অফিসার হতে মোটামুটি বছর আটেক সময় লাগবে, এবং মহকুমা শাসক হতে দু-বছর বা তিন-বছর। প্রথম বছরে মোটামুটি অফিসের, বা করণিকের কাজকর্ম করতে হয়।

আপনি যেমন বলেছেন, এই আন্দোলন এখন এক অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল অবস্থায়। কিন্তু এটিকে যথোপযোগী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের। অপেক্ষা ও লক্ষ্য রাখার Asquithian পদ্ধতি গ্রহণ আমাদের কোন কার্যকরী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে না।

এই আন্দোলন হয় সফল হবে, নয় বিফল। যদি সফল হয়, তবে তা হবে আমাদের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও; যে ঔদাসীন্য গর্হিত অপরাধ। যদি তা বিফল হয়, তবে এ আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের উপরই বর্তাবে।

দেশের ঘটনাবলীর অগ্রগতি সম্পর্কে আমার কোন অতিরঞ্জিত ধারণা নেই। এই আন্দোলন সন্তোষজনকভাবেই এগিয়ে চলবে, এ সম্বন্ধে যদি আমি নিশ্চিত হতে পারতাম, তাহলে অনায়াসেই অপেক্ষা করা যেত। আন্দোলন বিফল হওয়ার কিংবা শিথিল হওয়ার আশঙ্কাতেই আমি এখনই এতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই, যাতে অবস্থার উন্নতি ঘটাতে খুব বেশী দেরী না হয়ে যায়।

আমি ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছি, এই গুজব কলকাতায় কে ছড়িয়েছে আমি জানি না। কিছু কিছু লোক আমার সম্বন্ধে আমার চাইতে বেশী জানে বলে মনে হচ্ছে।

মিলিটারি কমিশন বসানোর জন্য আমি আবেদন করেছি, যদিও এ বিষয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। কেম্ব্রিজের ভারতীয় ছাত্ররা সেখানকার Officers' Training Corps-এ ভর্তি হওয়ার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। Michaelmas Term ১৯২০-তে, অন্তর্ভুক্তির জন্য যাঁরা আবেদন করেছিলেন আমি তাঁদের মধ্যে একজন। কিন্তু আমরা কেবলমাত্র কেম্ব্রিজে থাকাকালীন সময়ের জন্যই ট্রেনিং চেয়েছিলাম। আবেদনপত্রে আমি পরিষ্কার করে লিখেছিলাম যে আমি আই সি এস চাকরীতে পরীক্ষাধীন। এটা পরিষ্কার যে যখন আমি আই সি এস থেকে পদত্যাগ করবো H.M.-এর সেনাবাহিনী সম্পর্কে আমার আর কোন দায়িত্ব থাকতে পারে না।

দেশে ফেরার অব্যবহিত পরেই আমি শিক্ষকতা করতে পারি, কিন্তু স্থায়ী পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাই আমার পছন্দ। আমার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আয় করতে তা সাহায্য করবে।

যদি কোন কারণে, পদত্যাগের ব্যাপারে আমার মতের পরিবর্তন হয়, বাবাকে টেলিগ্রাম করে জানাব। তাতে তাঁর দুশ্চিন্তা লাঘব হবে।

আপনারা সকলে কেমন আছেন? এখানে আমরা ভাল আছি।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরাজী থেকে অনূদিত)

৭১

১৬ হারবার্ট স্ট্রীট
কেম্ব্রিজ
২২। ৪। ২১

রাইট্ অনারেবল ই. এস. মনটেগু, এম্ পি
ভারত সচিব

মহাশয়,

আমি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রোবেশনার্স (probationers) তালিকা থেকে আমার নাম প্রত্যাহার করে নিতে চাই।

এই প্রসঙ্গে আমি জানাচ্ছি যে ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফল অনুযায়ী আমি মনোনীত হয়েছিলাম।

এখন পর্যন্ত আমি £ ১০০ (একশ পাউন্ড) ভাতা পেয়েছি। আমার পদত্যাগ গৃহীত হওয়া মাত্র আমি এই অর্থ ইণ্ডিয়া অফিসে ফেরৎ পাঠিয়ে দেব।

আপনাদের অনুগত
সুভাষচন্দ্র বসু

(ইংরাজী থেকে অনূদিত)

(শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত)

৭২

ফিটজ্ উইলিয়াম হল, কেম্ব্রিজ
২২শে এপ্রিল, ১৯২১

ভাই চারু,

তুমি জান কর্তব্যের আহ্বানে একবার জীবন-তরী ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। সেই তরী এখন রম্যকাননে উপনীত হয়েছে যেখানে Power, Property, Wealth করতলগত। কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে সাড়া আসছে—"তোমার এতে আনন্দ নাই। তোমার একমাত্র আনন্দ—সাগরের ঊর্মিমালার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেড়ানো।"

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ তাঁরই হাতে জীবন-তরী ভাসিয়ে দিলাম। তিনি জানেন, এ তরী কোথায় পোঁছবে।

কি করব এখনও ঠিক করতে পারিনি। একবার ইচ্ছে হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবো। একবার ইচ্ছা হচ্ছে—বোলপুরে যাব। আবার ইচ্ছে হচ্ছে সাংবাদিক হব। দেখা যাক কি হয়।

ইতি—
তোমার সুভাষ।

পরবর্তী তিনখানি পত্র শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

৭৩

কেম্ব্রিজ
২০. ৪. ২১

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

গত দু-সপ্তাহ আপনার কোন খবর পাই নি। মেজবৌদিদির অবস্থা জানতে আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।

আমি পদত্যাগ করেছি. এই গুজব দু-মাস আগে কলকাতায় কেমন করে রটল আমি জানি না। কলকাতায় মাত্র একজনকে আমি আমার ইচ্ছার কথা জানিয়েছি, এবং তিনি একথা প্রকাশ করেন নি। আমার মনে হয় যে কয়েকজন লোকের এইরকম আশা গুজবের আকার নিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে।

আগামী পরশু দিন আমি আমার পদত্যাগপত্র পেশ করব। এ সপ্তাহে আমি কলকাতার দুজনকে এ বিষয়ে লিখেছি এবং এ নিয়ে হৈ চৈ না বাঁধাতে তাদের অনুরোধ করেছি। আমি যে নিশ্চিতভাবেই পদত্যাগ করতে যাচ্ছি, এই খবরটা এখানে মাত্র গত কয়েকদিন হল ফাঁস হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়। অতএব, একথা ভেবে আমি শঙ্কিত হচ্ছি যে স্থানীয় কিছু লোক হয়ত ভারতবর্ষে এ খবরটি পাঠাবে, এবং সেখানে এটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। অনেক কারণে আমি এই উত্তেজনা এড়িয়ে চলতে চাই। প্রথমত, উত্তেজনা ও কলরবমুখর প্রশংসা আমি অপছন্দ করি। দ্বিতীয়ত, যদি কোন উত্তেজনার সৃষ্টি না হয় তাহলে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরতে পারি। তৃতীয়ত, মেজদিদির বর্তমান শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আমি আমার পদত্যাগের ঘটনাটি বাবার শ্রুতি-গোচর হতে দিতে চাইছি না। মেজদিদির অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর থেকে আমি বাবাকে আমার পদত্যাগের বিষয়ে কোন কথা লিখি নি। কিন্তু, এটিকে গোপন রাখা আদৌ সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। তবুও, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।

অক্সফোর্ডে থাকার সময় আমার মনের ভিতরে ঝড় বয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কি কি

কারণে আমাকে পদত্যাগ করার পথ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করল, পরের চিঠিতে আমি বিস্তারিত ভাবে সে সব কথা লিখব।

এই মুহূর্তে আমাকে টাকা পাঠানো নিয়ে আপনার চিন্তিত হবার কারণ নেই, বিশেষত যখন মুদ্রা বিনিময়ের হার এমন অসন্তোষজনক। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে যথেষ্ট টাকা ধার দিতে চেয়েছে এবং সে টাকায় বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত আমার ভালভাবেই চলে যাবে। বর্তমানে তাদের যে উদ্বৃত্ত আছে, তা থেকেই তারা আমাকে ধার দিচ্ছে বলে আমি সে টাকা নিতে দ্বিধাবোধ করি নি। আমি পাউণ্ডে ধার নেব, এবং আগামী কয়েকমাসে যদি মুদ্রাবিনিময় হারের কোন উন্নতি হয়, তাহলে ভারতবর্ষ থেকে সে টাকা শোধ করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। আমাকে ধার দিয়ে তাদের কোন ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে না (ব্যাঙ্কের সুদ ছাড়া) কিন্তু আমি প্রভূত উপকৃত হচ্ছি। কয়েকমাসের মধ্যেই মুদ্রাবিনিময়ের হারে উন্নতি হবে বলে আশা করছি।

আগামী সপ্তাহের গোড়াতেই আমি আসন সংরক্ষণের আবেদন করব। জুন মাসের শেষাশেষি আমার বাড়ি ফেরার ইচ্ছে। Mersageries Maritimes-এর একটি বার্থ যোগাড় করার চেষ্টা করব, বিফল হলে B.I.S.N-এ কিংবা City Line-এ।

আপনার চিঠিগুলিতে আপনি আমার অনেক গুণের কথা লিখেছেন; আমি সেসব কথার কতখানি যোগ্য, তা ভালই জানি। চিঠিতে আপনার যে মহৎ মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে, আমি তাতে অতীব আন্দোলিত। এই মানসিকতা আপনারই সাজে, এবং আমি এটুকুই বলব যে আমি আপনার সম্পর্কে গর্বিত। মতামতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে অগ্রজ দাদার কাছ থেকে এর চাইতে বেশী সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ উত্তর পাবার আশা কেউ করতে পারে না।

কত অন্তরে আমি ব্যথা দিয়েছি, কত গুরুজনের অবাধ্যতা করেছি, আমি জানি। কিন্তু এই বিপদসংকুল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমার একমাত্র প্রার্থনা—তা যেন আমাদের প্রিয় দেশের মঙ্গলের জন্যই হয়।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

৭৪

ইউনিয়ন সোসাইটি
কেম্ব্রিজ
২৩. ৪. ২১

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

গত দু-সপ্তাহে আপনার কোন চিঠি পাই নি। বাবার চিঠিতে জানতে পারলাম যে ইস্টারের সপ্তাহে আপনি কটকে গিয়েছিলেন। মেজদিদির অবস্থা জানতে আমি উদ্গ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু আপনারা সকলে কেমন রহস্যজনক ভাবে তাঁর সম্পর্কে নিশ্চুপ হয়ে আছেন।

পদত্যাগের বিষয়ে ফিট্জ উইলিয়াম হলের সেন্সর মিঃ রেড্ডাওয়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আশাতীত ভাবে তিনি সর্বান্তঃকরণে আমার এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। তিনি বলেছেন যে আমি মত পরিবর্তন করেছি জেনে তিনি বিস্মিত, এমনকি বেদনাহত হয়েছেন, কারণ তাঁর জানার মধ্যে কোন ভারতীয় নাকি ইতিপূর্বে একাজ করে নি। আমি তাঁকে বলেছি যে পরবর্তী জীবনে আমি সাংবাদিকতা করতে চাই এবং তিনি ক্লান্তিকর এক-ঘেয়ে সিভিল সার্ভিসের চাকরীর চেয়ে সাংবাদিকতার জীবন বেশী আকর্ষণীয় বলে মনে করেন।

এখানে আসার আগে গত তিন সপ্তাহ আমি অক্সফোর্ডে ছিলাম, এবং সেখানেই আমার বিবেচনার শেষ অধ্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে। একমাত্র যে চিন্তা আমাকে গত কয়েকমাস যাবৎ পীড়া দিয়ে এসেছে তা হল, এতগুলি মনে বিশেষত বাবা-মার মনে প্রভূত দুঃখ ও অসন্তোষের সঞ্চার করে, এই পথ বেছে নিয়ে নীতিগতভাবে আমি সঠিক কাজ করছি কি না।

আগের একটি চিঠিতে আপনাকে লিখেছিলাম, একথা আমার মনে হয়েছে যে, নিজে বিদেশে শিক্ষালাভের সুযোগ অর্জন করে, পরিবারের অন্যদেরও সেই সুযোগ দেবার জন্য আমার সর্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত; কিংবা অন্যভাবে অন্তত এমন কিছু করা উচিত যাতে আমাদের পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হয়। যেহেতু আমার কোন জাগতিক কামনা নেই,

এবং যেহেতু আমি চিরকুমার থাকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেহেতু সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কোন চিন্তা আমাকে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে নি। কিন্তু একথা আমার মনে হয়েছে যে পারিবারিক সব স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার আগে এ বিষয়ে আমার স্থিরনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, আরও উচ্চতর কোন কর্তব্যের অনুপ্রেরণায় আমি সত্যিই একাজ করছি। সে একটি ভণ্ড, যে সহোদরকে ঘৃণা করে অথচ বলে ঈশ্বরকে ভালবাসে—যীশুখৃষ্টের এই তীক্ষ্ণধী উক্তি আমাকে মনে করে দিয়েছে যে উচ্চতর উদ্দেশ্যসিদ্ধির মোহে বিবশ হয়ে হয়ত পার্থিব কর্তব্য অবহেলা করা প্রায়ই সম্ভব।

একথা আমার সর্বদাই মনে হয়েছে যে, আপনার কাঁধে এই বিরাট আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়ত আমাদের পক্ষে অন্যায়—যদিও আমাদের আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য আমি কার্যকরী তেমন কোন কিছু করতে পারি নি। ফলত আমি অনুভব করেছি যে সেই দায়িত্ব-ভার লাঘব করে, তার কিছুটা নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার চেষ্টা আমার করা উচিত। বাবা অবসর নেবার পর আপনার উপর আরও আর্থিক দায়িত্ব এসে পড়বে একথা ভেবে একাজ করা আমার একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। এ বিষয়ে আমি যা ভেবেছি, চিঠিতে আপনাকে তা জানিয়েছি। আপনার উত্তর-ও এসেছে। উত্তরটা যতখানি সম্ভব মহানুভবতার পরিচায়ক, এবং এই উত্তরে আপনি আমার বর্তমানের নৈতিক দায়িত্ব থেকে আমাকে অবলীলায় মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এতৎসত্ত্বেও, আমি মনে করি যে নৈতিক কর্তব্যজাল থেকে আমি মুক্ত হই নি, ভবিষ্যতেও হব না—যদি না ও যতদিন পর্যন্ত আমি আমার ভাবী কর্মজীবনে সন্তুষ্ট হবার মতন পুরোদস্তুর এবং বলিষ্ঠ কোন কাজ করতে পারি।

একথা গোপন করার প্রয়োজন নেই যে, যে কাজ আমি করেছি তার জন্য অন্য কারুর চাইতে বাবা, মা এবং আপনার কাছে আমি বেশী করে দায়ী বলে মনে হয়েছে। যদিও নৈতিক কর্তব্য আইনগত কর্তব্যের চাইতে গভীরতর এবং এক পক্ষের বা উভয়পক্ষের ইচ্ছেয় তাকে ত্যাগ করা চলে না, তবুও আপনি নৈতিক কর্তব্যপালন করা থেকে আমাকে রেহাই দিতে চেয়েছেন। অক্ষমতার সংগে কাজ করে বাবা-মাকে সন্তুষ্ট করা তাঁদের প্রতি আমার কর্তব্য নয়। আমার নিজের স্বার্থের জন্যই তাঁরা এই ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, এবং স্বভাবতই একথা ভেবে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন যে যদি আমি সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করি তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত আমি দুঃখ ও দারিদ্র্য ডেকে আনব। একথা আমি কিছুতেই তাঁদের বোঝাতে পারছি না যে, যে পথ আমি গ্রহণ করতে চলেছি তা হবে আমার পক্ষে পরম সুখ-প্রদ, যে প্রকৃত সুখের পরিমাপে কেবল পাউন্ড, শিলিং, পেন্স দিয়ে হয় না—যে আমি যদি এ চাকরীতে টিকে থাকি তাহলে আমার অবস্থাটা সর্বদা হবে এমন একজন অপরাধীর মতন যার নিজের দৃঢ় প্রত্যয় ফলবতী করার সাহস নেই। স্বভাবতই, জীবনের বাহ্যিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের উপরই তাঁদের মত প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা আমি ভালভাবেই উপলব্ধি করি যে আমার উপর তাঁদের অকৃত্রিম স্নেহবশতই তাঁরা আমাকে অনিশ্চয়তার সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার পরিবর্তে, জীবনে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে এগিয়ে চলতে দেখতে আগ্রহী।

আমার অবস্থাটা সুতরাং এই রকম যে, নতুন কর্মজীবনে প্রবেশ করলে আমি তা করব বাবা, মার সুস্পষ্ট ইচ্ছের এবং আপনার উপদেশের বিরুদ্ধে, যদিও আপনি 'যে পথই আমি গ্রহণ করি না কেন তার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন পাঠিয়েছেন।'

সিভিল সার্ভিসে যোগদানের ব্যাপারে আমার যেটা সবচাইতে বড় আপত্তি তা হল এই যে, সেক্ষেত্রে আমাকে চুক্তিপত্রে সই করতে হবে। সই করার অর্থ হল একটি বিদেশী আমলাতন্ত্রের অধীনতা স্বীকার, যেটির আমার মতে,—তা সে ঠিকই হোক আর ভুলই হোক—অস্তিত্ব রক্ষার কোন নৈতিক অধিকারই নেই। একবার এই চুক্তিপত্রে সই করলে, তিন দিন, তিন বছর, বা ত্রিশ বছর চাকরী করি, নীতিগতভাবে কিছু যায় আসবে না। এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে আপোষ ব্যাপারটি মন্দ, এর ফলে মানুষের অধঃপতন হয় এবং তার উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওটেনকে মারার ব্যাপারে যখন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছিল, আমি সেই ব্যাপার সম্পর্কে আমার যোগাযোগের কথা অস্বীকার করেছিলাম। আমি তখন এই মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম। পরবর্তীকালে আমি আই, ডি, এফ-এ যোগদান করার সময় আমি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অধীনতা স্বীকার করার শপথ নিয়েছিলাম, যদিও অন্তরের অন্তঃস্তলে কোন রকম অধীনতা অনুভব করি নি। এসব দৃষ্টান্ত থেকে আমার শিক্ষা হয়েছে যে একটি আপোষ থেকে অন্য একটি আপোষের জন্ম হয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি যে কেবল নাইট উপাধি আর মন্ত্রীত্ব সম্বল করে জীবন

বিলাতে ব্যারিস্টারি অধ্যয়নরত শরৎচন্দ্র বসু

কেম্ব্রিজে সুভাষচন্দ্র

কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র ১৯২৪

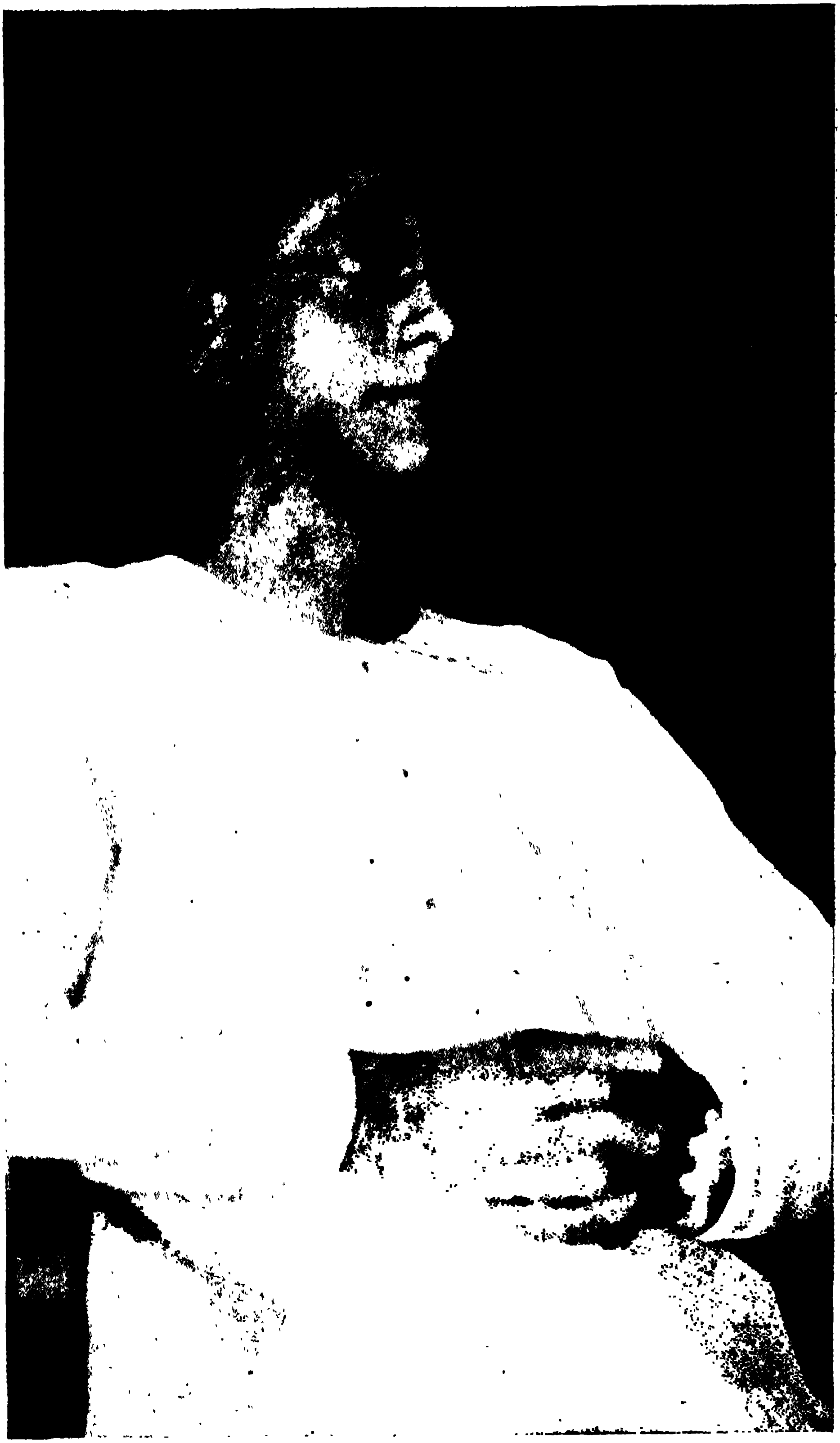

মান্দালয় জেল থেকে প্রত্যাগত সুভাষচন্দ্র

জানকীনাথ বসু

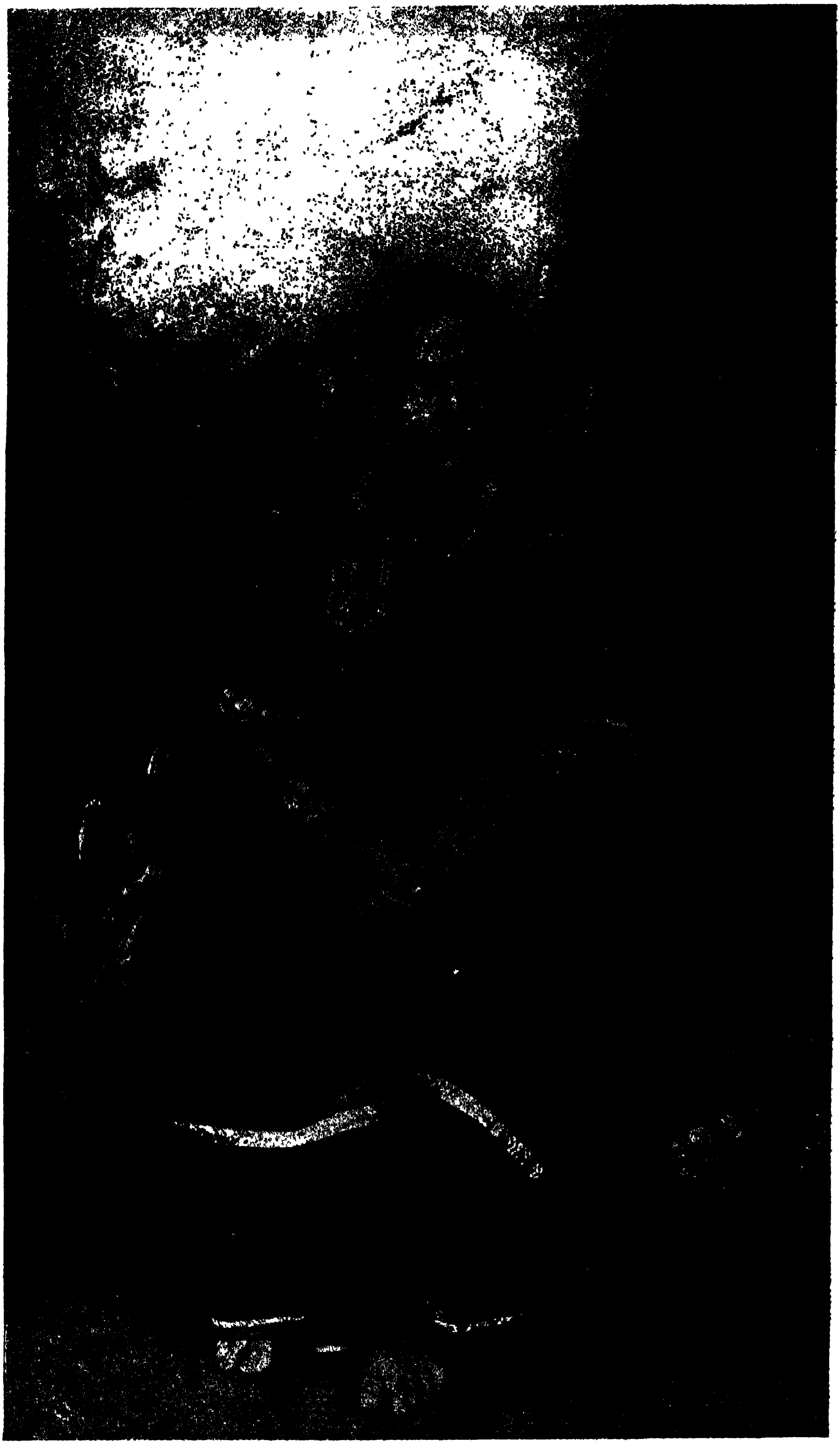

প্রভাবতী বসু

বসু পরিবার : পিছনের সারিতে ডানদিকে সুভাষচন্দ্র

ইউনিভার্সিটি ক্যাডেট কোর : পিছনের সারিতে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় সুভাষচন্দ্র

শেষ করতে চলেছেন তার কারণ হল তিনি এডমণ্ড বার্কের 'Philosophy of expediency'-তে বিশ্বাসী। এই দর্শনে বিশ্বাস করার পর্যায়ে আমরা এখনও এসে পৌঁছুই নি। আমাদের একটি জাতি গঠন করতে হবে, এবং হ্যাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষহীন আদর্শের দ্বারাই কেবল একটি জাতি গঠন সম্ভব।

আমার অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে, আমি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছি যে আপোষ অতি অপবিত্র পথ। ১৯১৬ সালে যদি আমি জেমসের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে স্বীকার করতাম যে আমি ওটেনকে মেরেছি, তাহলে সেটা আরও ভাল ও সততার পরিচয় হত, ছাত্র স্বার্থের পক্ষেও অধিকতর অনুকূল হত—যদিও আমার ক্ষেত্রে তার ফল সন্তোষজনক হত না। একইভাবে, আমার নিজের কাছে এবং আমার নীতির কাছে আমি পরিষ্কার থাকতাম। যদি বর্তমান অবস্থার পরিপেক্ষিতে আই. ডি. এফ-এ যোগদান করতে অস্বীকার করতাম এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে আসা থেকে নিজেকে বিরত করতে পারতাম। কিন্তু যা অতীত, তা অতীত-ই, তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। কিন্তু ভবিষ্যত এখনও আমার হাতে, এবং আমাকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, সম্ভবত যা সংশোধনের অসাধ্য সেই আপোষের পথেই থাকব, না ফলাফলের কথা চিন্তা না করে একটি নীতির জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব।

চাকরীতে যোগ দিলে দেশের জন্য ভাল কিছু করা যায় না, এ কথায় আমার বিশ্বাস নেই। একথাও আমি বিশ্বাস করি না যে চাকরীতে ভালভাবে থাকবার জন্য একজনের ইউরোপীয়ানের মত জীবনযাপন আবশ্যক। একথা আমি উপলব্ধি করি যে সত্যিকাব মানুষ সর্বদাই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে, নিজে অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। সুতরাং এ জাতীয় বিবেচনা অতীব তুচ্ছ, এবং আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে বিবেচনা সেটি নীতিগত।

আমি বিশ্বাস করি যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় এসেছে। প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারী—সে একজন তুচ্ছ চাপরাশীই হোক আর প্রদেশের রাজ্যপালই হোক—কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব বিধানে সহযোগিতা করে একটি সরকারের পতন ঘটানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল তা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। টলস্টয়ের মতবাদ বা গান্ধীর উপদেশ বলে আমি একথা বলছি না, বলছি এই কারণে যে এ বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে বলে।

এ বিষয়েও আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে, আন্তরিক ভাবে ত্যাগস্বীকার ও কষ্টভোগের মূল্যের বিনিময় ব্যতীত আমাদের আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় স্বাধীনতা মিলবে না। আমাদের মধ্যে যাদের অনুভব করার মতন অন্তর আছে, এবং কষ্টভোগ করার সুবিধে আছে, অর্ঘ্য নিয়ে তাদের এগিয়ে আসা উচিত। সিভিল সার্ভিসে যাঁরা অনেক দিন ধরে আছেন কিংবা যাঁদের কাঁধে অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা, তাঁরা একাজ করতে পারবেন বলে আমি আশা করি না। এতৎসত্ত্বেও, আমাদের এই সুবিস্তীর্ণ দেশে প্রত্যেকটি পরিবারের তার ক্ষুদ্র উপহার নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত; এবং যতদিন না আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করছি, ততদিন নেতারা স্বার্থপর এ অভিযোগ করার অধিকার আমাদের নেই।

আমার মনে হয় যে এখনও পর্যন্ত আমাদের পরিবার কোন অংশ নেয় নি এবং সেই কারণে আমার ত্যাগস্বীকার করা উচিত। ত্যাগস্বীকার বা কষ্টভোগ এমনিতে খুব আকর্ষণীয় বস্তু নয়; কিন্তু এ পথ অবলম্বন করা ছাড়া আমাদের জাতীয় অভিলাষ কোন-মতেই চরিতার্থ হবার নয়, এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত বলে এঁদের এড়িয়ে চলতে পারি না। অন্য কারুর বদলে আমিই-ই এগিয়ে যাচ্ছি, এটা নেহাতই দুর্ঘটনা, আর কিছু নয়। তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা যদি এই ত্যাগস্বীকারকে মেনে নিতে পারি, তবে নিজেদের ক্ষেত্রে তাকে মেনে না নেওয়ার কোন কারণ নেই।

তাছাড়া, ভেবে দেখেছি যে মানসিকতায় ও পূর্ববর্তী শিক্ষানবিসীর সুবিধা থাকার জন্য আমি এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি।

এই সব কথা চিন্তা করে আমি সিদ্ধান্তে এসেছি যে চাকরী বর্জন করে আমি সঠিক কাজ-ই করেছি। আমি চাকরী করি, বাবার এই ইচ্ছা অযৌক্তিক এবং আমার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক স্নেহে এবং আমার জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে তাঁর উৎকণ্ঠা, এই ইচ্ছাকে সক্রিয় করেছে।

আমার পদত্যাগের ফলে হয়ত কিছু ক্ষতিস্বীকার করতে হতে পারে—যেমন এর

ফলে হয়ত পরে সেজদাদার উন্নতি বিঘ্নিত হতে পারে। কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে কষ্ট-স্বীকারকে আমার মনে হয় আমরা অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিতে পারি।

ধর্মোপদেশ দিচ্ছি, আমার চিঠির বক্তব্য বিষয় তেমন দাঁড়াচ্ছে না আশা করি। আমার মনে সেরকম কোন চিন্তা-ই নেই। উপরে এত কথা লেখার কারণ হল আপনাকে বলা যে কি কি বিষয় বিবেচনার পর আমি এই কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি—যে সিদ্ধান্ত আপনাদের প্রায় সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্য ত্যাগস্বীকার ও লাঞ্ছনা ভোগ অবশ্যম্ভাবী, এবং এ কাজের জন্য আমিই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি—এ বিষয়ে স্থির-বিশ্বাসী হওয়ার পরেই কেবলমাত্র অমি অবাধ্যতাচারণ করেছি।

সব বিরুদ্ধ উপদেশের মুখে দাঁড়িয়ে নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করার এটি কোন নীতিগত যুক্তি কি না, সে বিচার আমি করতে পারি না। বাবাকে আমি অপরিসীম দুঃখ দিয়েছি জানি, এবং সেজন্য নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতেও পারব না। আমি ঠিক পথে গেছি না ভ্রান্ত পথে, সময়-ই একমাত্র তার প্রমাণ দেবে। আপনি যদি মনে করেন যে তাড়াতাড়ি করা এবং অবিবেচনার দোষে আমি দোষী, প্রার্থনা করি আমার ভবিষ্যত পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আপনি আপনার মন্তব্য করবেন না, এবং আমাকে দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকবেন। যদি মনে করেন, নির্বাচনে আমার কোন ভুল হয় নি, তাহলে আমার ভবিষ্যত কর্মজীবনে আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা পাথেয় হয়ে থাকবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

মায়ের একটি চিঠি পেয়েছি যাতে তিনি লিখেছেন যে, বাবা বা অন্যেরা যা-ই ভাবুক না কেন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে তাঁর নিজের আস্থা আছে। এই রকম একটি চিঠি পেয়ে আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি, আপনাকে বোঝাতে পারব না। এটি আমার কাছে একটি স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে কারণ এটি আমার মন থেকে একটি ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছে।

কয়েকদিন আগে আমি আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। সেটি গৃহীত হয়েছে কিনা আমাকে জানানো হয় নি।

আমার একটি চিঠির উত্তরে, চিত্তরঞ্জন দাশ, এ পর্যন্ত কি কাজ করা হয়েছে আমাকে জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে বর্তমানে একনিষ্ঠ কর্মীর নিদারুণ অভাব। বাড়ি ফেরার পর, আমার করার মতন অনেক মনোমত কাজ পাব।

জুন মাসের শেষে আমি বাড়ি ফিরতে চাই। আমার পদত্যাগপত্র গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আসন সংরক্ষণের জন্য আবেদন করব। এখন আমাকে টাকা পাঠানোর ব্যাপারে আপনাকে চিন্তিত হতে হবে না। আমি টাকা ধার করেছি, এবং কলকাতা যাওয়া পর্যন্ত সে টাকায় আমার ভালভাবেই চলে যাবে।

মেজদিদি সুস্থ হয়ে উঠেছেন জেনে আশ্বস্ত বোধ করছি। সুতরাং পদত্যাগ করেছি, এ কথা জানাবার জন্য আমি বাবাকে চিঠি লিখছি। আমি আশা করি ও প্রার্থনা করি যে তিনি যেন এই দুঃসংবাদ সহ্য করার ক্ষমতা রাখেন।

আমার আর কিছু লেখার নেই। যা করার তা করে ফেলেছি, এবং সর্বান্তঃকরণে আশা করি যে, এর ফলে ভাল বই মন্দ কিছু হবে না।

অন্তত তিন সপ্তাহ হল আপনার কোন খবর পাই না। আপনার নিস্তব্ধতা আমাকে অবাক করছে। আপনি ভাল আছেন তো?

আমরা এখানে বেশ ভাল আছি। আপনারা সকলে কেমন আছেন? অমি কি আমার কথা এখনও মনে করতে পারে? ফিরে দেখব ও বেশ বড়-সড় হয়ে গেছে।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

৭৫

ইউনিয়ন সোসাইটি
কেম্ব্রিজ
১৮. ৫. ২১

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

অনেক দিন আপনার কোন খোঁজ-খবর না পাওয়ায় আপনার চিঠি পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। ভারত থেকে ডাক এসেছে, তবে প্রথম কিস্তিতে বাড়ির কোন চিঠি নেই।

পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করে নেবার জন্য স্যার উইলিয়াম ডিউক আমাকে পীড়াপীড়ি করছেন। বড়দাদাকেও তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন। কেম্ব্রিজ সিভিল সার্ভিস বোর্ডের সেক্রেটারী, মিঃ রবার্টস-ও আমাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে দেখতে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে ইণ্ডিয়া অফিসের নির্দেশ অনুসারেই তিনি একাজ করছেন। স্যার উইলিয়ামকে আমি লিখে জানিয়েছি যে অনেক বিবেচনার পরেই আমার এই সিদ্ধান্তে আসা।

আমার পরীক্ষা (Tripos) ৯ জুন তারিখে শুরু হবে।

আমার বর্তমানের যা পরিকল্পনা, তা হল জুনের শেষ দিকে অথবা জুলাই-এর প্রথমে আমি মারসেলস্ থেকে জাহাজে যাত্রা করব। আমার পদত্যাগপত্র গৃহীত হবার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি জায়গা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব।

আপনারা সকলে কেমন আছেন? আমি এখানে বেশ ভালই। বড়দাদা শীগগিরই অক্সফোর্ডে বেড়াতে যাবেন।

Nippon Yusen Kaisha জাহাজে আমার যাওয়ার ইচ্ছে, এবং কলম্বোতে পেঁছব।

জাপানী যুবরাজ ইংলণ্ডের সর্বত্র সম্বর্ধনা পাচ্ছেন। তিনি এখানে গতকাল এসেছেন সম্মানসূচক L.L.D. ডিগ্রী নেওয়ার জন্য। এখানে তিনি চমৎকার বক্তৃতাও দিলেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(পরবর্তী ৭ খানি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

৭৬

বহরমপুর জেল
সোমবার
৮।১২।২৪

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

গত বুধবার আমি এখানে এসে পেঁছেছি—অথবা বলা যায় আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি এখানে ভালই আছি।

ইংলিশম্যান ও ক্যাথলিক হেরাল্ডের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার বিষয়ে আমার সলিসিটরদের কোনও নির্দেশ পাঠাতে বা মামলার অগ্রগতি সম্বন্ধে খবরাখবর করতে আমি অসমর্থ বলে দুঃখিত। আমাকে এখানে বদলি করার উদ্দেশ্য দিনের আলোর মতই, আমার কাছে পরিষ্কার।

অনুগ্রহ করে রামিয়াকে বলবেন, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমি যে সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও চেয়ার ব্যবহার করতাম তা যেন তিনি সরিয়ে নিয়ে যান। আগের ইচ্ছামত, এটি আমি সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসি নি। পৌরশাসন সংক্রান্ত কিছু কিছু বই-ও আমাকে পাঠাতে বলবেন। কর্পোরেশনের লাইব্রেরীতে বইগুলি হয়ত থাকতে পারে।

গরম পোষাকের ব্যাপারে আর কোন পরিবর্তন হয় নি, এবং আমার অবস্থা একই রকম।

এখন কিছুদিন আপনাদের কারুর সঙ্গে বোধহয় দেখা হবে না। সপ্তাহে মাত্র দুটি চিঠি আমাকে লিখতে দেওয়া হয়, তবে আমার কাছে যতখুশী চিঠি লেখা যেতে পারে।

মা এখন কোথায় আছেন? বাবা কটকেই আছেন বোধহয়। আপনারা সকলে কেমন আছেন?

Statesman-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটি সম্পর্কে উকিলদের অভিমত জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

মিউনিসিপ্যাল গেজেটের চতুর্থ সংখ্যা আমি পাই নি। এটি যেন আমাকে অবশ্যই নিয়মিত পাঠানো হয়।

আমি এখানে ভালই আছি।

ইতি—

আপনার স্নেহের
সুভাষ
(স. চ. ব.)

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

বহরমপুর জেল
১৬।১২।২৪

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ৫-১২-২৪ তারিখের চিঠি কয়েকদিন আগে এবং ১২-১২-২৪ তারিখেরটি গতকাল পেয়েছি।

(১) গরম পোষাকের বিষয়ে গভর্নমেন্ট আমাকে জানিয়েছেন যে, নির্দিষ্ট বরাদ্দের কোনও পরিবর্তন তাঁরা করবেন না। বন্দীদের প্রতি তাদের মর্যাদার অনুরূপ আচরণের এটিই নমুনা।

(২) আমি আলিপুরে এই কয়েকটি জিনিস ফেলে এসেছিঃ—(১) কোমোড (২) অ্যালুমিনিয়ামের বাটিসুদ্ধ টিফিন বাক্স (৩) টাইপরাইটার। এগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জেল থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করুন। আমি জেলারকে বলেছিলাম এই জিনিসগুলি সম্বন্ধে আপনাকে জানাতে—আশা করি সে ইতিমধ্যে আপনাকে খবর দিয়েছে। এ ছাড়া, আমি একটি সেক্রেটেরিয়াট টেবিল, রিভল্‌ভিং চেয়ার ও ম্যাপ-ও রেখে এসেছি, আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

(৩) আমি গভর্নমেন্টকে আমার খরচের বিষয়ে আরেকটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছি এবং উত্তরের অপেক্ষায় আছি।

(৪) আশা করি আপনি বিড়লা ব্রাদার্স ও মিঃ এইচ. এন. দত্ত, সলিসিটর, সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি দেখতে ভুলবেন না এবং দেখবেন যেন কিছু একটা করা হয়।

(৫) এখানে আসার পর আমি মিউনিসিপ্যাল গেজেটের কোনও কপি পাইনি। আমি প্রথম তিনটি সংখ্যা আলিপুরে থাকতে পেয়েছিলাম। অনুগ্রহ করে রামিয়াকে বলবেন গেজেট্ সোজা এখানে পাঠিয়ে দিতে।

(৬) আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি অনুলিপি পাঠাবার জন্য আমি বাংলা গভর্নমেন্টকে লিখছি। যে অভিযোগগুলি আমাকে পড়ে শোনানো হয়েছে, সেগুলির একটি অনুলিপি পাঠাতে তাঁদের কি আপত্তি থাকতে পারে জানি না।

(৭) আমার অনুপস্থিতিতে একজন অস্থায়ী C.E.O. নিয়োগ করা হয়েছে জেনে আনন্দিত হলাম।

কর্পোরেশনের কাজ কোনক্রমেই বাধাপ্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। অনুগ্রহ করে মেয়রের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং মৌখিক যে সব কথা হয়েছিল তা সমর্থন করে লিখিতভাবে ছুটির আবেদন করতে হবে কিনা জানাবেন।

মিঃ জে সি মুখার্জির জায়গায় মিঃ ডি সি দত্ত, কালেক্টর, অস্থায়ী ডেপুটী এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার পদে নিয়োজিত হলে আমি বেশী খুশী হতাম। তিনি নিঃসন্দেহে কর্পোরেশনের সব চেয়ে দক্ষ অফিসারদের অন্যতম।

আমি আপনাকে সপ্তাহে একটি করে চিঠি লেখার চেষ্টা করব—কিন্তু আপনি ত জানেন আমি সপ্তাহে মাত্র দুটি চিঠি লিখতে পারি, যদিও পেতে পারি যে কোন সংখ্যা।

(৮) আপনি আমার বাগানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন জেনে আমি আনন্দিত বোধ করছি। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি ব্যাডমিন্টন কোর্ট করবার আমার ইচ্ছা ছিল। আপনি নিশ্চয়ই সমস্ত জমিটা কাজে লাগিয়েছেন; তবে তাতে কোন অসুবিধে হবে না কারণ ৩৮/২ নং বাড়ির পিছনে যে খালি জায়গাটুকু পড়ে আছে, তা ঠিকমত পরিষ্কার করে নিতে পারলে সেখানে ছেলেমেয়েদের জন্য একটি ব্যাডমিন্টন কোর্ট করা যেতে পারে।

(৯) মাদক বর্জন সংক্রান্ত আপনার প্রস্তাবটি বার বার মুলতুবী রাখা হচ্ছে শুনে আমি দুঃখিত। প্রস্তাবটির কি হয় তা জানার জন্য আমি উদ্বিগ্ন। আশা করি স্টেট্‌সম্যানে এ বিষয়ে খবর পাব।

(১০) ইম্‌প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট সংক্রান্ত মিঃ এল এম সেনের প্রস্তাবটির কি হল জানার জন্যেও উৎকণ্ঠা বোধ করছি। এখনও কি সেটি বিরক্তিকর ভাবে ঝুলে আছে?

(১১) সন্তোষবাবুকে বলবেন যে আমি তাঁর দীর্ঘ চিঠি আলিপুরে থাকতে পেয়েছিলাম। আমি তাঁকে শীঘ্রই চিঠি দেব। যে Loans statement আমি তৈরী করেছিলাম, সেটির কি হল? সেটি কি E.G.P. বা কর্পোরেশন কোনও ভাবে পরিবর্তন করেছেন? আশা করি মনমাতলা পরিকল্পনাটি ঠিকই আছে।

(১২) মিঃ স্টুয়ার্ট স্মিথের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বলবেন যে স্টেট্‌সম্যানে তাঁর নোট্‌স পড়তে আমার ভাল লাগে। আলিপুর ত্যাগের পর থেকে আমি কর্পোরেশনের

সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক হারিয়েছি, তাঁর "ভিতর থেকে কর্পোরেশনের" বর্ণনা পড়ে খুবই আনন্দ পাই। তিনি সম্প্রতি কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু আশা করি ভবিষ্যতে আরও ঘন ঘন লিখবেন।

(১৩) গভর্নমেন্ট এখানকার সমস্ত বন্দীদের বই, ইত্যাদি কিনবার জন্য ৩০্ টাকার বিরাট এক মাসিক ভাতা মঞ্জুর করেছেন। জানি না এতগুলি প্রাণীর মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এই সামান্য টাকায় কি বই কেনা যেতে পারে—বিশেষত যখন ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। দিলীপ ও ক্ষিতীশ অনায়াসেই বিভিন্ন লেখকদের কাছ থেকে কিছু কিছু বই সংগ্রহ করে এখানকার রাজবন্দীদের জন্য পাঠাতে পারে। আরও অসুবিধে এই যে, এই জেলের নিজস্ব কোন লাইব্রেরী নেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন ও অন্যান্য লেখকদের অনুরোধ করা হলে তাঁরা তাঁদের কিছু কিছু বই উপহার দিতে পারেন।

(১৪) সরকার আমার খাওয়ার জন্য প্রতিদিন ছয় থেকে দশ টাকা মঞ্জুর করেছেন। এটি আমার মতে যথেষ্ট অপর্যাপ্ত। আমি যখন আলিপুর জেলে ছিলাম, অনেক বেশী ব্যয় করতাম। আমার ভাতা বৃদ্ধির জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন করব।

(১৫) নদাদা এখন কোথায় আছেন "and has he been fixed up?" সেজদাদা কি আমার গ্রেপ্তারের পর কলকাতায় এসেছেন?

জেনে খুশী হলাম বড়মামাবাবু (শ্রী জে এন দত্ত) আমার খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং তাঁর চিরপরিচিত উদ্ধৃতি আওড়ে চলেছেন। কিন্তু এই সুপরিচিত প্রবাদবাক্য সম্পর্কিত আপনার ব্যাখ্যার সঙ্গে আমি এখনও একমত নই। তিনি এখন কেমন আছেন? মামীমাই বা কেমন?

আমি এখানে ভালই আছি। "Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage"—কবির এ উক্তি সত্যিই বটে।

সমসাময়িক ইংরেজী ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের কিছু কিছু বই (অনুবাদ অবশ্যই) পেলে ভাল হয়।

আশা করি আপনারা ভালই আছেন ইতি—

আপনার স্নেহের
সুভাষ
(সু. চ. ব.)

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

৭৮

বহরমপুর জেল
২৪।১২।২৪

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটি চিঠিতে, জানতে পারলাম আপনি পুরীতে যাবেন। অতএব, বড়দিনের ছুটিতে আপনি এখানে আসতে পারবেন কি না জানি না।

C.E.O. এবং Deputy Executive Officer-এর পদের ব্যাপারে কর্পোরেশন কি কারণে এবম্বিধ ব্যবস্থা নিয়েছে, আমি অনুমান করতে পারি। আশা করি, কাজ এখন পুরো-দমে চলবে।

আশু নির্বাচনে, ২৪ পরগণা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য আমি বিজয়কাকাকে লিখতে চেয়েছিলাম। নির্বাচন সম্পর্কে এবং জেলে থাকাকালীন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। যেহেতু আমার ক্ষেত্রে চিঠি লেখা প্রতি সপ্তাহে মাত্র দুটিতে সীমাবদ্ধ, এখনও পর্যন্ত তাঁকে লিখে উঠতে পারি নি। আপনি দয়া করে তাঁর কাছ থেকে খবরটি জেনে, যথাসময় আমাকে জানিয়ে দেবেন।

খুড়ো এখন কোথায়? আশা করি তিনি ভালই আছেন।

গত চিঠিতে আপনাকে রাজবন্দীদের বই সম্পর্কে লিখেছিলাম। চেষ্টা করা হলে লেখক এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে যে অনেক বই সংগ্রহ করা সম্ভব, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনি ক্ষিতীশ বা দিলীপকে এ বিষয়ে কিছু করতে বলতে পারেন। যেহেতু অনির্দিষ্টকালের জন্য আমাদের এখানে থাকতে হবে, মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তির আরও উপকরণের সেজন্য প্রয়োজন।

আমি এখানে বেশ ভালই আছি। ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রেহাই পেলে হয়ত ভালই থাকব। প্রায়ই কুইনাইন খাচ্ছি।

পোষাক, ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে বাঙলা গভর্নমেন্টের কাছে আমার আবেদন ফলপ্রসূ হয় নি। আপনি কি মনে করেন, বড়লাটের কাছে আবেদন করা লাভজনক? আবেদন করতে করতে আমি পরিশ্রান্ত। কিন্তু একইসঙ্গে পরবর্তীকালে এমন কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত নয় যে, আমার অভিযোগগুলি বড়লাটের নজরে আনা হয় নি, অরডিন্যান্স এবং Regulations ঘোষণার ব্যাপারে সর্বোচ্চ দায়িত্ব যাঁর।

আপনি যখন এখানে আসবেন, দয়া করে কিছু টাকা আনবেন—ধরুন, পঞ্চাশ বা একশ টাকা। সুপারিনটেনডেন্ট কলেজ লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবেন, যাতে আমরা সেখান থেকে আমাদের প্রয়োজনমত বই-পত্র পেতে পারি। গচ্ছিত রাখার জন্য তাই কিছু টাকা দরকার।

আশা করি আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল।

ইতি—
আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

৭৯

বহরমপুর জেল
৩।১।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আশা করি এতক্ষণে আপনি কলকাতায়।

গতকাল নমামা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। যথাসময়ে আপনি তাঁর কাছ থেকে সব কিছুই জানতে পারবেন।

দুঃখের বিষয় যে, আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলি সম্বলিত কোন কপি ছাড়াই আপনাকে কাজ চালাতে হবে। গভর্নমেন্ট আমাকে জানিয়েছেন কোন কপি দেওয়া সম্ভব নয়। আমার সলিসিটররা মিঃ আর্মস্ট্রং-এর কাছ থেকে যে উত্তর পেয়েছিলেন গভর্নমেন্টের এই নির্দেশ তাকে সমর্থন করে।

আমার মনে হয় পৃথ্বীশকে আপনি চাকরি থেকে খারিজ করেছেন। তার জন্য আমার দুঃখ হয়। তার পরিবারের দুরবস্থার কথা এবং কষ্টভোগের কথা ভেবে আশা করব আপনি তাকে পুনর্বহাল করবেন। রমেশ কোথায়?

আমি বেশ ভালই। আশা করি আপনারাও।

ইতি—
আপনার স্নেহের
সুভাষ
(স. চ. ব.)

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

৮০

২৪. ১. ২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার এ মাসের ১১ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। গত দু-সপ্তাহে আপনাকে লিখে উঠতে পারি নি।

আপনার চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সম্পর্কে আইনজীবীর মতামত পাওয়া গিয়েছে এবং সেই মতামত অনুসারেই অভিযোগ তৈরী করা হয়েছে। এটি উত্থাপন করার আগে আমি দ্বিতীয় বার চিন্তা করতে চাই, যাতে ইংলিশম্যানের মতন এক্ষেত্রেও একটি সন্তোষজনক সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি। একটি মামলায় যদি আমরা বিফল হই, তাহলে অন্যটির উপর তার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হবে। এই মুহূর্তে আমার কাছে স্টেট্‌সম্যানের প্রবন্ধটি নেই তবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে আপনি সুবিবেচনার সঙ্গে অবস্থা যাচাই করে দেখবেন এবং

সবচেয়ে উপযোগী উপায়-ই গ্রহণ করবেন।

পারিবারিক ভাতার বিষয়ে গভর্নমেন্টকে লেখা আমার দ্বিতীয় আবেদনপত্রের এখনও কোন উত্তর পাই নি। আপনি হয়ত জানেন যে, আমার প্রথম চিঠির উত্তর ছিল নঞর্থক—কিন্তু দ্বিতীয় আবেদনপত্রটি বর্তমানে বিচারাধীন হয়ে আছে। যতদিন না আমি কোন উত্তর পাই, আমার ডিসেম্বর মাসের কয়েকদিনের বেতন তোলার আপনার প্রয়োজন নেই। খুড়ো কেমন এবং কোথায় আছেন? কতটুকু দোষ পৃথ্বীশের, আপনি আশা করি সে বিষয়ে খোঁজ-খবর নেবেন। যদি তাকে দোষ দেবার মতন বেশী কিছু না থাকে; তাহলে একবার সাবধান করে দিয়ে, তাকে পুনর্বহাল করা যায় কি না, আপনি একবার ভেবে দেখতে পারেন। মোটের উপর ছেলেটি কঠোর পরিশ্রমী এবং বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন। তাই তার প্রথম অপরাধের ক্ষমা করে দেওয়া যেতে পারে। একই বেতনে, অন্যত্র একজন উপযোগী লোক পাওয়া কষ্টকর, এমন কি অসম্ভবও হতে পারে।

'বেঙ্গলী' পত্রিকা এখানে আমি নিয়মিত পাচ্ছি। বত্রিশ পাতার বড়দিন-সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে অতি ভাল। অনেকগুলি দেশজ শিল্পের বর্ণনা এতে আছে, সঙ্গে আছে অসংখ্য উদাহরণ। রবিবারের সংখ্যাতেও মাঝে মাঝে সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্পকলা ও কারিগরী বিষয়ের উপর ভাল ভাল প্রবন্ধ থাকে। আপনি বড়-দিন সংখ্যাটি একবার দেখতে পারেন, মাঝে মাঝে রবিবারের সংখ্যাগুলোও।

আলিপুর জেলের জিনিসপত্রের সঙ্গে আশা করি আপনি একটি ছোট টিফিনের বাক্সও পেয়েছেন, যেটি আমি বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ওখানে রেখে এসেছিলাম।

আমি নিয়মিত মিউনিসিপ্যাল গেজেট পাচ্ছি, কিন্তু তাঁরা আমাকে কর্পোরেশনের কার্য-বিবরণী পাঠাচ্ছেন না—জানি না কেন।

বিড়লার মামলার বিষয়ে শ্রীযুক্ত দাশ সাহায্য করতে পারেন। বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার ব্যাপারে সলিসিটর মিঃ এইচ. এন. দত্তের বিমুখতা বিস্ময়কর।

সন্তোষ বাবুর চিঠি পেয়েছি, তাঁকে উত্তর-ও দিয়ে দিয়েছি।

পানশালার বিষয়ে আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হয়ে আছি। আশা করি আপনি বিষয়টি বাতিল করে দেবেন না। এটি নিয়ে যে আপনি চালিয়ে যেতে পারবেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

হাওড়া ব্রিজ বিলের বিষয়ে কর্পোরেশন কমিটির রিপোর্ট আমি দেখেছি। এটিকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমি আশা করি যে কর্পোরেশন দ্ব্যর্থহীনভাষায় গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক ক্যানেল স্কিমের-ও বিরোধিতা করবে। রিসার্ভার স্কিম আর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক ক্যানাল স্কিম—দুটোর-ই উৎসস্থল এক, এবং আমার মতে দুটি পরিকল্পনাই ব্যয়বহুল এবং অপ্রয়োজনীয়। দয়া করে সন্তোষবাবুকে এই পরিকল্পনার বিষয়ে একটু উৎসাহ নিয়ে যা দরকার তা করতে বলবেন। বিদ্যাধরী স্পেশ্যাল কমিটির চেয়ারম্যান, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক ক্যানেলের বিষয়ে আলোচনার সময় তাঁকে বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন। ক্যানালটি যেহেতু কাশীপুরের মধ্যে দিয়ে যাবে এবং তার ফলে সেই অঞ্চলের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার ক্ষতি হবে; সেজন্য কর্পোরেশন এই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক ক্যানাল স্কিমের বিষয়ে অত্যুৎসাহী বলে মনে হয়।

বুক কোম্পানী আমাকে টেনিসনের রচনা সমগ্র আর অভিধান পাঠিয়েছে। সবকটি পার্শেলই ভাল অবস্থায় আমার হাতে এসে পৌঁছেছে; যেমন আচার, ভাজা মশলা, জনি এন্ড কোং-এর জুতো, কমলালয় দোকানের এবং বাড়ি থেকে পাঠানো জামা-কাপড়ের পার্শেল।

আমার চাপরাশী এবং আর্দালিদের এখনও বখশিস দেওয়া হচ্ছে জেনে ভাল লাগল।

চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের নির্বাচনে ভোটার তালিকায় আমি নিজের নাম সংযোজিত করতে আগ্রহী। আমি আরও জানতে চাই যে আমার এখানে থাকাকালীন অবস্থায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধা আছে কি না। বাকি অন্য বিষয়ের জন্য আমি নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি। জমির খাজনা কি বাবার নামে দেওয়া হয়েছে না সমস্ত পরিবারের? একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য হিসেবে, শেষোক্ত বিষয়ে আমার নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিলেও দিতে পারে।

মূল অভিযোগপত্রটি, লিখিত মতামত এবং আপনার চিঠি পেয়েছি। 'ক্যাথলিক

হেরাল্ডের' সম্পাদকের উপর এতদিনে সমন জারী করা হয়েছে আশা করি। 'ইংলিশম্যান' সম্পর্কিত মামলা কবে নাগাদ হাইকোর্টে উঠবে বলে আপনার মনে হয়?

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। আশা করি আপনারা সকলে ভাল।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

৮১

ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ
এস. এস. আরোন্ডা
২৯. ১. ২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

বৃহস্পতিবার

মান্দালয় জেলে যাওয়ার পথে আমি এই চিঠি লিখছি। কাল সকালে আমরা রেঙ্গুনে পৌঁছাব বলে মনে হয়। সেদিন সন্ধ্যেতেই মান্দালয়ের ট্রেন ধরে শনিবার দুপুর নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছাব। মান্দালয়, রেঙ্গুন থেকে উনিশ ঘন্টার পথ।

বহরমপুরে গত সোমবার (২৬শে) বিকেলে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এই মর্মে এক আদেশ পেলাম যে আমাকে মান্দালয় জেলে বদলী করা হয়েছে। সেই রাত্রেই আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল, এবং লালবাজার লক্ আপে আমার রাত্রি কেটেছে। মঙ্গলবার খুব সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। এখন রেঙ্গুনের কাছে।

ভাল আছি। মান্দালয় জেলে পৌঁছে আবার আপনাকে চিঠি লিখব। এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে কটকে বাবাকেও লিখছি। মা এখন কলকাতায় আছেন বলেই আমার ধারণা। আশা করি আপনারা সকলে ভালই আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

৮২

মান্দালয় জেল
১২।২।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২৪-১-২৫ তারিখের চিঠি মাত্র গতকাল পেয়েছি।

এখানে আসার পর কর্পোরেশনের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। সভার কার্যবিবরণী বা মিউনিসিপ্যাল গেজেট কিছুই আমি পাচ্ছি না। **যদি আপনি মাদক বর্জন বিলটি উত্থাপন করেন, আনন্দিত হব। এটি উত্থাপন করা দরকার এবং দেশবাসী এটিকে সমর্থনও করবে।

* * *

কর্পোরেশনের পাম্পিং স্টেশনে অথবা জল সরবরাহের যে কোনও কেন্দ্রে ইঞ্জিন ড্রাইভারের কাজের জন্য এন্তাজ আলি নামে একটি লোক দরখাস্ত করেছিল। বাঁশের মত গোলাকৃতি একটি টিন কেসের মধ্যে পুরে সে তার দরখাস্তের সঙ্গে প্রশংসাপত্রগুলি আমাকে দিয়েছিল। সেটি আমার অফিসে হয় টেবিলের উপর নতুবা আমার চেয়ারের বাঁ দিকে whatnot-এর মধ্যে আছে। টিন কেসটি দেখতে এত অদ্ভুত যে, ভুল হবার নয়। লোকটি আমাকে ঐ প্রশংসাপত্রগুলির কথা লিখেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এটি তাকে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। কারণ এটি না পেলে সে অন্য কোথাও চাকরীর জন্য দরখাস্ত করতে পারছে না।***

এখানকার পত্রিকাগুলিতে ঘাটতি বাজেটের খবর প্রকাশিত হয়েছে। তা দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আপাততঃ নতুন কোন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু না করলে খরচ অনায়াসে কমানো যেতে পারে; সে ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের সমতাও রক্ষা হবে। আশা করি এটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার আগেই কর্পোরেশন "ব্যয় সঙ্কোচের" নীতিটি ঠিকমত

কাজে লাগাবে।

আমার মনে হয়, আপনারা কেউ কেউ ৩৮/২ নং বাড়িতে গিয়ে থাকলে ভাল হয়। নতুবা বাড়িটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে না।

*   *   *

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের একটি কপি আমার দরকার, এতে জেলা বোর্ডের গঠনতন্ত্র লেখা আছে।

বিজয়কাকার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত যে, লোকাল বোর্ডের প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হওয়াই অনেক সুবিধেজনক।**

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলি—আমার জেলে থাকাকালীন অবস্থায় যদি বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আমি কলকাতার উত্তর কিংবা দক্ষিণ যে কোনও অঞ্চল থেকে, এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই।**

বাস্তব অসুবিধা কিছু কিছু থাকলেও আমার মনে হয় না যে, কারাবন্দী হিসেবে জেলা বোর্ড বা আইনসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় আইনগত কোন বাধা আছে।

*   *   *

কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কর্পোরেশন যে কমিটি নিয়োগ করেছেন তার সদস্য কে কে হয়েছেন? এ বিষয়ে আমি নিজে যা লক্ষ্য করেছি সে সম্বন্ধে একটি নোট কমিটির কাছে পেশ করবার জন্য তৈরী করছি। আশা করছি আগামী ডাকেই তা পাঠতে পারব।

[* সেন্সার কেটে দিয়েছে *]

আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলতে পারি যে, জেলে আসার পর এই প্রথম আমি অসুস্থ বোধ করছি। এখানে আসার দিন থেকেই আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না এবং ক্রমাগত হজমের গোলমালে ভুগছি। আমাদের প্রায় সকলেরই এখানে এই একই অবস্থা। এখানকার জলহাওয়া আমার সহ্য হবে বলে মনে হয় না। বাঙলা গভর্নমেন্টের কাছে বদলীর জন্য লিখবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই, কারণ আমি জানি তা নিরর্থক। মান্দালয় জেলকে বার্মার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জেল বলে ধরা হয়, তবে আমি শুনেছি যে, প্লেগ ও বসন্তে এখানে প্রতিবছর অনেকের মৃত্যু হয়ে থাকে। প্লেগেই নাকি মৃত্যু হয় বেশী। গত বছর প্রায় তিরিশ হাজার লোক প্লেগে মারা গেছে, অবশ্য আমাকে যে খবর দেওয়া হয়েছে তা যদি সত্য হয়।

এই মাত্র গভর্নমেন্ট আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা আমাকে কোনও family-allowance দেবেন না। এর অর্থ আমার বাড়ি-ঘর দেখাশোনার কোনও খরচ তাঁরা বোধহয় বহন করতে চান না। মাসিক চাঁদার কথা বাদ দিলেও বাড়ি-ঘর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমার কি পরিমাণ খরচ হত, আপনি জানেন।

*   *   *

অনুগ্রহ করে বাবা কিংবা মাকে বলবেন না যে আমার শরীর ভাল নেই।

ইতি—
আপনার স্নেহের
সুভাষ
(সু. চ. ব.)

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

৮৩

মান্দালয় জেল
১৪।৩।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

কাউকে চিঠি লেখা এখন আমার কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রায় একটা দুঃস্বপ্নের মতন। দুঃস্বপ্ন বলছি এই কারণে যে, ডেমোক্লিসের তরোয়ালের মতন, মাথার উপরে সর্বদাই পুলিশের সেন্সর ঝুলছে, যার স্বেচ্ছাচারিতা আগেকার জারকেও সহজেই হার মানায়। জানি না এ চিঠি-ও সেন্সরের কৃপাদৃষ্টি এড়িয়ে আপনার কাছে পৌঁছবে কি না—তবু লিখতে আমাকে হবেই।

অনেক কষ্টে এ চিঠি লিখবার জন্য তৈরী হয়েছি। শুধু যে দুঃস্বপ্নের ভয়টাকেই

জয় করতে হয়েছে তাই নয়, ডিসপেপসিয়া ও ফ্লুর যুগ্ম আক্রমণে যে ভয়ানক আলস্য আমাকে পেয়ে বসেছে, তা-ও আমাকে কাটিয়ে উঠতে হয়েছে। আজ সপ্তাহের শেষ দিন এবং আমার হাতে চিঠি লিখবার যে সামান্য সময়টুকু অবশিষ্ট আছে, তা নষ্ট করতে আমার ইচ্ছে নেই।

মিউনিসিপ্যাল গেজেটের প্রতিটি সংখ্যা এখন আমি পাচ্ছি; কিন্তু এ কথা বুঝতে পারছি না কেন কর্পোরেশনের সভার কার্য-বিবরণী আটক করে রাখা হচ্ছে। পুলিশের কর্তাদের যুক্তি বড় অদ্ভুত। রেঙ্গুনের পত্রিকাগুলিতে দেখলাম যে, আমার ছুটি আরও তিনমাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

■ ■ ■

যে সব ভাউচার, রসিদ, ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন, অনুগ্রহ করে সেগুলি রেখে দিতে ভুলবেন না। কেননা কারামুক্তির পর এ বিষয় নিয়ে আমি লড়তে চাই। চরম দুঃসময়েরও একটা শেষ আছে; অতএব লড়তে একদিন পারবই। আমার বিশ্বাস, আমি ভাতা পাবার অধিকারী এবং এ ব্যাপারে আমার যুক্তিও দুর্বল নয়।

আপনি জানতে চেয়েছেন যে, Regulation III-র পরিবর্তে অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে এখানে আমার প্রতি অন্য কোন রকম ব্যবহার করা হচ্ছে কি না। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অসমর্থ, কারণ আমি অনুভব করতে পারছি যে, দুঃস্বপ্নটা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চালিত হয়ে আঙ্গুলগুলিকে পর্যন্ত অবশ করে ফেলছে। দৈহিক কষ্ট, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রশ্নের উত্তর-ও ঐ একই কারণে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। জানি না, পুলিশের সেন্সর আমাকে একথা বলতে দেবেন কি না যে, এখানে আমাদের বইপত্র কিছু দেওয়া হয় না, এবং মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনও উপায়ও আমাদের নেই। গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এ পর্যন্ত একটি বই-ও আমি পাই নি। বন্দীদের প্রতি যে রকম ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তা তাদের মর্যাদার অনুরূপই বটে!

অনুগ্রহ করে রামিয়াকে বলবেন যে কর্পোরেশনের ছুটি, পেন্সন ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত নিয়মাবলী যেন তিনি আমাকে পাঠান। বিদ্যাধরী সমস্যার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে কর্পোরেশনের অফিসের জন্য আমি দু-তিনখানা বই কিনেছিলাম। বাঙ্গলার নদ-নদীর উপরে লেখা Adams Williams-এরও একটি বই আছে, সেটি আমার পড়বার ইচ্ছে।

* * *

বাঙ্গলাদেশে আমাকে বদলী করবার জন্য বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করব স্থির করেছি; কারণ এ জায়গাটা আমার ঠিক সহ্য হচ্ছে না। এখানে আসবার পর থেকেই ডিসপেপসিয়া আমার নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠেছে, এবং সর্দিকাশিও লেগেই আছে। সর্দিকাশি না বলে বরং স্থানীয় ভাষায় বলা যায় ফ্লু। তবে পার্থক্য এই যে, এতে জ্বর খুব বেশী হয় না। কিন্তু সাধারণতঃ ফ্লু যেরকম কষ্ট দিয়ে থাকে এখানকার ফ্লু-ও ঠিক তাই।

বাবু জিতেন্দ্রিয় বসু একদা তাঁর সাধের কাশীপুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, এটি নাকি "ধুলার রাজ্য"। আমি নিশ্চিত, তিনি সত্যিকারের ধুলার রাজ্য এখনও দেখেন নি, কারণ সেটি মান্দালয়ে। জনৈক কবি একবার বলেছিলেন যে মৃত্যুর কাছে বছরের সব ঋতুই সমান, মান্দালয়ে ধুলাও তেমনি বারোমাস। কারণ পৃথিবীর এ প্রান্তে বর্ষা ঋতু বলে কিছু নেই। মাদালয়ে বাতাসে ধুলো উড়ে বেড়ায়; ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে। খাদ্যের সঙ্গেও একে গ্রহণ করতে হয়। টেবিলে, চেয়ারে, বিছানায়, সর্বত্রই এর কোমল স্পর্শ অনুভূত হয়। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড়ও ওঠে, তখন দূরের গাছপালা আর পাহাড় ঢাকা পড়ে যায়; অতএব এর সমস্ত সৌন্দর্য না দেখে কোনও উপায় নেই। বাস্তবিক মান্দালয়ের চারিদিকেই ধুলো ছড়িয়ে আছে—সর্বত্র তা এত ব্যাপ্ত যে এক অর্থে একে দ্বিতীয় বিধাতাও বলা যায়। ঈশ্বর করেন, আমরা এই নব-বিধাতার হাত থেকে রক্ষা পাই।

কোনও কোনও দার্শনিক মনে করেন যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহটি মানুষের আনন্দোপভোগের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, পৃথিবীর অন্য সব দেশের চাইতে বর্মা দেশেই তাঁরা তাঁদের অনুগামীদের দেখতে পাবেন সর্বাধিক সংখ্যায়। যদি এই জগৎ বিশেষতঃ প্রাণিজগৎ মানুষের জন্যই তৈরী হয়ে থাকে তাহলে অখাদ্য বলে কিছু এখানে থাকতে পারে না। আপনি জেনে বিস্মিত হবেন যে বর্মী-

বিধানে অখাদ্য মাংস বলে কিছু নেই। কাক, বিড়াল, কুকুর—এমন কি সাপ পর্যন্ত সাদরে রান্নাঘরে গৃহীত হয়ে থাকে এবং মানুষের পেটে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে। এদেশে খাদ্যের ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব চলে না; এমন কি কীটপতঙ্গাদিও বলতে পারে না, তারা উপেক্ষিত।

এখানকার জলহাওয়া আমাকে ক্রমেই যেন দুর্বল করে ফেলছে। গাঁটে গাঁটে খিল ধরে যাওয়াটা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বর্মীরা অনেক বিষয়েই একটা আশ্চর্য সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তারা এই রোগের প্রতিকারের জন্য ম্যাসাজ্‌ও আবিষ্কার করেছে, যা আশ্চর্য ফলদায়ক।

ভয় হচ্ছে বোধহয় আমার চিঠি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে; অতএব আজ এখানেই শেষ করি।

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(স. চ. ব.)

(ইংরেজী থেকে অনুদিত)

৮৪

মান্দালয় জেল

২৮।৩।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আশা করি, আপনি আমার চিঠি নিয়মিত পাচ্ছেন।

* * *

একটি নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। চিড়িয়াখানার প্রাণীদের আমি দেখতে গিয়েছি; কিন্তু একবারও খেয়াল হয় নি যে, আমি নিজেও এইরকম একটি প্রাণী হতে পারি। শুনে আপনি হয়ত অবাক হতে পারেন, তবু একথা সত্যি যে আমরা চিড়িয়াখানার প্রাণীর মতই এখন দিন কাটাচ্ছি। এই জেলের ওয়ার্ডগুলি ইঁটের তৈরী নয়, কাঠের খুঁটি পুঁতে বেড়ার আকারে প্রস্তুত। রাত্রিতে যখন আমাদের তালাবন্ধ করে রাখা হয়, তখন যে কোনও বাইরের লোক নিশ্চয়ই আমাদের দেখে মনে করতে পারে যে, কতকগুলি মনুষ্যাকৃতি প্রাণী আলোকিত খাঁচার মধ্যে শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটি এক অদ্ভূত অনুভূতি। ঈশ্বর জানেন, আমাদের এ রূপান্তর কতদিনে শেষ হবে। সে যাই হোক, যে লেজ ও থাবা মানুষ একবার বহু আগেই ত্যাগ করতে পেরেছে, অবস্থার এই সাদৃশ্যের ফলে তা নিশ্চয়ই পুনরায় আমাদের গজাবে না।

* * *

আমি একপ্রকার।

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনুদিত)

(শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত)

৮৫

মান্দালয় জেল

মে, ১৯২৫

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪।৩।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশংকা করেছিলে যে, মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে "double distillation-এর ভিতর দিয়ে আসতে হবে কিন্তু এবার তা হয়নি সেজন্য খুবই খুশী হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমলভাবে স্পর্শ করে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন, এ চিঠিখানিকে যে আবার

"censor" -এর হাত অতিক্রম ক'রে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা; কেন না, এটা কেউ চায় না যে তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত আলোতে প্রকাশ হয়ে পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর ও লোহম্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাবছি ও যা অনুভব করছি, তার অনেকখানিই কোন এক ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত অকথিতই রাখতে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি লোক যে অকারণে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জিত রুচিতে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মেনে চলতেই হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। একথা আমি বলতে পারি না যে, জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি—কেননা, সেটি নিছক ভণ্ডামী হয়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে, কোন ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ-কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাস কালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরো হীন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে এতদিন জেলে বাস করার পর কারা-শাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারাসংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রণালীর) আদর্শের অনুসরণ মাত্র ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা খারাপ, অর্থাৎ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-সংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এর মত উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটি সব চেয়ে প্রয়োজন সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ বা যদি বল, একটা নূতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রতি একটা সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিষেধ-মূলক দণ্ডবিধি—যেটা কারা-শাসন-বিধির ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে—তাকে এখন সংস্কারমূলক নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে। আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তা' হলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে আমাদের দেশের আর্টিষ্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে আমাদের শিল্প সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত ব্যাপে এই ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তা হলে দুঃখে কষ্টে আর কোন যন্ত্রণা থাকত না এবং তাইতেই ত আত্মা ও দেহের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলেছে।

সাধারণতঃ একট দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই ক'রে নিয়েছি এবং দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হ'লেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে, কিন্তু আমাদের কষ্ট ত শুধু আধ্যাত্মিক নয়—সে যে শরীরেও কষ্ট এবং প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় সময় দুর্বল হয়ে পড়ে।

'লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার সমালোচনা লেখেন। এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এবিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে ছ' বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।

একথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পারি যে, আমার ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অন্য কারণে না হ'লেও শুধু এই

জন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা 'Martyrdom' ব'লে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু 'humour' ও 'Proportion'-এর জ্ঞান আছে, (অন্তত আশা করি যে আছে) তাই নিজেকে 'Martyr' বলে মনে করবার মত স্পর্ধা আমার নেই। স্পর্ধা বা আত্মম্ভরিতা জিনিষটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই, অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি, শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই 'Martyrdom' জিনিষটা আমার কাছে বড়জোর একটা আদর্শই হ'তে পারে।

আমার বিশ্বাস বেশীদিনের মেয়াদীর পক্ষে সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকালবার্ধক্য এসে চেপে ধরে সুতরাং এ-দিকে তার বিশেষ সতর্ক থাক'ই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, অবশ্য অনেকগুলি কারণই এর জন্য দায়ী—যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফূর্তির অভাব, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা একটা অধীনতার শৃঙ্খলভার, বন্ধুজনের অভাব, এবং সঙ্গীতের অভাব যাহা সর্বশেষে উল্লিখিত হ'লেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এই সব বাইরের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকাল-বার্ধক্যের জন্য কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিক্‌নিক্, বিশ্রম্ভালাপ, সঙ্গীত-চর্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলা-ধুলা করা, মনোমত কাব্য-সাহিত্যের চর্চা—এ সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না এবং যখন আমাদিগকে জোর ক'রে বন্দী ক'রে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলি আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র থাকবে।

এ কথা আমার লিখতে ভোলা উচিত নয় যে, আপনার নিজের লোকের, বন্ধুবান্ধবের এবং সর্বসাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা মানুষকে জেলের মধ্যেও অনেকখানি সুখ দিতে পারে। এই দিকের প্রভাবটা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষ্মভাবে কাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে, এই ভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধীদের অদৃষ্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী, সে জানে মুক্তি পেলে সমাজ তাকে বরণ ক'রে নেবে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের তেমন কোন সান্ত্বনা নেই। সে বোধ হয় তার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কোন সহানুভূতিই আশা করতে পারে না এবং সেই জন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদের Yard-এ যে সমস্ত কয়েদীর কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে, তাদের নিজের লোকেরা জানেই না যে সে জেলে বন্দী। লজ্জায় তারা বাড়ীতে কোন সংবাদও দেয়নি। এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হয়। সভ্য সমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহানুভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারি কিন্তু একটা চিঠির ত' শেষ আছে। আমার বেশী উদাম ও শক্তি থাকলে একখানা বই লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত সামর্থ্যও আমার নেই।

আমার জেলের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেখানে বন্দী জীবনটা তত যন্ত্রণাদায়ক হয় না, এই সমস্ত সূক্ষ্ম ধরনের আঘাত উপর থেকেই আসে, জেলের কর্তাদের এ বিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন—এগুলো আঘাতকারীর প্রতি মানুষের মনকে আরও বিরূপ করে দেয় এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আনন্দধাম গড়ে তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ করে আমাদের স্বপ্নাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে

বলে দেয় যে, মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়। তুমি বলেছ যে, মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটিকে একেবারে তলা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে—এই দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে তুলেছে। কিন্তু এই অশ্রু সবটুকুই দুঃখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা ও প্রেম-বিন্দুও আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দস্রোতে পৌঁছাবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি দুঃখ কষ্টের ছোটখাট অগভীর ঢেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে? আমি নিজে ত দুঃখবাদ বা নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখি না বরং আমার মনে হয় দুঃখ-যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর, বিনা দুঃখ-কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে?

তুমি কিছুদিন আগে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারব না, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে এ কথা বলা অনাবশ্যক যে, আরও বই সাদরে গৃহীত হবে। ইতি—

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(পরবর্তী ৬ খানি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

৮৬

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
১৬।৫।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ৭-৫-২৫-এর চিঠি গত ১২ তারিখে পেয়েছি।

আপনার চিঠি পাওয়ার আগে আমি P. & O.-এর একটি জাহাজের যাত্রী-তালিকায় ছোট দাদার নাম দেখেছি। আমি জানতাম না যে, তিনি এত তাড়াতাড়ি পাড়ি দেবেন। তিনি স্যার রাসবিহারী ঘোষ ফেলোশিপ পেয়েছেন শুনে আনন্দিত হলাম। তিনি কতদিন সেখানে থাকবেন? তিনি কাজ করবেন কোথায়, ইংল্যান্ডে না Continental Laboratories-এর পশ্চিমে, জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সমস্যাবলীর কিভাবে সমাধান করা হয়, সে সম্পর্কে তিনি কি আমাদের খোঁজখবর এবং বইপত্র পাঠাতে পারবেন? আমাদের জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তারা, পাশ্চাত্যের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে যে সব পদ্ধতি গৃহীত হয়, সে সম্বন্ধে খুবই কম ওয়াকিবহাল। ডাঃ বিশ্বাসই একমাত্র D.H.O. যিনি বিদেশে গেছেন, কিন্তু তাঁর চিন্তা-শক্তি খুবই গোলমেলে। আমার মনে হয়, আমাদের কয়েকজন স্যানিটারি অফিসারকে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষানবিশীর জন্য বিদেশে পাঠানো প্রয়োজন। আমেরিকার শহরগুলোতে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি কিছু কিছু পড়াশুনা করছি। পড়ে আমি বিস্মিত।

হাওড়া ব্রিজ সম্পর্কে লেখা শাস্ত্রীর প্রবন্ধটি পেয়েছি। আমি এখনও এটি পড়িনি, তবে কলকাতার কাগজগুলোতে এর সারাংশ পড়েছি। রামিয়ার কাছ থেকে আমি আর কোন বই পাই নি।

আপনার চিঠি যখন পেলাম, মান্দালয় তখন এক অগ্নিকুণ্ড। তারপর থেকে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। গরম আবার আগের মতন।

এখনও পর্যন্ত কলকাতার অন্নে আমার তেমন কিছু উপকার হয় নি, কিন্তু আমি চালিয়ে যাব। অন্যকিছুর চাইতে, আবহাওয়াই আমার অসুস্থতার কারণ বলে আমার বিশ্বাস।

আমার বদলীর ব্যাপারে বাঙলা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এখনও কিছু শুনি নি।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল। আমি একপ্রকার।

ইতি—

আপনার স্নেহের
সুভাষ
(সু. চ. ব.)

পুঃ—শৈলেশ এবং সন্তোষ পরীক্ষায় কেমন করেছে? মেজবৌদিদি কেমন আছেন?

এস. সি. বি.

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

৮৭ মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
২২· ৫· ২৫
শুক্রবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ১১. ৫. ২৫-এর চিঠি গত মঙ্গলবার আমার হাতে এসেছে।

ভারত সরকারের আদেশে, ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের এক্তিয়ারে আমাকে প্রথমবার গ্রেপ্তার ও বন্দী করা হয়েছিল আপনি জানেন। আমার মান্দালয়ে স্থানান্তরিত হওয়ার অব্যবহিত আগে, অর্ডিন্যাস অনুসারে আমাকে বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের একটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আমাকে বর্মায় স্থানান্তরিত করার বিষয়ে অর্ডিন্যান্সের শর্ত অনুসারে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের প্রাক্-সম্মতি নেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ আমার নিজ-প্রদেশের বাইরে), কিন্তু আদেশটি পুরোপুরি বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের। অন্যভাবে বলতে গেলে, বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের আদেশ ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের আদেশকে নিবর্তিত করেছে—এটি আমার কাছে নিয়ম ও আইন বহির্ভূত বলে মনে হচ্ছে। ভারত সরকারের আদেশটি যদি, বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আদেশ আমার উপর আরোপ করার আগে প্রত্যাহৃত হত, তাহলে অবস্থাটা মোটামুটি আইনানুগ দাঁড়াত।

এই বে-আইনী কাজ ছাড়া, ১৯২৫ সালের ২৪শে এপ্রিল অর্ডিন্যান্সের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরেও আমার উপর নতুন কোন আদেশ আরোপিত হয় নি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে নতুন আইনটি বর্তমান বন্দীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমাকে নতুন কোন আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। হয় আমাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক কিংবা আমাকে বন্দী করে রাখার যথাযথ কারণ দর্শান হোক—জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আমি এই দাবী করার পর এবং অর্ডিন্যাসের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পরে নতুন আইনের শর্তাবলী আমার দৃষ্টি-গোচরে আনা হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাকে জানানো হয় ততক্ষণ কেবলই একটি আইনের অস্তিত্ব বা সরকারের একটি আদেশ কার্যকরী করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, তিন নম্বর রেগুলেশান অনুযায়ী আমাকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানায় সই করা হয় ২৭শে আগস্ট, ১৯২৪। কিন্তু ২৫শে অক্টোবর আমার দৃষ্টিগোচর হওয়ার আগে এটি বলবৎ করা হয় নি। আমি সেজন্য মনে করি না যে, অর্ডিন্যান্সের মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আমাকে নতুন আদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া নতুন আইনে এই মর্মে একটি ধারা আছে যে আইনটি সমগ্র বাঙ্গলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি এখন বাঙ্গলাদেশে নেই। কি করে আইনটি আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়?

সবশেষে, আমার মনে হয় যে সরকারের অবস্থানস্থল খুব নিরাপদ নয়।

এখনও পর্যন্ত, আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনার কিংবা স্থানীয় আইন আদালতে মামলা করার সুযোগ আমি পাইনি। আই· জি· প্রিজনস্, কয়েক দিনের মধ্যে এখানে আসবেন এবং আমি তাঁকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাগুলি দিতে বলব।

এখনও পর্যন্ত আমার তেমন একটা উন্নতি হয় নি; কয়েক পাউণ্ড ওজন কমে যাওয়া ছাড়া আমার অবস্থা অনেকটা আগের মত। যতদিন এখানে আছি, আমার পাকস্থলী ঠিক মত কাজ করবে বলে মনে হয় না।

আমাদের খাদ্য সংক্রান্ত সমস্যার এখনও সমাধান হয় নি।

কাউন্সিল অফ্ স্টেটের নির্বাচন-বিষয়ক নিয়মাবলীর একটি কপি দয়া করে পাঠাবেন। আমি ভোটার কিনা কিংবা ভোটার হবার যোগ্য কিনা—আপনি কি এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন? যদি হই, তাহলে আমার নামটা যেন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আপনারা সকলে যদি মনে করেন যে কাউন্সিল অফ স্টেটের নির্বাচনে আমার দাঁড়ানো উচিত, তবে আমার কোন আপত্তি নেই। সে যাই হোক, ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে থাকলে, আমার নাম ভোটার-তালিকাভুক্ত করতে আমি আগ্রহী।

বাঙ্গলাদেশে আমাকে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে আমার আবেদনের এখনও কোন উত্তর মেলে নি।

জানতে পারলাম যে ডি. ই. সতীশ মিত্রকে তাঁর ডি· ই· প্লি-র দায়িত্বের সঙ্গে, স্টোর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। আমার ধারণা কাজটি পরিমাণে সুবৃহৎ, এবং

ব্যক্তি নির্বাচনও খুব ভাল হয় নি।

বুক কোম্পানী বা অন্য কোন দোকানে আমাকে নিম্নলিখিত বইগুলি পাঠাতে বলবেন : (১) লর্ড রোনাল্ডসের "হার্ট অফ আর্য ভারত" (২) এস. এন. ব্যানার্জির "নেশান ইন মেকিং", (আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষের উপর লর্ড রোনাল্ডসের আর একটি বই আছে। বইটি কিছুকাল আগে লেখা। যদি তা-ই হয় তাহলে আপনি তাদের এই বইটিও পাঠাতে বলবেন) (৩) নরেন্দ্রনাথ ল-এর 'এনসেন্ট হিন্দু পলিটি।'

কর্পোরেশনের কার্য-বিবরণী থেকে জানতে পারলাম যে সহকারী সম্পাদকের জন্য তিনটি নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। এই তিন জনের মধ্যে তামিজউদ্দিন্ই সর্বোৎকৃষ্ট বলে আমার ধারণা।

ছোট-বৌদি এখন কেমন আছেন? গোপালি আর সতী পরীক্ষায় কেমন করল? গোপালি এখন কি করবে? সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারে।

আপনার
স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

৮৮

মান্দালয়
৩০।৫।২৫
শনিবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

কিছুদিন হল আপনার কোন খবর পাচ্ছি না। জানি না আপনার চিঠিগুলো আটক করা হচ্ছে কিনা।

রামিয়ার কাছ থেকে আমি কয়েকটি বই পেয়েছি। কিন্তু Adams Williams-এর নদীর উপর লেখা বইটির সঙ্গের মানচিত্রটি পাই নি। মানচিত্রটি ব্যতিরেকে বইটির প্রায় কোন মূল্যই থাকে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, রামিয়াকে এটি পাঠাতে বলবেন।

আপনারা সকলে কেমন আছেন সে খবর জানতে উদ্বিগ্ন আছি। সন্তোষবাবুর সঙ্গে দেখা হলে, কর্পোরেশনের বিষয়ে আমাকে লিখতে বলবেন। তিনি তো একেবারেই যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ
(স. চ. ব.)

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল

৮৯

৬।৬।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২৭-৫-২৫-এর চিঠি আমার হাতে এসেছে ২-৬-২৫-এ।

যদি পারেন, তো দয়া করে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বাবাকে কিছু লিখবেন না। এখানকার জলহাওয়া আমার ধাতে সয় না—একথা ছাড়া তাঁকে আমি আর কিছু লিখি নি। বাবাকে দুশ্চিন্তায় রাখার কোন অর্থ হয় না।

গত ২২শে এপ্রিল, বদলীর জন্য আমি আবেদনপত্র পাঠিয়েছি। বার্মায়, I. G. Prisons কিংবা সেক্রেটারীর অফিসে সেটির নিশ্চয়ই বিলম্ব ঘটানো হচ্ছে। আপনার চিঠি পাওয়ার পর, আমি একটি অনুস্মারক চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার আবেদনপত্রটি পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছি।

হ্যাঁ, সুপারিনটেনডেন্টের কাছে আপনি যে টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন, সেটি পেয়েছি। তিনি আমাকে সেটি পড়ে শুনিয়েছেন।

আগামী সপ্তাহে আমি অবশ্যই কর্পোরেশনের কাগজপত্র পাঠাব। সেকথা রামিয়াকে জানিয়ে দেবেন।

ঋণের প্রশ্নটিতে আমি এখন মন দিয়েছি। আশা করি রামতারণবাবু সরকারকে দিয়ে এই ঋণ মঞ্জুর করাতে সক্ষম হবেন। অন্যথায় একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে।

সেজদাদার দিয়াশলাই-এর কারখানা কবে নাগাদ কাজ করতে শুরু করবে বলে তিনি মনে করেন?

জেনে আনন্দিত হলাম যে মেজবৌদিদি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আশা করছি, আপনারা এক সপ্তাহের জন্য কার্সিয়ঙ বেড়াতে যেতে পেরেছেন এবং সকলেই যাত্রা উপভোগ করেছেন।

আধুনিক শিল্পের যুগে, একজনের ভবিষ্যত কেবলমাত্র একটি শিল্পেই নিবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় নয় বলে আমার মনে হয়। যদি সম্ভব হয় তাহলে সহজাত শিল্পে উদ্যোগী হওয়া সর্বদাই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে, উপজাতিদ্রব্য কাজে লাগানো যায়, বিজ্ঞাপন ও আনুষঙ্গিক খরচ কমানো যায়। তা ছাড়া, খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে যৌথ ক্রয় ও বিক্রয়ের চেষ্টাও করা যেতে পারে। যদি সহকারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে দেশলাই প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন তা কিছু কিছু স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা যায়। এই ভাবে দেশলাই প্রস্তুতের ব্যয় হ্রাস করা যেতে পারে। ভবিষ্যত স্থির করার ক্ষেত্রে গোপালী এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে দেখতে পারে। এতে অকৃতকার্য হলে, মোটর সংক্রান্ত কারিগরি বিদ্যায় তার বিশেষ মেধা আছে বলে আমার বিশ্বাস।

সি. আর. কেমন আছেন?

আশা করি আপনারা সকলে ভাল।

আপনার স্নেহের
সুভাষ
(স. চ. ব.)

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

৯০

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
১৩।৬।২৫

আপনাকে চিঠি দেবার পর গভর্নমেন্ট আমাকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে আমাকে বদলী করার জন্য যে আবেদন আমি পাঠিয়েছিলাম সেটি তারা অগ্রাহ্য করেছে। বার্মায় আসার পর আমার ওজন ১০ পাউন্ড কমে গেছে।

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

৯১

মান্দালয় জেল
১৯. ৬. ২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

গতকালের রেঙ্গুন সংবাদপত্র আমাদের নেতার আকস্মিক এবং দুর্ভাগ্যজনক পরলোকগমনের খবর বয়ে এনেছে। এই আঘাতে আমি হতচেতন এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। আমার এই বর্তমানের মানসিক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে কতদিন সময় লাগবে জানি না।

কিছু কালের জন্য যে শোক পালিত হবে, তার মাঝে যেন একটি বিষয় বিস্মৃত না হয়ে যায়। সমস্ত মূল্যবান কাগজ এবং নথিপত্র যেন যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত করে রাখা হয়। আমরা যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলাম, উনি তখন একটি বই লিখছিলেন। বইটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দর্শনের উপর এবং সেজন্য তিনি উপকরণাদি সংগ্রহ করছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং জীবন-দর্শনের উপর তাঁর কিছু কিছু মতামত আমার জানা আছে। তাঁর কাগজ-পত্রাদি পেলে, আমি সেগুলি থেকে একটা ভাল কিছু গড়ে তুলতে পারব আশা করি। একথা আমি বলতে পারি যে অন্য কেউ আর ভাল উদ্দেশ্যে এগুলি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। তাছাড়া বিদেহী আত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতি আলোকপাত করতে পারে এমন যাবতীয় কাগজ এবং চিঠিপত্রও সযত্নে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। যথাসময়ে একটি জীবনী লেখা যাবে; কিন্তু এগুলি যদি এখনই সংরক্ষিত না করা হয় তাহলে কাজটি দ্বিগুণ শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এই ধরনের পার্থিব বিষয়ের কথা ঠিক এই অবস্থায় আমি তাঁর পরিবারের কাউকে লিখতে পারছি না। আপনি সুধীরবাবুকে টেনে এনে (এস. সি. রায়) এ বিষয়ে কথা বলতে পারেন। তাঁর পরিবারের লোকেদের কাছে পাঠানো শোক-

প্রকাশমূলক চিঠি এবং টেলিগ্রামগুলিও রক্ষা করে রাখা দরকারী।

কাউন্সিল অফ স্টেটের নির্বাচনের বিষয়ে এই মুহূর্তে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, আমার ভোটার হওয়ার যোগ্যতা আছে কি না তা যাচাই করা এবং থাকলে, ভোটার-তালিকায় আমার নাম সংযোজিত করা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত দাশের আকস্মিক মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে রেঙ্গুনের সংবাদপত্রগুলি নীরব। মনে হয় যে, এমনকি সুধীরবাবুও, তিনি যে মারা যাচ্ছেন একথা বুঝতে পারেন নি। হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যাবার ফলেই কি এমন ঘটল? আমি এই খবরটি জানার জন্য উৎসুক।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

পুঃ—দয়া করে, ৩৪, থিয়েটার রোডে, দিলীপকে একটি চিরকুট লিখে জানাবেন যে আমি ওর বইগুলো পেয়েছি এবং আগামী সপ্তাহে ওকে চিঠি লিখব।

স. চ. ব

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত)

৯২

মান্দালয় জেল
২৫।৬।২৫

প্রিয় দিলীপ,

আমার শেষ চিঠির পরে তোমার কাছ থেকে সর্বসমেত তিনখানি চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলির তারিখ—৬ই মে, ১৫ই মে ও ১৫ই জুন।

তোমার প্রেরিত বইয়ের শেষ পার্শ্বেলটা পেয়েছি। টুর্গেনিভের 'Smoke' বইটা পাইনি। আফিসে পার্শ্বেলটি খোলা হয়েছিল, সুতরাং সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে এ বিষয়ে খোঁজ নিতে বলেছি। দরকার হলে কলকাতায় C.I.D. আফিসে তিনি খোঁজ করবেন, তুমিও D.I.G. C.I.D.- কে লিখে এ-বিষয়ে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পার।

Bertrand Russel-এর "Prospects of Industrial Civilisation"-খানি বহরমপুর জেলে কয়েকজন কয়েদীর কাছে আছে। আমাদের যখন স্থানান্তরিত করা হয়, তখন অনেকেই সেই বইখানি কাছে রাখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর বাস্তবিক একজন তখনও বইটা পড়ছিল। বইখানা তোমার দরকার হবে সে কথা না জেনে সেখানে রেখে এসেছিলাম। রাসেলের বইগুলির আদর এত বেশী যে, একখানা পেলে কেউ শীঘ্র ছাড়তে চায় না। বহরমপুর জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে আজ লিখলাম তিনি যেন তোমার কাছে বইখানা পাঠিয়ে দেন। তুমি তাঁকে লিখতে পার, তাতে কাজটা তাগাদা হবে। তোমার এত দরকারের সময় বইটা আটকে রাখবার জন্য দায়ী বলে বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ এত অসুবিধার কথা আগে আমি ভেবে উঠতে পারিনি। "Free thought and official propaganda" ত আমার কাছে নেই—এ বইটা তুমি আমাকে পাঠাও নি?

বই বেছে দেওয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা সকলে আশা করি, তুমি যে কাজ আরম্ভ করেছ ভগবানের ইচ্ছায় তা ভালভাবেই চলবে। তোমার লেখাগুলি যে আমি সসম্মানে পাঠ করব সে কথা বিশেষ করে বলবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। বই প্রকাশ করবার সময় প্রচ্ছদপটের দিকে যেন নজর রেখো। এইমাত্র একখনা হালের "বঙ্গবাণী"তে রবীন্দ্রনাথের উপর তোমার লেখা একটা প্রবন্ধ দেখলম, আমি এখনও সেটা পড়িনি কিন্তু বিষয়টা চিত্তাকর্ষক বলেই বোধ হল।

তুমি জান আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই একই চিন্তা—সে হচ্ছে মহাত্মা দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন এই দারুণ সংবাদ দেখি তখন এ দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু হায়! সংবাদটা নিতান্তই নির্মম সত্য। আমরা সমগ্র জাতিটাই যেন নিতান্ত হতভাগ্য বলে মনে হচ্ছে।

যে সব চিন্তা আমার অন্তরকে তোলপাড় করছে সে সব চিন্তাগুলি বাইরে প্রকাশ করে মনকে লাঘব করতে চাইলেও আমায় কষ্টের সহিত সংযত হ'তে হবে। যে সব চিন্তা আজ মনে উদয় হচ্ছে সেগুলি এত পবিত্র, এত মূল্যবান যে অচেনা লোকদের কাছে তা

প্রকাশ করা যায় না—censor-দের ত অচেনা অজানা মনে না করে পারি না। আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে সমগ্র দেশের ক্ষতি যদি অপূরণীয়ই হয়ে থাকে, বাঙ্গলার যুবকদের পক্ষে এ একটা সব চেয়ে বড় সর্বনাশ—সত্যই এটা আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

আজকের দিনে এত বিচলিত ও শোকাচ্ছন্ন হয়েছি এবং সেই সঙ্গে মনোজগতে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার এত কাছাকাছি নিজেকে অনুভব করছি যে, তাঁর গুণাবলী বিশ্লেষণ করে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা মোটেই সম্ভব নয়। আমি তাঁর অত্যন্ত কাছে থেকে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তগুলিতে তাঁর যে ছবি দেখেছিলাম সময় এলে জগতের সামনে তার কথঞ্চিৎ আভাস দিতে পারব আশা করি। তাঁর সম্বন্ধে আমার মত যাঁরা অনেক কথাই জানেন, তাঁরা পারলেও আজ কিছু বলতে সাহস করছেন না, আশঙ্কা হয়, তাঁর মহত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে না পেরে পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলেন।

তুমি যখন ফলতঃ এই কথাটাই বল যে, দুঃখ কষ্ট নয়, তখন আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। জীবনে অবশ্য এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদের উপর এসে পড়েছে—সেগুলিকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারি না। আমি এত বড় তত্ত্বজ্ঞানী বা এতবড় ভণ্ড নই যে, বলব আমি সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টই আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা-ও ভেবে দেখতে হয় যে, কতকগুলি এমন হতভাগ্যও আছে—হয়ত তারা সত্য সত্যই ভাগ্যবান—যারা সকল রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার জন্যই যেন নির্দিষ্ট আছে। বেশী কম যাই হোক, যদি কাউকে পাত্রভরে দুঃখ পান করতে হয় তাহলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পান করা ভাল। এমনি একটা আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণের ভাব চীনের প্রাচীরের মত অদৃষ্টের সমস্ত আঘাত একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিতে নাও পারে। কিন্তু এতে নিশ্চয়ই আমাদের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। Bertrand Russell যখন বলছেন যে, জীবনে এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে যার হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতিই পেতে চায়, তখন ত তিনি খাঁটি সংসারী লোকের অভিমতই প্রকাশ করেছেন এবং আমার বিশ্বাস যে কেবল নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তি অথবা সাধুত্বের ভাণ করে যে ভণ্ড, সে-ই এ কথার প্রতিবাদ করবে।

যারা ভাবুক বা তত্ত্বজ্ঞানী নয় তাদের যন্ত্রণাটা সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন মনে করাটা হয়ত তোমার ঠিক হচ্ছে না। তত্ত্বজ্ঞানহীনদের (abstract point of view থেকে আমি তাদের তত্ত্বজ্ঞানহীনই বলি) নিজেদেরও একটা idealism আছে। তারা যাকে পূজার সামগ্রী মনে করে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় সেই ভালবাসার উৎস হতেই তারা সাহস ও ভরসা পায়। এখানে আমার সঙ্গে যারা কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা ভাবুক বা দার্শনিক নয়, তবুও তারা শান্তভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং বীরের মত সহ্য করে। Technical অর্থে তারা দার্শনিক না হতে পারে, কিন্তু তাদের আমি সম্পূর্ণরূপে ভাব-বিবর্জিত মনে করতে পারি না। সম্ভবতঃ জগতের সর্বত্র যারা কর্মী তাদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ একথা খাটে।

সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে, অপরাধীদের যখন ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদের একটা স্নায়বিক দৌর্বল্য আসে এবং যারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাণ দেয় তারাই শুধু বীরের মত মরতে পারে। এ ধারণাটা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ অপরাধীরা সাহসের সহিত প্রাণ দেয়, এবং ফাঁসির দড়ি তাদের গলায় বসাবার আগে ভগবানের পায়েই আত্মনিবেদন করে। একেবারে ভেঙ্গে মুষড়ে পড়তে বড় একটা দেখা যায় না। একবার এক কারাধ্যক্ষ আমাকে বলেছিলেন যে একজন ফাঁসির কয়েদী তাঁর কাছে স্বীকার করেছিল যে, সে একজনকে হত্যা করেছিল। সে তার কাজের জন্যে অনুতপ্ত কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল যে, তার মোটেই অনুতাপ হয়নি, কারণ হত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার ন্যায্য অনুযোগ ছিল। তারপর সে বীরদর্পে ফাঁসিকাঠে উঠেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু একটি পেশীর সঙ্কোচনও তার বুঝতে পারা যায়নি।

অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে আমার চোখ ফুটে গেছে। আমার মনে হয়, মোটের উপর তাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। সেবারে অর্থাৎ ১৯২২ সালে যখন আমি জেলে ছিলাম, তখন একটা কয়েদী আমাদের Yard-এ ভৃত্যের কাজ করত। সে সময়ে আমি মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সহিত এক কারাপ্রাঙ্গণে একই ঘরে বাস করতাম। দেশবন্ধুর প্রাণটা ছিল খুবই কোমল, তাই সহজেই এই কয়েদীর দিকে তিনি কেমন আকৃষ্ট

হয়ে পড়েছিলেন। সে একটা পুরানো পাপী, আটবার তার সাজা হয়। কিন্তু সেও কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই দেশবন্ধুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং আশ্চর্য রকমের শক্তির পরিচয় দেয়। কারামুক্তির সময় দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন যে, জেল থেকে মুক্তি পেলে সে যেন বরাবর তাঁর কাছে যায় আর তার পুরানো সহকারীদের ছায়া না মাড়ায়। কয়েদীটি রাজী হয়েছিল ও কথামত কাজও করেছিল। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে পুরানো দাগী ছিল, সে এখন উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে তাঁর বাড়ীতে বাস করছে এবং মাঝে মাঝে অভদ্র মেজাজ তার দেখা দিলেও সে যে এখন শুধু অন্য মানুষ তাহা নয়, অধিকন্তু বেশ সরল ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে এবং আজ এই ক্ষতি যাদের সবচেয়ে বেশী বেজেছে তাদের মধ্যে সেও একজন! অনেকে বলেন যে, মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে তার মহত্ত্বের বিচার করা উচিত—একথা যদি সত্য হয় তবে তাঁর দেশের কাজের দিকটা বাদ দিলেও স্বর্গীয় দেশবন্ধু একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

আমি আমার আসল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি, এবং এখন আমার থামা উচিত। তোমার চিঠির জবাব লেখা এখনও শেষ করতে পারলাম না, কিন্তু আজকের ডাক ধরতে গেলে আমাকে এইখানেই শেষ করতে হয়। আমি জানি তুমি আমার খবর পাবার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকবে, সুতরাং আজকের ডাক ধরতেই হবে। পরের পত্রে আরও খবর লিখব।

ইতি—

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(পরবর্তী ২ খানি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

৯৩

মান্দালয় জেল
২৬. ৬. ২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

কয়েকদিন হল আপনার কোন খবর পাই নি। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আপনি হয়ত সময় করে উঠতে পারেন নি।

স্বর্গত দেশবন্ধুর যাবতীয় চিঠি, কাগজপত্র সযত্নে সংরক্ষিত করে রাখার জন্য সুধীরবাবুকে বলতে আপনাকে আগের চিঠিতে লিখেছি। একটি জীবনী রচনার জন্য এগুলির প্রয়োজন হবে। প্রশ্নটি ব্যবহারিক এবং প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করে এমন। এই গভীর শোকাবেগে তাঁর নিকটতম ব্যক্তিদের এই প্রশ্নটি মনে না-ও আসতে পারে।

আপনি সম্ভবত জানেন যে, মাথুর নামে দেশবন্ধুর একজন নিজস্ব পরিচারক ছিল। মাথুর, যখন তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন তখন সেখানে ছিল এবং খুব আন্তরিকতার সংগে তাঁর সেবা করেছিল। মাথুর এর আগে সাত-আটবার দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, দেশবন্ধু তাঁকে পছন্দ করেছিলেন, এবং ছাড়া পাওয়ার পর থেকে সে তাঁর সঙ্গেই ছিল। আমি জানি যে দেশবন্ধুর মাথুর সম্পর্কে কিছু দুর্বলতা ছিল এবং ওকে তিনি ভাল পথে আনতে সমর্থ-ও হয়েছিলেন। সেই বিরাট মানুষটির প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি থাকার জন্য মাথুর নিশ্চয়ই যাঁদের পক্ষে এই আঘাত সহ্য করা অসম্ভব, তাঁদের মধ্যে একজন। তার অতীত জীবনের দু-একটা স্বভাব যেমন মাঝে মাঝে হিংস্র আচরণ করা, এখনও ওর মধ্যে রয়ে গেলেও, আমি ওকে যতটুকু দেখেছি তা থেকে মনে হয়েছে ও সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। সুধীরবাবু এই লোকটির বিষয়ে কি করবেন আমার জানা নেই। তাঁকে হয়ত নির্দয়ভাবে কুঠার চালনার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। যদি মাথুরকে কাজ ছাড়তে হয়, আমি তাকে রাখতে ইচ্ছুক। সুতরাং যতদিন না আমি ফিরি, আপনাকে মাথুরের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটি বুদ্ধিমান এবং কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, বাড়ির যাবতীয় কাজ ওর জানা। মোটের উপর লোকটি উপকারে আসবে বলেই মনে হয়। আমার মনে হয় যে মাথুরকে আশ্রয় দিলে তা হবে বিগত আত্মার ইচ্ছানুযায়ী কাজ। আপনার সুবিধেমত আপনি এ বিষয়ে সুধীরবাবু কিংবা শ্রীমতী দাশের সংগে কথা বলতে পারেন।

আমার আবেদনের জবাবে জানানো হয়েছে যে আমাকে বাংলা দেশে স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়। তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্যের বিষয়ে আমি গভর্নমেন্টকে যা লিখেছি তারা তা বিশ্বাস করে নি। এই ধরনের ব্যবহার মনে নরমপন্থা এবং "সুমিষ্ট

ন্যায়পরায়ণতার” উদ্রেক করে—তাই নয় কি?

ঋণের ব্যাপারে সরকারের কোন উত্তর পেয়েছেন? পরে যাই হোক না কেন, আশা করি এই ঋণ মঞ্জুর হবে। আপনারা কি একজন স্টোর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিয়োগ করে উঠতে পেরেছেন? আপনারা কি একটি স্বতন্ত্র কয়লা নিয়ন্ত্রণাধিকারিক নিয়োগ করবেন না দুটি পদকে এক করে দেবেন? শুনলাম, নিউ মার্কেটের অবস্থার উন্নতির জন্য সন্তোষবাবু সবিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন। ভাল কাজের দ্বারা তিনি আস্থার উদ্রেক করতে পারবেন বলে আশা করি। মোটর ভেহিক্‌লস বিভাগের দায়িত্বে এখন কে আছেন? ওয়াচার জায়গায় আপনারা কি কোন ভাল লোক পেলেন? যা-ই করুন, আপনাকে তা করতে হবে স্যার ট্যামানি হল ব্যানার্জির নির্দেশ অনুসারে। অন্যথায় তিনি ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে আপনার উপর বজ্র নিক্ষেপ করবেন।

আশা করি আপনি ভাল আছেন। এই গভীর শোকে শ্রীযুক্তা দাশের অবস্থা কেমন? ঈশ্বর তাঁকে শক্তি দিন।

আপনার
স্নেহের
সুভাষ

পুঃ—যে সব ছাত্রদের আমি সাহায্য করতাম, তাদের একজন বিপিন আমাকে লিখে জানিয়েছে যে গত এপ্রিল মাস থেকে সে আর আগের মতন বিনা বেতনে থাকা খাওয়ার সুবিধে পাচ্ছে না। মোট তার যত টাকা খরচ হয় তার অন্তত কিছুটা অংশ দিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য আমার বন্ধুদের কাছে লিখতে বলেছে। পরের সপ্তাহে আমি কয়েক-জন বন্ধুকে লিখব। ইতিমধ্যে আপনি দয়া করে আগের মতই সাহায্য করে যান। আপনাকে সমস্ত টাকাটা দেওয়ার কথা বলতে ও ভীষণ দ্বিধাবোধ করছে, এবং সেজন্যই সে অন্যত্র থেকেও যাতে মাসিক একটা ভাতা পাওয়া যায় তার চেষ্টা চালাচ্ছে। ও এখন কলেজের কোন একটা পরীক্ষার পরীক্ষার্থী।

স. চ. ব

(ইংরেজী থেকে অনুদিত)

৯৪

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
২।৭।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

অনেকদিন আপনার চিঠি না পেয়ে চিন্তিত আছি।

*　　　*　　　*

কিছুদিন আগে কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, ২ নং ওয়ার্ড থেকে ডালের গোলা অপসারণ করে মানিকতলা এলাকায় কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে তা স্থাপন করা উচিত। কলকাতা শহরের সম্প্রসারণের প্রশ্ন নিয়ে আমি কিছু চিন্তা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মাণিকতলাকে একটি বসতিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবেই গড়ে উঠতে দেওয়া উচিত। একবার এখানে ঠিকমত পাকা নর্দমার ব্যবস্থা হলে এবং বর্তমানে যে ধরনের সেতু আছে তার পরিবর্তে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বড় ও যাতায়াতের সুবিধাযুক্ত কয়েকটি সেতু নির্মাণ করে দিলে এখানকার জনবসতি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে * * * এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ১০ বছরের মধ্যেই মাণিকতলায় একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে উঠতে পারবে। কাজে কাজেই ডালের গোলা অপসারিত না হলে, তা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক হবে না, এবং শহরের উন্নতির পথেও একটা প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ হয়ে দেখা দেবে। * * * অতএব এই গোলাগুলি ভবিষ্যতে কোথায় স্থাপিত হবে সে সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। * * *

আর একটি মারাত্মক সমস্যা ৮ নং ওয়ার্ডের চামড়ার গুদামগুলি। * * * যদি এগুলিকেও অপসারিত করতে হয় তাহলে ভবিষ্যতে এটি কোথায় স্থাপিত হবে এ প্রশ্নও সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা কর্তব্য। শহরের উন্নতি এবং ভবিষ্যতের কলকাতা শহর কি রকম হবে, এ সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণার উপরেই এ সব সমস্যার সমাধান নির্ভর করে।

* * *

ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্‌স্‌ কয়েকদিন আগে এখানে এসেছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, অতিরিক্ত ভোজনের ফলেই আমার যে ডিসপেপসিয়া হয় নি, এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত কি না। আমি বললাম, আমার খাদ্য-ভাতা অর্ধেক পরিমাণ কমিয়ে দেবার পর এ প্রশ্ন অবান্তর। তাঁর সম্বন্ধে যে যা-ই ভাবুক না কেন, এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত খুবই স্বাভাবিক; কেননা Administration Report-এর বার্ষিক সংখ্যায় সম্প্রতি তাঁর যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তিনি একথাই বলেছেন যে, দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়। যখন এটি পড়ি, নিজের চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। এর পরে আর কোনও মন্তব্য করা চলে কি?

আই জি আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে প্রতিকারের জন্য আমার মাঝে মাঝে অনশন করা উচিত। (তাহলে গভর্নমেন্টের কর্মচারীদের মধ্যেও, মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য আছে দেখা যাচ্ছে!) আমি তাঁকে বলেছি যে, সে চেষ্টা আমি করে দেখেছি, কিন্তু তা আমাকে শুধু দুর্বল করে ফেলে। [* সেন্সর কেটে দিয়েছে *]

* * *

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করছি। আপনি পরের চিঠিতে আরও কিছু কিছু খবর দেবেন বলে জানিয়েছিলেন; আমি সেই চিঠিটার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছি। শ্রীমতী দাশকে এখনও চিঠি দিই নি, শোকের প্রথম আঘাত কেটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। তবে ভোম্বলকে চিঠি দিয়েছি, এবং আজকের ডাকে তার জবাবও পেয়েছি।

* * *

ইতি—
আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(শ্রীহরিচরণ বাগচীকে লিখিত পত্রাংশ)

৯৫

মান্দালয় জেল
৩।৭।২৫

তোমার তিনখানা পত্র আমি যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিবার সুযোগ পাই নাই; তা ছাড়া শরীর ভাল নাই। কোনও প্রকার কাজ করিতে (এমন কি লেখাপড়া করিতে) মন লাগে না। পূর্বে মাত্র দুইখানি পত্র সপ্তাহে লিখিতে পারিতাম—এখন একখানা লিখিতে পারি। ফলে দু'তিন মাসের চিঠি জমা হইয়া থাকে—উত্তর দিবার সুযোগ পাই না বলিয়া।

Social Service বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য—গরীবকে সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারা কাজ করানো, শুধু দান করা Organised Charity-র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। প্রতিদান না দিলে দান গ্রহণ করা আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর—এই ভাবটা গরীব সাহায্যপ্রার্থীদের মনে জাগান উচিত। সুতরাং যদি কেহ সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত না হয় তবে তাহার সাহায্য বন্ধ করা ভাল। তবে এ-ক্ষেত্রে দু' একটি কথা বিবেচনা করা উচিত—

(১) যে সাহায্য গ্রহণ করে তার কাজ করিবার অবসর থাকা উচিত। অর্থাৎ যদি কোনও বিধবা সাহায্য গ্রহণ করে এবং গৃহস্থালী কাজ করিয়া তাহার যদি অন্য কাজ করিবার অবসর না থাকে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উচিত নয়। আমাদের শুধু দেখা চাই যে, সাহায্য গ্রহণ করিয়া কেহ আলস্যে সময় কাটাইতেছে কি না। এই জন্য inspection বা স্থানীয় তদন্ত করিয়া সংবাদ লওয়া উচিত। সময় বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যাহারা কাজ করে না তাহাদের সাহায্য করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

(২) যাহাদের শারীরিক সামর্থ্য নাই ও যাহাদের সংসারে অন্য কোন কার্যক্ষম লোক নাই তাহাদের কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উচিত নয়।

(৩) কাজ করাইতে হইলে Variety of Choice থাকা চাই; কারণ সব

লোকের দ্বারা সব রকম কাজ হয় না। আগে সহজ কাজ লইয়া আরম্ভ করিবে, যেমন পুরাতন খবরের কাগজ দিয়া ঠোঙা প্রস্তুত করান—তারপর কঠিন কাজ শিখাইবে।

(৪) যাহাদের কাজ করাইতে চাও তাহাদের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা চাই। অনেক কাজ আছে যাহা মানুষে ভয় করে—না শেখা পর্যন্ত সে ক্ষেত্রে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কাজ করিতে রাজী হইবে না, কিন্তু একবার কাজ শিখিলে তাহারা ক্রমশঃ কাজে মন দিবে।

আমরা ভিক্ষুকের জাতে পরিণত হইয়াছি, সুতরাং ভিক্ষুকের মনোভাব একদিনে পরিবর্তিত হইবে না। যদি তোমরা আশা কর যে, একদিনে ভিক্ষুকের প্রবৃত্তি বদলাইবে তাহা হইলে তোমরা হতাশ হইবে। Social Service-এ অসীম ধৈর্য দরকার।

মোটের উপর তোমাদের কাজের প্রোগ্রাম এই raw materials (যেমন খবরের কাগজ, তুলা অথবা ঝিনুক) তোমরা যোগাইবে, যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে তাহারা সাহায্যের বিনিময়ে raw materials হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দিবে। সে জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার ভার তোমাদের এবং সেই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দোকানের সঙ্গে তোমাদের বন্দোবস্ত করা উচিত যাহাতে তোমাদের জিনিষ তাহারা ক্রয় করিয়া লয়। এই সব জিনিষ তাহারা বিক্রয় করিয়া খরচ খরচা বাদে যে লাভ থাকিবে তাহা হইতে সাহায্য দানে (অন্ততঃ আংশিক ভাবে) খরচ উঠিয়া যাইবে। Public Charity-র উপর চিরকাল নির্ভর না করিয়া সমিতির একটা স্বতন্ত্র আয়ের ব্যবস্থা তোমাদের করা উচিত। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ ও আয়াস-সাধ্য।

লাইব্রেরীর জন্য টাকা খরচ করিয়া বই না কিনিয়া author এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেদের নিকট হইতে বই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিও।

অনিলবাবুকে বলিও যে, লাইব্রেরীর জন্য haphazardly কতকগুলো বই সংগ্রহ না করিয়া একটা method অনুসারে বই সংগ্রহ যেন করেন। অবশ্য বিনা খরচে যে সব বই পাইবে—সেগুলিও গ্রহণ করিবে। কিন্তু তথাপি একটা প্রণালী থাকা উচিত। সর্বাগ্রে বাংলা ইংরাজী এবং ইউরোপীয় (Continental) সাহিত্যের নামকরা বই সংগ্রহ করিবে। তারপর ভারতের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসের বই সংগ্রহ করিবে। তারপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং মহাপুরুষদের জীবনী সংগ্রহ করিও। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও রাজনীতি, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বই সংগ্রহের চেষ্টা করিও। যদি একসঙ্গে সব রকম বই সংগ্রহ করিতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। মোট কথা, প্রত্যেক বিষয়ের অন্ততঃ কতকগুলি বই রাখা চাই—যাহাতে যে কোনও রুচির লোক আসুক না কেন সে পড়িবার বই পাইবে। বাজে উপন্যাস রাখার প্রয়োজন নাই—তবে ভাল ভাল উপন্যাস রাখা উচিত। অল্পের মধ্যে একটা আদর্শ লাইব্রেরী করা চাই।

*   *   *

দূরদেশে যদি সুতা কিনিতে হয় তাহা হইলে তোমরা weaving depot বেশীদিন রাখিতে পারিবে না। যাহাদের সাহায্য করিবে তাহাদের ঘরে এবং সমিতির সভ্যদের ঘরে সুতা উৎপাদনের চেষ্টা করা চাই, যদি অন্ততঃ খানিকটা সুতা ভবানীপুরে কিংবা তার আশে পাশে তৈয়ারী না হয় তবে তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ। আর একটি কথা তোমাদের মনে রাখা উচিত। যদি স্থানীয় লোকেদের মধ্যে সুতা প্রস্তুত হয়—তবে জানিবে যে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সহানুভূতি আছে। স্থানীয় সহানুভূতির অভাবে কোনও প্রতিষ্ঠান বেশী দিন চলিতে পারে না।

স্থানীয় লোকদের মধ্যে এমন লোক পাইবে যাহারা সুতা কাটিবে অথচ সুতা বিক্রয় করিবে না। তাহাদের সুতায় যদি ধুতি বা শাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিতে পার—তবে তাহারা সুতা কাটিতে পারে। পূর্বে অনেক লোক এইভাবে সমিতিতে ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত করাইত। এখনকার অবস্থা আমি জানি না. তবে আমার মনে হয় যে, সমিতিতে সুতা লইয়া ধুতি শাড়ী প্রস্তুত করিবার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। সভ্যদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাহাতে সুতা প্রস্তুত হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখিবে। ইতি—

পরবর্তী দুইখানি পত্র বাসন্তী দেবীকে লিখিত

৯৬

শ্রীচরণেষু মা,

আজ আপনার এই ঘোর বিপদের দিনে আমরা কয়েকজন প্রবাসী কারারুদ্ধ বাঙ্গালী আপনার নিকট সান্ত্বনার বাণী প্রেরণ করিতেছি, যে বিপদ আজ আপনাকে অভিভূত করিয়াছে তদপেক্ষা মহান বিপদ কোন মহিলার জীবনে ঘটিতে পারে না। যে শোক আজ আপনার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে, তদপেক্ষা গভীর শোক কোনও হিন্দু নারীর জীবনে কল্পনা করা যায় না, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আপনার এই দুর্দিনে আমরা আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। বিপদের ঘন কুজ্ঝটিকায় শোকের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া আমাদের হৃদয়ের বাণী যদি আপনার চরণে পেঁছায় তাহা হইলে আমরা ধন্য হইব।

যিনি গিয়াছেন তিনি আমাদেরও খুব আপনার জন ছিলেন। আজ আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকল ভারতবাসীই কাঁদিতেছে—কিন্তু সব চেয়ে বেশী কাঁদিতেছে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়।

তাঁহার আত্মীয়-স্বজন—তাঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ের বন্ধুরা—আজ তাঁহার জন্য কাঁদিতেছেন। সাহিত্য ও কলা জগতের মহারথীরা—এমন কি সকল ক্ষেত্রের ভাবুক সম্প্রদায়—আজ তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন। অভাগা তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিরা আজ তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে। যাহাদের জন্য তিনি তাঁহার সঞ্চিত ধন ও যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন—যাহাদের দেবার জন্য তিনি তাঁহার প্রাণ, মান, স্বাস্থ্য ও আয়ু উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—সেই দেশবাসীরা আজ তাঁহার শোকে অবসন্ন। কিন্তু বাঙ্গলার যে সব তরুণ প্রাণ তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের যৎকিঞ্চিৎ সম্পদ উৎসর্গ করিয়া তাঁহার উদ্ধৃত পতাকার তলে সমবেত হইয়াছিল—যাহারা সুখে দুঃখে আঁধারে আলোয় তাঁহার আদেশবাণী অনুসরণ করিয়াছে—সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা কখনও বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে, কখনও বা কারার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে—নৈরাশ্যের রজনীতে অথবা সফলতার প্রভাতে যাহারা তাঁহার মধ্যে পিতা সখা ও গুরুর অপূর্ব সমাবেশ পাইয়াছিল—আজ সেই সব তরুণ প্রাণের অবস্থা কি কথায় বর্ণনা করা যায়?

দেশবন্ধু গিয়াছেন। যশোরশ্মিমণ্ডিত পূর্ণরবির ন্যায় তিনি জীবন-মধ্যাহ্নেই অস্ত গিয়াছেন। সিদ্ধিদাতার বরপুত্র তিনি বিজয়মুকুট পরিয়াই ভারতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দিব্যলোকে যাত্রা করিয়াছেন। অত্যন্ত ত্যাগের মধ্য দিয়া তিনি আজ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আজ আমাদের বাহিরে তিমির, অন্তরে শূন্যতা। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল মেঘের পর মেঘ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে; সে তিমির-প্রাচীরের মধ্যে আলোক প্রবেশের তিলার্ধ স্থান নাই।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে—যেদিন বাংগলার আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, বাংগলার বীরকেশরী কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত। সেদিন নৈরাশ্যের আঁধার ভেদ করিয়া এক অপূর্ব মোহনীয় মূর্তি বরাভয়হস্তা মহাশক্তিরূপে বাঙ্গলার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেদিন বাঙ্গালী আপনার স্বরূপ চিনিয়াছিল; সেদিন বাঙ্গালী আপনাকে শুধু দেশনায়িকা নয়—দেশমাতৃকার আসনে বসাইয়াছিল। সেই গৌরবের, সেই আনন্দের, সেই উন্মাদনার দিন বাঙ্গলা ভুলে নাই, ভুলিতে পারে না। সেদিন বাঙ্গালী আপনাকে যে ভক্তি শ্রদ্ধা ও মানের সিংহাসনে বসাইয়াছিল, আজও বাঙ্গালীর হৃদয়ে আপনার সেই সিংহাসন অটুট রহিয়াছে। সেদিন হইতে আপনি শুধু চিররঞ্জন-মাতা নন,—আপনি বঙ্গমাতা

তাই বলি আমাদের এই বিপদের দিনে আপনিই আমাদের শক্তি সাহস ও সান্ত্বনা দিন, যে নিবিড় নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আজ সমগ্র দেশ নিমগ্ন—যে বিষাদ ও হাহাকারে আজ সোনার বাঙ্গলা শ্মশানপ্রায়—তার মধ্যে, নূতন আলোক বিকিরণ, নব শক্তির উন্মেষ ও নূতন উৎসাহ সঞ্চার—আপনি ভিন্ন আর কে করিতে পারে? যে আহ্বানে আপনি একদিন বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় নব জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই আহ্বানে আপনি আর একবার বাঙ্গালীকে জাগান। যে মন্ত্র-বলে আপনি একদিন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—সেই মন্ত্র লইয়া, মহাশক্তিরূপে, আপনি আর একবার আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হউন। মুহূর্তের মধ্যে অবসাদ ঘুচিবে—প্রাণে নূতন প্রেরণা, নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহ আসিবে—আশার অরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া দশদিক আবার সুখে হাসিয়া

উঠিবে। বাঙ্গলার সকল তরুণ-প্রাণ আপনার চরণে ভক্তির অর্ঘ্য অর্পণ করিবে; আপনার আশীষ লভিয়া কর্মক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইবে এবং অর্জিত জয়মাল্যে আপনাকে ভূষিত করিয়া গাহিবে "বন্দে মাতরম্"।

ম্যাণ্ডেলে সেন্ট্রাল জেল
ইং ৬।৭।২৫

ইতি—আপনার সেবকবৃন্দ
শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমদনমোহন ভৌমিক
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী

To
Mrs. C. R. Das
148, Russa Road South
Calcutta

৯৭

Mandalay Central Jail
10.7.25

মা,

এত দিন পত্র দিবার চেষ্টা করি নাই, কলমে ভাষা আসিছিল না—হাত অবশ হয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে যখন খবর কাগজে দেখি—তখন বিশ্বাস করিতে পারি নাই। তারপর যখন সমস্ত কাগজে একই কথা দেখলাম—তখন বাস্তবের কাছে মাথা নোয়াতে হ'ল। তিনি নিজে আমাকে লিখেছিলেন যে ২/৩ মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে আবার কর্মের মধ্যে ঝাঁপ দিবেন। সকলেই আশা করেছিল যে তাঁর অসমাপ্ত কাজ তিনি সমাপ্ত করবেনই। কিন্তু এর মধ্যেই বজ্রপাত! বজ্রপাতে লোকের শরীর-মন অল্পক্ষণের জন্য অবসন্ন থাকে—কিন্তু এ হেন অশনিপাতে অবসন্নতা সহজে দূর হয় না।

প্রথম কথা মনে হ'ল—আজ আমি যে সুদূর ব্রহ্মদেশে! হৃদয়ের প্রেরণা অনুযায়ী কাজ করবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। এ দুঃখ আমার পক্ষে ভোলবার নয়। কারাগৃহ—কারার লৌহকপাট—কারার অসংখ্য গারদগুলি ইহার পূর্বে কখনও এত বিষময় বলিয়া বোধ হয় নাই। ইচ্ছা হ'ল টেলিগ্রাম করে প্রাণের একটা কথা অন্ততঃ বলে পাঠাই—কিন্তু Conventional হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় তাহা করলাম না।

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় আলিপুর জেলে। তখন আমি সংবাদ পেয়েছি যে বহরমপুরে বদলি হ'ব। বিদায়ের সময়ে আমি তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে বললাম, "আপনার সঙ্গে বোধ হয় অনেকদিন দেখা হবে না।" তিনি উত্তরে হেসে বললেন, "না, আমি তোমাদের বেশীদিন জেলে থাকতে দিচ্ছি না।" হায়! তখন কি আমি জানি যে আমার কথা এত বেশী সত্য হয়ে দাঁড়াবে—অদৃষ্টের কি পরিহাস!

আমি ৬ই জুনে তাঁর নিকট একখানি পত্র দিই—সে পত্র কি তিনি পেয়েছিলেন? তাঁর শেষ পত্র আমি এইখানেই পাই। সেই চিঠি এবং সেই চিঠির ভাষা তাঁহার ভালবাসার শেষ নিদর্শন। আমি সেই চিঠির উত্তর ৬ই জুনে দার্জিলিং-এর ঠিকানায় পত্র দিই।

কয়েকদিন হ'ল আপনার নিকট ১৪৮নং ঠিকানায় আমরা সকলে মিলে একটা Joint চিঠি দিয়েছি। সে চিঠি পেলেন কিনা তা' জানবার জন্য আমরা একটু উদ্বিগ্ন আছি। আপনার মনের অবস্থা যদি সে রকম না হয়—তা' হলে লৌকিকতার দরুন কোনও উত্তর দেবার প্রয়োজন নাই। প্রাপ্তি সংবাদ পেলেই আমাদের যথেষ্ট হবে।

তাঁর বন্ধুবান্ধব ও follower-দের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার appreciation লিখেছেন বা লিখিতেছেন। কিন্তু appreciation লিখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা তাঁর এত নিকটে বাস করেছি এবং তাঁহার প্রাণের গভীরতা ও বিস্তৃতি এতটা অনুভব করেছি যে সেই অনুভূতি-জনিত বিহ্বলতার মধ্যে কিছু লেখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সান্ত্বনা দিবার ভার যাঁদের উপর—আশা করি তাঁহারা সে কর্তব্য পালন করেছেন। আমার কি সান্ত্বনা দিবার শক্তি আছে? আমারই যে সান্ত্বনার প্রয়োজন। তাই বলি আপনাকে ভগবানই শক্তি ও সান্ত্বনা প্রেরণ করুন।

ভোম্বলকে পত্র দিয়েছিলাম—তার উত্তর পেয়েছি। প্রত্যুত্তর আগামী সপ্তাহে দিব।

আমি বাহিরে থাকিলে আমার সেবায় কোনও ফল হত কিনা জানি না। আমার সেবার প্রয়োজন হ'ত কিনা—তা'ও জানি না। কিন্তু সেবার সুযোগ যে থাকত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আজ যে সেবার সুযোগ আমার নাই—এই কথা যেন ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে। এবং ব্যর্থ বাসনা ও ততোধিক ব্যর্থ প্রয়াস যেন বারে বারে বন্ধ দুয়ারের গায়ে আঘাত খেয়ে ফিরে আসছে। যেখানে মানুষ সামর্থ্যহীন—সেখানে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই আমি আবার প্রার্থনা করি তিনিই আপনাকে সান্ত্বনা ও শক্তি দিন। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আমায় ধন্য করুন।

ইতি—

আপনার সেবক

শ্রীসুভাষ

Mrs. C. R. Das
2, Beltala Road
Calcutta.

(C/o D.I.G., I.B., C.I.D.
13, Elysium Row
Calcutta)

(পরবর্তী ৩টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

৯৮

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
১৭।৭।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

দীর্ঘদিন আপনার চিঠি না পেয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করছি। ** আশংকা হয়, আপনার চিঠি এখানে আটক করা হচ্ছে। **

প্রায় দশদিন আগে শ্রীমতী দাশের কাছে একটি যুক্ত শোকবার্তা আমরা পাঠিয়েছিলাম। এ অবস্থায় উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে, এ আশা আমি করি না। আর উত্তর দেবার মতন মানসিক অবস্থা না থাকলে এই কষ্ট করারও এখন কোন প্রয়োজন নেই। শুধু একটি কথা জানতে ইচ্ছা হয়, এই চিঠি তাঁর কাছে পোঁছেছে কি না।

স্যার তমানি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই "A Nation in Making" সবে মাত্র পেয়েছি। এটি পড়ে আনন্দ পাওয়া যাবে বলে বোধ হচ্ছে।

*　　　*　　　*

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

৯৯

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
২২।৭।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

দীর্ঘদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের সকলের খবর জানবার জন্য আপনার কাছে একটি তার করব ঠিক করেছিলাম।

আমি জানি আপনাকে কিরকম ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই আমার মনে হয়, আপনার সময়াভাব হলে, অন্য কাউকে আমার কাছে চিঠি লিখবার জন্য আপনার বলা উচিত।

*　　　*　　　*

না, দেশবন্ধুর মৃত্যু-সংক্রান্ত কোনও তার আমি পাই নি। আপনার ১৫/৭/২৫ তারিখের যে চিঠিতে আপনি ঐ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, সেটি না পাওয়া পর্যন্ত আমি জানতেই পারি নি যে এ রকম কোন তার আমার নামে এসেছিল। **

*　　　*　　　*

**হোমিওপ্যাথির উপর দেশবন্ধুর এই রকম গভীর বিশ্বাস ছিল যে অন্য কোনও

চিকিৎসায় তাঁকে রাজী করানো যেত না। যাই হোক, শ্যামাদাস কবিরাজের ধারণা এই যে, তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং হিতৈষীরাই তাঁকে কবিরাজী চিকিৎসা করতে দেন নি।

ফরোয়ার্ডের দেশবন্ধু সংখ্যা খুব ভাল হয়েছে, এ সংবাদ আমি রেঙ্গুনের পত্রিকাগুলিতে পড়েছি। অনুগ্রহ করে চীফ সেক্রেটারীর কাছে এক কপি পাঠাবেন, যাতে তা আমার কাছে পৌঁছয়। এখানে আমাকে "ফরোয়ার্ড" দেওয়ার হুকুম নেই; তাই এই সংখ্যাটির জন্য বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হবে।

ফরোয়ার্ডের সম্পাদকমণ্ডলীতে দেশবন্ধুর জায়গায় কাকে মনোনীত করা হয়েছে? আপনি এতে কোন নতুন পদ গ্রহণ করেছেন কি?

* * *

ভালো কথা, ফরোয়ার্ডের নতুন সম্পাদক কে হয়েছেন—শ্রীপি. কে. চক্রবর্তী কি?

মেয়রের নির্বাচন সম্বন্ধে আমি কোনও কথা বলতে চাই না। এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, ভোটদানের সময় ভারতীয় সদস্যগণ যে সত্যি সত্যিই একমত হয়েছিলেন এজন্য আমি আনন্দিত।

হ্যাঁ, আই জি অফ প্রিজন্স্-ও তাঁর নিজস্ব বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। Administration Report-এর বার্ষিক সংখ্যায় সম্প্রতি তাঁর যে গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে তা এই যে, দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যায়। এর চাইতে মৌলিক গবেষণা আর কি হতে পারে?

* * *

আশা করি নানা কাজের চাপের মধ্যেও আপনি স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে ভুলবেন না। ** অসুখ হওয়ার আগেই সাবধান হওয়া অনেক ভাল এবং শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ার আগেই আপনি সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। **

* * *

আমি এবার বাঙ্গলা সাহিত্য নিয়ে কিছু কিছু পড়াশুনা করব ভাবছি, কিন্তু বইপত্র এখানে কিছুই নেই। গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করেও কোন ফল হচ্ছে না, কেননা তাঁরা অতি অল্পসংখ্যক বই-ই মঞ্জুর করে থাকেন। আমি বুক কোম্পানীতে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই, যাতে সরাসরি তাঁদের কাছে অর্ডার দিয়ে বই আনিয়ে নিতে পারি। কারামুক্তির পর আমি তাঁদের সব টাকা শোধ করে দেব। দরকার হলে সুদ দিতেও রাজী আছি।

এখানে একটু একটু ঠাণ্ডা পড়েছে এবং আগের চাইতে আমি একটু ভাল বোধ করছি। আগস্ট মাস নাগাদ পরিষ্কার আবহাওয়ার মুখ দেখা যেতে পারে। যদি শীত আসা পর্যন্ত এই রকম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব থাকে তাহলে পড়াশুনায় বেশী মনোনিবেশ করতে পারব আশা করি। আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

* * *

ইতি—
আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১০০

মান্দালয় জেল
১. ৮. ২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

এ সপ্তাহে আমি আপনার কোন খবর পাই নি। আশা করি আপনি শারীরিক সুস্থ আছেন।

এখন পর্যন্ত কর্পোরেশন অফিস থেকে আমাকে যে যে বই পাঠানো হয়েছে, রামিয়াকে তার একটি তালিকা পাঠাতে বলবেন। আমি তালিকা থেকে মিলিয়ে নিতে চাই যে, যে যে বই কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছে আমি তার সবগুলি পেয়েছি কি না।

মাসিক বসুমতীর আষাঢ় সংখ্যায়, ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশবন্ধুর উপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি আকর্ষণীয় এবং দেশবন্ধুর শেষ সাত দিনের অনেক সংবাদ আছে। বর্ণিত ঘটনাগুলি কতখানি সত্যি জানি না। কিন্তু ঐতিহাসিক

হিসাবে মিঃ ব্যানার্জি সঠিক তথ্যই পরিবেশন করবেন একথা আমি ধরে নিতে পারি। দয়া করে সময় করে লেখাটি পড়বেন, দশ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।

পরে সময় হলে ওই একই কাগজে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের লেখাটিও পড়তে পারেন। যথার্থই এটি পড়ার মত।

পাহাড়ে যাওয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্তে এলেন? যদি সম্ভব হয়, আমার মনে হয় তা বাতিল করে দেওয়া ঠিক হবে না।

দেশবন্ধু সম্পর্কিত অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা এবং সার-বর্জিত। এগুলিতে অনেক বাগাড়ম্বরপূর্ণ বাক্য আছে বটে, তবে তার বেশী কিছু নেই। লেখকেরা তাঁদের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে পারেন। এই ধরনের লেখাই সাধারণের উৎসাহ আকর্ষণ করে এবং মানুষটার চরিত্র উন্মোচিত করে তোলে। শরৎবাবুর লেখাটি—যার কথা উপরে লিখেছি—সঠিক লক্ষ্যানুসারী। দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপের কথা বিবৃত করে এবং বিশ্লেষণ করে, বাইরে থেকে যে সব ঘটনা তাৎপর্যহীন বলে বোধহয় চতুরভাবে সেগুলির উল্লেখ করে, তিনি নিজে যেমনটি তাঁকে দেখেছেন, তেমনি ভাবে তাঁকে আঁকতে চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সঠিক পথেই পদচারণা করেছেন।

দেশবন্ধুর কর্মজীবনের একটি দিক আছে, যার কথা বর্তমানে সাধারণত বলা হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে বাঙালীর চিন্তায় এর প্রভূত প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। 'নারায়ণ' পত্রিকায় তিনি যে চিন্তা-পথের উপর আলোকপাত করতে চাইতেন এবং তাকে উন্নত করতে চাইতেন, আমি সেই চিন্তা-পথের কথাই উল্লেখ করছি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং অন্যান্য লেখক-দের রচনায় বাঙলার প্রাচীন ও জাতীয় সংস্কৃতির যে উল্লেখ পাওয়া যায় দেশবন্ধু যে সেই সংস্কৃতির পুনরুত্থান চেয়েছিলেন, একথা আপনি হয়ত জানেন। রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রানুসারীদের জীবনে ও সাহিত্যে যে শূন্যগর্ভ, অগভীর আন্তর্জাতিকতাবাদের স্ফুরণ দেখা যায়, এবং যে আন্তর্জাতিকতাবাদ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের মূল সত্যটি অনুধাবন করতে অক্ষম, চিত্তরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে তাকেও অনাবৃত করে দেখাতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্র-বিরোধী গোষ্ঠীর লেখকদের কয়েকটি নিবন্ধ যেগুলি 'নারায়ণে' প্রকাশিত হয়েছিল, আমি সেগুলি পড়ছি এবং অনুভব করছি যে আগামী দিনগুলিতে এই গোষ্ঠী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, তাঁর চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা-রূপে দেশবন্ধু একজন ভদ্রলোককে চিহ্নিত করতেন। তিনি, হাইকোর্টের উকিল, বাবু গিরিজা শংকর রায়চৌধুরী।

আমার অবিন্যস্ত চিন্তাধারায় এক্ষুনি ছেদ টানা উচিত কারণ বহির্গামী ডাক ধরতে হবে।

মনে হয় যেন আগস্ট মাসে আর এটি যাবে না।

আপনার
স্নেহের
সুভাষ

(বিভাবতী বসুকে লিখিত)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল
৭।৮।২৫

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আমি অনেকদিন হ'ল আপনাকে কোন পত্র দিই নাই। এ সপ্তাহে মেজদাদাকে লেখবার মত কিছু নাই, তাই আপনাকে লিখতে বসেছি। আপনাকে কাজের সম্বন্ধে লেখবার প্রয়োজন নাই, তাই ঘরকন্না সম্বন্ধে লিখিব।

আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে—মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। অর্থাৎ যেখানে মধুর অভাব সেখানে গুড় দিয়ে মধুর কাজ সারা উচিত, তাই ছোট ছেলেপুলের অভাব এখানে বেরালছানা দিয়ে মেটান হয়। আমি ছোট ছেলেমেয়ে খুব পছন্দ করি কিন্তু বেরালছানা আমার ভাল লাগে না—বিশেষত যেখানে সব কয়টি বেরালই বদরঙের। তা' আমার কথা কেহ শুনতে চায় না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বেরাল ভালবাসে—আর যে সব গরীব

কয়েদীরা আমাদের গৃহস্থালীর কাজ করে তারাও বেরাল ও বেরালছানাকে আদর করে। এইসব লোকের বেরাল প্রীতির ফলে এখানে বেরালের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখানে বেরাল সবচেয়ে ভালবাসে যে লোকটি মেথরের কাজ করে—তাকে সবাই "ময়লা-লু" বলে, তার আসল নাম "লবানা"। আর ময়লা সাফা করে বলে তার নাম সবাই রেখেছে "ময়লালু"—বর্মা ভাষায় 'লু" মানে "লোক" বা "মানুষ"। সে ময়লা সাফা করে অতএব তার নাম "ময়লালু"। "ময়লালু" কথাটা ভাল লাগে না বলে "ময়লালু"—তার থেকে ভাল নাম দাঁড়িয়ে গেছে "মলয়"। আমাদের "মলয়" যখন শোয়—তখন তার মাথার কাছে বেরাল, বুকের উপর বেরাল, পায়ের কাছে বেরাল। চতুর্দিকে বেরালের পরিবারের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সে ঘুমোয়। নিজের খাবারের অংশ থেকে সে খাবার বাঁচিয়ে বেরালকে খাওয়ায়—আর আমাদের কাছ থেকে দুধ চেয়ে নিয়ে বেরালছানাকে দুধ খাওয়ায়। আর সে যখন একবার তু বলে ডাক দেয় রাজ্যের বেরাল তার কাছে ছুটে আসে। ইতি বেরাল কাহিনী সমাপ্ত।

আমাদের গৃহস্থালী নেহাৎ ছোট নয়। পরিবারের সংখ্যা ৯ জন। তবে বলা বাহুল্য যে সকলেই পুরুষ। চাকরটাকর নিয়ে মোট ২০ জনের বেশী বই কম নয়। জেলের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র জেলে আমরা বাস করি। এখানকার লোকেরা কি বাবু কি চাকর—জেলের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে মিশতে পায় না। আমাদের সংসারের মধ্যে বাবুর্চী, মশালচী, মেথর, ঝাড়ুদার ইত্যাদি সবরকম লোক আছে। বসতবাটী ছাড়া এই ক্ষুদ্র জেলের মধ্যে রান্নাঘর, পুখুর, খেলবার জন্য টেনিস কোর্ট প্রভৃতি আছে। স্নানের ঘর গত ৬ মাস ধরে তৈয়ারী হচ্ছে। কবে তৈয়ারী শেষ হবে তা শ্রীভগবান ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বলতে পারে না।

বুঝতেই পারছেন যে এই বৃহৎ সংসারে সকলেই কয়েদী—কেহ দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী আর কেহ আমার মত বিনাবিচারে সরকারের হুকুমে কয়েদী। আপনারা চোর-ডাকাতের নাম শুনে বোধ হয় নাক সিঁটকোবেন, কিন্তু এখন জেলের কয়েদীদের উপর আমার আর ঘৃণার ভাব নাই। এদের মধ্যে অনেকেই বিপদে পড়ে অথবা বাধ্য হয়ে অন্যায় করে এবং অনেকেই বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয়। তাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয় আছে এবং ভাল অবস্থায় পড়লে তারা যে ভাল হতে পারে এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে বলে—"গৃহিণী গৃহং উচ্যতে" অর্থাৎ গৃহিণী না থাকলে গৃহ নাকি গৃহই নয়। আমাদের এখানে গৃহ আছে কিন্তু গৃহিণী নাই। গৃহিণীর অভাবে আমাদের একজন ম্যানেজার বাবু নিযুক্ত করা হয়েছে—বলা বাহুল্য যে ম্যানেজার বাবু আমাদের মত একজন বিনাবিচারে কয়েদী। তিনি হিসাবপত্র রাখেন; দৈনিক বাজারের ফর্দ তৈয়ারী করে দেন এবং গৃহস্থালীর কাজ সম্বন্ধে তিনি সর্বেসর্বা, আমাদের এই বিশাল সংসার তাঁর অঙ্গুলি চালনায় চলে। খাওয়া-পরার জন্য তাঁকে আমরা দায়ী করি এবং খাওয়া খারাপ হলে তাঁকে গালাগালি দিতে ছাড়ি না। আমাদের এই সংসারের নাম রাখা হয়েছে--অমুক বাবুর হোটেল।

এখানকার খাওয়াদাওয়া সাধারণতঃ মন্দ নয়—তবে আজ কয়েকদিন হ'ল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোল বেঁধেছে। ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে তা এখন বুঝতে পারছি না। বাঙ্গালীর মিষ্টান্ন বাদে এখানে জিনিষপত্র মন্দ পাওয়া যায় না—তবে জিনিষপত্রের দাম বড় বেশী। ম্যানেজার বাবুর কৃপায় এখানে আমাদের উঠানের এককোণে মুরগীশালা খোলা হয়েছে—সেই ঘরের মধ্যে কতকগুলি মোরগ ও মুরগী স্থান পেয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা এই সব পক্ষবিশিষ্ট জীবের "কক্কর কোঁ" শব্দে আমি অস্থির হয়ে উঠি—কিন্তু এই মধুর রব না শুনলে ম্যানেজার বাবুর নাকি ঘুম হয় না।

উঠানের মধ্যে একটা ছোট পুখুর আছে। তাতে আমাদের নাক পর্যন্ত জল ধরে। সেই পুকুরের জল পরিষ্কার থাকলে আমরা লম্ফঝম্ফ করে, একটু সাঁতার কাটবার চেষ্টা করি। অবশ্য যেখানে ডোববার ভয় নাই—সেখানে সাঁতার ভাল হয় না। কিন্তু আমি গোড়ায় বলেছি মধুর অভাবে লোকে গুড় খায়—আমরাও নদীর অভাবে বড় চৌবাচ্চায় সাঁতার দিয়ে মনকে প্রবোধ দিই।

ম্যানেজার বাবুর চেষ্টায় এই উঠানের মধ্যে কতকগুলি ফুলের গাছ লাগান হয়েছে। তবে তার মধ্যে গন্ধহীন সূর্যমুখী ফুলই বেশী, এ রাজ্যে সুগন্ধি ফুল পাওয়া সহজ নয়। জানি না এটা দেশের গুণ কি জেলের গুণ। জেলের মধ্যে যে সব রজনীগন্ধা ফুল ফোটে সেগুলোর সুগন্ধ নাই বলে মনে হয়।

আমার কাহিনী আজ এখানেই অসমাপ্ত রাখতে হবে—তা না হলে এ সপ্তাহের ডাক যাবে না। কাহিনী সকলকে পড়ে শোনাবেন, মেজদাদাকেও। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বাড়ীতে পত্র দিই। যদি কোনও সপ্তাহে আমার পত্র না পান তবে এখানকার সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে পত্র বা টেলিগ্রাম দিয়ে আমার খবর নেবেন।

আপনারা সকলে কেমন আছেন—এবং আমার কাহিনী ভাল লাগল কিনা জানাবেন। যদি ভাল লাগে তা হলে আমি আরও লিখতে পারি। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

সুভাষ

(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত)

১০২

মান্দালয় জেল

১২।৮।২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'মাসিক বসুমতী'তে আপনার "স্মৃতিকথা" তিনবার পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি; দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ ক'রে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

যাহারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা' নয়—আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হাল্‌কা করেছেন। বাস্তবিক "পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করতে হয় বেশী" এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তাঁর অনুগ্রহ, কর্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সবচেয়ে ভাল লাগল—"একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালোও লাগে না।" বাস্তবিক, হৃদয়ের নিগূঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয় তো সে উপহাস সহ্য করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করতে পারে তা' হলে অসহ্য বোধ হয়. মনে হয়, "অরসিকেষু রসনিবেদনং শিরসি মা লিখ।" আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কে বুঝতে পারে?

আর একটি কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল লেগেছে।..."আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।" প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যারা তাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধ হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না করেও পারতেন না। আর তিনিও মতনির্বিশেষে সকলকে ভালবাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে আমি তাঁকে মনুষ্য-চরিত্র বিচার করতে দেখিনি। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সবচেয়ে ঝগড়া। নিজের কথা বলিতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু আমি জানতুম যে যত ঝগড়া করি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট যে, যত ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক না কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হ'তো মা'র (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায় "রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও ঘুচে গেছে।"

আপনি এক জায়গায় লিখেছেন—"লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!" সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি—তখন নানাপ্রকার অসত্যে এবং অর্ধ সত্যে বাঙ্গলার

সব খবর কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলেই নাই—এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে এক সময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ণ গৌরব ঘুরে এল—বাহিরের লোক এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল—তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে ভাণ্ডারে অর্থসঞ্চয় হ'ল, নিজেদের খবর কাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জনমত অনুকূল দিকে ফেরান হ'ল তা বাহিরের লোক জানে না—বোধ হয় কোনও দিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার—এই দুয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য করতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে, তাঁর স্বদেশ সেবাব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এবং অনেকটা সফলও হ'য়েছিলেন। ১৯২১ খৃঃ ধরপাকড়ের সময়ে স্থির সঙ্কল্প করেছিলেন যে একে একে তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি পাঠাতে পারবেন না—এ রকম বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক থেকে খুব নিম্নস্তরের বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম যে, তিনি শীঘ্রই ধরা পড়বেন, তাই আমরা বলেছিলুম যে তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্বে তাঁর পুত্রের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্তমান থাকতে আমরা কোনও মহিলাকে যেতে দিব না। অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক চলে, কোনও সিদ্ধান্ত হয় না—আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পারিনি। শেষে তিনি বলেন, "এটা আমার আদেশ—পালন করতে হবে।" তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য করলুম।

তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা—তাঁর উপর তাঁর অধিকার বা দাবী নাই, সেইজন্য তাঁকে পাঠাতে পারলেন না। কনিষ্ঠা কন্যা তখন বাগ্‌দত্তা—তাঁকে পাঠান উচিত কিনা—সে বিষয়ে ভীষণ তর্ক হ'ল, তিনি পাঠাতে চান—কন্যারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু অন্যান্য সকলের মত—তাঁকে পাঠান উচিত নয়। কারণ একেই তিনি অসুস্থ, তারপর আবার বাগ্‌দত্তা—শীঘ্রই বিবাহ হবার কথা। এ ক্ষেত্রে দেশবন্ধু সাধারণের মত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। শেষে সিদ্ধান্ত হ'ল সর্ব প্রথমে ভোম্বল যাবে—তারপর বাসন্তী দেবী ও ঊর্মিলা দেবী যাবেন—এবং তাঁর ডাক যে মুহূর্তে আসবে তখনই যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে—লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা নিহিত রয়েছে—তার সন্ধান কয়জন রাখে? তাঁর সাধনা শুধু নিজেকে নয়—তাঁর সাধনা তাঁর সমস্ত পরিবারকে নিয়ে। আমার মনে হয় যে, মহাপুরুষের মহত্ত্ব বড় বড় ঘটনার চেয়ে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই বেশী ফুটে উঠে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'বসুমতী'তে আমি দেশবন্ধুর সহকর্মী ও অনুগত কর্মীদের লেখা সযত্নে পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রকমের এবং কতকগুলো বাঁধা শব্দের পুনরুক্তিতেই পরিপূর্ণ, কেবল আপনি একা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধুর চরিত্র অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাই আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর তৃপ্তি হ'ল তা বলিতে পারি না।...দেশবন্ধুর শিষ্য ও সহকর্মীদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করেছিলুম। তাঁরা বোধ হয় কিছু না লিখলেই ভাল করতেন।

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারি না যে, দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু ও দেহত্যাগের জন্য তাঁর দেশবাসীরা ও তাঁর অনুচরবর্গও কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন, তাহলে বোধ হয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে হত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে, যাঁকে একবার নেতৃপদে বরণ করি, তাঁর উপর এত ভার চাপাই ও তাঁর কাছ থেকে এত বেশী দাবী করি যে কোনও মানুষের পক্ষে এত ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত সব রকম দায়িত্বের বকল্‌মা নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকতে চাই।

যাক্—কি বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা—শুধু আমরা কেন—এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্মৃতিকথা'র মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হতে পারে না, অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপনি যদি লেখেন, তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে কোন সন্দেহ নাই।

আমি বোধ হয় খুব বেশী দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা এখন আর নাই। বাহিরে গেলেই যে শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সংকুচিত হ'য়ে পড়ে। এখানে সুখে দুঃখে স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে। পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত ক'রে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বন্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ, একটা শান্তি—একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাহিরের হতাশা, বাহিরের শূন্যতা এবং বাহিরের দায়িত্ব—এখন আর মন যেন চায় না।

এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাঙ্গলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছিলেন—

"সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙ্গলার বিচিত্ররূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল—বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

কেন এ পত্র লিখে ফেল্লুম জানি না। আপনাকে পত্র দিব এ কথা আগে কখনও মনে আসেনি। তবে আপনার লেখা পড়ে কতকগুলো কথা মনে আসাতে লিপিবদ্ধ করলুম। যখন লিখে ফেলেছি—তখন পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয় দেবেন। তবে উত্তর দাবী করবার মত ভরসা রাখি না, যদি উত্তর দেন এই আশায় ঠিকানা দিলুম—

C/o D.I.G., I.B., C.I.D
13, Elysium Row
Calcutta.

(শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১০৩

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
১৮।৮।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

অনেক দিন হল আপনার কোন খবর নেই। মনে হয় ইদানীং আপনি খুব ব্যস্ত আছেন।

আমার কাছে যে ৫টি ফাইল ছিল, সেগুলি আমি কর্পোরেশনের সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেগুলির মধ্যে আছে একটি Salt ফাইল, একটি Straw ফাইল, একটি Gram ফাইল, মোটর ভেহিকল্স্ বিভাগের দুটি ফাইল—সব মিলিয়ে পাঁচটি। নুন, খড়, এবং ছোলা—ইত্যাদির বিষয়ে আমি একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পাঠিয়েছি, যেটি কাজে আসতে পারে। শ্রীসন্তোষকুমার বসু, Motor Vehicles বিভাগের উপর যে বিবরণীটি লিখেছিলেন, আমার কাছে সেটি নেই। আমি যত্ন করে খুঁজে দেখেছি কিন্তু সেটি পাই নি। আমার যতদূর মনে পড়ে, বিবরণীটি আমাকে পাঠানো হয় নি। অন্যত্র কোথাও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে কর্পোরেশন স্ট্রীটে আমার অফিসের টেবিলে এটি থেকে থাকতে পারে।

এখন পর্যন্ত রামিয়া আমাকে যে সব বই পাঠিয়েছেন, তার একটি তালিকা তাকে

পাঠাতে বলবেন। কর্পোরেশন অফিস থেকে যত বই পাঠানো হয়েছে, তার সবগুলি আমার কাছে পৌঁছেছে কি না জানতে চাই।

কিছুদিন আগে আপনি লিখেছিলেন যে আমাকে কিছু বই পাঠানোর জন্য আপনি Book Company- কে বলেছেন। বইগুলি এখনও পর্যন্ত আমি পাই নি।

বুক কোম্পানীর কাছ থেকে কি কি বই আমি চাই, তার একটি তালিকা পাঠাচ্ছি। তাঁরা বইগুলি ধারাবাহিকভাবে ভাগ করে করে পাঠাতে পারেন। একই সঙ্গে তাঁদের সমস্ত বই পাঠাতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

বার্মা গভর্নমেন্ট আমাদের জানিয়েছেন যে, নিজেদের খরচে আমরা বাদ্য-যন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি পাব না, তাতে জেলের শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। অথচ সুপারিনটেনডেন্ট নিজে আমাদের উপস্থিতিতে Inspector-General of Prisons- কে বলেছিলেন, তাঁর কোন আপত্তি নেই।

ছুটির জন্য হাইকোর্ট কবে বন্ধ হচ্ছে? আপনি শেষ পর্যন্ত কি করবেন, ঠিক করে ফেলেছেন? আমার মনে হয় আপনি পুজোর সপ্তাহে কোদালিয়ায় যাবেন। এখানে আমরা দুর্গাপুজো উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করছি।

১০৪

১৯।৮।২৫

আপনার ২৭-৭-২৫ এবং ১০-৮-২৫ তারিখের চিঠি গতকাল পেলাম। পোস্ট অফিসের চিহ্নে যদিও ২৭-৭-২৫ লেখা আছে, জানি না তবুও, এটি পেতে কেন এত দেরী হল। এ বিষয়ে আমি D.I.G.- কে লিখছি।

আপনার ২৭. ৭. ২৫-এর চিঠি পাওয়ার আগে, রেঙ্গুনের সংবাদপত্রে দেখেছি যে শ্রীমতী দাশের কাছে লেখা আমাদের চিঠি গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে। ওই চিঠির কোন কোন অনূদিত অংশ Associated Press টেলিগ্রাফ করে রেঙ্গুনের সংবাদপত্রগুলিতে পাঠিয়েছে। অনুবাদটি আমার বিশেষ পছন্দ হয় নি।

ফরোয়ার্ড পত্রিকার 'দেশবন্ধু সংখ্যা' পেয়েছি। বেশ ভাল হয়েছে, এবং প্রকাশকদের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বাবা এখন ভাল আছেন শুনে ভাল লাগল। তিনি কোথায় ছুটি কাটাতে ইচ্ছা করেন?

এখানে এখন আবহাওয়া পরিবর্তনশীল। তবে মোটের উপর ঠাণ্ডা। আশা করছি, শীত আসার আগে, আর গরম পড়বে না। গত চিঠিতে লিখেছি, আগের চাইতে এখন আমি সামান্য ভাল।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন।

ইতি—
আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(এন. সি. কেলকারকে লিখিত)

১০৫

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
উত্তর বর্মা
২০।৮।২৫

প্রিয় মিঃ কেলকার,

গত কয়েক মাস যাবৎই আপনাকে চিঠি লিখে কয়েকটি খবর জানাব বলে ভাবছিলাম যা আপনার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে। জানি না আপনি জানেন কি না যে গত জানুয়ারী মাস থেকে আমাকে এখানে আটক করে রাখা হয়েছে। বহরমপুর জেলে (বাঙলা) থাকা-কালীন, জানুয়ারীর শেষাশেষি যখন মান্দালয়ে বদলির হুকুম আসল, তখন আমার মনে হয় নি যে এই মান্দালয় জেলেই স্বর্গত লোকমান্য তিলক তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী কারাবাসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছিলেন। এখানে আসবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও আমি ভাবতে পারি নি যে, এই জেলের চার-দেওয়ালের মধ্যেই নানা প্রতিকূল পরিবেশ

সত্ত্বেও স্বর্গতঃ লোকমান্য তাঁর বিখ্যাত গীতা-ভাষ্য লিখেছিলেন যা, আমার ক্ষুদ্র-বিবেচনায় তাঁকে শঙ্কর ও রামানুজের মতন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে একাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

লোকমান্য যে ওয়ার্ডে বাস করতেন তা এখনও আছে, তবে নতুন পরিকল্পনায় একে আরও বড় করা হয়েছে। আমাদের ওয়ার্ডের মতই কাঠের বেড়া দিয়ে এটি এমনভাবে তৈরী যে, গ্রীষ্মকালে তাপ ও রোদ, বর্ষাকালে বৃষ্টি, শীতকালে শীত—এমন কি সারা বছর ধরে যে ধূলোর ঝড় বয়, তা থেকে আত্মরক্ষার কোনও উপায়ই নেই। এখানে আসবার পর কয়েক-মিনিটের মধ্যেই এই ওয়ার্ডটি আমাকে দেখানো হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে আমার এই নির্বাসনকে খুশি মনে গ্রহণ করতে পারি নি। তবু আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম যে, স্বদেশ ও স্বগৃহ থেকে, মান্দালয়ে এই বাধ্যতামূলক নির্বাসনের ফলে স্মৃতির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, যা আমার কাছে সান্ত্বনা ও প্রেরণাস্বরূপ হবে। অন্যান্য জেলের মত এই জেলও নোংরা, একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন; তবু এটি আমার কাছে একটি পবিত্র তীর্থস্থান। কারণ এখানে ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান একাদিক্রমে ছয় বছর কারাবাস করে গেছেন।

লোকমান্যের এই ছয় বছরব্যাপী কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু যে দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তাঁর দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল সে খবর আমরা খুব কম-সংখ্যক লোকই রাখি, একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। ভাবের আদানপ্রদান চলতে পারে এমন কোন সঙ্গী তাঁর ছিল না—ফলে তাঁকে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাতে হত। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, তাঁকে আর কোন বন্দীর সঙ্গে মেলামেশা পর্যন্ত করতে দেওয়া হত না। বই-ই ছিল তাঁর একমাত্র সঙ্গী এবং একাকী একটি ঘরে তাঁকে বাস করতে হত। এখানে অবস্থানকালে তাঁকে দুই-তিনবারের বেশী কারও সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয় নি। এমন কি যে কয়বার তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তাতেও পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষ সামনে উপস্থিত ছিলেন, যার ফলে সহজ ও খোলাখুলি ভাবে তিনি কোন আলাপ-আলোচনা করতে পারেন নি।

তাঁকে পত্রিকা পড়তে দেওয়া হত না। তাঁর মত একজন বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাকে বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখার চেষ্টা নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এ যন্ত্রণা যে ভোগ করেছে, সে-ই শুধু আমার কথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারবে। উপরন্তু তাঁর কারাবাসের অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁর অবর্তমানে তা সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে—এমন কোন সান্ত্বনাও তিনি খুঁজে পান নি।

তাঁর দৈহিক যন্ত্রণার বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল। তিনি পেনাল কোডের ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তখনকার রাজনৈতিক বন্দীদের চেয়ে অনেক বেশী কঠোর বিধিনিষেধ তাঁকে মেনে চলতে হত। এই সময়ে বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। এখন মান্দালয়ের জলবায়ু যে রকম, লোকমান্য যখন এখানে ছিলেন তখনও তা অবশ্যই এরকম ছিল। আর যদি এখনকার যুবকেরাও স্বীকার করেন যে, কারাবাস মানুষকে দুর্বল করে তোলে, অজীর্ণতা ও বাতরোগ ডেকে আনে এবং প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করে দেয়, তা হলে লোকমান্যের মতন একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিকে কি যন্ত্রণাই না ভোগ করতে হয়েছে!

জেলের মধ্যে লোকমান্য নীরবে যে কষ্ট সহ্য করেছেন, তার কতটুকুই বা আমরা জানি! যে সব যন্ত্রণা একজন বন্দীর জীবনকে মাঝে মাঝে দুঃসহ করে তোলে সে সম্বন্ধে কয়জনই বা খবর রাখে! গীতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলেই হয়ত তিনি এ সব যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে কখনও তিনি কাউকে কিছু বলেন নি।

বার বার আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি যে, কি অবস্থার মধ্যে লোকমান্য তাঁর মূল্যবান জীবনের দীর্ঘ ছয় বছর অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছি,—"যদি যুবক বন্দীদেরই এইরকম কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাহলে লোকমান্যের মত একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তাঁর সময়ে কত বেশী কষ্টই না সহ্য করতে হয়েছে যা তাঁর দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত ছিল।" ঈশ্বর এই পৃথিবীর স্রষ্টা, কিন্তু জেলগুলি তৈরী করেছে মানুষ। এটি একটি পৃথক জগৎ এবং সভ্য সমাজের ধ্যান ধারণার দ্বারা এটি চালিত হয় না। আত্মার মৃত্যু না ঘটিয়ে এই বন্দীজীবনের সঙ্গে মানিয়ে চলা সহজ ব্যাপার নয়। পুরোনো অভ্যাস সমস্তই ত্যাগ করতে হবে—অথচ স্বাস্থ্য ও শক্তিও নষ্ট করা চলবে না; জেলের আইন-কানুন মেনে চলতে হবে, আবার হার স্বীকার না করে মনের প্রফুল্লতা ও

শান্তিটুকু বজায় রাখতে হবে। এই যন্ত্রণা ও পরাধীনতার মধ্যেও কারাবাসের অমানুষিক প্রতিক্রিয়া তুচ্ছ করা এবং মানসিক স্থৈর্য বজায় রেখে গীতা-ভাষ্যের মত একটি বিরাট যুগ-সৃষ্টিকারী গ্রন্থরচনা—এ শুধু লোকমান্যের মতন অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন একজন দার্শনিকের পক্ষেই সম্ভব।

যদি কেউ জানতে ইচ্ছুক হন যে, এইরকম প্রতিকূল, ক্লান্তিকর ও নিরুৎসাহজনক পরিস্থিতির মধ্যেও লোকমান্যের গীতা-ভাষ্যের মত একটি বিরাট ও মহৎ গ্রন্থ রচনা করতে হলে পাণ্ডিত্য ছাড়াও কি পরিমাণ ইচ্ছাশক্তি, গভীর সাধনা ও সহনশীলতার প্রয়োজন তা হলে তাঁর কিছুদিন জেলে বাস করা উচিত। আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি, এ বিষয়ে যতই আমি চিন্তা করি ততই শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অভিভূত হয়ে যাই। আশা করি দেশবাসী লোকমান্যের মহত্ত্বের পরিমাপ করবার সময় এ সব বিষয় মনে রাখবেন। তিনি বহুমূত্রের রোগী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকালব্যাপী কারাবাসের সেই দুঃসহ মুহূর্তগুলিতে নিজ প্রতিভা ও অবিচল সংগ্রামের আদর্শের দ্বারা মাতৃভূমিকে এইরকম একখানি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের প্রথম সারিতে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য; লোকমান্য তাঁর কারাবাসকালে তা অস্বীকার করে-ছিলেন বলেই প্রকৃতি তাঁর উপর প্রতিশোধ নিয়েছিল। এবং আমার মনে হয়, সত্যি কথা বলতে গেলে, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেই যেরকম দেশবন্ধুর মৃত্যুর সূচনা হয়েছিল সেই সেই রকম মান্দালয় থেকে মুক্তি পাবার সময়েই লোকমান্যের মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠেছিল। এটি নিঃসন্দেহে পরিতাপের বিষয় যে, এইভাবেই আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারাব; অথচ আশ্চর্য হয়ে ভাবি যে, এই শোকাবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যদি কোনভাবে রোধ করা যেত।

গভীর শ্রদ্ধা জানবেন। ইতি—

আপনাদের
সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত এন· সি· কেলকার
পুণা

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

১০৬

মান্দালয় জেল
১১।৯।২৫

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার চিঠি পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। আমার চিঠি পড়ে আপনারা যে রস উপভোগ করেছেন তা' জেনে সুখী হয়েছি—কারণ মধ্যে মধ্যে আশঙ্কা হয় যে হয়তো জেলে থাকতে থাকতে জীবনের সব রস শুকিয়ে যাবে। শাস্ত্রে বলে "রসো বৈ সঃ"—অর্থাৎ ভগবান নাকি রসময়। সুতরাং রস যে লোক হারিয়েছে—সে যে জীবনের সারবস্তু—আনন্দ—হারিয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—তার জীবন তখন ব্যর্থ, নিরানন্দ ও দুঃখময়। আমার চিঠি পড়ে আপনারা যদি আনন্দ পান, তাহলে বুঝতে পারব যে আমি আনন্দ দিবার ক্ষমতা এখনও হারাই নাই। পৃথিবীর বড় বড় লোকেরা—যেমন দেশবন্ধু, রবি ঠাকুর ইত্যাদি—অনেক বয়স পর্যন্ত এমন কি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত—আনন্দ ও স্ফূর্তি হারান নাই। সে আদর্শ আমাদের পক্ষে অনুকরণীয়।

যাক্—বক্তৃতা রেখে এখন গল্প করি। এখানে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে যা শুনলে আপনারা মনে করবেন বুঝি নাটক অথবা উপন্যাসের কথা বলছি। আমাদের মলয় হঠাৎ খালাস পেয়ে বাড়ী চলে গেছে। তার সাত বৎসর মেয়াদ হয়েছিল এবং প্রায় সাড়ে তিন বৎসর মেয়াদ সে ভোগ করেছিল। গভর্নমেন্টের নূতন নিয়ম অনুসারে যাদের বেশী মেয়াদ হয়, তাদের মেয়াদের অর্ধেকটা...ভোগ হয়ে গেলে, তারা খালাস পেতে পারে। সে নিয়মা-

নুসারে হঠাৎ একদিন খবর এলো যে মলয় কালই খালাস পাবে। যার তিন বৎসর মেয়াদ বাকী আছে, সে যদি হঠাৎ খবর পায় কালই খালাস পাবে, তবে তার মনের অবস্থা কি রকম হবে—তা হয়তো কল্পনা করতে পারেন। বহুদিন যাদের দেখে নাই, বহুদিন যাদের খবর পায় নাই, বহুকাল যাদের দেখা পাবার আশা ছিল না—হঠাৎ তাদের সব কথা সব স্মৃতি যখন মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তখন বোধ হয় মানুষের মন আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। আমরা মনে করেছিলাম যে হঠাৎ খালাসের খবর পেয়ে সে আনন্দে নৃত্য করবে—কিন্তু তা যখন করলে না তখন বুঝতে পারলাম যে অত্যন্ত আনন্দের চাপে সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। মনের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলছে "কাউন্ডে কাউন্ডে" অর্থাৎ "ভাল ভাল।"

তার খালাসের পূর্বদিনে তাকে কাছে বসিয়ে তার বাড়ীর সব খবর জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম তার দুইটি স্ত্রী, এবং দুইটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে। এক স্ত্রীর কোন সন্তান হয় না। বহুকাল, অর্থাৎ প্রায় চারি বৎসর, এদের সম্বন্ধে কোনও খবর পায় নাই। তাই খালাসের সময়ে তাদের মঙ্গল সম্বন্ধে অমঙ্গল চিন্তা করে মনটা আকুল হয়েছে। তারা সকলে বেঁচে আছে কিনা—তারা কেমন আছে এই সব চিন্তা এতদিন এক রকম চাপা ছিল। কিন্তু খালাসের সময়ে এই কথা মনে আসাতে একদিকে আনন্দ হচ্ছে এবং অপর দিকে নানা প্রকার চিন্তা মনের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। এই কারণে ও খালাসের খবর পেয়েও বেশী আনন্দ করতে পারে নাই।

তারপর তার বাড়ীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করে শুনলাম যে সে গ্রাম্য জমিদার কি রাজা। পূর্বে তারা একেবারে স্বাধীন ছিল এবং স্বাধীনতার জন্য বর্মীদের রাজাদের সহিত লড়াই করেছিল। তারপর ইংরাজের অধীনে তারা গিয়ে পড়ে। মধ্যে প্রায় সাত বৎসর পূর্বে, খাজনা বন্ধ করাতে ইংরাজের সহিত লড়াই হয়। সেই লড়াইতে উভয় পক্ষের অনেক লোক মরে। শেষে হার মেনে সে পলায়ন করে। প্রায় তিন বৎসর লুকিয়ে থাকবার পর তার বৈমাত্রেয় ভাই তাকে এবং তার ভাইকে ধরিয়ে দেয়। তার ভাইয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং তার অর্থাৎ মলয়ের সাত বৎসর মেয়াদ হয়।

তারপর মলয় তার শরীরের অনেকগুলি ক্ষতচিহ্ন দেখাইল, সে সবগুলি যুদ্ধের সময়ে আঘাতের চিহ্ন। তারপর আমরা বর্মাদেশের ইতিহাস শুনে দেখলাম যে তার কথা সত্য বটে। তার খালাসের পরও সেই দেশের অন্যান্য কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে মলয়ের কথা এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

একজন গ্রাম্য রাজাকে আমরা মেথর করে রেখেছি একথা শুনে আমরা লজ্জায় মাথা হেঁট করলাম। শেষে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কেন মেথরের কাজ করতে স্বীকার করল। অত্যন্ত দুঃখের সহিত সে বললে—"কি করব—জেলের হুকুম! এখানে কি আর মানুষ আছি—এখানে কুকুর হয়ে গেছি। আবার বাহিরে গেলে তখন মানুষ হব।"

তার করুণ কাহিনী শুনে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—ভবিষ্যতে সে কি করবে। অনেক চিন্তা করে বললে,—"এখনও কিছু স্থির করতে পারি নাই। আমার বৈমাত্রেয় ভাই আবার শত্রুতা আচরণ করবে কিনা জানি না—কারণ আমার অবর্তমানে সে-ই জমিদারী ভোগ করছিল। ভয় হয়—হয়তো আমার কপালে এখনও অনেক দুঃখ আছে।"

যাবার সময়ে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—বাড়ীতে গিয়ে আমাদের কথা ভুলে যাবে কিনা। তখন গদগদ কণ্ঠে বল্লে—"বেঁচে থাকতে আপনাদের স্নেহের কথা ভুলব না—এবং আমার ছেলে ও নাতিদের কাছে আপনাদের গল্প করব।"

এখন আপনারা বলুন তো যে এ ঘটনা সত্য বলে মনে হয়, না উপন্যাসের গল্প বলে মনে হয়? ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যে সত্য ঘটনা অনেক সময়ে গল্পের চেয়েও অলৌকিক বলে বোধ হয়। এও তাই।

বর্মা ভাষা ভালো রকম শিখতে পারি নাই—তবে সাধারণ কথাবার্তা চালাবার মত কিছু কিছু শিখেছি। বর্মীদের মধ্যেও কেহ কেহ ইংরাজী বা হিন্দুস্থানী জানে, তাদের সাহায্য নিয়ে বর্মা কথা আমরা বুঝে থাকি। মোটের উপর একটু অসুবিধা হলেও আমরা কোন রকমে কাজ চালিয়ে নি।

টেনিস কোর্টের দরুন আমরা কতকটা ব্যায়াম করতে পারি। তা না হ'লে বোধ হয় বাতগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরতুম। এমনি তো বাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে ব'লে বোধ হয়। পূর্বে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলতে পেতাম। ব্যাডমিন্টন আমি চিরকাল মেয়েদের খেলা বলে মনে করতাম এবং সেইজন্য কখনও খেলি নাই। জেলে এসে সব উল্টে যায়—তাই আবার

শৈশব ফিরে আসে এবং আমরা ব্যাডমিন্টন খেলতে আরম্ভ করি। প্রথমে যে একটু লজ্জা হ'ত না তা বলতে পারি না। তবে শাস্ত্রে বলে যে মধু না পাওয়া গেলে গুড় ব্যবহার করা উচিত। তাই অন্য খেলার অভাবে ব্যাডমিন্টন খেলা খেলে আশ মেটাতে হ'ত। আমাদের সব সময়ে জেলখানার মধ্যে আর একটা ক্ষুদ্র জেলে বাস করতে হয়—আমাদের ওয়ার্ডের (ward) বাহিরে আর কাহারও সহিত মিশিবার উপায় নাই। অধিকাংশ জেলে আমাদের কপালে এরূপ ward (ওয়ার্ড) জুটতো—যে কোন রকমে ব্যাডমিন্টন খেলার মত জায়গা করে নেওয়া যায়। এখানে একটু জায়গা বেশী থাকাতে টেনিস খেলা সম্ভব হয়েছে। তাতেও মুস্কিল এই যে বলগুলি প্রায় দেয়াল পার হয়ে বাইরে গিয়ে পড়ে। আর যে গুলি বাইরে যায় না সেগুলি দেওয়ালের গায়ে আঘাত খেয়ে আবার কোর্টের মধ্যে এসে পড়ে। তবুও—"নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।"

পুখুরের জল বাড়বার উপায় নাই। কারণ বাড়লেই উপছে নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর মধ্যে মধ্যে পুখুর খালি করে নূতন জল ভরতে হয়। বস্তুতঃ চৌবাচ্চা না বলে পুখুর বলবার কোনও কারণ নাই। তবে ব'লে মনকে বোঝান যায় যে পুখুরে স্নান করেছি।

এখানে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হচ্ছে। আশা করি এখানেই মায়ের পূজা করতে পারব। তবে খরচ নিয়ে কর্তৃপক্ষদের সহিত ঝগড়া চলছে, দেখা যাক কি হয়। পূজার কাপড় এখানে পাঠাতে যেন ভুল না হয়—বিজয়া দশমী যখন এখানেই কাটবে।

আমাদের হোটেলে সবই পাওয়া যায়। সেদিন ম্যানেজারবাবু আমাদের গরম গরম জিলিপী খাওয়ালেন—আর আমরাও দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলাম তিনি যেন চিরকাল জেলেই থাকেন। তার পূর্বে রসগোল্লা খাইয়েছিলেন যদিও গোল্লা রসে ভাসছিল তবুও ভিতরে রস ছিল না এবং ছুঁড়ে মারলে রগ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আমরা সেই লোহবৎ রসগোল্লা, নিশ্চিন্তমনে গলাধঃকরণ করে কৃতজ্ঞ চিত্তে ম্যানেজারবাবুর দীর্ঘায়ু কামনা করেছিলাম।

আমরা যখন বাঙ্গালী তখন বাঙ্গালী রকমের রান্না নিশ্চয় হয়। ম্যানেজারবাবু স্থির করেছেন যে জগতে একমাত্র পেঁপেই সত্য—তাই ঝোলে, ঝালে, অম্বলে, তরকারীতে, ডালনায়—সর্বত্র পেঁপে পাওয়া যায়। আর যেহেতু আমাদের ম্যানেজার বাবু half-doctor অর্থাৎ আধা-ডাক্তার—তিনি তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বেশী পরিমাণে পেঁপে ভক্ষণ করলে পেটের অবস্থা ভাল থাকবে। চলতি কথায় বলে—"খাওয়ার মধ্যে থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়।" এখানে থোড়ও পাই না আর বড়িও পাই না। তাই বলতে ইচ্ছা করে নিরামিষ রান্নার মধ্যে পেঁপে, বেগুন, শাক, পেঁপে। ভাগ্যিস পাঁঠা ও মুরগীটা খাওয়ার অভ্যাস ছিল তাই ম্যানেজারের গুণগান করতে পারছি—তা না হলে কি হোত বলা শক্ত।

এটা কিন্তু না বললে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে যে এর মধ্যে ম্যানেজারবাবু অনেক অনুরোধের ফলে ধোঁকার ডালনা, ছানার কালিয়া ও ছানার পোলাও খাইয়েছেন! অতএব তাঁর জয় হ'ক। দুর্মুখেরাও যেন তাঁহার নিন্দা কখনও না করে!

বাগানের খবর জিজ্ঞাসা করেছেন। এখানে বাগানের অবস্থা শোচনীয়। ফুলের বীচি লাগান হয়েছিল, পিঁপড়ে ও পোকার উপদ্রবে বেশী গাছ গজায় নি। যে কয়টি হয়েছিল মুরগী কয়টা মিলে সেগুলি ধ্বংস করেছে। ফলে, গাছের মধ্যে এখন দাঁড়িয়েছে সূর্যমুখী এবং ঐ জাতীয় দুই এক রকম গাছ। রজনীগন্ধা গাছ কয়েকটি আছে কিন্তু গন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গন্ধ ও গানের অভাব সময় সময় বোধ করি। কিন্তু উপায় কি?

এ মুলুকে ভাল চা পাওয়া যায় না—তাই কলিকাতা থেকে ভাল চা আনবার জন্য দোকানে আমরা ফরমাস দিয়েছি। এখানকার লিপ্টন ও ব্রুকবন্ড চা অখাদ্য এবং উভয়ই বিলাতী। আমি গত চিঠিতে খলের কথা লিখেছিলাম। একটা ভাল খল কবিরাজী ওষুধ খাবার জন্য। এবং খুড়োকে বলবেন ভালো চায়ের দোকানের ঠিকানা আমাকে জানাতে। আমরা দার্জিলিঙের অরেঞ্জ পিকো (Orange Pekoe) চা খাই। এখানকার দোকানে ফরমাস দিয়ে আমরা কলকাতার সেই দোকান থেকে চা আনাবো।

সবচেয়ে সুন্দর এখানকার ইলিশ মাছ। দেখতে ঠিক গঙ্গার ইলিশ। কিন্তু গঙ্গার অথবা বাঙ্গলার ইলিশের মত একটুও স্বাদ নাই। খাবার সময় বলতে পারা যায় না কি মাছ। মাছের মধ্যে রুই ভিন্ন ভাল মাছ পাওয়া যায় না। চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় বটে—কিন্তু

আগন্ন দর।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। কণ্ঠি মামা এখন কোথায়? প্রাক্‌টিশ কেমন হচ্ছে? মেজদাদাকে বলবেন যে টাকার কথা যা লিখেছিলাম তা যেন পাঠান। আপনারা কি এবার দেশে যাবেন পূজার সময়? আমার Financial Secretary-র খবর কি? তিনি এখন বোধ হয় কটকে? অরুণার ও গোরার বিবাহ কি স্থির হল? বড়দিদিরা কেমন আছেন? শরীর কেমন?

কাপড় জামা ইত্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনারা কি জানেন না যে আমরা সম্রাটের অতিথি? আমাদের কি কোন অভাব থাকতে পারে? আমাদের অভাব মানে যে সম্রাটের নিন্দা। আর তাও কি হতে পারে?

আমার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। সুখে দুঃখে দিনগুলি একরকম কেটে যাচ্ছে। গরমের সময় বেশ অসুবিধা হয়েছিল আর স্বাস্থ্যও খারাপ হয়েছিল। বদলী হবার জন্য যে দরখাস্ত করি সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়। কর্তৃপক্ষেরা বোধ হয় মনে করেন যে আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ; সরকার এত কষ্ট করে আমার খোরাক পোষাক বিনা খরচে যোগাচ্ছেন—আর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে বদলী হবার জন্য ব্যস্ত। যাক্ এখন আর বদলী হবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না। গরমটা কমেছে; শরীরটা তাই পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে। যদি হজমের গোলমাল না বাড়ে, তবে শীতকালটা ভাল থাকব বলে ভরসা করি। এখান থেকে বর্মারাজার প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়—এবং তাঁরই কেল্লার মধ্যে যে জেলখানা সেই জেলখানার মধ্যে আমরা বাস করি। পূর্ব গৌরবের কথা প্রায় মনে হয় এবং বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করলে যে চোখে জল আসে না তা বলতে পারি না। ভারত কি ছিল—আর কি হয়েছে।

এখানে এসে অনেক শিখেছি এবং সে হিসেবে অনেক লাভও হয়েছে। ভগবান যা করেন—মঙ্গলের জন্য করেন। দেশকে কত ভালবাসি তা বোধ হয় এখানে এসে ভালরকম বুঝতে পেরেছি।

আপনারা সকলে আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—
শ্রীসুভাষ

দিলীপকুমার রায়কে লিখিত

১০৭

কেয়ার অব ডি আই জি,
আই বি, সি আই ডি, বেঙ্গল
১৩, এলিসিয়াম রো
কলিকাতা

মান্দালয় জেল
১১/৯/২৫

প্রিয়বরেষু,

দিলীপ,

আমার পূর্বেকার পত্র শেষ হয়নি। পরের সপ্তাহে তোমাকে আর একটি পত্র পাঠাব ভেবে রেখেছিলাম কিন্তু ইতিমধ্যে যে দারুণ বিপদ ঘটে গেল তা আমাদের সকলকে প্রচন্ড-ভাবে আঘাত করেছে। হয়তো আমার মত সকলেই আজ একটা অনিশ্চিত অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে তবু ব্যক্তিগতভাবে এ ক্ষতি আমার পক্ষে অপূরণীয়; তাছাড়া এই বিপদের দিনে আমি জেলে পড়ে আছি—এই চিন্তা আমার মনকে আরও বেশী শোকাচ্ছন্ন করে তুলেছে।

কালের আবর্তনে ব্যক্তিগত ক্ষতির প্রশ্নটা হয়তো মুছে যাবে কিন্তু দেশের যে ক্ষতি হল তা তাঁর দেশবাসী যতই দিন যাবে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে থাকবে। বাস্তবিক তাঁর প্রতিভা ও কর্মধারা এমনই বহুবিস্তৃত ছিল যে সর্বশ্রেণীর মানুষ এই নিদারুণ আঘাতে বিচলিত বোধ করেছে। কখনও কখনও আমি তাঁর সমালোচনা করে বলেছি যে, অনেক কাজের মধ্যে কেন তিনি নিজেকে এভাবে জড়িয়ে ফেলছেন। কিন্তু সৃজনশীল প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এই যে, কোনও যুক্তিতর্কের সীমার বন্ধনে তা আবদ্ধ হতে চায় না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় অখন্ড জীবনের উপলব্ধি ছিল বলেই তিনি জাতীয় জীবনের

নানা ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

তোমাদের অন্ততঃ একটা সুযোগ ছিল তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার; এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষার কর্মপ্রয়াসের মধ্যেও কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে নিতে পার। কিন্তু এই বিপদের দিনে সুদূর মান্দালয়ে কারাবাসের মুহূর্তগুলিতে এই দুঃসংবাদ আমাদের কয়েকজনকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে আমরা নিতান্ত অসহায় বোধ করছি—বোধহয় ঈশ্বরের ইচ্ছাই এরূপ। তবু আমি অতি মাত্রায় আশাবাদী বলে নিজেকে কিছুটা সংযত রাখতে পেরেছি। মনের গভীরে যখন অসংখ্য চিন্তা তোলপাড় করতে থাকে তখন তাকে ভাষায় প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়; তাই এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করে এখন অন্য প্রসঙ্গ শুরু করছি।

তোমার বই প্রকাশ হতে আর কত দেরি? এখনও কি প্রেসেই আছে? কবে নাগাদ বেরোবে আশা করছ? ভারতীয় সঙ্গীতে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার ও তার প্রচারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ইংরাজীতে (অন্য প্রদেশের লোকদের সুবিধা হয় তাহলে) কেন বই লেখ না একটা?

কিছুদিন পূর্বে রুদ্রকে তার শোকে সমবেদনা জানিয়ে এক পত্র দিয়েছিলাম। তার কোনও উত্তর পাইনি। তুমি কোনও পত্র পেয়েছ কি?

তোমার মহান পিতার রচনাবলীর একটা সম্পূর্ণ সেট পাঠাতে পারবে কি? আমরা আবার ঐ বইগুলো পড়ে ফেলতে চাই। যদি সম্ভব হয় তাহলে এখানকার জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নামে তা সরাসরি পাঠাতে পার। ঐ বইগুলোর কথা লিখে সঙ্গে একখানি পত্রও (বইগুলোর নাম সহ) পাঠাবে। আমাদের সব পত্র কলিকাতার অফিসে পরীক্ষা করে দেখা হয় কিন্তু এখানকার জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বইগুলো পরীক্ষা করে দেখেন। সুতরাং বই-টই সব তাঁর নামে পাঠানোই ভাল, এতে অনেকখানি সময় বেঁচে যাবে। ভাল কথা, টুর্গেনিভের 'Smoke' বইটি পাওয়া গিয়েছে কি? কলিকাতার সি আই ডি বিভাগ আমাকে জানিয়েছে যে, এরকম কোনও বই তাদের কাছে পাঠানো হয়নি। বইটি সত্যই হারিয়ে গিয়ে থাকলে দুঃখের ব্যাপার হবে।

যদিও এখানকার আবহাওয়া আমাকে খুশী করতে পারেনি তবু অনেকটা যেন আরাম বোধ হচ্ছে। যে সব জটিল প্রশ্নের উত্তর এতদিন খুঁজে পাইনি সেগুলোরও সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। আমাদের জীবনের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য যে নিরাসক্ত মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন, এই নির্জনতা ও প্রবাসজীবনের ফলে তা আমি পেয়েছি, এজন্য কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারছি না। যদি আমার শরীর সুস্থ থাকত তাহলে যে নির্বাসন আমাকে বাধ্য হয়ে ভোগ করতে হচ্ছে তার দ্বারা আরও অনেক কিছু লাভ হত। তবে যে রকম বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় আমাকে দীর্ঘকাল এখন এখানেই থাকতে হবে।

নানা দিক থেকে বর্মা এক আশ্চর্য দেশ; এবং এখানকার জীবন ও সংস্কৃতি পর্যালোচনের ফলে অনেক নূতন অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি। কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি এদের আছে—তবু আমার মনে হয়—বর্মীরা চীনাদের মতই সামাজিক দিক থেকে অনেক অগ্রসর। তবে যেটা এদের একান্ত অভাব তা হল কর্মশক্তির প্রেরণা, Bergson যাকে বলতেন 'elan vital'— অর্থাৎ সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে প্রগতির পথে ছুটে চলার যে প্রচণ্ড আবেগ তা এদের নেই। এখানকার সমাজে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, শুধু তাই নয় ইউরোপের যে কোনও দেশ অপেক্ষা এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতাও অনেক বেশী। কিন্তু হায়! প্রকৃতির বৈচিত্র্যহীনতাই বোধ হয় সব উৎসাহ কেড়ে নিয়েছে এদের। সুদূর অতীত কাল থেকে বিরলবসতি এই দেশে প্রচুর শস্য জন্মানোর ফলে এদের জীবনযাত্রা সহজ হয়ে পড়েছিল, যার অবশ্যম্ভাবী ফল দেহ ও মনের দিক থেকে এরা সবাই অলস হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, যদি এরা কোনও দিন কর্ম-শক্তির প্রেরণা খুঁজে পায় তাহলে সমৃদ্ধির পথে এরা অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবে।

তুমি বোধহয় জান বর্মাতে স্ত্রী ও পুরুষ মিলিয়ে শিক্ষিতের শতকরা হার ভারত-বর্ষের যে কোনও প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশী। ধর্মীয় সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলো দেশীয় প্রথায় আশ্চর্য অল্প খরচে যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে তার ফলেই সম্ভব হয়েছে এটা। বর্মাতে আজও প্রত্যেক ছেলেকে কয়েক বছর না হলেও অন্ততঃ কয়েক মাস ব্রহ্মচর্য পালন করে গুরুর কাছে পাঠ নিতে হয়। এ প্রথার শুধু যে একটা শিক্ষাগত ও নৈতিক মূল্য আছে তা নয়, এর আর একটা দিকও আছে—ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে মানুষ হবার সুযোগ পায়। সারা দেশ জুড়েই এই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা

যে, যদি কর্পোরেশন নতুন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায় তা হলে এই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত সাহায্য বন্ধ করে দিতে হবে; তার ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভীষণ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রকৃতপক্ষে যামিনী এন্ড কোম্পানীর দ্বারাই এই একত্রীকরণের প্রস্তাব আনীত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্য সব প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিহ্ন করা ও একটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করা। এবং এই লোকগুলিই অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে দেশবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমার মনে হয় সংগঠনমূলক কাজের নিদর্শন হিসেবে এর মূল্য ও কার্যকারিতা অনেকখানি। এই কলেজের অধ্যক্ষ কবিরাজ-দের মধ্যে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। নোংরা ব্যবসাবুদ্ধি তাঁর নেই এবং পসারের জন্য ভাড়াটে লোকদের মুখাপেক্ষী হয়েও তাঁকে থাকতে হয় না। তিনি একজন খাঁটী কবিরাজ এবং প্রাচীন রীতির চিকিৎসায় পারদর্শী; তবে আধুনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধেও তিনি কম সচেতন নন। ভবিষ্যতের কবিরাজদের জন্য তাঁর মত একজন সরল, ধার্মিক ও নির্মল চরিত্রের শিক্ষক অপেক্ষা আর কোন ভাল শিক্ষকের কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। তবে তিনি আত্মপ্রচার ও খোসামোদের ধার ধারেন না বলেই যামিনী এন্ড কোম্পানীর বেশ কিছুটা সুবিধে হয়ে গেছে।

শ্যামাদাস কবিরাজ এখনও পর্যন্ত নিজে অর্থসাহায্য করে কলেজটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু জনসাধারণ অথবা কর্পোরেশন যদি সাহায্যের জন্য না এগিয়ে আসেন তাহলে কলেজটিকে চালানো তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে। স্বভাবতই তিনি এই একত্রীকরণের প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না, কারণ তা হলে যামিনী এন্ড কোম্পানীর ক্ষমতা ও আধিপত্য বৃদ্ধি পাবে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালন ব্যবস্থায় যদি তাঁদের কোন ক্ষমতাই না থাকে, তবে তিনি এতে কিছুতেই রাজী হবেন না।

আমাদের মধ্যে যাঁরা দেশবন্ধুর অনুগত ছিলেন তাঁদের উপরই তাঁর কাজ এবং তিনি যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার দায়িত্বভার ন্যস্ত। কাউন্সিলারগণ তাঁদের এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন আছেন কি ?

যদি সম্মানজনক শর্তে একত্রীকরণ সম্ভব না হয় তাহলে যতদিন না যুক্তি ও ন্যায়াদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন তিনটি কলেজকে আলাদাভাবে অর্থ সাহায্য দেওয়াই বোধহয় সঙ্গত হবে।

যামিনী কবিরাজ বলে বেড়াচ্ছেন যে, তিনি নতুন কলেজের জন্য ৫,০০০ টাকা চাঁদা দিয়েছেন। বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ চালাবার জন্য ইতিমধ্যে শ্যামাদাস কবিরাজকেও তাঁর নিজস্ব বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে—অবশ্য যদি অর্থের প্রশ্নটাই এক্ষেত্রে মুখ্য বিবেচ্য হয়। আমার মনে হয় না যে অর্থসাহায্যের ব্যাপারে তাঁর দানও খুব সামান্য।

যদি আমার কথায় আপনার কোন সন্দেহ থাকে, তবে যে কোনও দিন বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে গিয়ে আপনি দেখে আসতে পারেন। শ্যামাদাস কবিরাজকে টেলিফোনে খবর দিয়ে গেলে তিনি খুশী হয়ে সবকিছু আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবেন। শ্যামাদাস নিজে যদিও একজন প্রাচীনপন্থী কবিরাজ তবু বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের পাঠ্যসূচীতে তিনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, শারীরবৃত্ত ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আমি জানি আপনি কোনও ব্যাপারে দায়িত্ব নিলে সে সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন এবং তার একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে শ্যামাদাসের চিঠিগুলি পড়ে আমি খুব বেদনা বোধ করেছি এবং আমার ধারণা যে, আপনি যদি এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতেন তাহলে কিছু সুফল হয়ত ফলত।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমার খবরও মোটামুটি একরকম। বিজয়ার আলিঙ্গন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনার স্নেহবদ্ধ
সুভাষচন্দ্র বসু

পুঃ—এ বিষয়ে আপনি ব্রজবাবুকে বলতে পারেন—Public Health Com-র তিনি চেয়ারম্যান।

আমার লেখায় যদি তাঁর সমালোচনা প্রকাশ পেয়ে থাকে, সেজন্য অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।

(স. চ. ব)

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

পরবর্তী তিনখানি পত্র শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে লিখিত

১১১

মান্দালয় জেল (১৯২৫?)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া ও সকল সমাচার অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম। কার্যকরী সমিতির খুব বেশী সভ্য সেবাশ্রমের কাজের দিকে দৃষ্টি দেন না বলিয়া আপনারা নিরাশ বা চিন্তিত হইবেন না। অধিকাংশ কার্যকরী সমিতিরই এইরূপ অবস্থা। আপনাদের নিজেদের সেবা ও আগ্রহাতিশয্যের দ্বারা অপরের আগ্রহ ও সেবা প্রবৃত্তি জাগাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে অপরের দুঃখে সমবেদনা ও সহানুভূতি না জাগিলে সেবাকার্য সম্ভবপর হয় না। অন্ততঃ সম্ভবপর হইলেও সার্থক হয় না। আপনাদের আত্যন্তিক সেবা ও জনপ্রীতির ফলে সমাজে অপরের হৃদয়েরও তাদৃশভাব জাগরিত হইবে—ইহাই আমার ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা।

সেবাশ্রমের বাড়ীর সঙ্গে বাগান করিবার মত জমি আছে কি?

মাসিক ১৪০৲ টাকা পর্যন্ত চাঁদা আদায় হয় শুনিয়া সুখী হইলাম। বাড়ীভাড়া এখন কত দিতে হয়? বাড়ী কয় তলা এবং মোট কয়খানা ঘর আছে? কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলে কয়জন ছাত্র হয় এবং কোন জাতির ছাত্র পড়িতে আসে? সেবাশ্রমের বালকদের কি শিক্ষা দেওয়া হয় তার বিস্তৃত বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন, সেবাশ্রমের কোনও চাকর আছে কিনা এবং থাকিলে কয়জন চাকর আছে তাহা জানাইবেন।

দৈনিক রন্ধন কে করে? বালকদের মধ্যে কয়জন তাঁতের ও Sewing machine-এর কাজ শিখিতেছে? কতদিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি বালক কাপড় বুনিতে ও সেলাই-এর কাজ (মোটামুটি কোট ও পাঞ্জাবী তৈয়ারী করা) শিখিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করেন?

বালকদের average intelligence কি রকম? সেবাশ্রম সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইবেন, আমি তাহা পড়িয়া কিছু পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিব। বালকদের আহারের কি রকম ব্যবস্থা আছে তার বিস্তৃত বিবরণও পাঠাইবেন। অসুখ-বিসুখ হইলে চিকিৎসার কিরূপ ব্যবস্থা আছে? চিকিৎসা বা ঔষধের জন্য খরচ লাগে কি না?

ইতি—

১১২

মান্দালয় জেল

আপনি বোধ হয় ইতিপূর্বে শুনিয়াছেন যে, আমাদের অনশনব্রত একেবারে নিরর্থক বা নিষ্ফল হয় নাই। গভর্নমেন্ট আমাদের ধর্ম বিষয়ে দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙ্গলা দেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসরিক ত্রিশ টাকা allowance পাইবেন। ত্রিশ টাকা অতি সামান্য এবং ইহা দ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবে না। তবে যে Principle গভর্নমেন্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ—টাকার কথা সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে অতি তুচ্ছ কথা। পূজার দাবী ছাড়া আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি দাবীও গভর্নমেন্ট পূরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় কিন্তু বলিতে গেলে আমাকে বলিতে হইবে "এহ বাহ্য"। অর্থাৎ অনশন-ব্রতের সব চেয়ে বড় লাভ, অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ—দাবী পূরণের কথা বাহিরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। Suffering ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থিরনিশ্চিন্ত ভাবে বলিতে পারে না, তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরও ভালভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।

*　　*　　*

Social Service-এর ভিতর দিয়া গৃহ-শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। Commercial Museum, Bengal Home Industries Assoociation প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বা দোকান ঘুরিয়া দেখিলে আমাদের মনে নূতন ভাব আসিতে পারে। বাংলা গভর্নমেন্টের শিল্প-বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী (Administration Report of the Department of Home Indusrties) কয়েক বৎসর পাঠ করিলেও উপকার হইতে পারে। সর্বোপরি যেখানে গৃহশিল্প চলিতেছে সেখানে গিয়া স্বচক্ষে কর্মপ্রণালী দেখা ও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কুটীর-শিল্প চালাইতে হইলে যে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা আমার মনে হয় না। সর্বপ্রথমে আমাদের দরকার সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ একজন ভদ্রলোক পাওয়া যিনি শুধু এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন, খবর লইবেন এবং পুস্তকাদি পড়িবেন। তারপর যে সব কুটীর-শিল্প চালাইবার কিছু সম্ভাবনা আছে, তিনি সেগুলি নিজে দেখিয়া আসিবেন। যখন শেষে কুটীর-শিল্প বিশেষ চালাইবার প্রস্তাব স্থির হইবে তখন কর্মীকে পাঠাইয়া কাজ শিখাইয়া লইতে হইবে। Polytechnic Institute-এ আগাগোড়া কাহাকেও পড়াইবার প্রয়োজন দেখি না। Electroplating প্রভৃতি শিল্প সেখানে শিখিবার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না। কারণ সেলাই-এর বিভাগ আমাদের নিজেদেরই আছে এবং কামারের কাজ অথবা Electroplating-এর কাজ আপাততঃ সমিতির কর্মীকে শিখাইয়া কোনও লাভ হইবে না। আমার যতদূর স্মরণ আছে (আমি মাত্র একবার Polytechnic-এ গিয়াছি) Polytechnic-এর সমস্ত শিল্পের মধ্যে একমাত্র বেতের কাজ অথবা মাটির পুতুলের কাজ আমরা কুটীর-শিল্প হিসাবে চালাইতে পারি—ইহার মধ্যেও আমি বেতের কাজ সম্বন্ধে কতকটা সন্দিহান, কারণ স্ত্রীলোকদের দ্বারা এ কাজ আমরা করাইতে পারিব কিনা ঠিক বলিতে পারি না। এখন যদি শেষে মাটির পুতুলের কাজ চালাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে যে-কোনও কর্মী কয়েকদিনের মধ্যেই এ কাজ শিখিয়া আসিতে পারে। খরচ কিছুই লাগিবে না এবং আমরা যখন কুটীর-শিল্প আরম্ভ করিব তখন মাত্র রং-এর জন্য কিছু নগদ টাকা খরচ হইবে। ইহা ব্যতীত আর খুব কম খরচই লাগিবে। মোট কথা, একজনকে শুধু এই সমস্যা লইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে—He must become mad over it.

আর একটা কথা আমার বার বার মনে আসে—পূর্বেও বোধ হয় এ বিষয়ে লিখিয়াছি —ঝিনুকের বোতাম তৈরী করা। ঢাকা জেলার অনেক গ্রামে এই শিল্প ঘরে ঘরে চলিতেছে। গরীব গৃহস্থের বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষেরা তাহাদের অবসর সময়ে এই কাজ করিয়া থাকে। একজন কর্মীকে খুব অল্প দিনের মধ্যে এই কাজ শিখান যাইতে পারে। অথবা এই কাজ জানে এবং শিখাইতে পারে এমন একজন নূতন কর্মীকে আপনারা নিযুক্ত করিতে পারেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনারা এরূপ কর্মীকে আকর্ষণ করিতে পারেন। আমার নিজের মনে হয় যে, পাথরের গায়ে ঘসিয়া বোতাম তৈরী করা যায়—আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিলে তৈয়ার করিতে পারি। শুধু সরু যন্ত্র থাকিলে গর্ত করা যায় এবং হয়তো গোল করিয়া কাটিবার জন্য একটা ধারাল যন্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। সমিতি হইতে কয়েকটা যন্ত্র এবং এক বস্তা ঝিনুক আনাইয়া দিলে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন। কাজটা সাহায্য-প্রার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ হইবে কিন্তু একবার কৃতকার্য হইলে দেখিবেন যে, সাধারণ গরীব গৃহস্থেরা নিজেদের আয় বাড়াইবার জন্য এই কাজ আরম্ভ করিবে। সমিতি শুধু সস্তা দরে raw mterials প্রভৃতি জোগাইবে এবং প্রস্তুত জিনিষ বেশী দরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথম দিকটা খুব বেশী সময় দিতে হইবে। ইতি—

১১৩ মান্দালয় জেল

আপনি পূর্বে যে সব কাগজ পাঠাইয়াছিলেন, (মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা-পত্র, দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য যে সম্মিলনী হইয়াছিল তাহার কার্যসূচী ইত্যাদি) তাহা যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। গতকাল আবার আপনার প্রেরিত লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা (Variety Entertainment-এর কার্যসূচী ইত্যাদি) পাইয়াছি। সমিতির কাজ যে দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে আমি যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না।

* * *

আপনারা যে খরচ বাদে এত টাকা পাইয়াছেন, তাহা জানিয়া সুখী হইলাম। চরকা সুতা কাটা প্রভৃতি বিষয়ে আপনি যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমি একমত। তবে এখনও চেষ্টা ত্যাগ করিলে চলিবে না। আপনি পূর্ব পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তুলার চাষ করিতে পারিলে এক ভদ্রলোক আশী বিঘা জমি ছাড়িয়া দিতে পারেন। সেরূপ জমি পাইবার যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে তুলার চাষের বেশী খরচ অগ্রিম লাগিবে না। দু'একজন মুটীর বেতন ও তুলার বীজের দাম জোগাইতে পারিলে আমরা এক বৎসরের মধ্যে ফল পাইতে পারি। জমিটা পতিত হইলে চাষোপযোগী করিবার জন্য বেশী খরচ লাগিতে পারে। অবশ্য কৃষি-বিভাগের (Agricultural Department) সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে কোন্ জাতীয় তুলার বীজ লাগান উচিত। যে সব কুটীর-শিল্প আরম্ভ করিয়াছেন (যেমন ঠোঙা তৈরী করা) সেগুলিতে যদি লোকসান না হয়, তবে অল্প লাভ হইলেও চালাইবেন। পরে অপেক্ষাকৃত লাভজনক শিল্প চালাইতে পারিলে আমরা ঐগুলি বর্জন করিব। এখন যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অন্ততঃ যে-কোনও প্রকারের কাজ করান দরকার। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া তাহারা যখন কাজ করিতে শিখিবে তখন লাভজনক শিল্পে তাহাদিগকে লাগাইয়া দিতে পারিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এখনকার কুটীর-শিল্পগুলি যদি Financial success না হয় তবে কর্মে প্রবৃত্তি ও dignity of labour জাগাইয়া তুলিলেও সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে। কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্মণ মহাশয়ের অনেক রকম ধারণা আছে। আপনি যদি এই বিষয় সম্পর্কে তাঁহার সহিত একবার দেখা করিতে পারেন তাহা হইলে লাভ হইতে পারে।

বড়ী, আচার, চাটনী প্রভৃতি তৈরী করিতে পারিলে না চলিবার কোনও কারণ নাই। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ বিধবারা এ কাজ ভাল করিতে পারিবে। কিন্তু শিখাইবার লোক পাইবেন কি? বাজারে চালাইতে গেলে এই জিনিষগুলি খুব ভাল হওয়া চাই। যদি ভাল জিনিষ প্রস্তুত করাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে এ বিষয়ে experiment করিতে পারেন। Raw materials আপনারা supply করিয়া তৈয়ারী মাল পাইতে পারেন—(বিক্রি করার ভার আপনাদের অবশ্য) অথবা তাহারা নিজেরাই Raw materials কিনিয়া এবং মাল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিকট বিক্রয় করিয়া যাইতে পারে। কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে দোকানদারদের সহিত কথা বলা প্রয়োজন—তাহারা আমাদের মাল চালাইতে পারিবে কিনা, Raw materials ভাল হইলে অবশ্য জিনিষ ভাল হইতে পারে কিন্তু অপর দিকে চুরির সম্ভাবনা খুব বেশী। যাহারা এই কাজ করিবে তাহারা গরীব সুতরাং আম, লেবু, তেল, লঙ্কা প্রভৃতি পাইলে যে তাহারা সংসারের কাজে লাগাইবে না তা কে বলিতে পারে? অপর দিকে তাহারা যদি Raw materials ক্রয় করিয়া মাল তৈয়ারী করিয়া supply করে তবে খারাপ উপাদানে (যেমন তেল) মাল তৈয়ারী হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ সব বিষয়ে আপনি স্বপক্ষের ও বিপক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। আর একটি কথা, এই সব বস্তুর বাজারের চাহিদা কি রকম তা জানা দরকার। আমার নিজের মনে হয় যে খুব Conscientious recipients না পাইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়ার ভরসা কম। গরীব ভদ্র পরিবারদের দ্বারা এ কাজ চলিতে পারে। মাল তৈয়ারী হইয়া আসিলে সঙ্গে সঙ্গে তার দাম অথবা পারিশ্রমিক চুকাইয়া দিতে হইবে এবং বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত মালগুলি আমাদের ভাণ্ডারে রাখিতে হইবে।

সমিতির পক্ষে আর একটি কাজে হাত দেওয়া বিশেষ দরকার।

কলিকাতায় দুইটি জেল আছে, প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর সেন্ট্রাল। জেলের হাসপাতালে কোনও হিন্দু কয়েদী মারা গেলে আর তার যদি আত্মীয়স্বজন কলিকাতায় কেহ না থাকে তবে তার উচিতমত সৎকার হয় না, পয়সা দিয়া ডোম বা মেথর শ্রেণীর লোক দিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এদিকে মুসলমানদের Burial Association আছে এবং মুসলমান কয়েদী মারা গেলে তারা খবর পাওয়া মাত্র সৎকারের ব্যবস্থা করে। এরূপ একটা Organization হিন্দু কয়েদীদের জন্য করা প্রয়োজন। এ কাজের ভার কি সেবক-সমিতি লইতে পারে? যদি আপনাদের মত হয় তবে বসন্তবাবুকে দিয়া জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে পত্র দিতে পারেন যে, সেবা-সমিতি এ কাজের ভার লইতে প্রস্তুত আছে। আপনারা যদি এখন ব্যবস্থা না-ও করিতে পারেন তবে আমি বাইরে গেলে নিজে এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। আমি নিজে লোকাভাব ঘটিলে অনেক সৎকার করিয়াছি, সুতরাং এরূপ কাজে আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে স্বয়ং প্রস্তুত।

* * *

কুটীর-শিল্প যদি চালাইতে চান তবে একটা কাজ করা দরকার। একটি উপযুক্ত যুবককে কাশীমবাজার Polytechnic অথবা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কিছু কাজ শিখিয়া লইতে হইবে। কাশীমবাজারের স্কুলে মাটির পুতুল ও দেবদেবীর মূর্তি খুব তৈয়ারী হয়। এইরূপ শিল্প যদি সমিতির সহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে চালাইতে পারেন তবে তাহাদের প্রস্তুত মাল বাঙ্গলার সর্বত্র (বিশেষতঃ মেলা ও উৎসবের সময়) বিক্রয় হইতে পারে। আর একটি শিল্পের প্রচার এদেশে আছে—রঙীন কাগজ হইতে নানা প্রকার ফুল, তোড়া ও ফুলসমেত গাছ এবং Chinese lantern তৈয়ারী করা। জিনিসগুলি এত সুন্দর হয় যে, হঠাৎ দেখিলে চিনিবার উপায় থাকে না যে, এগুলি কাগজের তৈয়ারী। ভদ্র ঘরের ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ খুব সুন্দর করিতে পারে।

ঢাকার বোতাম তৈয়ারী কুটীর-শিল্প হিসাবে চলিতেছে। অনেকের ধারণা যে ঢাকার বোতাম বুঝি ফ্যাক্টরীতে তৈয়ারী হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে অবসর সময়ে, এমন কি রান্নার ফাঁকের মধ্যে মেয়েরা এই কাজ করিয়া থাকে—সেইজন্য এত সস্তায় জিনিষ পাওয়া যায়। বোতামের শিল্প কলিকাতায় প্রচার করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে একটু চিন্তা করিবেন। হয়তো কি ভাবে এই শিল্প কুটীরে কুটীরে চলিতেছে তাহা দেখিবার জন্য কাহাকেও ঢাকা জেলায় পাঠাইতে হইবে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রের বন্দোবস্ত ভবানীপুর অঞ্চলে করিতে পারিলে ভাল হয়। যেখানে গরীবদের বস্তী—বক্তৃতা হওয়া বেশী দরকার সেখানে। যদি সম্ভব হয় তবে সেবক-সমিতির জন্য একটা ম্যাজিক লণ্ঠনের আসবাব ও ছবি কিনিবার চেষ্টা করিবেন। ছায়াচিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিলে ঢের বেশী কাজ হইবে। ছবিগুলি না কিনিয়া কোন স্থানীয় চিত্রকরকে দিয়া আঁকাইয়া লইলে বোধহয় লাভ হইবে।

ইতি—

(সন্তোষকুমার বসুকে লিখিত)

১১৪

মান্দালয়
৪।১২।২৫

প্রিয়বরেষু—

শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার চিঠি পড়তে ও তার উত্তর লিখতে আমি খুব আনন্দ বোধ করে থাকি। আপনার ও চিঠিটি পেয়ে আমি যে কি পরিমাণে আনন্দিত হয়েছি, তা প্রকাশ করতে পারব না। বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্পোরেশনে আপনি যে সব কাজ করে যাচ্ছেন, যতদূর সম্ভব তা লক্ষ্য করে যাচ্ছি। আশা করি রাস্তার কুকুরের উৎপাত বন্ধ করার জন্য তাদের মেরে ফেলার যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাতে কাজ হবে।

গেজেটের বার্ষিক সংখ্যা খুব সুন্দর হয়েছে। অনুগ্রহ করে সম্পাদক মহাশয়কে তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য আমার অভিনন্দন জানাবেন। তিনি আমার কাছ থেকে একটি বাণী চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি সেই সঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাবও করে পাঠিয়েছি। ব্যাপারটা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল; তবু আমার মতামত জানাবার একটি সুযোগের সদ্ব্যবহারের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম। সেই কারণেই আমি এটি পাঠিয়েছি। তখন আমি বুঝতে পারিনি যে, অদূর ভবিষ্যতে গেজেট সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়কে আমার মতামত জানাবার কোনও সুযোগ পাব এবং প্রস্তাবগুলি পাঠাবার সেটিই একমাত্র কারণ। আরও কয়েকটি জরুরী বিষয় আপনাকে জানাতে চাই এই কারণে যে, আপনার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও উৎসাহ নিয়ে আপনি এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করবেন। ইতিপূর্বে কোন কোন সদস্যের কাছে লিখেছি, তবে ফল হয় নি।

রাস্তার আলো সম্বন্ধে গ্যাস কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি ১৯৩১ সালে শেষ হবে। এটি শেষ হওয়ার ৫ বছর আগে (অর্থাৎ ১৯২৬ সালে) নতুন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা, যাতে ১৯৩১ সালে কাজ শুরু করার জন্য নতুন পার্টি তৈরী হতে পারে। আমাদের সামনে চারটি উপায় খোলা আছে :

(১) এই বিভাগকে পৌরসভার অধীনে আনা ও গ্যাস সরবরাহ করা

(২) এই বিভাগকে পৌরসভার অধীনে আনা ও গ্যাসের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

(৩) শহরের রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করার জন্য নতুন কোন কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করা।

(৪) গ্যাস কোম্পানীর সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করা।

আপনি বোধহয় অনুমান করতে পারেন, আমি এই বিভাগটিকে পৌরসভার অধীনে আনারই পক্ষপাতী। পৃথিবীর বড় বড় শহরে পৌরসভাগুলিই রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করে থাকে; তবে আমরা কেন পারব না? যদি আমরা গ্যাসের ব্যবহার চালু রাখতে চাই তাহলে এর উপজাত জিনিসগুলিকে শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির কাছে বিক্রী করে কাজে লাগাতে পারি অথবা পৌরসভাই এর দ্বারা শিল্প-পরিচালনা করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, Phenyl অথবা Phenocol না কিনে আমরা নিজেরাই বীজাণুনাশক দ্রব্য উৎপাদন করতে পারি। গ্যাস কোম্পানীর সমগ্র কারখানাটি সেলামী দিয়ে কিনে নিয়ে সেটিকে আমাদের পরিচালনাধীনে আনাও সম্ভব হতে পারে। আমি বুঝতে পারি না কেন এটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে না।

পৌরসভার অধীনে এলে গ্যাসের পরিবর্তে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করব কি না, তা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। এ সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আর্থিক সঙ্গতির উপর। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আমি লাইটিং সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনের কারখানা পরিচালনা করতে কি রকম খরচ পড়তে পারে তার একটি তুলনামূলক বিবরণ তৈরী করতে বলেছিলাম। জানি না, একাজে তিনি অগ্রসর হয়েছেন কি না। মোটের উপর বিদ্যুতের অনুকূলেই তা যাবে বলে বোধ হয়। একথা আপনার অজানা নেই যে, পাম্পিং স্টেশনগুলিতে ও শহরের কয়েকটি রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করতে বিদ্যুতের খরচের জন্য আমরা Eelectric Supply Corporation-কে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে থাকি। যদি আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি তাহলে সমস্ত পাম্পিং স্টেশন এর দ্বারাই পরিচালিত হবে এবং খরচের ব্যাপারেও অনেক সাশ্রয় হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে সব দিক সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য। এক বছর না লাগলেও অন্তত ছ'মাস আলোচনা চালাতে লাগবে—তাই এখনই অবিলম্বে তা উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

আমি কিছুদিন যাবৎ Municipal Market-এ ঠাণ্ডা ঘর প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছি। অবিক্রীত মাছ, মাংস, ফল এর ফলে রক্ষা করা সম্ভব হবে। বাজারে প্রত্যহ বেশ কিছু পরিমাণ খাদ্য নষ্ট হয়; এবং এই ক্ষতি পূরণ করে নেবার জন্য সব জিনিষের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যদি একটি ঠাণ্ডা ঘরের দ্বারা এটি রোধ করা সম্ভব হয়. তাহলে খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং দামও কমে যাবে। এই বিষয়টি মার্কেট কমিটির কাছে উত্থাপন করা যেতে পারে।

ইংলণ্ডে Food Preservation Department বলে একটি বিভাগ আছে এবং কেম্ব্রিজে আমার এক বন্ধু (মিঃ পি পারিজা, বোটানীর অধ্যাপক, র‍্যাভেনশ' কলেজ, কটক) এই বিভাগে প্রায় একবছর Paid Research Scholar হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি আপেল ও তার রক্ষার উপায় সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। কয়েকদিন আগে লণ্ডন টাইমসে একটি প্রবন্ধ পড়ছিলাম যাতে বলা হয়েছে, আপেল রক্ষা সম্বন্ধে কোনও পরীক্ষাই এখনও সফল হয় নি। এ সম্বন্ধে সর্বাধুনিক গবেষণা ও এর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে আপনাকে তথ্য সরবরাহের জন্য আপনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা সেক্রেটারী মারফৎ মিঃ পারিজাকে চিঠি দিতে পারেন। ইংলণ্ডের Ministry of Health অথবা London County Council-এর সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন তথ্যানুসন্ধানের জন্য। খাদ্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হলে সরবরাহ বৃদ্ধি পাবেই, এবং দামও কমবে; তাই এ বিষয়ে অন্যান্য দেশ কতদূর কি অগ্রসর হয়েছে, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের অবশ্য প্রয়োজন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়ে বোম্বাই, দিল্লী ও চট্টগ্রাম আমাদের চাইতে এগিয়ে গিয়েছে। কি লজ্জার কথা। প্রায় তিন মাস আগে ডেপুটি মেয়রকে এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় না যে তিনি বিন্দুমাত্র উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯২৬ সালে কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের আমার ইচ্ছা ছিল—তাহলে বর্তমান কর্পোরেশনের মেয়াদ যখন শেষ হত তখন এ সম্বন্ধে একবছরের অভিজ্ঞতা তাদের সঞ্চয় হত। আইনে এরকম কোন ব্যবস্থা নেই যাতে আমরা তা প্রবর্তন করতে পারি; এজন্য কর্পোরেশনকে বিশেষ ক্ষমতা দিতে হবে। আমাকে

জানানো হয়েছে যে, কাউন্সিলের গত অধিবেশনে বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যাতে স্থানীয় গভর্নমেন্টকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে,—তাঁরা বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করে কোন স্থানীয় সংস্থাকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও এতৎ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নিযুক্ত করতে পারবেন।

নদীর উৎস, ধারা ও বিলুপ্তি—সব মিলিয়ে এটি একটি বিজ্ঞান। বিদেশে কিছু সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন। ছোট ছোট নদী তৈরী করে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে তার সম্ভাব্য গতিপথ সম্বন্ধে পরীক্ষাকার্য চালানো হয়। বিদ্যাধরী সম্বন্ধে জানতে উৎসুক কোন নদী বিশেষজ্ঞকে সেখানকার ভূমি পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং নকল নদী তৈরী করে পরীক্ষা চালাতে হবে। ভবিষ্যতে কলকাতার নর্দমা তৈরী সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনাই কার্যকরী হবে না যতক্ষণ না আপনি বিদ্যাধরী এলাকার ভবিষ্যত সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী (অথবা ধারণা) করতে পারছেন।

Mr. Wilkinson অথবা যে কোন পয়ঃপ্রণালী বিশেষজ্ঞ দ্বিতীয় সমস্যাটির বিষয়ে কিছু করতে পারেন; কিন্তু প্রথমটির সমাধান একমাত্র নদী বিশেষজ্ঞের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। বিদ্যাধরী কমিটি এতদিনে প্রথম সমস্যাটির কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার বিশিষ্ট নদী বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর জানতে চেয়ে আপনি ডাঃ বেন্টলীকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখতে পারেন। এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য কর্পোরেশনের পক্ষ থেকেও ইংলন্ডের Institute of Civil Engineers-এর কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। আপনি যদি এই বিষয়টির দায়িত্বও গ্রহণ করেন, তাহলে আনন্দিত হব।

Markets Committee-র কার্যাবলী জানবার জন্য উৎসুক হয়ে আছি। ভবিষ্যতে যত ঝড়-ঝাপ্‌টাই আসুক না কেন—Turai Manshatala Boat তা কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে গভীর আশা পোষণ করি। কার্যকরী কোনও প্রস্তাবের কথা ভাবতে পারলে মেজদাদাকে মাঝে মাঝে লিখে জানাব। আশা করি আপনি আমার প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে দেখবেন।

Workshop Committee কোন রিপোর্ট দাখিল করেছে কি? বর্তমানে Motor Vehicles Dept.-এর অবস্থাই বা কি রকম? অদূর ভবিষ্যতে এর পুনর্গঠনের সম্ভাবনা আছে কি? Municipal Railway-র ইঞ্জিনগুলির অবস্থা খারাপ বলে আমার মনে হয় এবং এজন্য আপনাকে E. B. Rly.-র সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার নতুন মেশিনের জন্য পরবর্তী বাজেটে কিছু অর্থ বরাদ্দ করা কর্তব্য। কর্পোরেশনের মধ্যে আরও যে সব অঞ্চল এসেছে, সেখানকার জন্য জলের গাড়ীও প্রয়োজন। ভবিষ্যত সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে, আমাদের নতুন যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রাস্তাঘাটের অবস্থা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধানকার্য শুরু হয়েছিল তা আর অগ্রসর হয়েছে কি? আমার বিশ্বাস, Roads Department-কে একজন Road Engineer-এর অধীনে এনে তার কেন্দ্রীকরণ করতে হবে, অবশ্য তিনি ইউরোপে রাস্তাঘাট নির্মাণের আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া চাই। কর্পোরেশনে সে রকম কোনও যোগ্য Road Engineer নেই। অন্যান্য দেশে রাস্তাঘাটের এত দ্রুত উন্নতি হয়েছে যে. আমরা অনেক পিছনে পড়ে আছি। কোনও যোগ্য লোককে ঠিক করে বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানোই বোধহয় ভাল হবে। আমাদের Roads Department এত অসংগঠিত যে, নতুন নতুন প্রয়োজনের চাপ সহ্য করা এর পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষতঃ যখন কলকাতার আয়তন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী বছর রাস্তার কাজে গুরুতর বিঘ্ন ঘটবে বলে মনে হয়, ফলে করদাতারা আপনাদের চেপে ধরবে। সমস্ত Engineering Dept. এরই পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন এবং বিভিন্ন বিভাগের (রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী, আবর্জনা) স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিতে হবে। কলকাতার মত একটি বিরাট শহরের পক্ষে একজন "সব জান্তা" চীফ ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন আছে কি না আমার সন্দেহ আছে।

প্রতি বছরই একটি বিশেষ সময়ে কলকাতায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে; এ সম্বন্ধে কোন তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন কি?

আরও অনেক বিষয় না লিখে আমাকে এখানেই হঠাৎ চিঠি শেষ করতে হচ্ছে। কারণ এ চিঠি অনেক দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে এবং আমাকে ডাক ধরতে হবে। যা লিখেছি তার

উপর আবার চোখ বুলোতেও পারলাম না—অনুগ্রহ করে এই ব্যস্ততার জন্য ক্ষমা করবেন।
গভীর শ্রদ্ধা জানবেন।

ইতি—
আপনার সহোদরপ্রতিম
সুভাষচন্দ্র বসু

(ইংরেজী থেকে অনুদিত)

বিভাবতী বসুকে লিখিত
শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

১১৫

মান্দালয় জেল
ইং ১৬ই ডিসেম্বর
(১৯২৫)

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ৫ই ডিসেম্বরের পত্র পেয়ে যে কতদূর আনন্দিত হয়েছি তা বলতে পারি না। আপনার দুইখানি পত্রের উত্তর না দেওয়াতে আমি আশা করি নাই যে আপনার পত্র পাব। যাক্ এখন তিনখানা পত্রের উত্তর দিচ্ছি।

আপনাদের প্রেরিত পাঞ্জাবী কয়েকদিন হ'ল পেয়েছি। পার্শ্বেলটা পেয়েই বুঝতে পারি যে বাড়ীর সুতায় তৈয়ারী—কারণ তা না হলে একখানা পাঞ্জাবী আসত না। তবে আমি ঠিক করতে পারি নাই কার সুতায় তৈয়ারী। একবার মনে হল যে পূর্বে সেজ-বৌদিদিরা যে সুতা কেটেছিলেন তার দ্বারা তৈয়ারী। তার পর মনে হল যে হয়তো লাল মামীমার সুতায় তৈয়ারী—কারণ গতবার যখন জেলে ছিলুম তখন তিনি তাঁর নিজের তৈয়ারী কাপড় ও চাদর আমায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখছি যে আমার অনুমান ঠিক হয় নাই। আপনারা যে এখন সুতা কাটছেন তা পূর্বে আমি শুনি নাই। আপনারা কে কে সুতা কাটেন এবং কার সুতা কি রকম হয় তা আমাকে অবশ্য অবশ্য লিখবেন। কার সবচেয়ে বেশী উৎসাহ? দিদি সুতা কাটতে পারে? সুতা দিয়ে আপনারা থান কোথায় বোনান?

পাঞ্জাবীটি খুব সুন্দর হয়েছে এবং আমি পরেই লিখছি। নিজের হাতের রান্না যেমন পরের রান্নার চেয়ে দশগুণ মিষ্ট লাগে নিজের হাতে তৈয়ারী কাপড় পরের তৈয়ারী কাপড়ের চেয়ে দশগুণ সুন্দর বোধ হয়। আশা করি আপনাদের উৎসাহ দিন দিন বেড়েই যাবে। আমরা এখানে এসে কয়েকদিন সুতা কাটি। তারপর চরকাটা ভেঙ্গে যায় এবং যাঁর খুব বেশী উৎসাহ ছিল তিনি এখান থেকে বদলী হয়ে যান। তাই এখন ভাঙ্গা চরকাটা আলমারীর উপর তোলা আছে। একবার ইচ্ছা হয়েছিল কলকাতায় ডাক্তার পি. সি. রায়কে লিখি একটা চরকা পাঠাতে। তারপর ভাবলুম যে হয়তো পথে আসতে আসতে ভেঙ্গে যাবে, তাই লেখা হ'ল না।

সারুদার কথা প্রায় মনে হয়। সে এখন কেমন আছে? তার এখন প্রধান অবলম্বন কি? ছাগল, না বেড়াল, না পাখী, না ছেলেমেয়েরা? কাকে নিয়ে বেশী থাকে?

অনেকদিন পূর্বে শুনেছিলাম যে ছোট বৌদিদির অসুখ করেছিল, তিনি এখন কেমন আছেন?

আমি যে এক বৎসর কাল দেশান্তরে কারারুদ্ধ অবস্থায় রয়েছি তাতে আপনারা সকলে এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত দুঃখিত। আমারও যে মনে কষ্ট হয় না—তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি প্রায়ই ভেবে দেখি যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই ভগবানের একটা বড় উদ্দেশ্য আছে। তা যদি না হয় তবে এত রাজবন্দীদের মধ্যে আমি বা আমরা কয়জন কেন এখানে এলুম? তাছাড়া, আমি মধ্যে মধ্যে এত আনন্দ অনুভব করি যে তা বলতে পারি না। এ আনন্দ যদি না পেতুম, তবে এতদিনে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতুম। আমরা ধর্মপুস্তকে প্রায়ই পড়ে থাকি যে দুঃখের মধ্যে সুখ আছে। এ কথাটা একশবার সত্যি। কর্মের মধ্যে যদি মানুষ কোন প্রকার সুখ না পেতো, তা হ'লে মানুষ কখনও অম্লান মনে কষ্ট সইতে পারত না। অবশ্য যে কষ্টটা মানুষ পরের জন্য ভোগ করে তার মধ্যে যতটা সুখ পায় বোধ হয় অন্য কোন কষ্টের মধ্যে ততটা সুখ পায় না। মা ছেলের জন্য, ভাই

ভাইয়ের জন্য, বন্ধু বন্ধুর জন্য অথবা স্বদেশসেবী দেশের জন্য, যে দুঃখ ভোগ করে, তার মধ্যে যদি আনন্দ না পেতো, তবে কি সে কষ্ট সহ্য করতে পারতো? ভক্ত যে বিরহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে থাকে একথা খুব ঠিক। কারণ এক বৎসর কাল দেশান্তরিত হয়ে আমি অনুভব করছি আজ আমার জন্মভূমি আমার নিকট কত প্রিয়, কত সুন্দর হয়ে উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে জন্মভূমিকে এখন যত ভালবাসি, জীবনে এত ভালবাসি নাই। আর সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য যদি কষ্ট সইতে হয়—সে কি আনন্দের বিষয় নয়? আজ আমি বাইরে দেশছাড়া—কিন্তু অন্তরের মধ্যে, কল্পনার মধ্যে দেশকে পেয়ে থাকি। আর সে পাওয়ার মধ্যে কি কম আনন্দ?...[ইহার পর পাঁচটি পঙক্তি সেন্সর কর্তৃপক্ষ বাদ দিয়াছিল]

১৯।১২।২৫

মেজদাকে গত সপ্তাহে এবং এ সপ্তাহে পত্র দিতে পারি নাই—আগামী সপ্তাহে পত্র দেব।

কনকের প্রেরিত ভাইফোঁটার ধুতি ও চাদর পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। তাকে আলাদা পত্র দেব মনে করেছিলুম—কিন্তু শীঘ্র হয়ে উঠবে কিনা জানি না। সে ওখানে এলে আমার কথা বলবেন।

একটা কথা আমার এখনও বলা হয় নাই। পূজার কাপড় যা পাঠিয়েছিলেন তা পেয়ে আমরা সকলে খুব আনন্দ করেছি। পূজার সময় পোঁছায়নি বটে কিন্তু তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? মাসের মধ্যে আমাদের ৩০ দিনই ছুটি। আপনাকে আলাদা করে বিজয়ার প্রণাম জানাতে পারি নাই। মেজদাদার পত্রে জানিয়েছিলুম। আশা করি রাগ করেন নাই।

'পূজার কথা বোধ হয় এখন পুরোন হয়ে গেছে। এত আনন্দ কোনও পূজাতে পেয়েছি কিনা জানি না। আর অনেক ঝগড়াঝাঁটি করে আমরা পূজা করবার অনুমতি পাই তাই বোধ হয় পূজার মধ্যে বেশী আনন্দ পাই। কতদিন জেলে কাটাতে হবে তা জানি না। তবে বৎসরান্তে যদি 'মার দর্শন পাই তবে সব দুঃখ সহ্য করতে পারব। দুর্গা-মূর্তির মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একাধারে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ী।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলুম। আমি মেজদাদাকে পূর্বে জানিয়েছিলুম যে 'দুর্গাপূজার খরচের টাকা বোধ হয় সরকার থেকে দেওয়া হবে। এখন আমরা হুকুম পেয়েছি যে আমাদের পকেট থেকে দিতে হবে। আমরা বলেছিলুম যে ৫০০৲ টাকা সরকার থেকে দেওয়া হোক—বাকী টাকা আমরা দোব। আমাদের প্রতিশ্রুত অংশ আমরা দিয়ে বসে আছি। কিন্তু ৫০০৲ টাকার এক পয়সা আমরা দিতে পারব না—এবং দোব না।

এখানকার খবর অবশ্য জানতে চান। মুরগীর সংখ্যা বেড়েছে। চারটি ছানা হয়েছে। আরও কয়েকটি হয়েছিল—জন্মাবার পর মারা যায়। মুরগীর জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রীতিমত একটা ঘর তৈয়ারী করা হয়েছে। আর নূতন মোরগও কেনা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে মোরগের লড়াই হয়। পূর্বে আমি কখনও মোরগের লড়াই দেখি নাই। পায়রা পোষবার প্রস্তাব হয়েছিল—রাখবার ঘরের অভাবের দরুন কেনা হয় নাই। তবে এখানে বেশীদিন থাকলে যে একটা পায়রার আড্ডা করা হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জেলের মধ্যে জীবনটা এত একঘেয়ে এবং নীরস যে এর মধ্যে রসের সৃষ্টি না করতে পারলে মাথা ঠিক রাখা কষ্টকর ব্যাপার।

বেরালের উপদ্রব পূর্ববৎ চলেছে। পূর্বে ৮।৯টা ছিল। প্রত্যহ রাত্রে হুলো বেরালদের ঝগড়ায় ঘুম ভেঙ্গে যেতো। আমাদের তর্জন-গর্জন তারা গ্রাহ্য করত না—কারণ তারা বুঝতে পারত যে আমরা ঘরের মধ্যে বন্ধ। তারপর একদিন আমরা সব ক'টাকে বস্তা বন্ধ করে দূরদেশে পাঠিয়ে দিই। তার মধ্যে কয়েকটা আবার ফিরে আসে। এখানে অনেকে খুব বেরালপ্রেমিক। কি করবে—আদর করার বস্তুর অভাবে শেষে বেরালকে আদর ক'রে মনের আশা মেটায়। আমি কিন্তু এখনও বেরাল ভালবাসতে পারলুম না—(আর এগুলো দেখতে এত বিশ্রী)—তবে সারদার বেরালের মত সুন্দর হয় তো ভালবাসা যায়।

বাগান করবার চেষ্টা খুব চলেছে। আমাদের স্থায়ী ম্যানেজার এখন ম্যানেজারী কাজ ছেড়ে বাগানের পেছনে লেগেছেন। কিন্তু জমি রাজী নয় সোনা ফলাতে। ম্যানেজার-বাবুও নাছোড়বান্দা। দুই হাত জমির মধ্যে এমন কিছুই নাই তিনি লাগান নাই। শাক,

বেগনে, ছোলা, মটর, আখ, আনারস, প্যাজ কত কি? তা ছাড়া নানা রকমের ফুলের গাছ। খানিকটা জায়গায় রোদ লাগে না বলে ফুলের গাছগুলি বাড়ছে না দেখে তিনি নানা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করেছেন। আজ এক সপ্তাহ হ'ল তিনি রোদের মধ্যে একটা বড় আর্শি রেখে ফুলের গাছগুলির উপর সূর্যের আলো কয়েক ঘণ্টা করে ফেলছেন। তাঁর মতে এই উপায়ের দরুন ফুলের গাছগুলি খুব তাড়াতাড়ি এখন বাড়ছে। আমরা তাই এখন তাঁকে "দ্বিতীয় জগদীশ বোস" সাব্যস্ত করেছি।

জেলখানা যে একটা চিড়িয়াখানা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের এখানে একটি লোক আছে তার নাম শ্যামলাল। তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমরা প্রথমে তাকে "পণ্ডিত" উপাধি দিয়েছি। সম্প্রতি আরও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে "উপাধ্যায়" দেওয়া হয়েছে এবং তাকে ভরসা দেওয়া হয়েছে যে ক্রমশঃ "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি পাবে।

শ্যামলাল মহাপ্রভু ডাকাতি করতে গিয়ে পাঁচ টাকা নিয়ে ঘরে ফেরেন। হাজারের বেশী টাকা তার ডাকাত বন্ধুরা তাঁকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়। পাঁচ টাকার জন্য সে পেল ১৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। তাকে পাঠান হ'ল রাজসাহী জেলে। সেখানে কয়েদীরা জেল ভেঙ্গে পালাল। যখন সব কয়েদীরা পালাল তখন শ্যামলাল দেখল যে জেলখানা খালি এবং সদর দরজা খোলা। সে গিয়ে জমাদারকে বললে—"জমাদার সাহেব, আমিও কি যেতে পারি?" জমাদার উত্তর দিল, "তুমরা যো খুসী করো"। যখন সব কয়েদীরা ধরা পড়ে আবার জেলে এলো—তাদের বিচার আরম্ভ হ'ল। বিচারের সময় শ্যামলাল দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, "হুজুর আমি জমাদারের অনুমতি নিয়ে জেলের বাহিরে গিছলুম।" জজ তার কথা শুনলে না—সে পেলো এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড—জেলভাঙ্গার অপরাধে।

এখানে এসে শ্যামলালকে দেওয়া হ'ল স্নানের ঘরের কাজ। তার কাজ জল ঠিক রাখা—কাপড়, তেল, সাবান ঠিক রাখা ইত্যাদি। পাঁচজন কয়েদী এসে স্নানের জল নষ্ট করে দেখে সে মনে মনে বুদ্ধি আঁটল কি করলে জল নষ্ট হবে না। অনেক চিন্তার পর সে স্নানের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করল। তারপর জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসে জোরে ধাক্কা দিয়ে জানলা বন্ধ করল। ছিটকানি পড়ে ভিতর থেকে জানালা বন্ধ হয়ে গেল এবং শ্যামলালও মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হল। স্নানের সময় যখন দরজা খোলা দরকার হল তখন শ্যামলাল মাথা চুলকোতে লাগল। আমরা তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ "পণ্ডিত" উপাধি দিলুম।

শ্যামলালের উপাধির সংখ্যাও বাড়তে লাগল কিন্তু সে পণ্ডিত নামে সবচেয়ে বেশী সন্তুষ্ট রইল এবং উপাধিটি পাবার পর তার কাজের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

চুলকানি হয়েছে দেখে শ্যাম পণ্ডিত একদিন স্থির করল তার কুষ্ঠ ব্যাধি হয়েছে। কি উপায়ে কুষ্ঠ রোগের আরাম হতে পারে তা জানবার জন্য সে সকলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তারপর আর একটি ঘটনায় সে এরূপ বুদ্ধি দেখায় যে তার প্রমোশন হয়ে সে "উপাধ্যায়" উপাধি পায়। যে রকম বেগে তার বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে, সে যে শীঘ্র "মহা-মহোপাধ্যায়" নাম পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আর একটি মজার লোক এখানে আছে। তার নাম "ইয়াঙ্কায়া"। তার আদি নিবাস মান্দ্রাজ অঞ্চলে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন ইংরাজেরা উত্তর বর্মা দখল করে তখন সে ইংরাজদের সহিত এদেশে আসে। এখন তার বয়স মাত্র ৭০ বৎসর এবং জীবনে মাত্র তিনবার বিবাহ করেছে। যেমন লম্বা, তেমন চওড়া, আর পেটটা তার চেয়ে বড়। খেতে খুব ভালবাসে এবং দুনিয়ার মধ্যে পেটটা সব চেয়ে বড় সত্য একথা সে প্রাণে প্রাণে বুঝে। কোন ভাষা সে জানে না। এখন যে ভাষা বলে সেটা কারুঙ্গী (একটা মান্দ্রাজীয় ভাষা) হিন্দুস্থানী ও বর্মা ভাষার একটা খিচুড়ি। সে কোন ভাষা ভাল বলতে পারে না এই গুণের জন্য তাকে প্রথমে বাঙ্গালীদের কাজের জন্য দেওয়া হয়। এখন তার ভাষার চেয়ে তার ভাবভঙ্গী দেখে বুঝি। তার আর একটা বড় গুণ আছে, সে কোনও নাম ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না। "ভোগ সিং" না ব'লে বলে "বুর্সিং"; কৃপারামের স্থলে সে বলে "ত্রিপদ-রাজু"; সুভাষবাবুর স্থলে সে বলে "সুর্বন বাবু"; "বিপিনবাবুর" স্থলে "গোবিন্‌বাবু" ইত্যাদি। তার ভাষার একটা নমুনা দিই—"ত্রিপদ-রাজু চলা গয়া সীদে" অর্থাৎ কৃপারাম চলে গেছে। এর মধ্যে "চলা গয়া" হচ্ছে হিন্দুস্থানী এবং "সীদে" হচ্ছে বর্মা কথা। ইয়াঙ্কায়ার সদা সর্বদা আশঙ্কা হয় আমরা কোনদিন চলে যাব। তখন ওর খাওয়াদাওয়ার একটু অসুবিধে হতে পারে।

খবর কাগজ নিয়ে আমরা যদি একত্র বসে পড়তে বসি—অমনি তার অন্তরাত্মা খাঁচা

ছাড়া হবার উপক্রম। একটু আড়ালে এলেই সে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "বাবু বেংলা চলা গয়া?" অর্থাৎ বাবু বাংলা দেশে চলে যাবেন না কি? "না" উত্তর পেলে সে আশ্বস্ত হয়। তবে মুখে বলে, "বাবু, বেংলা চলা গয়া বহুৎ কাউণ্ডে" অর্থাৎ বাবুরা বাংলা দেশে চলে গেলে খুব ভাল হয়। "কাউণ্ডে" হচ্ছে বর্মা কথা, তার মানে "ভাল"।

যাক্, একদিনে কাহিনী শেষ করলে চলবে না। পলি কেমন আছে? কবিরাজী ওষুধ খেয়ে কিছু উপকার পেয়েছি, কিন্তু উপকারটা স্থায়ী হবে কি না বলতে পারি না। মধ্যে সর্দিজ্বর মত হয়েছিল এখন ভাল আছি। আপনারা সকলে কে কেমন আছেন? আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

শ্রীসুভাষ

১১৬

মান্দালয় জেল

প্রযত্নে ডি আই জি, আই বি, সি আই ডি

(বাঙলা)

১৩, এলিসিয়াম রো

কলকাতা

২৪. ১২. ২৫

প্রীতিভাজনেষু

গোপবন্ধুবাবু,

কিছুদিন আগে আপনার ২৬. ৪. ২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। এই কয়দিন ধরে আমি উড়িয়া বইগুলির আশায় রয়েছি, কিন্তু সেগুলি এখনও পৌঁছয় নি। আমি বইগুলি পেতে আগ্রহী কেননা উড়িয়া শেখার জন্য আমি উৎসুক। আমার প্রয়োজনীয় বইপত্র আমি কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের বুক কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করি, সেখানে আমার একটা এ্যাকাউন্ট আছে। উড়িয়া-বইগুলোর নাম জানতে পারলে, আমি তাদের বইগুলি আমাকে পাঠাতে বলতে পারি। আপনি কি একটি ভাল উড়িয়া ব্যাকরণ কিংবা অধিকতর পছন্দসই একটি ইংরেজী-উড়িয়া বা বাংলা-উড়িয়া ব্যাকরণের নাম বলতে পারেন?

আপনার আশীর্বাদ এবং আশা ও শক্তির বার্তা পেয়ে আমি যে কি পরিমাণ উৎফুল্ল হয়েছি আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমার বর্তমান অভিজ্ঞতাকে ভাল কাজে নিয়োগ করার শক্তি, অসীম করুণাময় ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই—যদিও এতদিন ধরে সবসময়ই আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না।

উড়িষ্যা একত্রীকরণ পরিকল্পনার সম্প্রসারণের ঘটনাবলীর উপর আমার নজর আছে। কেবলমাত্র এইটুকুই আমি আশা করতে পারি যে বিদায়ের আগে লর্ড রিডিং উড়িষ্যার জনমতের অনুকূলে কিছু ঘোষণা করে যাবেন।

উড়িষ্যার বন্যার খবর শুনে আমি মর্মাহত। ক্ষতির পরিমাণ কতখানি, এবং দুর্গতদের সেবার জন্য কি করা সম্ভব হয়েছে, দয়া করে আমাকে জানাবেন।

সিলেটকে বাঙলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গঞ্জামকে উড়িষ্যায় ফিরিয়ে না দেওয়ার কোন কারণ দেখি না। এখনই হোক আর পরেই হোক একত্রীকরণ অবশ্যম্ভাবী। মাদ্রাজ সরকার বিরোধিতা করে কেবলমাত্র সেটিকে দেরী করিয়ে দিচ্ছেন।

ডাঃ বালকৃষ্ণ মিশ্র এবং পণ্ডিত কৃপাসিন্ধু মিশ্রের আকস্মিক মৃত্যুতে আপনি কতখানি দুঃখিত ও অভিভূত হয়েছেন, আমি বুঝতে পারছি। আপনাকে কি সান্ত্বনাই বা আমার দেওয়ার আছে? এই শোক কাটিয়ে ওঠার শক্তি ঈশ্বর আপনাকে দিন! ঈশ্বর যাঁদের ভালবাসেন, মৃত্যু তাঁদের অল্পবয়সেই হয়। জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে আপনার অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত আমাকে বিশেষ বেদনাহত করেছে। আমি উপলব্ধি করতে পারি এখন আপনি যে মানসিক অবস্থায় আছেন, তাতে এইরকম ভাবনা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু সর্বান্তঃকরণে আশা করছি যে এই ইচ্ছে সময় গেলে যেন কেটে যায়। জনকল্যাণমূলক কাজে প্রবেশের প্রথম দিন থেকেই আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আপনি পরিত্যাগ করেছেন। জনসেবা হল সন্ন্যাসধর্মের মতন—একজন যখন এ কাজে প্রবেশ করে, তখন তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অস্বীকার করে, তাকে সকল দম্ভের অবসান ঘটাতে হয়। একবার একাজে প্রবেশ করলে, ফিরে যাওয়ার রাস্তাও নেই। সাময়িক

ভাবে যদিও আপনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন এবং আপনার দুঃখ যদিও সীমাহীন, তবুও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আপনি ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। কেন হয় তা জানি না—তবে জীবনের ধর্মই হল, হৃদয় যার যত প্রসারিত দুঃখ তার তত গভীর। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়।" অর্থ যার এক।

পুরী জেলার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা সম্পর্কে সত্যিই কিছু করা হবে বলে মনে হয়, কারণ কেবলমাত্র বিনীত প্রস্তাবেই কাজ সম্পন্ন হয় না।

উড়িষ্যার ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও দুর্দশা কেবল সম্পূর্ণ ছবির একটি অংশ মাত্র। উড়িষ্যা শুরু থেকেই গরীব, আর সেজন্যই তার আজকের দুর্দশা এত ভয়াবহ। কিন্তু সেই একই অবস্থা, অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও দুর্দশা ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং বর্মাতেও বর্তমান।

আপনার শোক সত্ত্বেও, ভাল আছেন আশা করি। বন্ধুদের আমার কথা বলবেন। আমি একপ্রকার। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন।

আপনার
স্নেহের
সুভাষচন্দ্র বসু

পুঃ—উড়িয়া সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবন এবং তাঁদের সাধনার পদ্ধতি বিষয়ক কোন বই আছে কিনা জানাবেন।

(স. চ. ব)

(পরবর্তী ৩টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১১৭

মান্দালয়
৩০।১২।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

কয়েকদিনের মধ্যে আপনাকে কোন চিঠি লিখিনি—মনে হয়, এক পক্ষকালের চাইতেও বেশী। আপনার ১৯ তারিখের চিঠি গতকাল পেয়েছি, আর ৫ তারিখেরটির এখনও উত্তর দেওয়া হয় নি।

আমি আমার বই-এর সঙ্গে রামিয়ার পাঠানো তালিকা মিলিয়ে দেখেছি। দেখলাম, পাঠানো বইগুলোর সবকটিই আমি পেয়েছি।

কানপুর থেকে ফিরে এসে আপনি এ চিঠি পাবেন—অবশ্য যদি গিয়ে থাকেন। কানপুর যাওয়া কিরকম উপভোগ করলেন, তা জানতে আগ্রহী রইলাম।

রাঙ্গামামাবাবুর সঙ্গে আলোচনার সময়, যে সব বিষয় আমি উল্লেখ করেছিলাম, আশা করি, সেগুলি বর্মা ও বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের নজরে আনতে তিনি সমর্থ হয়েছেন।

কিছুদিন ধরে শ্রীমতী দাসের কোন খবর পাচ্ছি না। তিনি কেমন আছেন?

আমার মনে হয় না যে কোনো ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে B. A-র পরিবর্তে A. B লেখা হয়। আমি অবশ্য abardeen-এর মতন, স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু জানি না।

আশা করি আপনারা সকলে কুশল।

ইতি—

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনুদিত)

১১৮

মান্দালয়
১৬।১।২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

কিছুদিন হল আপনার কোন খবর পাই না। শেষ যে চিঠি লিখেছিলেন, আমার মনে হয় তার তারিখ ছিল ২৫শে ডিসেম্বর।

আপনার উত্তর-ভারতবর্ষ ভ্রমণ কেমন উপভোগ করলেন? কানপুর সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? শুনেছি যে পণ্ডিত মতিলাল গুরুতর ভাবে অসুস্থ এবং স্বাস্থ্যের কারণে তিনি বিদেশে যাবেন। এ কথা কি সত্য?

এই শীতে সেখানে কেমন ঠাণ্ডা? সরস্বতী পুজোয় টাকা মঞ্জুরীর ব্যাপারে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। গভর্নমেন্টের কাছে আমরা আবেদন করেছি। এখন ফলাফলের প্রতীক্ষায়।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে ক্যাপ্টেন স্মিথ এখানে ফিরে এসেছেন। বর্মার Inspector General of Prisons একদিন এখানে এসেছিলেন। আমরা তাঁকে বলেছি যে, আরও একবছর যদি আমাদের এ দেশে থাকতে হয়, তাহলে আগামী গ্রীষ্মে যেন আমাদের বর্মার কোন পাহাড়ী অঞ্চলে বদলী করা হয়। তিনি এখনও নিরুত্তর। আর বিশেষ কিছুই লিখবার নেই। আমি একপ্রকার।

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১১৯

মান্দালয়

২৩।১।২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ১৪ তারিখের চিঠি পেয়ে এবং আপনার উত্তর-ভারত ভ্রমণ উপভোগ্য হয়েছে জেনে, আনন্দিত হলাম।

গোপালীকে আমার চশমা-জোড়া খুঁজে পাঠিয়ে দিতে বলবেন, সঙ্গে দু'খণ্ড Myer's Experimental Psychology. চশমাগুলি সরাসরি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু বইগুলি Elysium Row-তে—তাতে অনেক সমস্যা এড়ানো যাবে। আমার লাইব্রেরীতে সাইকোলজির অন্যান্য বই-ও পাঠানো যেতে পারে, তবে Myers-এরটি আমার অবশ্যই চাই।

আশঙ্কার বিষয় এই যে, শহরের সর্বত্র ম্যালেরিয়া মহামারীর মতন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের কাছে যে উপায় আছে, তাই দিয়ে অনায়াসেই ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। আমি জানি না, সংশ্লিষ্ট বিভাগ কেন তৎপর হন না।

শ্রীমতী দাসের কথা জেনে আমি দুঃখিত। মাঝে মাঝে, তাঁকে দেখার জন্য গভীর উদ্বিগ্ন বোধ করি। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কবে আমি দেখা করতে সক্ষম হব। ঈশ্বর তাঁকে এই দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগ সহ্য করার শক্তি দিন।

সাময়িকভাবে, নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, আমরা এখানে সরস্বতী পুজো করেছি। অবশ্য আমরা গভর্নমেন্টকে খরচটা দিয়ে দিতে বলেছি, এবং ভবিষ্যতেও ক্রমাগত বলব। কবিরাজী ওষুধ আমার সামান্য উপকারে এসেছে, যদিও আমি এখনও ওজন হারাচ্ছি। আমার ওজন এখন ১৫৯ পাউন্ড। অবশ্য আমি জানি না যে কবিরাজী ওষুধের ফল স্থায়ী হবে কি না।

জেনে খুশী হলাম যে কোদালিয়ার কাজ এগিয়ে চলেছে।

Book Company-কে জানাবেন যে Netzche-এর রচনাবলী পাঠানোর সময় তাঁরা ভুলক্রমে একই খণ্ডের দুটি কপি আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা ভাগে ভাগে বইগুলি পাঠিয়েছেন বলেই এই ভুলটি হয়েছে। আমি কি অতিরিক্ত কপিটা ডাকযোগে পাঠিয়ে দেব, না আমার বাঙলাদেশে ফেরা পর্যন্ত সঙ্গে রেখে দেব? আমার মনে হয় এটি পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল, সেক্ষেত্রে তাঁরা কোন ক্রেতাকে এটি বিক্রী করতে পারবেন।

এই ডাকে আমার অন্য কিছু লেখার নেই। আশা করি আপনারা সকলে ভাল।

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

পুঃ—Dr. Revers-এর Instinct and the Unconscious বইটিও আমার চাই।

(স. চ. ব)

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত)

১২০

Censored and Passed
স্বাঃ অস্পষ্ট
7. 2. 26
for D.I.G., I.B., C.I.D.
Bengal

Mandalay Jail
(C/o D.I.G., I.B., C.I.D.
(Bengal)
13, Elysium Row
Calcutta)
23.1.26

শ্রীচরণেষু—

মা, অনেকদিন যাবৎ আপনার কোনও খবর পাই নাই। ২।৩ দিন পূর্বে মেজদাদার পত্রে আপনার খবর পেলুম। অনেকদিন থেকে আপনাকে পত্র দিবার ইচ্ছা হচ্ছে—উত্তর পাবার জন্য নয়—যদিও উত্তর পেলে যারপরনাই সুখী হব। পত্রটা লিখলে হয়তো মনটা হাল্কা হবে—এই জন্য। কিছুদিন পূর্বে আপনার খবর পাবার জন্য মিঃ হালদারকে পত্র দিই। তিনি উত্তর দেন কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে পত্র পুলিশ কর্তৃক আটক হয়। জানি না আপনার খবর পাবার জন্য আমার মন কেন উতলা হয়।

মধ্যে আমার ইচ্ছা হয়েছিল সরকারের নিকট দরখাস্ত দিই আপনার সহিত একবার দেখা করার অনুমতির জন্য। রাজবন্দীদের মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের সহিত দেখা করতে দেওয়া হয়—এমন কি ৫।৭ দিন পর্যন্ত বাড়ীতে থেকে আসতে দিয়েছে আমি জানি। কিন্তু ভেবে দেখলুম দরখাস্ত করে কোনও লাভ নাই, কারণ সে সৌভাগ্য আমার ভাগ্যে ঘটবে বলে ভরসা হয় না। প্রার্থনা করাই সার হবে—আর লাভের মধ্যে মনকে আরও উদ্বিগ্ন করা হবে এবং বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে একটা অর্থহীন আপত্তি করা হবে। তাই অনেক চিন্তার পর দরখাস্ত করার প্রস্তাব মন থেকে দূর করেছি।

আপনার শরীর অত্যন্ত দুর্বল এবং স্বাস্থ্য খুব খারাপ শুনে খুব চিন্তিত হয়েছি। কি করি, আমরা এত নিঃসহায় যে কিছুই করিতে পারি না। আমাদের কপালে যে কি আছে তাহাও জানি না। কত কথা বলতে ইচ্ছা করে—কত কথা বলবার আছে—কিন্তু বলবার সময় এখনও আসে নাই। এ পত্রও অনেক দ্বিধার পর লিখতে বসেছি—কারণ এ পত্র অন্যের হাত দিয়ে যাবে।

খবর-কাগজে কংগ্রেসের নিকট আপনার বাণী পাঠ করলুম। ঐ করুণামাখা Pathos-পরিপূর্ণ কথাগুলি আমার হৃদয়তন্ত্রীকে কি ভাবে আঘাত করেছে তা বলতে পারি না। নিজের পর্বতপ্রমাণ বিপদ ও দুঃখরাশি পায়ে ঠেলে যিনি পরের জন্য কাঁদেন তাঁর প্রতি লোকে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না। অপর কেহ যদি ঐ বাণী পাঠাতেন তা' হ'লেও আমি কৃতজ্ঞ হতুম এবং কৃতজ্ঞতা জানাতুম—কিন্তু এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নাই, কারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত সম্বন্ধ এ নয়। এত বড় হৃদয়ের পরিচয় না পেলে আপনার দেশবাসী আপনাকে "মা" বলে সম্বোধন করবে কেন? যাঁকে মা বলা হয়, তাঁহাকে কি কৃতজ্ঞতা জানান যায়? মার প্রাণ যদি সন্তানের জন্য না কাঁদে, তবে কার প্রাণ কাঁদবে? কৃতজ্ঞতা জানালে কি মাতা-সন্তানের পবিত্র সম্বন্ধকে অপমান করা হয় না? আশা করি আপনার সকল শোক ও বিপদের মধ্যে আপনি ভুলবেন না বাঙ্গলার কত সন্তান আপনাকে "মা" বলে থাকে। হয়তো এ কথা মনে পড়লে আপনি কিছু সান্ত্বনা পেতে পারেন। তারা নিঃস্ব ও নিঃসহায় হলেও, আপনার বিপদকে তারা নিজেদের বিপদ বলে মনে করে নিয়েছে।

আজ আপনার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আপনার দেশবাসীকে—আমাদের সকলকে—ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিচ্ছে। আপনি যদি এত সহিতে পারেন, আমরা কি তার কিয়দংশ সইতে পারব না? আশীর্বাদ করুন—যত বড় বিপদ আসুক না কেন—যেন সঙ্গে সঙ্গে সহ্য করবার শক্তিও আসে। ভগবানের কৃপায় আজ পর্যন্ত এই শক্তি পেয়ে আসছি—চিরকাল যেন এই শক্তি পাই, এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার জীবনে আর নাই। আজ তবে আসি মা।

আর কি লিখিব? কি লিখিতে কি লিখেছি জানি না।

ইতি—
আপনার সেবক
শ্রীসুভাষ

(পরবর্তী তিনখানি পত্র শ্রীহরিচরণ বাগচীকে লিখিত)

১২১ মান্দালয় জেল (১৯২৬?)

তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা সত্য—খাঁটি কর্মীর অভাব বড় বেশী তবে যেরূপ উপাদান যোগাড় হয় তাহা লইয়াই কাজ করিতে হইবে। জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায় না—ভালবাসা না দিলে যেমন প্রতিদানে ভালবাসা পাওয়া যায় না—তেমনি নিজে মানুষ না হইলে মানুষ তৈয়ারী করাও যায় না।

রাজনীতির স্রোত ক্রমশঃ যেরূপ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে না। সত্য ও ত্যাগ—এই দুইটি আদর্শ রাজনীতির ক্ষেত্রে যতই লোপ পাইতে থাকে, রাজনীতির কার্যকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে। রাজনীতির আন্দোলন নদীর স্রোতের মত কখনও স্বচ্ছ কখনও পঙ্কিল; সব দেশে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রাজনীতির অবস্থা এখন বাঙ্গলা দেশে যাহাই হউক না কেন, তোমরা সেদিকে দ্রূক্ষেপ না করিয়া সেবার কাজ করিয়া যাও।

* * *

তোমার মনের বর্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কারণ কি তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কিনা জানি না—আমি কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি। শুধু কাজের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভবপর নয়। বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন। কাজের মধ্য দিয়া যেমন বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং মানুষ সংযত হয়, লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা সেরূপ internal discipline অর্থাৎ ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিতরে সংযম না হইলে বাহিরের সংযম স্থায়ী হয় না। আর একটি কথা, নিয়মিত ব্যায়াম করিলে শরীরের যেরূপ উন্নতি হয়—তেমনি নিয়মিত সাধনা করিলেও সদ্বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দুইটিঃ—(১) রিপুর ধ্বংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা, (২) ভালবাসা, ভক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধনা করা।

কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রী-মূর্তিতে (যেমন দুর্গা, কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রী-মূর্তিতে ভগবানকে দেখিতে শিখে সে অবস্থায় পেঁৗছিলে মানুষ নিষ্কাম হইয়া যায়। এই জন্য মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্ত্রী-মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন! ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে "মা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া যায়।

ভক্তি প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানবের মনে যখনই কোন ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বাড়ে তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতাও কমিয়া যায়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা ভক্তি ও ভালবাসা বাড়াইতে পারে এবং তার ফলে স্বার্থপরতাও কমাইতে পারে। ভাল বাসিতে বাসিতে মনটা ক্রমশঃ সকল সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে। তাই ভালবাসা, ভক্তি বা শ্রদ্ধার যে-কোন বস্তু-বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করার দরকার। মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়ে। নিজেকে 'দুর্বল পাপী' যে ভাবে সে ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে, যে নিজেকে শক্তিমান্ ও পবিত্র বলিয়া নিত্য চিন্তা করে সে শক্তিমান ও পবিত্র হইয়া উঠে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু আছে তাই আমরা ধূপ, গুগ্গুল প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিষ দিয়া পূজা করি ইত্যাদি। বলির অর্থ—রিপু বলি—কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ।

সাধনার উদ্দেশ্য একদিকে রিপু ধ্বংস করা অপরদিকে সদ্বৃত্তির অনুশীলন করা।

রিপুর ধ্বংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিব্যভাবের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আর দিব্যভাব হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সকল দুর্বলতা পলায়ন করিবে।

প্রত্যহ (সম্ভব হইলে) দুইবেলা এইরূপ ধ্যান করিবে। কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার। তাঁহার বই-এর মধ্যে "পত্রাবলী" ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই-এর মধ্যে এসব বোধ হয় পাইবে। আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। 'পত্রাবলী' ও বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। 'Philosophy of Religion', 'Jnanyoga' বা ঐ জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ করিও না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়িতে পার। রবিবাবুর অনেক কবিতার মধ্যে খুব inspiration পাওয়া যায়। ডি এল রায়ের অনেক বই আছে (যেমন 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস') যা পড়িলে বেশ শক্তি পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবু ও রমেশ দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও খুব শিক্ষাপ্রদ, নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'ও পড়িতে পার। 'শিখের বলিদান' (বোধ হয় শ্রীমতী কুমুদিনী বসু লিখিত) ভাল বই, Victor Hugo-র 'Les Miserables' পড়িও (বোধ হয় লাইব্রেরীতে আছে), খুব শিক্ষা পাইবে। তাড়াতাড়ি এখন বেশী নাম দিতে পারিলাম না। আমি অবসরমত চিন্তা করিয়া একটি তালিকা করিয়া পাঠাইব।

ইতি—

১২২

মান্দালয় জেল (১৯২৬ ?)

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তুমি যদি প্রত্যহ কিছু ব্যায়াম-চর্চা কর, তবে খুব উপকার পাবে। Muller-এর "My System" বই জোগাড় ক'রে যদি তদনুসারে ব্যায়াম কর তবে ভাল হয়। আমি নিজে মধ্যে মধ্যে Muller-এর ব্যায়াম ক'রে থাকি এবং উপকারও পেয়েছি। Muller-এর ব্যায়ামের বিশেষত্ব এইঃ—(১) কোনও খরচ লাগে না এবং ব্যায়াম করবার জন্য জায়গা খুব কমই লাগে। (২) ব্যায়াম করিলে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। (৩) শুধু অঙ্গবিশেষের পরিচালনা না হয়ে সমস্ত শরীরের মাংসপেশীর চালনা হয়। (৪) পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে—বিশেষতঃ ছাত্রসমাজে—যদি মুলারের ব্যায়ামের বহুল প্রচলন হয় তা হইলে উপকার হবে।

মানুষের দৈনন্দিন কাজ করেই সন্তুষ্ট বোধ করলে চলবে না। এই সব কাজকর্মের যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ অর্থাৎ আত্মবিকাশ সাধন—সে কথা ভুললে চলবে না। কাজটাই চরম উদ্দেশ্য নয়; কাজের ভিতর দিয়ে চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করতে হবে। মানুষকে অবশ্য নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রবৃত্তি অনুসারে একদিকে বৈশিষ্ট্য লাভ করতে হবে; কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মূলে (specialization) একটা সর্বাঙ্গীণ বিকাশ চাই। যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় নাই সে অন্তরে কখনও সুখী হতে পারে না; তার মনের মধ্যে সর্বদা একটা শূন্যতা বা অভাব-বোধ শেষ পর্যন্ত রয়ে যায়। এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য চাইঃ—(১) ব্যায়াম-চর্চা (২) নিয়মিত পাঠ (৩) দৈনিক চিন্তা বা ধ্যান। কাজের চাপে মধ্যে মধ্যে এসব দিকে দৃষ্টি থাকে না বা দৃষ্টি থাকলেও সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপ কমলেই আবার এই সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দৈনিক কাজকর্ম করে নিশ্চিন্ত হলে চলবে না; তার মধ্যে ব্যায়ামের সময় এবং লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণারও সময় করে নিতে হবে। এই তিনটি অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য মানুষ যদি অন্ততঃপক্ষে প্রতিদিন দেড় ঘন্টা বা দু' ঘন্টা সময় দিতে পারে, তা হলে খুব উপকার হবে। মুলার বলেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন পনর মিনিট করে তাঁর উপদেশানুসারে ব্যায়াম করে তা হলেই যথেষ্ট। তারপর মানুষ যদি প্রতিদিন পনর মিনিট করে নির্জনে চিন্তা বা ধ্যান করে—তবে মোট সময় লাগবে আধ ঘন্টা। এর সঙ্গে যদি আর এক ঘন্টা লেখাপড়ার জন্য রাখা যায় (খবর-কাগজ পড়া নয়—খবর-কাগজ পড়বার সময় আলাদা ধরতে হবে)—তবে দিনের মধ্যে মোট সময় লাগবে দেড় ঘন্টা। অন্ততঃ পক্ষে এই দেড় ঘন্টা সময় করে নিতে হবে—তারপর "অধিকন্তু ন দোষায়"—যত বেশী সময় দিতে পার—তত ভাল। প্রত্যেককে নিজের সুবিধা অনুসারে এই সময় করে নিতে হবে।

ধ্যান-ধারণার বিষয়ে আমি বোধ হয় পূর্ব পত্রে কিছু লিখেছি—তাই সে সম্বন্ধে এখানে আর লিখলাম না। বইগুলির নাম আমি এই পত্রে দিচ্ছি। প্রথমে যে বইগুলি সমিতির লাইব্রেরীতে পাবে তার নাম দিচ্ছি—তারপর অন্যান্য বইয়ের নাম দিচ্ছিঃ

(ক) ধর্ম সম্বন্ধীয়

(১) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'; (২) 'ব্রহ্মচর্য'—সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য; ঐ—রমেশ চক্রবর্তী; ঐ—ফকির দে; (৩) 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'—শরৎ চক্রবর্তী; (৪) 'পত্রাবলী'—বিবেকানন্দ; (৫) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'—বিবেকানন্দ; (৬) 'বক্তৃতাবলী'—বিবেকানন্দ; (৭) 'ভাববার কথা'—ঐ; (৮) 'ভারতের সাধনা'—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ; (৯) 'চিকাগো (Chicago) বক্তৃতা'—স্বামী বিবেকানন্দ।

(খ) সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতিঃ—

(১) 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী'—(বসুমতী সংস্করণ); (২) 'বাঙ্গলার রূপ'—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী; (৩) 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী'; (৪) নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'রৈবতক' ও 'পলাশীর যুদ্ধ'; (৫) 'যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী'; (বসুমতী সংস্করণ); (৬) রবি ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী,' 'চয়নিকা,' 'গীতাঞ্জলি', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা'; (৭) ভূদেববাবুর 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ'; (৮) ডি এল রায়ের 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'রাণা প্রতাপ'; (৯) 'ছত্রপতি শিবাজী'—সত্যচরণ শাস্ত্রী; (১০) 'শিখের বলিদান',—কুমুদিনী বসু; (১১) রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল'; (১২) সত্যেন দত্তের 'কুহু ও কেকা' (কবিতা-গ্রন্থ); (১৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনচরিত'; (১৪) 'রাজস্থান' (বসুমতী সংস্করণ); (১৫) 'নব্য জাপান'—মন্মথ ঘোষ; (১৬) 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'—রজনীকান্ত গুপ্ত; (১৭) উপেনবাবুর 'নির্বাসিতের আত্মকথা' ও অন্যান্য পুস্তক; (১৮) 'কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস'—উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুপাঠ্য তিন আনা সংস্করণের ভারতের অনেক মহাপুরুষের ছোট ছোট জীবনী পাবে।

এই বই-এর তালিকা যথেষ্ট। অন্ততঃ পক্ষে এক বৎসরের খোরাক এর মধ্যে পাবে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলি।

প্রাথমিক শিক্ষার সহিত উচ্চ শিক্ষার একটা বড় প্রভেদ এই যে প্রাথমিক শিক্ষায় নূতন facts শেখাবার চেষ্টাই বেশী প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষায় নূতন facts যেরূপ শিখাতে হয় তার সঙ্গে সঙ্গে reasoning faculty-র অনুশীলনও সেইরূপ করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ইন্দ্রিয়-শক্তির উপর বেশী নির্ভর করতে হয়, কারণ তখন চিন্তা করবার বা মনে রাখার শক্তি ভাল রকম জাগে। সেইজন্য কোনও বিষয় শেখাতে গেলে যেমন, গরু, ঘোড়া, ফল, ফুল, সেই জিনিষগুলি চোখের সামনে না ধরলে শেখান মুস্কিল। উচ্চ শিক্ষায় এমন বিষয় ও বস্তু না দেখেও নিজের চিন্তাশক্তির বলে তা বুঝতে পারে। আর একটা কথা—শেখাবার সময়ে যত বেশী ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেওয়া যায়—তত সহজে শেখান সম্ভব। বাঁশী বা কোনও রকম বাজনা সম্বন্ধে যদি কিছু বোঝাতে চাও—তবে ছাত্র যদি জিনিষটা চোখে দেখে, হাতে স্পর্শ করে এবং বাজিয়ে তার আওয়াজ কানে শোনে, তবে সেই বিষয়ে তার জ্ঞান খুব শীঘ্র লাভ হবে। কারণ দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি এবং শ্রবণশক্তি সে এক সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। কোলের শিশু যে-কোন জিনিষ দেখা মাত্র স্পর্শ করিতে চায় এবং মুখে দিতে চায়—তার কারণ এই যে, শিশু সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে চায়। অতএব প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে আমরা যদি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান জন্মাতে পারি তবে ফললাভ খুব শীঘ্র হবে। পাটীগণিত শেখাবার সময়ে শুধু মুখস্থ না করিয়ে যদি কড়ি, marble অথবা ইটপাথরের টুকরো দিয়ে আমরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির উদাহরণ দেখাতে পারি তবে সেই সব জিনিষ শিশুরা খুব শীঘ্র শিখতে পারবে।

আর একটা বড় কথা—শুধু মানসিক শিক্ষা না দিয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা চাই। পুতুল তৈয়ারী করা, ছবি আঁকা, রঙের ব্যবহার, সহজ গান শিক্ষা—এ সবের ব্যবস্থা করা চাই। ইহার দ্বারা শিক্ষাটা যে শুধু সর্বাঙ্গীণ হবে তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়ারও বিশেষ উন্নতি হবে। পাঁচরকম জিনিষ শেখাতে পারলে ছেলেদের মনটা সজাগ হয়, বুদ্ধি বাড়ে, লেখাপড়ায় মন লাগে—এবং লেখা-পড়ার নাম শুনলে ভীতির উদ্রেক হয় না। পাঁচরকম জিনিষ না শিখে যদি কেবলি মুখস্থ ক'রে লেখা-পড়া শিখতে আরম্ভ করে, তবে সে লেখা-পড়ার মধ্যে রস পায় না, লেখা-পড়াকে ভয় করতে শেখে এবং তার বুদ্ধি বিকশিত হয় না। শিশুর চোখ, কান, হাত, জিহ্বা,

নাক যদি উপভোগের এবং জানবার বস্তু পায়, তবে এই সব ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে, এর ফলে মনেও বুদ্ধি জাগরিত হয় এবং সকল রকম জ্ঞান সংগ্রহের ফলে লেখা-পড়ায় সে রস পায়। Manual training না হ'লে শিক্ষার গোড়ায় গলদ রয়ে যায়। নিজের হাতে কোনও জিনিষ প্রস্তুত করলে যেরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, সেরূপ আনন্দ পৃথিবীতে খুব অল্পই পাওয়া যায়। সৃষ্টির মধ্যে গভীর আনন্দ নিহিত রয়েছে। সেই Joy of Creation শিশুরা অল্প বয়সেই উপভোগ করে যখন তারা নিজের হাতে কোনও বস্তু তৈয়ারী করে। বাগানে বীজ পুঁতে গাছের সৃষ্টির দ্বারাই হোক অথবা নিজের হাতে পুতুল তৈয়ারী করেই হোক, যে কোন বস্তু নূতন করে সৃষ্টি করতে পারলে শিশুরা গভীর আনন্দ উপভোগ করে। যে সব উপায়ে ছাত্রেরা এই আনন্দ অল্প বয়সেই উপভোগ করতে পারবে তার ব্যবস্থা করা চাই। এর দ্বারা তাদের originality বা ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুবিধা হবে এবং লেখা-পড়াকে ভয় না করে তারা উপভোগ করতে শিখবে। বিলাতে অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রেরা বাগানের কাজ শেখে, ব্যায়াম-চর্চা করে, drill করে, পড়ার মাঝখানে খেলাধূলো করে, গান-বাজনা শেখে, route march করে পথে পথে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়, clay-modelling (মাটি দিয়ে পুতুল প্রভৃতি তৈয়ারী করা) শেখে, গল্পচ্ছলে নানা বিষয় এবং নানা দেশের কথা শেখে। গল্পচ্ছলে শেখান সব চেয়ে বেশী দরকার। ছাত্রেরা যেন না বুঝতে পারে যে তারা লেখা-পড়া শিখছে, তারা যেন অনুভব করে যে তারা গল্প শুনছে অথবা খেলা করছে। প্রথমাবস্থায় Text-Book-এর আদৌ প্রয়োজন নাই। গাছ-পালা, ফুল, প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন শেখাবে তখন যেন সামনে গাছপালা এবং ফুল থাকে। আকাশ, তারা প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন শেখাবে তখন মুক্ত আকাশের তলে নিয়ে গিয়ে তাদের শিক্ষা দেবে। যে জিনিষই শেখাবে তা যেন সকল ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে। যখন ভূগোল শেখাবে তখন মানচিত্র, Globe প্রভৃতি যেন থাকে, ইতিহাস যখন শেখাবে তখন সুবিধামত museum প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাবে। খুব গরীব চালেও গানশিক্ষা, Painting, Drawing প্রভৃতি শিক্ষা, Gardening শিক্ষা প্রভৃতি চাই। তা না হলে প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে ব্যর্থ। বস্তুজ্ঞানই বেশী দরকার। পাঠ মুখস্থের তত বেশী প্রয়োজন নাই।

আমি প্রাথমিক শিক্ষার Principles বা নীতি বিষয়ে কিছু বললুম। Text-Book-এর কথা ইচ্ছে করেই বলি নাই। Text-Book-এর প্রয়োজন কম এবং পাঠ্য-পুস্তক যেগুলি রাখতে হবে সেগুলির importance কম, ভাল শিক্ষক না হলে প্রাথমিক শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষার Fundamental Principles সর্বপ্রথমে শিক্ষককে বুঝতে হবে। তারপর তিনি নূতন প্রণালীতে শিক্ষা-প্রবর্তন করতে পারবেন। শিক্ষকের অন্তরের ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা শিক্ষককে ছাত্রের দিক থেকে সব জিনিষ দেখতে হবে। ছাত্রের অবস্থায় যদি শিক্ষক নিজেকে কল্পনা না করতে পারে, তবে সে কি করে ছাত্রের difficulty এবং ভুলভ্রান্তি বুঝতে পারবে? সুতরাং Personality of teacher হচ্ছে সব চেয়ে বড়। শিক্ষার প্রধান উপাদান তিনটিঃ— (১) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, (২) শিক্ষার প্রণালী, (৩) শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য-পুস্তক। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব না থাকলে কোনও শিক্ষা সম্ভবপর নয়। চরিত্রবান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া গেলে তারপর আমাদের শিক্ষার প্রণালী নির্ধারিত হয়, তবে যে-কোনও বিষয়ক পুস্তক সহজে শেখান যাইতে পারে।

* * *

আশা করি তোমাদের কুশল। ইতি—

১২৩

মান্দালয় জেল
ইং ৬।২।২৬

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিও না। আশা করি তুমি সকল প্রকার মানসিক অশান্তি দূর করিয়া প্রফুল্লভাবে সকল কর্তব্য করিয়া যাইবে। Milton বলিয়াছেন—"The mind is its own place and can make a hell of heaven and a heaven of hell", অবশ্য এ কথা কার্যে পরিণত করা সব সময়ে সম্ভব হয় না, কিন্তু আদর্শ সব সময় চোখের সামনে

না রাখিলে জীবনে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব। জীবনের কোনও অবস্থাই অশান্তিহীন নহে—এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

আমার মুক্তির কথা আমি আর ভাবি না, তোমরাও ভাবিও না। ভগবানের কৃপায় আমি এখানে মানসিক শান্তি পাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে এখানে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে পারি—এরূপ শক্তি পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। আমার শুভ ইচ্ছার কোনও প্রভাব নাই, কিন্তু বিশ্বজননীর শুভ ইচ্ছা ও আশীর্বাদ তোমাকে বর্মের মত সর্বদা আচ্ছাদন করিয়া রাখুক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আমি কি লিখিব—বিশ্বজননীতে বিশ্বাস ও ভরসা রাখিও—তুমি তাঁর কৃপায় সকল বিপদ ও মোহ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। মনের মধ্যে সুখ ও শান্তি না থাকিলে কোনও অবস্থায় (বাহিরের অভাব দূর হইলেও) মানুষ সুখী হইতে পারে না। সুতরাং সাংসারিক সকল কর্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজননীর চরণে হৃদয় নিবেদন করা চাই। ইতি—

(পরবর্তী দুইখানি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১২৪

মান্দালয়
৬।২।২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

মনে হয়, গত সপ্তাহে আপনাকে কোন চিঠি লিখি নি। আপনার উত্তরপ্রদেশ যাত্রা উপভোগ্য হয়েছে জেনে প্রীত হলাম। Council of State-এর নির্বাচনের ফলাফল, আগে থেকেই জানা থাকলেও, গভীর সন্তোষের কারণ।

শ্রীমতী দাসের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে শুনে আমি চিন্তিত।

কলকাতায় ম্যালেরিয়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে শুনে সর্বত্রই উদ্বেগ। ম্যালেরিয়া মহামারী জীবনীশক্তির ক্ষতি করে যক্ষ্মার পথ প্রশস্ত করে। আমার মনে হয় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তব্য মশক-নিধন বাহিনীকে পুনর্গঠন করা এবং ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য এক ব্যাপক অভিযান শুরু করা।

গত প্রায় দু-মাসের কবিরাজীতে আমার কতকটা উপকার হয়েছে এবং আমার ওজন কিছুদিনের জন্য ১৬১ পাউণ্ডে স্থির। আপনাকে শেষ চিঠি লেখার পর আমার হজমের গোলমাল দেখা দিয়েছে। এর কারণ আবিষ্কার করতে পারি নি। বেশী ওষুধ খাওয়া হচ্ছে এই ভয়ে, আমি কিছুদিনের জন্য ওষুধ বন্ধ রাখব, ঠিক করেছিলাম এবং সে কথা কবিরাজ মশায়কে জানিয়েছিলুম। এখন দেখছি আমাকে ওষুধ পরিবর্তন করতে হবে, এবং চালিয়ে যেতে হবে। আজ সেইমত কবিরাজ মশায়কে লিখছি। আমি বিভিন্ন রকম খাদ্য খেয়ে দেখেছি, যদি তাদের একটি আমার সহ্য হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সফল হতে পারি নি। ইতিমধ্যে আমার ওজন নেমে গিয়ে ১৫৬ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে। Inspector General of Prisons জানুয়ারীতে এখানে এসেছিলেন, এবং আমার স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে খোঁজখবর করেছিলেন। তাঁর পর, ইংলণ্ডের Commissioner of Prisons—যিনি Borstal ব্যবস্থার বিষয়ে বার্মায় এসেছেন,—আমাদের এই-খানে এসেছেন এবং আমাদের অভিযোগগুলি নিয়ে খোঁজখবর করেছেন।

কোদালিয়ায় কাজ যে সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে সে কথা জেনে আমি খুশী। কাজের দায়িত্বে কি সেই এক-ই চিকিৎসক আছেন? তিনি কেমন অগ্রসর হচ্ছেন? গভর্নমেন্ট আমাদের জানিয়েছেন যে বাৎসরিক সংশোধনের পর তাঁরা স্থির করেছেন যে Criminal Law amendment act অনুযায়ী বিনা বিচারে আটক রাখার আদেশ পুনর্বহাল থাকবে। জানি না একথা আপনাকে জানিয়েছে কি না।

আমরা সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন করেছি, এবং সাময়িকভাবে নিজেদের পকেট থেকে ব্যয় নির্বাহের জন্য অগ্রিম টাকা দিয়েছি। টাকা মঞ্জুরির আবেদন করে আমরা গভর্নমেন্টকে লিখেছি, যাতে আমাদের ক্ষতিপূরণ হয়। আশু দোল পূর্ণিমা উৎসবে, টাকা মঞ্জুরির আবেদনও করেছি। দুর্গাপূজোর হিসেব এখনও মিটিয়ে ফেলা হয় নি। গভর্নমেন্ট চান আমরা আমাদের ভাতা থেকে ৫৬০ টাকা ফেরৎ দিই। অবশ্য বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন এবং আমরা ফলের অপেক্ষায়।

হেমেন্দ্রবাবু ছাড়া অন্য কেউ কি দেশবন্ধুর জীবনী লেখার চেষ্টা করছেন? মিঃ

পৃথ্বীশ কি তাঁর সংকল্প রক্ষা করেছেন? কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়ছিলাম, যে মাদ্রাজের কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছে, শ্রী গোস্বামীর কাজটি গ্রহণ করা উচিত।

অ্যাটর্নি মিঃ ও সি গাঙ্গুলী ও শিল্প সমালোচক ও সি গাঙ্গুলী কি একই ব্যক্তি? যদি তা-ই হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই একজন বহুমুখী প্রতিভাধর পুরুষ।

আপনি কি বুক কোম্পানীকে বলতে পারবেন যে যদি তাঁদের সর্বশেষ কোন বই-এর তালিকা থাকে তাহলে আমাকে যেন একটা পাঠায়?

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। একথা শুনে আমি আনন্দিত, এমন কি বিস্মিত হয়েছি যে অশোক একজন দক্ষ সুতো-কাটিয়ে হয়ে উঠেছে।

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১২৫

মান্দালয় জেল

৭।২।২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

জানতে পারলাম, পরের বুধবার কিংবা বৃহস্পতিবার ছোটদাদা এখানে আসছেন। জানি না, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা কোথায় হবে, এখানে না রেঙ্গুনে। একদিক থেকে বিচার করলে রেঙ্গুন যাওয়াই বাঞ্ছনীয়—যদিও জায়গাটি আমি পছন্দ করি না—কারণ, আমাকে যিনি পরীক্ষা করেছিলেন সেই কর্নেল কেলসাল সেখানে থাকবেন, এবং সেখানে কথাবার্তা হতে পারে।

আমার মনে হয় যে কমিটি, ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। শুনে আমি দুঃখিত হলাম। নিভন্ত আগুন আবার জ্বালিয়ে কি লাভ? আশা করছি কর্পোরেশন এক উদার মনোভাব গ্রহণ করবে—বিশেষতঃ যখন বর্তমান কর্পোরেশন কয়েকদিন পরেই ভেঙ্গে যাবে।

আমার ওজন কমে হয়েছে ১৩৮ পাউন্ড। অন্যান্য লক্ষণ আগের মতই।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল।

আমাদের জানানো হয়েছে যে, অরডিন্যান্সের অধীনে বিনা বিচারে আটক রাখার আদেশ, ১৯২৫ সালের ২রা জানুয়ারী থেকে দু-বছর অতিক্রম করার পরেও বলবৎ থাকবে।

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(বিভাবতী বসুকে লিখিত)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

১২৬

মান্দালয় জেল

১২।২।২৬

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার চিঠি অনেকদিন হলো পেয়েছি। অশোক এত ভালো সুতা কাটতে শিখেছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আশ্চর্য যে হই নাই তা বলতে পারি না। বস্তুতঃ সুতা কাটা এত সহজ যে, আমার মনে হয় অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরাও শিক্ষা পেলে কাটতে পারে। আসাম অঞ্চলে একটা রীতি প্রচলিত আছে যে বিবাহের সময় কন্যার পক্ষে খুব ভাল সুতা কাটা জানা চাই—আমাদের মধ্যে যেমন এক সময় খুব ভাল রান্না জানার প্রথা ছিল। গোরা, অরুণা প্রভৃতি কেন সুতা কাটে না? তারা অবসর নিশ্চয় যথেষ্ট পায়।

আমার মনে হয় যে একবার যদি নিজের হাতে কাটা সূতার কাপড় কেহ চোখে দেখে তা হ'লে তার সূতো কাটার উৎসাহ খুব বেড়ে যাবে। নিজের হাতের রান্না যেমন মিষ্টি লাগবেই লাগবে—নিজের হাতে কাটা সূতার জামাকাপড়ও সেরূপ ভাল লাগবেই লাগবে।

ভগবানের ইচ্ছায় আজকাল আমার প্রায় প্রত্যেকটি চিঠির কয়েক লাইন কাটা হয়ে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়। তার অর্থ বোধ হয় আপনারা বুঝতে পারেন।

আপনার চিঠি পাবার পূর্বেই এখানে পায়রার আড্ডা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর মধ্যে একটি পায়রা এর মধ্যেই একটা হুলো বেরালের উদরস্থ হয়েছে। এখানে কোর্ট বসিয়ে বেরালের বিচার করা হ'ল। খাবার দিয়ে রাত্রে ফাঁদ পেতে বেরালকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমে কথা উঠে যে বেরালের ফাঁসি হওয়া উচিত। কারণ মানুষ হত্যা করলে জেল-খানায় মানুষের ফাঁসি হয়ে থাকে। তার পর কথা উঠে যে ফাঁসি দিয়ে যখন কাহারও কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন বেরাল ভোজনের ব্যবস্থা করা উচিত। এদেশে কতক-গুলো লোক অভাবে পড়লে বেরাল খেতে আপত্তি করে না—সেরূপ কয়েদী জেলের মধ্যে আছে। জেলখানায় কয়েদীদের পক্ষে যখন মৎস্য-মাংস দুষ্প্রাপ্য, তখন তাহারা একটা বেরাল পেলে রান্না করে খেতে প্রস্তুত হতে পারে—এরূপ প্রস্তাব একজন ভদ্রলোক করলেন। সর্বশেষে হঠাৎ সকলের মধ্যে বৈষ্ণব ভাব জেগে উঠল এবং বেরালকে বস্তায় বন্ধ করে বনবাসে পাঠাবার হুকুম জারি করা হয়ে গেল।

প্রায় একমাস কাল মুরগী ডিমে তা দিয়ে, ডিম ফুটে ছানা বাহির হ'ল। ইয়াঙ্কা ছিলেন সেই সব মুরগী দেখা শোনার কাজে। গোড়া থেকেই ইয়াঙ্কা প্রভু ডিম সরাতে আরম্ভ করলেন। যেখানে ডিম হয় ৫।৬টা সেখানে ঘরে উঠে মাত্র ২।৩টা। বাকী কয়টা তার কৃপায় অদৃশ্য হয়। যেদিন ধরা পড়লেন, সেদিন একেবারে ন্যাকা। তার বয়স ৭১ বৎসর কিন্তু পেটটা অতিশয় বড়। অনেকে বলেন যে তিনি ভোলানাথের অবতার; কারণ পেটটা একেবারে মহাদেবের মত। ইয়াঙ্কার কৃপায় প্রত্যহ মুরগীর ছানা মরতে আরম্ভ করল। ১০।১২ থেকে দাঁড়াল তিনটা। সেগুলি এখনও পর্যন্ত জীবিত আছে। বোধ হয় মরবার আর আপাততঃ আশা নাই। একদিন তার অযত্নের দরুন চিল এসে ছোঁ মেরে একটি মুরগীর ছানা নিয়ে গেল। সকাল বেলা যখন ধরা পড়ল তখন ইয়াঙ্কা সাধু সেজে বল্লেন, "মুসীতু" অর্থাৎ "ছিল না"। অনেক ধমকা-ধমকির পর সত্য কথা স্বীকার করলেন।

কিন্তু আসলে ইয়াঙ্কা লোক মন্দ নয়। সে বুঝেছে যে জগতে সার সত্য হচ্ছে পেট। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং"—পেট ঠাণ্ডা হলেই জগৎ সন্তুষ্ট হয়। এবং পেটের জন্য সে কোনও কাজ করতে পশ্চাৎপদ হয় না। বুদ্ধের স্তব বর্মা ভাষায় সে বেশ বলতে পারে—তার কাছ থেকে আমি সে স্তব শুনে শিখেছি। যখন ফিরব তখন আপনাদের সকলকে সে স্তব শোনাব।

বাঙ্গলা দেশ থেকে চারজন কয়েদীকে এ জেলে বদলী করে আনা হয় আমাদের কাজকর্ম করার জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে কাজের লোক মাত্র একজন। তার উপরেই রান্না-ঘরের ভার। এখানে এত রকম লোক দেখতে পাওয়া যায় যে তাতে আনন্দ যেমন পাওয়া যায়—শিক্ষাও সেরূপ হয়।

কবিরাজী ঔষধ খেয়ে প্রায় দুই মাস বেশ উপকার পেয়েছিলাম। এখন বোধ হয় ঔষধ বদলাতে হবে কারণ বিশেষ সুবিধা বোধ হয় না। গরমও পড়তে আরম্ভ করেছে—সাত-সকালেই যত গণ্ডগোল। যাক্ দিনগুলি কেটে যাবে তাতে সন্দেহ নাই। আমার চিঠি-গুলি আপনি রেখে দেবেন এবং মেজদাদাকে বলবেন রেখে দিতে।

আশা করি ওখানকার সকল খবর ভাল। আমি মেজদাদাকে লিখছি চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতের জন্য মাষ্টার ছেলেমেয়েদের জন্য রাখতে। তাঁর মত কি হবে জানি না—তবে আমি এই দুই জিনিষের অভাব নিজের জীবনে বোধ করি। সেইজন্য ছেলেমেয়ের সুশিক্ষা হ'লে সুখী হব।

সরস্বতী পূজা আমরা এখানে করেছিলুম। পূজার খরচ নিয়ে আমাদের সহিত কর্তৃপক্ষের গণ্ডগোল চলেছে। দুর্গাপূজার টাকা ও সরস্বতী পূজার টাকা এখনও সরকার দেয় নাই। আমি কয়েকটি কাগজ এর সহিত পাঠাচ্ছি—তার থেকে বুঝতে পারবেন যে আমাদের সংক্রান্ত খরচ মঞ্জুর করবার ভার বাঙ্গলা সরকারের উপর—বর্মা সরকারের উপর নয়। বর্মা সরকার বলেন যে খরচের ভার বাঙ্গলা সরকারের উপর এবং বাঙ্গলা কাউন্সিলে সরকারের পক্ষ হতে বলা হয়েছিল যে সব খরচ মঞ্জুর করে বর্মা সরকার।

এই কাগজগুলি হতে বুঝতে পারবেন যে পূজার খরচ নামঞ্জুর করেছে বাঙ্গলা সরকার। এই কাগজগুলি আমরা বর্মা সরকারের নিকট পাঠিয়েছি।

ইতি—
শ্রীসুভাষ

(পরবর্তী ৩টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১২৭

মান্দালয় জেল
১৪।২।২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

কিছুদিন হল আপনাদের কোন সংবাদ নেই। আশাকরি সকলেই ভাল আছেন।

কিছুদিন আগে কবিরাজ মশায়কে লেখা একটি চিঠিতে, আমি অত্যধিক ওষুধ সেবনের ভয়ে, কিছুদিনের জন্য তা বন্ধ রাখার কথা লিখেছিলাম। তাঁকে লেখার পর থেকে, আমার হজমের চূড়ান্ত গোলমাল দেখা দিয়েছে। এর কারণ বোধহয় এই যে আবার গরম বেড়েছিল। সেজন্য আবার তাঁকে লিখলাম। অনুরোধ করলাম, পুরোনো প্রেসক্রিপশন বদল করে নতুন ওষুধ পাঠাতে, কারণ পুরোনোটি আমার কোন উপকারে আসবে না। ইতিমধ্যে, এক পক্ষকাল আমি পুরোনো ওষুধ বন্ধ রেখেছিলাম। আজ সকালে নিজে ওজন নিয়েছি—১৫৫ পাউন্ড। আমার জন্য আপনার চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই

অরুণার বিবাহের দিন কবে স্থির হল? সেজদিদি কি গোরার বিবাহের ব্যবস্থাদি করতে সক্ষম হলেন? দাদা কেমন আছেন? বঙ্কুদাদা এখন ভাল আছেন জেনে ভাল লাগল। তিনি কেন পাহাড়ে যান না—যেমন কার্সিয়ঙ-এ? সেজদাদাকে আমি তাঁর চিরুনির নমুনা পাঠাতে লিখেছি। আমার মনে হয়, গোপালী তার পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। সতী কি এখন সাইকেল করে ইস্কুলে যায়, না ট্রেনেই? ইস্কুলে যাওয়া ও আসা—সাইকেলে এ এক দীর্ঘ পথ। রাঙামামাবাবু এখানে এলে তাঁকে আমি বলেছিলাম যে কাজের দিনে তিনি কোন একটি হোস্টেলে থেকে সপ্তাহ-শেষে বাড়ি আসতে পারেন। অবশ্য বিপদ এই যে, তাঁর ম্যালেরিয়া হতে পারে কারণ জায়গাটি এখনও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে নি।

আমার মনে হয় যে, ছেলেমেয়েদের জন্য ৩৮/১ নং বাড়িতে একটি ব্যাডমিন্টন কোর্ট থাকা উচিত, অন্যথায় তাদের যথেষ্ট ব্যায়াম হবে না। প্রতিটি শহরবাসীর বংশানুক্রমিক ভাবে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, এবং বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের মান বজায় রাখার কিংবা তার চাইতেও উন্নতি করার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার। শারীরিক সক্ষমতা ও জাতীয় জনকল্যাণের বিষয়ে আমি কয়েকটি সর্বাধুনিক বই পড়েছি। পড়ে, শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির ব্যাপারে আমরা যে কি পরিমাণে অবহেলা ও ঔদাসীন্য দেখাই, সে সম্পর্কে আমার চোখ কতকটা খুলে গেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ব্যাডমিন্টন একটি ভাল খেলা। আমার চাইতে বয়সে যারা অনেক ছোট, একা একা খেললে (singles) এই খেলায় তাদের প্রভূত শারীরিক ব্যায়াম হয়। আর জোড়ে জোড়ে (doubles) খেললে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। আমি আশা করি, বিষয়টি আপনি ভেবে দেখবেন।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন। আমি একরকম।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে

১২৮

মান্দালয়

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

১৭।২।২৬

আপনার ৮ই ফেব্রুয়ারীর চিঠি গতকাল হাতে এসেছে।

গত চিঠিতে আপনাকে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে লিখেছিলাম। বর্তমানে সংযোজন করার মতন কিছু নেই। রক্ত পরীক্ষা করে কোন লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না, তবুও

আপনার উপদেশ আমি বিবেচনা করে দেখব। কিছুদিন আগে একবার আমার প্রস্রাব পরীক্ষা করা হয়েছিল, সুগার আছে কি না দেখার জন্য—ফল হয়েছিল নঞর্থক। জেল হসপিটালে যে পরীক্ষা হয়, তা কতখানি নির্ভরযোগ্য আমার জানা নেই। তবু আমি আর একবার পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারি।

প্রায় পনেরো দিন হল, মাকে কিছু লিখিনি। দিদি কেমন আছেন? কিছুদিন যাবৎ আমি তাঁর কোন খবর পাই নি। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। কাণ্ডী-কাকা এখন কোথায়? সেখানে কি তিনি একা, না সপরিবারে? প্র্যাকটিশের শুরুতেই তিনি ভাল করছেন জেনে খুশী হলাম। আরও বেশী লোক যদি দন্ত চিকিৎসায় যায়, তবু প্র্যাকটিশের প্রচুর ক্ষেত্র উপযুক্ত থাকবে। আমি একপ্রকার।

আপনার স্নেহের
সুভাষ।

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১২৯

মান্দালয়
২২।২।২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

মনে হয়, ইতিমধ্যে আপনার গত চিঠির উত্তর আমি দিয়েছি। আপনার শেষ চিঠি পাওয়ার পর, আমি যে ক্রিমি পরীক্ষা করিয়েছি, সে কথা আপনাকে জানিয়েছি কি না মনে নেই। কিন্তু ফল এবারও নঞর্থক। অন্যান্য পরীক্ষাগুলো অচিরেই করিয়ে নেব।

ওষুধের বিষয়ে কবিরাজ মহাশয়ের নির্দেশ ও তাঁর ওষুধ পাওয়ার অপেক্ষায় আছি। জানি না, আমার চিঠি তাঁর কাছে আদৌ পোঁছেছে কি না।

বাবার কাছ থেকে কিছুদিন হল কোন চিঠি পাই নি। তিনি কেমন আছেন? নতুন-মামাবাবুর সম্বন্ধেও কোন খবর জানি না। তিনি কি বরাহনগরে আছেন, না ন'মামাবাবুর সংগে? অফিসে যেতে কি তিনি সক্ষম? নতুনদাদা কেমন আছেন? কয়েকদিন আগে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলাম, কোন উত্তর মেলে নি। আগামী সপ্তাহে মায়ের চিঠির উত্তর দেব। আশা করব, ইতিমধ্যে তিনি দুশ্চিন্তায় থাকবেন না।

কয়েকদিন আগে আমি যে সাইকোলজি বইগুলি চেয়েছিলাম, আশা করি আপনি সেগুলি পাঠাবেন।

ইচ্ছা ছিল আরও বেশী লেখার।

আপনারা সবাই আছেন কেমন?

আপনার স্নেহের
সুভাষ।

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(জানকীনাথ বসুকে লিখিত)

১৩০

মান্দালয়
৮।৩।২৬
সোমবার

শ্রীচরণেষু বাবা,

হয়ত আপনি এতদিনে জেনেছেন যে এ মাসের ৪ তারিখে আমরা অনশন ভংগ করেছি। আমরা সকলেই দুর্বল কিন্তু এমনিতে সুস্থ। হৃত-শক্তি পুনরুদ্ধার করতে, নিঃসন্দেহে আমাদের কয়েক দিন সময় লাগবে।

ধর্মঘটের সময় মেজদাদাকে তার পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, আমার স্বাস্থ্যের দৈনিক অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করব কি না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, এখান থেকে প্রেরিত দৈনিক টেলিগ্রাফের বিবরণী দেখে, তিনি আপনাকে রোজ খবর দিচ্ছেন। সেজন্য টেলিগ্রাফের মাধ্যমে, সরাসরি আপনাকে কোন খবর দিই নি। এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আপনি অবগত ছিলেন আশা করি।

অরুণার বিবাহের কথাবার্তা ভেঙ্গে গেছে শুনে দুঃখ পেলাম।

ক্রমশই এখানে গরম বাড়ছে।

আপনারা সকলে কেমন আছেন জানতে উদ্বিগ্ন আছি। গরমের ছুটি আপনি কোথায় কাটাবেন ঠিক করলেন?

আমার প্রণাম নেবেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ।

পুঃ—রাঙামামাবাবু এখন এখানে। তাঁর সঙ্গে আজ আমার শেষ সাক্ষাৎ হবে। আজ বিকেলে তিনি রেঙ্গুনে যাবেন এবং মঙ্গলবার জাহাজে কলকাতায়।

সুভাষ।

পুঃ—সেজদাদার চিরুনি ও দেশলাই-এর নমুনা পেয়েছি। এগুলি অবশ্যই খুব ভাল।

সুভাষ।

(ইংরেজী থেকে অনুদিত)

(পরবর্তী ৫টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১৩১

মান্দালয়
৮। ৩। ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

রাঙামামাবাবু এখন এখানে। আজ সকাল এগারোটায় ও'র সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎকার হবে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মেজবৌদিদিকে লিখেছিলাম। তারপর আপনাকে পর পর ১৭ই, ১৯শে, ২২শে, এবং ১লা মার্চ লিখেছি। ১৭ তারিখে যে চিঠি ছাড়া হয়েছে কেবল মাত্র সেটি ১৪ তারিখে লেখা। তাছাড়া অন্য চিঠিগুলি লেখার পর পরই ছাড়া হয়েছে। কোন কোন তারিখে আপনি চিঠিগুলি পেয়েছেন আমাদের জানান, আর চিঠি পেতে দেরী হলে ডি আই জি-কে লিখুন

আপনাকে আমি ২১-২-২৬, ২৫-২-২৬, ২-৩-২৬, ৩-৩-২৬ এবং ৪-৩-২৬-এ, এই টেলিগ্রামগুলি পাঠিয়েছি :

২১শে ফেব্রুয়ারী

Am on hunger strike since 18th for religious questions and other grievances— Subhas Bose, Mandalay

২৫শে ফেব্রুয়ারী

Today eighth day of hunger strike. Subhas Bose

২. ৩. ২৬

Is sending direct health report to father necessary stop Wire parents' health. Subhas

৩. ৩. ২৬

No news from Govt. regarding general question of religious worship strike continues today 3rd March fourteenth day stop all weak otherwise well.

৪. ৩. ২৬

Detenues broken fast today all well.

সি আই ডি-র মাধ্যমে আপনার টেলিগ্রাম (Mr Sarat Chandra Bose enquires how his brother Mr Subhash Bose is keeping please wire reply) এখানে সেই দিন বিকেলেই পৌঁছেছে। কলকাতা টেলিগ্রাম অফিস থেকে এটি দুপুর বারোটা চল্লিশ মিনিটে ছাড়া হয়েছে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর টেলিগ্রাম আসার কথা আমাকে পরের দিন বা তার পরের দিন জানানো হয়েছে।

শ্রীযুক্ত গোস্বামীর মুলতুবী প্রস্তাব বিষয়ে আপনার দীর্ঘ টেলিগ্রামটি আমি ২৭শে ফেব্রুয়ারী, বিকেল ৫'টায় পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি এই উত্তরটি পাঠাই: "Your telegram though weak well no anxiety stop strike continues till honourable settlement—Subhas Bose."

বাবাকে খবর জানাবেন কি না একথা জানতে চেয়ে, আমার ২ তারিখের টেলিগ্রামের যে জবাবটি আপনি পাঠিয়েছিলেন সেটি আমি ৩০ তারিখে পেয়েছি।

কলকাতা থেকে ২. ৩. ২৬ তারিখে ছাড়া আপনার টেলিগ্রাম (দুর্গাপূজার টাকার ব্যাপারে) এখানে যথাসময়ে পৌঁছেছে।

লালা লাজপত রায়, মিঃ গোস্বামী, মিঃ সেনগুপ্ত, মিঃ অমরনাথ দত্ত ইত্যাদিদেরও আমি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি:

যাঁদের কাছে পাঠিয়েছি:	টেলিগ্রাম ছাড়ার তারিখ
অমরনাথ দত্ত	২১-২-২৬, ২৫-২-২৬
টি, সি, গোস্বামী	২৫-২-২৬, ২৭-২-২৬, ৩-৩-২৬
মিঃ সেনগুপ্ত	২৫-২-২৬
লালা লাজপত রায়	২৭-২-২৬, ৩-৩-২৬

অনশন ধর্মঘট বন্ধ করার অনুরোধ করে লালা লাজপত রায় ও মিঃ গোস্বামী যৌথ ভাবে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন, ২৭. ২. ২৬ তারিখে যৌথ ভাবে তাঁদের সে টেলিগ্রামের উত্তর দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য টেলিগ্রামগুলি আলাদা আলাদা ভাবে পাঠানো হয়েছে।

আমার ৬ই ফেব্রুয়ারীর যে চিঠি আপনি ২১ তারিখে পেয়েছেন, সেটির বিষয়ে আমি খোঁজখবর করছি। পরের চিঠিতে আমার এই অনুসন্ধানের ফলের কথা লিখব।

আপনার ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২৭শে ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চের চিঠি এবং মেজ-বৌদিদির ২২ তারিখের চিঠি পেয়েছি। পরের চিঠিতে আমি সব কথা লিখব। এই-মুহূর্তে আমি আজকের ডাক ধরতে চাইছি।

আমি দুর্বল, তাছাড়া ভাল আছি।

মামার হাত দিয়ে আমি নিট্স-এর বাড়তি কপিটি এবং ধোলাই-এর জন্য শালটা পাঠাচ্ছি।

অনশনের শেষ দিনে আমার ওজন ছিল ১৩৮ পাউন্ড; আর অনশনের ঠিক আগে ১৫৫ পাউন্ড।

লালাজি ও মিঃ গোস্বামীর মতন, বন্ধুদের কাছে আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি নি।

'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা এখনও আমাদের দেওয়া হয় না।

দিয়াশলাই, চিরুনি, মশলা ও আচারের পার্শেলটি পেয়েছি। দিয়াশলাই আর চিরুনিগুলি সত্যিই ভাল।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ।

পুঃ—আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভাতার দাবী করে, আবার নতুন করে আবেদন করার কথা ভাবছি। আপনি কি বলেন?

স. চ. ব

পুঃ—আই জি প্রিজন্স-এর মাধ্যমে আমরা মৌলানা শৌকত আলির কাছে দুটি বার্তা পাঠিয়েছি। প্রথমটিতে আমাদের অভিযোগগুলির কথা আর দ্বিতীয়টিতে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মঘট বন্ধ রাখার কথা লিখেছি। প্রকৃতপক্ষে ধর্মঘট আমরা মুলতুবী রেখেছি মাত্র, সম্পূর্ণ বন্ধ করি নি।

মামাবাবুকে আমি আমাদের অভিযোগগুলির কথা বলেছি, এবং তিনি সেগুলো লিখে নিয়েছেন। দিল্লীতে হোম মেম্বারের কাছে এইসব অভিযোগ সম্বলিত একটি বৃহৎ আবেদন পাঠানো হবে। এখন আমি সেই আবেদনপত্র লিখছি।

আপনার স্নেহের
সুভাষ।

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৩২

মান্দালয়
১৩।৩।২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ছয় তারিখের চিঠি আমার কাছে ১১ তারিখে পৌঁছেছে।

অ্যাসেম্ব্লিতে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে Mr. Patterson সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব-ধারণা সত্য। তিনি দোষ ঢাকার চেষ্টা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন এবং কাজও সেইমত করেছেন। তাঁর মধ্যস্থতা করার অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে আমরা তাঁকে আমাদের কতকগুলি অভিযোগের কথা বলেছিলাম,—পাছে তিনি ফিরে গিয়ে বলতে না পারেন যে, সেখানে কোনওরকম অভিযোগ নেই। অবশ্য তিনি অভিযোগগুলি সঠিক কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছেন কি না জানা নেই।

এখন থেকে থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, তবে শীগ্‌গিরই একই রকম গরম পড়বে। এপ্রিলেই হবে প্রকৃত গরম কালের সূচনা।

অন্তত আমরা যতদূর জানি, Inspector General এখন ডুমুরের ফুল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি জানুয়ারী মাসে আমাদের বলেছিলেন যে ফেব্রুয়ারীতে আবার আসবেন। এখন মনে হয় যে খুব শীগগির তিনি এ পথ মাড়াবেন না।

বিনা বিচারে আটক রাখার নতুন আদেশটি স্বাক্ষরিত হয়েছে ১৬ই জানুয়ারী ১৯২৬, আর জারী করা হয়েছে ২৯শে জানুয়ারী। ১৯২৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী শেষ আদেশটি স্বাক্ষরিত হয়, এবং বহরমপুরে ২৫ তারিখে তা জারী করা হয়।

Nietzche-এর রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড রাঙামামাবাবুর হাত দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি, আর আমার আলোয়ানটাকে পাঠিয়েছি আরং ধোলাই-এ।

আমার চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত কাগজ-পত্রাদি যে কেন বিলি করা হয় না বা হারিয়ে যায়, আমার জানা নেই। এখানে আমার বন্ধুকে জানানো হয়েছে যে, তার চিঠির সঙ্গে আসা কাগজপত্র সেন্সর অফিসে পৌঁছেছে, কিন্তু সেগুলি আটক করা হয়েছে। আমার মনে হয় না যে, সংলগ্ন কাগজগুলি লেফাফার মধ্যে পুরে দিতে আমার ভুল হয়েছিল।

আমি কবে কবে আপনাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম সেকথা গত চিঠিতে ইতিমধ্যেই জানিয়েছি। টেলিগ্রাম বিলি করার দিনগুলির সঙ্গে এই দিনগুলি আপনি মিলিয়ে দেখতে পারেন। প্রায় সবক্ষেত্রেই টেলিগ্রামগুলি প্রথমে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে রেঙ্গুনে পাঠানো হয়েছে এবং সেখান থেকে তার করা হয়েছে। প্রথম আট-দশ দিন, কতকটা অস্বাভাবিক ভাবেই রেঙ্গুনে টেলিগ্রাম পাঠাতে দেরী হচ্ছিল। কিন্তু শেষের দিকে আর এমনটি ছিল না। কোনও না কোনও ভাবে সংবাদগুলো যদি আগে থেকেই ফাঁস না হয়ে যেত, আমার ধারণা, টেলিগ্রামগুলি রেঙ্গুন থেকে আদৌ প্রেরিত হত না।

ডেপুটি কমিশনারের কাছে আপনি কোন কোন দিন এবং সর্বমোট কয়টি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন? আপনি কি তার সবগুলোর উত্তর পেয়েছেন? তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, বাবা-মাকে এখানকার খবর না দেওয়ার কথা, তিনি যেন আপনাকে জানিয়ে দেন। তারপর থেকে তিনি আর এখানে আসেন নি, তবে জেনে আনন্দিত হলাম যে তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

গভর্নমেন্ট অনুমোদিত কাগজের তালিকা থেকে, স্থানীয় কাগজ Rangoon Daily News-এর এক টুকরো অংশ পাঠাচ্ছি। আপনি দেখতে পাবেন যে, রেঙ্গুনের খবরের কাগজে আমরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে মাত্র কতটুকু খবর পাই এবং Associated Press কিভাবে ইচ্ছা করে কিছু কাগজকে অবহেলা করে। Bengalee পত্রিকা সম্বন্ধে এটুকু বললেই চলে যে, আমরা রেঙ্গুনের খবরের কাগজে যে খবর পাই উদারপন্থীদের এই পত্রিকায় তা পাই না। জেলের চৌহদ্দির বাইরে, Bengalee-র কোন ক্রেতা আছে কি না আমার সন্দেহ হয়।

শ্রী গোস্বামী আমাদের জন্য যা করেছেন, তার জন্য আমরা সকলে যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, একথা বলাই বাহুল্য।

এখনও পর্যন্ত আমি ভাল আছি—কেবলমাত্র অনশনের দুর্বলতা আছে, যেটা ঝেড়ে ফেলতে কিছু সময় লাগবে। অনশন ভঙ্গের পর আমার ওজন কিছু বেড়ে এখন হয়েছে ১৪৩ পাউণ্ড।

অরুণার বিবাহের বিষয়ে আমার মনে হয় যে, যে সব বাধা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে রাখে, তার কিছু কিছু এখন ভেঙ্গে ফেলা উচিত। জানি না, আমার প্রস্তাবকে কিভাবে গ্রহণ করা হবে। তবে আমার ধারণা, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কায়স্থের মধ্যে অন্তর্বিবাহ চালু হওয়া উচিত। অন্যথায় সমস্যার কিভাবে সমাধান সম্ভব? সে যাই হোক, আমার মনে হয় শহরের চাইতে মফঃস্বলেই পাত্রের খোঁজ করা ভাল।

রাঙামামাবাবুর সঙ্গে আমার এক দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, আপনি তাঁর কাছ থেকেই সব কিছু জানতে পারবেন। আমি তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের অভিযোগগুলির কথা বলেছি এবং ধর্মঘট প্রত্যাহারের কারণগুলির ব্যাখ্যা যে কাগজে লেখা হয়েছে সেটি একাধিকবার পড়ে শুনিয়েছি। আশা করি তিনি, যতখানি সম্ভব, ততখানি সঠিক বিবরণ দেবেন। উপরোক্ত বিষয় সম্বলিত স্মারকলিপির কপি আমরা Inspector General of Prisons-কে পাঠিয়েছি। সেন্সর হওয়ার পর তিনি সেগুলি, মৌলানা শওকত আলির হাতে অর্পণ করবেন।

আপনার ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১লা মার্চ এবং ৬ই মার্চের চিঠি আমি যথাসময়ে পেয়েছি। ভবিষ্যতেও যদি সেন্সর একই রকম তৎপর থাকে আমার অন্তত অভিযোগ করার কোন কারণ নেই।

খাদ্য ও অভ্যাসের সঙ্গে, স্বাস্থ্যের উপর যতখানি যত্ন নেওয়া সম্ভব, নিচ্ছি। কোষ্ঠকাঠিন্য ও ঠাণ্ডা লাগা ছাড়া, বর্তমানে আর কোন অসুবিধে নেই। অবশ্য গরম যখন পড়ে গেছে তখন এক পক্ষকালের মধ্যে কি হতে পারে, আমার জানা নেই।

আপনি যেটির উল্লেখ করেছেন, Statesman-এ সেই প্রবন্ধটি আমরা দেখেছি, এবং এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কেন ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলাম, হয়ত এতক্ষণে তা আপনি জেনেছেন। কলকাতার টেলিগ্রামগুলি—বিশেষত আপনারটি আমাকে এবং আমাদের সবাইকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। প্রথমদিন মৌলানা শওকত্ আলির সঙ্গে তিন ঘন্টা আলোচনার পর আমরা তাঁকে নিবারিত করার চেষ্টা করলাম এই বলে যে, সমগ্র দেশের নামে তিনি যে আহ্বান জানিয়েছেন তাতে আমরা সাড়া দিতে অক্ষম; শুধুমাত্র বাংলার আবেদনে সাড়া দিতে পারি। বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত বার্তার মর্ম সম্পর্কে আমরা এতই সুনিশ্চিত ছিলাম যে পরের দিন সকালে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে চিঠি লিখলাম এ কথা জানিয়ে যে মৌলানা সাহেবের সঙ্গে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন নেই। বাংলার মতামতের বলে শক্তিশালী হওয়াতে আর কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারল না এবং যদিও আমাদের রূঢ় চিঠি তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল তবু তিনি নির্ধারিত সময় হাজির হলেন ও আমাদের তাঁর স্বমতে আনার জন্য বাগ্মিতা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি আবার ব্যর্থ হলেন, কিন্তু তিনি হাল ছাড়লেন না। শেষে তৃতীয় দিনের দিন অতি কষ্টে তিনি সফল হলেন। তৃতীয় দিনে এক সময়ে মনে হয়েছিল যেন সম্পূর্ণ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা চলে যাওয়ার উপক্রম করেছিলাম।

ঢাকায় লর্ড লিটনের বক্তৃতা পড়ে কৌতূহল হল। তাঁর বক্তব্য এতই অপ্রাসঙ্গিক যে তা পড়ে আমার বাংলা প্রবাদ “ধান ভান্‌তে শিবের গীত” মনে পড়ল।

আমি বইগুলি এখনও পাইনি। আশা করি সেগুলি যাত্রাপথে।

নতুন মামাবাবুর কথা জেনে দুঃখিত হলাম। মনে করেছিলাম তিনি ভালর দিকে। দাদা পুনরায় ভাল হয়ে উঠেছেন জেনে ভাল লাগল। কাণ্ডীমামার পেশা কতটা জমে উঠেছে?

আপনি তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী এমন কাউকে জানেন কি যিনি বিচারপতি Woodroffe-কে চিনতেন?

এখানে চিঠি ছাড়ার ব্যাপারে কোন দেরী হয় না। আমার এই ধারণা সুনিশ্চিত হয়েছে এই দেখে যে ডাকের দিন যখনই আমি অফিসে চিঠি পাঠিয়েছি সেগুলি যথা-সময়ে প্রেরিত হয়েছে। আপনাকে লেখা চিঠি এই অফিস থেকে নিম্নলিখিত দিনগুলিতে ছাড়া হয়েছে।—

ফেব্রুয়ারী : ১, ১০, ১৫, ১৭, ১৯, ২২। মার্চ : ১, ৮

আমার ৬ তারিখের চিঠি ১০ তারিখে এখান থেকে ছাড়া হয়েছে এবং মেজবৌদিদিকে লেখা ১ তারিখের চিঠি পাঠিয়েছি আপনার প্রযত্নে।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল। বাবা-মা কেমন আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৩৩ মান্দালয়

১৭. ৩. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনাকে লেখা ১৩. ৩. ২৬-এর চিঠি পোস্ট করা হয়েছে ১৫. ৩. ২৬-এ। চিঠিতে আমি এ কথার উল্লেখ করেছি। এখন থেকে, আমি এই পদ্ধতি অনুসরণ করব।

মামার চিঠিতে জানলাম যে লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক থেকে কিছুদিন আগে আমি যে কয়েক শ' টাকার 'ওভার ড্র্যাফ্‌ট' করেছিলাম সে নিয়ে আপনাকে জ্বালাতন করছে। এখন পর্যন্ত তারা এ বিষয়ে আমাকে কিছুই জানায়নি। টাকার অঙ্ক এতই সামান্য যে তারা ইচ্ছে করলে আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত, বিশেষত যখন তারা সুদ নিচ্ছে। আমি অবশ্য এ সপ্তাহে এ বিষয়ে তাদের চিঠি লিখছি।

Nietzch-এর রচনাবলীর অতিরিক্ত তৃতীয় খণ্ডটি আমি ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি। অনুগ্রহ করে বুক কোম্পানীকে বইটি পাঠিয়ে দেবেন।

সংগীতে ও ছবি আঁকায় ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত শিক্ষাদানের বিষয় প্রস্তাব করে কয়েকদিন ধরেই আপনাকে চিঠি লিখব ভাবছিলাম। এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে, অমির যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হলে সে শিল্পকলায় পারদর্শী হয়ে উঠবে। সংগীতচর্চার বিষয় আপনি দিলীপের সংগে আলোচনা করতে পারেন। সে বলতে পারবে কিভাবে সব চেয়ে ভাল উপায়ে ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদান সম্ভব। আমি জানি যে বাল্যকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের কিভাবে সংগীতশিক্ষা দেওয়া যায় এ সমস্যা নিয়ে সে কিছুদিন যাবৎ ভাবিত। সে নিজে একজন সুদক্ষ শিক্ষক—তার ছাত্রদের সাফল্যই এর পরিচায়ক। তবে, তার নির্দেশ গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে ছেলেমেয়েদের সংগীত বিষয়ে কতকটা অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

প্রায় মাস তিনেক আগে আমরা মান্দালয় থেকে নির্বাচিত বর্মার এম-এল-সি শ্রীযুক্ত এল কে মিটারকে এখানে এসে আমাদের সংগে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্য চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি বাংলার ডি. আই. জি-র কাছে অনুমতির আবেদন করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে বলা হয় জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। তিনি সেইমত করেন এবং তাঁর আবেদনপত্র বর্মার সরকারের কাছে পেশ করা হয় এবং সেই গভর্নমেন্ট সম্ভবত সেটি বাংলা গভর্নমেন্টের কাছে পাঠিয়েছে। আমরা এখনও পর্যন্ত কোন উত্তর পাইনি—তবে দেরী দেখে মনে হয় যে অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রসংগত উল্লেখ করি, মিঃ মিটার একজন এসিস্ট্যান্ট গভর্নমেন্ট এড্‌ভোকেট।

আশু নির্বাচনে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় আমার প্রার্থীপদের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। আমার মনে হয় না, আমি দাঁড়ালে প্রকৃতপক্ষে কোন উপকার হবে। আমি যদি আগেই একজন সভ্য হতাম সেক্ষেত্রে প্রশ্নটি হত অন্যরকম। পরবর্তী ব্যবস্থাপক সভার শাসনতন্ত্র যেরকমই হোক্ না কেন, এটি জীবন্ত হতে বাধ্য। তাই বলপূর্বক বন্দী রাখার কারণে একটি ভোটও হারানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এইমাত্র যা বলেছি, যদি আমি ইতিমধ্যেই একজন সভ্য হতাম সেক্ষেত্রে অন্যান্য সম্ভাবনাগুলি আমাকে ভেবে দেখতে হত—কিন্তু অবস্থা যা আছে তাতে মনে হয় আমার প্রার্থীপদ গ্রহণ করার না আছে কোন প্রয়োজনীয়তা, না কোন যুক্তি। উপরন্তু, যদি আমাকে জনকল্যাণমূলক কাজ ও রাজনীতির মধ্যে কোন একটিকে বেছে নিতে হয়—তাহলে হয়ত আমি বাক্‌প্রধান রাজনীতির দিকে না গিয়ে নিরহংকার অথচ কার্যকরী গঠনমূলক কাজের দিকেই ঝুঁকব। আমার প্রার্থীপদের প্রশ্ন যদি ওঠে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য আপনি জানিয়ে দিতে পারেন।

দিন দুয়েক আগে খুব অভিনব নয়, অথচ একটি মজার অভিজ্ঞতা আমাদের হল। সূর্য অস্ত গেছে এবং সন্ধ্যার ছায়া এসে নেমেছে আমাদের ওপর। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারের চেয়েও অন্ধকার, মান্দালয়ের গ্রীষ্মে সুপরিচিত ধুলোর ঝড় আবছা সুদূর

দিগন্ত থেকে উঠে এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল। পর্দা ফেলে দেওয়ার আগেই, চলমান ধুলোর আচ্ছাদন আমাদের সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে ফেলল। অতি কষ্টে পর্দা যদি বা নামানো গেল, তবু ঝড়ের তীব্র গতিবেগে সে পর্দা হাওয়ায় ভেসে সমস্ত আবহাওয়াকে গীতময় করে তুলল। পুরু আচ্ছাদনের মত ধুলো ঘরময় ছড়িয়ে রইল, এমন কি ঘরের সুদূরতম কোণ-ও বাদ রইল না। বাতাস বয়েই চলল, ছাদের টালিগুলোও সুরু করল উড়তে। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউয়ে দোলায়মান জাহাজের মত কাঠের কাঠামোটিতেও শোনা গেল গম্ভীর কর্কশ শব্দ। কাগজপত্র উড়তে লাগল, লণ্ঠনের আলো হয়ে এল নিবু নিবু, বিভিন্ন জিনিসপত্রের যেন গজিয়ে উঠল ডানা। স্বর্গের রোষ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না, করুণার বারিবিন্দু বর্ষিত হল উপর থেকে। দার্শনিকেরা বলেন, ঈশ্বরের করুণা গভীর অন্ধকারেও দীপ্যমান। সুতরাং, এটাই ত শোভন যে এই কৃপাবিন্দু অন্ধকারেই ঝরবে। পরিবেশের ঐকতান সম্পূর্ণ করতে বৈদ্যুতিক আলো যথাসময় গেল নিবে, মিল্টন-এর "Cimmerian darkness"-এ আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেললাম। বিদ্যুতের ভয়ঙ্কর ঝিলিক্ অন্ধকারকে করে তুলল দৃশ্যমান (আমি আবার মিল্টন-এর অনুগামী কারণ সেক্সপীয়ারের অপরূপ চন্দ্রালোকের বর্ণনা যতখানি সুমিষ্ট, সন্ত মিল্টনের অন্ধকারের বর্ণনা কি ততখানিই সুদক্ষ নয়?) আর অনুরাগী ভক্তের চোখে প্রকাশিত হল তমসার রাণী মা কালীর হাসির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য। (চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্টহাসি)

ধুলোর দৌরাত্ম্য পরাভূত হল, আমরা ও আমাদের দীন সম্বল হয়ে উঠলাম বৃষ্টি ও বাতাসের খেলার সামগ্রী। ইস্কুলে এইরকম একটি বৃষ্টির বর্ণনা পড়েছিলাম :

"Pitter, patter, pit, pat,
Down the window-pane" etc.

কিন্তু শার্সি ছিল না জানালায় আর খুঁটির বেষ্টনীর উপস্থিতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে টুপ্ টুপ্ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল আমাদের উপর, জামাকাপড় গেল ভিজে। হাওয়ার গতি হঠাৎ অন্য মোড় নিয়ে বইতে লাগল উত্তর দিক থেকে, যেদিকে আচ্ছাদনের চিহ্নটুকুও ছিল না। বৃষ্টির জলে স্নাত, হাড়-কাঁপানো হিমেল হাওয়ায় কাতর আমরা গুটিকতক প্রাণী জায়গা ছেড়ে নড়বার সাহস করলাম না, পাছে টেবিলে বা চৌকীতে হোঁচট খাই বা একের অন্যের মাথায় ঠোকাঠুকি লাগে। এর মধ্যেও উদ্দীপনা বজায় রেখে আমাদের গলা ছেড়ে গান গাওয়া এই প্রচণ্ড তাণ্ডবে হাস্যরসের সঞ্চার করল। যতক্ষণ না বাতি আবার জ্বলে উঠল, হাওয়ার গতি গেল মন্থর হয়ে, ততক্ষণ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলল। তারপর, আমরা কি দেখলাম? দেখলাম, বইপত্র গেছে ভিজে. জামাকাপড় থেকে টুপ্ টুপ্ করে জল ঝরছে. আর বিছানাপত্র একেবারে স্যাঁৎস্যাঁতে। আর সর্বোপরি যা দেখলেম তা হল, ঘরের মধ্যিখান দিয়ে বয়ে যাওয়া এক শীর্ণ নদীর ধারা। আমাদের একঘেয়ে জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্য আনার উদ্দেশ্যে, বিধাতা আমাদের কিছু অভিনব কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। পুরো ঘন্টা দুই ধরে আমরা ঘরের মেঝেতে জমে থাকা জল পরিষ্কার করতে এবং বই ও আসবাবপত্র মুছে ফেলতে ব্যস্ত রইলাম। রাত্রির স্নানে সতেজ হয়ে বইপত্র ও জামাকাপড়ের ত দিব্যি ঘুম হল, কিন্তু আমাদের? প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেয়াল ও পার্থিব সর্ববিধ দুর্ঘটনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার মত অবশ্য একজন ছিলেন—তিনি চীফ্ জেলার। রাত্রি দশটায় পাঠানো হল জরুরী দাবী—শুকনো কম্বল ও বিছানার চাদর পাঠানো হোক্। প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝায় ইতিমধ্যেই কাবু হয়ে থাকা এই মাননীয় ব্যক্তিটি যেন আমাদের দাবী শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জেলে তৈরী একদম নতুন কম্বল পাঠানো তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না, তাই তাঁর নিজের উদ্বৃত্ত থেকে আমাদের জন্য মোটামুটি ভাল কম্বল ও বিছানার চাদর পাঠানো হল। এই গভীর রাত্রে এ ধরনের উষ্ণ সহানুভূতি যে খুবই সাদরে গৃহীত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আমরা স্বাররক্ষীর হাতে আত্মসমর্পণ করলেম। ঘড়িতে তখন বাজে এগারোটা।

হয়ত আমার এখানেই থামা উচিত, নয়ত কবিত্ব করে ফেলব। পরের চিঠিতে আরও খবর দেব। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। কবিরাজ মহাশয়ের ওষুধের পার্শেল পেয়েছি। আমি একপ্রকার।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনুদিত)

মান্দালয়
২৬. ৩. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার এ মাসের ১৫ তারিখের চিঠি আমি ২৩ তারিখে পেলাম। এর আগে আপনার ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১লা মার্চ এবং ৬ই মার্চের চিঠিগুলি পেয়েছি।

আমার যে টেলিগ্রামটি আপনি ২৭ তারিখে পেয়েছেন সেটি এখান থেকে ছাড়া হয়েছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী, যেটি ২৭ তারিখে পেয়েছেন সেটি ২৫শে ফেব্রুয়ারী, যেটি ২রা মার্চে পেয়েছেন সেটি সেই দিন সকালে (অর্থাৎ ২রা মার্চ), যেটি ৩ তারিখে পেয়েছেন, সেটি একই দিনে (অর্থাৎ ৩রা মার্চ) পাঠানো হয়েছে। বাবা মাকে খবরটি না জানানোর অনুরোধ করে টেলিগ্রামটি করেছিলাম ২৬শে ফেব্রুয়ারী। আপনি সেটি পেয়েছেন ৭ই মার্চ তারিখে।

বিধানসভায় মিঃ গোস্বামীর মুলতুবী প্রস্তাবের ফলাফল জানিয়ে আপনি যে টেলিগ্রামটি করেছিলেন, সেটি আমি ২৭শে ফেব্রুয়ারী পেয়েছি। সম্ভবত এটি ২৫শে বা ২৬শে কলকাতা থেকে ছাড়া হয়েছিল। আমি আপনাকে একই দিনে, এই ভাষায় তার উত্তর পাঠিয়েছিলাম :

"Your telegram though weak well no anxiety stop strike continues till honourable settlement— Subhas Bose."

আমাদের সমস্ত কারাজীবনে আমরা বই-এর জন্য মাথাপিছু ২৮ টাকা পাঁচ পয়সা ভাতা পেয়েছি।

আমাদের মাদ্রাজে বদলী করা হতে পারে, কলকাতায় এই রকম একটা গুজব ছড়িয়েছে বলে "বেঙ্গলীতে" দেখলাম। দেখে উৎসাহিত বোধ করছি।

বাড়ি থেকে এখনও কোন বই পাই নি। আরও কয়েকটি বই পাঠানোর জন্য আমি 'বুক কোম্পানীকে' লিখেছি। 'বুক কোম্পানীকে' বলবেন তারা যেন আজ পর্যন্ত আমাকে যে যে বই পাঠিয়েছে তার একটি সম্পূর্ণ তালিকা পাঠায়। আমার তালিকার সঙ্গে আমি সেটি মিলিয়ে দেখতে চাই।

ধর্মঘটের পরে বাবু রমেশচন্দ্র গাঙ্গুলী ও তাঁর বাবার একটি বার্তা পেয়েছি। খুড়োকে বলবেন এটির জন্য আমার হয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে। রমেশবাবু বোধহয় আপনার ক্রীড়া-সাংবাদিক।

আপনাকে লেখা আমার চিঠিগুলো হয়ত আপনি রেখে দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে এগুলি উপকারে আসতে পারে।

আমার প্রত্যাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রাখতে অনুরোধ করে লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক-কে চিঠি লিখেছি।

মিঃ সেনগুপ্ত দেখছি তাঁর সব বক্তৃতায়, বন্দীদের "যুবক" বলে অভিহিত করছেন। ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই, এবং পঞ্চাশ বছর বয়সেও আমাকে "যুবক" বলে চিহ্নিত করা হলেও আমি খুশী হব। কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি এখানে এমন অনেক বন্দী আছেন যাঁরা মিঃ সেনগুপ্তর চাইতে বয়সে বড়। এই অবস্থায়, তাঁর বক্তব্যে সঠিক তথ্যটি প্রকাশিত হচ্ছে না।

আপনাদের সকলকে, অনশন ধর্মঘটের প্রতিটি কারণ জানানো সম্ভবপর নয়। যতদিন না আমরা মুক্তি পাচ্ছি, ততদিন সম্পূর্ণ ব্যাপারটি বলা হবে না। বর্তমানে এই-টুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি যে, কেউ মজা করার অভিপ্রায়ে জীবনের ঝুঁকি নেয় না, এবং গভীর বিবেচনার পরেই আমরা এ পথ গ্রহণ করেছি। মৌলানা শৌকত আলি এবং রাঙামামাবাবুকে আমরা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছি যে কলকাতা বা দিল্লীর নির্দেশ এবং উপদেশের সঙ্গে আমরা আদৌ একমত নই, এবং ধর্মঘট স্থগিত রেখে আমরা ঠিক কাজ করেছি কি না সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই। কলকাতায় গিয়ে, মৌলানা শৌকত আলি, যত কথা তাঁর পক্ষে মনে করা সম্ভব, তার সব কিছুই গুছিয়ে বলতে পারবেন বলে আশা করি।

বাবা কেমন আছেন জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। এখানে এখন যথেষ্ট গরম,

বলা চলে অগ্নিদাহ।

কয়েকদিনের মধ্যে যদি মাদ্রাজে যেতে হয়, তাহলে এ রাজ্যে আর সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে যদি কেউ দেখা করতে আসেন দয়া করে তাঁরা যেন হঠাৎ-দর্শন না দেন। আগে থেকে জানা থাকলে আমি কলকাতা থেকে তাঁদের হাত দিয়ে বই বা অন্যান্য জিনিস পাঠানোর কথা লিখতে পারি।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৩৫

মান্দালয়
৩১. ৩. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২০শে মার্চের চিঠি ২৭ তারিখে পেলাম। আপনি যে হিসেব দিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় ফেব্রুয়ারী মাসে আপনাকে লেখা আমার চিঠিগুলি পেঁছতে এক পক্ষকাল করে সময় নিয়েছে। সম্প্রতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে, দিন আষ্টেকেই চিঠি আপনার কাছে পেঁছয়। আমার মনে হয় না যে চিঠি পেঁছতে সপ্তাহখানেকের বেশী সময় লাগা উচিত।

আমার ওজন এখন ১৪৬ পাউন্ড, অর্থাৎ ধর্মঘটের সময়ের চাইতে ৮ পাউন্ড বেশী। স্বাভাবিক অবস্থায় হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে মাসখানেকের বেশী সময় লাগা উচিত নয়। এখানে এত গরম পড়েছে, বিশেষত দিনের বেলায় যে, ধর্মঘটের অব্যবহিত আগে আমার যে ওজন ছিল (১৫৫½ পাউন্ড) তা ফিরে পাওয়ার আশা রাখি না।

অন্য একটি সংবাদপত্রের খবরের উপর ভিত্তি করে আমার দূরবর্তী জেলে বদলী করার খবর কিছুদিন আগে 'Bengalee'-তে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আমরা নিজেরা এ বিষয়ে কিছু শুনি নি। স্বাস্থ্যের কারণে অন্যত্র বদলীর একটি আবেদন (আমার নয়), কয়েক মাস যাবৎ সরকারের বিবেচনাধীন, তবে এ পর্যন্ত কোন আদেশ আসে নি।

গত পরশু বুক কোম্পানীকে লিখেছি কয়েকটি বই পাঠানোর জন্য।

বাবা কেমন আছেন, জানার জন্য চিন্তিত আছি। বাবার চিঠিতে জানলাম, অরুণার বিবাহের কথাবার্তা পুনরায় শুরু করা হয়েছে।

জেনে খুশী হলাম যে 'Englishman' পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলায় আমাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। আমি Chotzner J-এর কাছ থেকে কিছুই আশা করি নি, তবে 'নাই মামার চাইতে কানা মামা ভাল।' তাছাড়া আমাদের মতই জয়ী হয়েছে। Statesman-এর বিরুদ্ধে মামলার শুনানি শুরু হবে কবে?

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন।

লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম, সি· আই. ডি-র মারফৎ তিনটি বই-এর একটি পার্শেল আমি পেয়েছি। তাছাড়া আমি দুটো ধুতি, এক বান্ডিল সুতো ও কিছু পাঁপরের একটি পার্শেল পেয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, ধুতি এবং সুতো—দুটোই হাতে বোনা। আমার বিশ্বাস সুতো কেটেছে অশোক, কারণ সেরা সুতো-কাটিয়ে হিসেবে তার নাম আছে। ধুতির সুতো বোনার কৃতিত্বের অধিকারীটি কে?

গত রাত্রে শয্যা গ্রহণের কিছু পরেই হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হল। মনে হয় বাতাসের সঙ্গে আলো ষড়যন্ত্র ফেঁদেছিল—তাই যে মুহূর্তে হাওয়া হল উতলা, বাতি গেল নিবে। P. W. D. যদি-বা গত পনেরো দিন যাবৎ কাজে নেমেছে, তবে বর্মাতে টালি মেলা ভার। গত দুর্যোগের পর থেকে ছাদের অবস্থা সঙ্গীন। সুতরাং বৃষ্টি যখন পড়ল, ছাদ দিল তাকে জায়গা করে। ঘরের একাংশে বন্যা বয়ে গেল। উত্তর দিকে বেড়ার মধ্যে দিয়ে দামাল হাওয়া বৃষ্টিকে এমন ভাবে তাড়িয়ে নিয়ে গেল যে, কিছু বই ও জিনিস-পত্র গেল ভিজে। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। আর জিনিসপত্র-গুলোকে ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সরিয়ে আনতে ও ভেজা জায়গাগুলি বাসযোগ্য করে তুলতে আমাদের প্রায় ঘন্টাখানেক সময় লাগল। সম্ভবত প্রকৃতি আমাদের পরি-

বর্তনের স্বাদ দিতে চেয়েছিল—বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল ঠিকই। আমি একপ্রকার।

আপনার স্নেহে

সুভাষ।

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(গোপবন্ধু দাসকে লিখিত)

১৩৬

মান্দালয়
প্রযত্নে ডি আই জি, আই বি, সি আই ডি,
(বাঙলা)
১৩, ইলিসিয়াম রো
কলকাতা
৭. ৪. ২৬

প্রীতিভাজনেষু গোপবন্ধুবাবু,

কিছুদিন আগে আপনার ২০শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি পেয়েছি। আপনার প্রেরিত বই-এর প্রথম পার্শেলের এখনও কোন হদিশ করে উঠতে পারি নি। জেল অফিসের লোকেরা বলছে, কোন পার্শেল তারা পায় নি। দ্বিতীয় পার্শেলটি-ও পৌঁছয় নি। প্রায়ই আমি জেল-অফিসে খোঁজখবর করছি। বই না পৌঁছনোর অভিযোগ সম্বলিত, জেলকে লেখা চিঠি এখানে পৌঁছেছে। অবশ্য তার কোন উত্তর আপনি পেয়েছেন কি না জানি না। কলকাতার কোন বই-এর দোকান থেকে এবার আমি সরাসরি বই কিনতে আগ্রহী। আপনি যদি আমাকে এই খবরগুলি দিতে পারেন, আনন্দিত হব :

১) একটি ভাল উড়িয়া-বাঙলা, অথবা উড়িয়া-ইংরেজী, অভিধানের রচয়িতার নাম।

২) উড়িয়া ভাষা পড়ার জন্য একটি ভাল ইংরেজী বা বাঙলা ব্যাকরণ বই ও তার লেখকের নাম।

৩) কতকগুলি উপযুক্ত এবং আকর্ষণীয় উড়িয়া বই-এর নাম, যাতে আমি মোটামুটি পড়তে শিখলেই, সেগুলি পড়া শুরু করতে পারি।

৪) ইংরেজী, বাংলা, কিংবা উড়িয়াতে, উড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসের কোন বই-এর নাম।

৫) কলকাতা, কিংবা কটক কিংবা পুরীর কতকগুলি বই-এর দোকানের নাম ও ঠিকানা, যেখানে উড়িয়া-বই পাওয়া যাবে।

পুরী জেলার দুর্দশার বিবরণগুলি অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমার মনে হয়, এই ব্যাপারে উড়িষ্যাকে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির একটি অনুদান দেওয়া কর্তব্য। আমি যত দূর জানি, কমিটির একটি সংরক্ষিত তহবিল আছে, যার থেকে এখন খাদির কাজকর্ম চালানো হয়। দাক্ষিণ-ভারতবর্ষের বন্যার সময়ের মতন এবারেও বাবু সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (ডাঃ পি সি রায়ের সেক্রেটারী) প্রস্তাবটির বিরোধিতা করবেন বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু জনমত এবং সঙ্গে সঙ্গে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিরা প্রস্তাবটিকে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন। আমি বিষয়টি জানি বলেই এতটা আস্থার সঙ্গে লিখতে পারছি। এই অবস্থায় যতদিন আছি, ততদিন আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু করে উঠতে পারব বলে মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত দাস যদি সাধারণের পারচালনায় বিশ্বাসী হন—আমার মনে হয় তিনি এখন বিশ্বাসী—তাহলে উৎকল ট্যানারী সম্পর্কে উড়িষ্যার উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন। ঠিকমতন চালানো গেলে এটি কেবল অর্থনৈতিক দিক দিয়েই সফল হবে না, উড়িষ্যার একটি গৌরব-ও হবে। কৃষিকার্যের দিক দিয়ে উড়িষ্যা যেহেতু অত্যন্ত অনুন্নত, শিল্পের উন্নতি ব্যতীত সেহেতু তার সন্তানদের চাকরী ও খাদ্যের যোগান দেওয়া অসম্ভব। এত সংখ্যক উৎকল-বাসীকে যে দূর দূরান্তরে গিয়ে স্থায়ী হতে হয়, তার সুনিশ্চিত কারণ হল উড়িষ্যার মাটী সমস্ত জনসংখ্যাকে সাহায্য করার মতন যথেষ্ট উন্নত নয়। বর্তমান অবস্থায় বাস্তু-ত্যাগ ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধকে শিথিল করে কারণ এর ফলে পরিবার ভাঙ্গে এবং কোন রকম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নেই এই জাতীয় অস্বাস্থ্যকর অনভ্যস্ত এবং অদ্ভুত পরিবেশে বাস করতে হয়। কলকাতার অবস্থা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই একথা

লিখছি, এবং আমার সিদ্ধান্ত বোধহয় ভ্রান্ত নয়।

আশা করি আপনি অদূর-ভবিষ্যতেই কলকাতায় শৌচাগার নির্মাণের কাজ শুরু করে দেবেন।

স্কুলের বর্তমান অবস্থার কথা জেনে দুঃখিত হয়েছি।

আমার মনে হয় দুটি বৃহৎ সমস্যা এখন বাঙলা ও উড়িষ্যার সম্মুখীন। প্রথমটি নদীর, দ্বিতীয়টি সমবায় উন্নয়নের। উভয় সমস্যাই নদীকেন্দ্রিক, কিন্তু নদীর উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কত অপ্রতুল। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা নদী সম্পর্কে অত্যন্ত অল্পই জানেন, এবং সাধারণ মানুষ তদপেক্ষাও কম। সে যাই হোক, আমার মনে হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হব, আমাদের জীবনে দুর্দশাও ততদিন স্থায়ী হবে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় আমাকে নদী সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা করতে হয়েছিল। এই সমস্যা-বিষয়ে গভীর অধ্যয়নের ব্যাপারে আমি এখন বিশেষ-ভাবে চিন্তা করছি। বিদ্যাধরী নদীর ভবিষ্যতের উপর কলকাতার সমস্ত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নির্ভরশীল। কলকাতার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার সমস্যার যদিও সহজেই সমাধান করা যায়, রহস্যময়ী বিদ্যাধরী কৌশলে সমাধান এড়িয়ে যায়। বাঙলার স্যানিটারি কমিশনার মিঃ বেন্টলি হলেন এমন একজন যাঁর এই সমস্যার বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি আছে।

কেবলমাত্র সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ শুরু করা গেলেই কৃষি-উন্নয়ন এবং ম্যালেরিয়ার মতন রোগের নিরাময়করণ সম্ভব। সমগ্র রাজ্যে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক সমবায় সংগঠন গড়ে তোলা উচিত। বাঙলায় এ কাজ আগেই শুরু হয়েছে, সাফল্যও যে হয় নি, এমন নয়। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হল যে, বাঙলার মতন এখানেও ম্যালেরিয়া রোগীর একটি বড় অংশ আসলে কালাজ্বরের প্রকোপে। বেঙ্গল হেলথ্ এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে, কয়েকটি গ্রামে কাজ করার সময় আমরা এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলাম। প্রথমদিকে সরকারী জনস্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ, হেলথ এ্যাসোসিয়েশনের পরিসংখ্যানকে অবজ্ঞা করেছিল। কিন্তু এখন তারা তা স্বীকার করেছে। কলকাতা কর্পোরেশনের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে, পৌর-দাতব্য চিকিৎসালয় চালানো ছাড়াও, আমরা ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক সমবায় সমিতি, বেঙ্গল হেলথ এ্যাসোসিয়েশন, এবং কতকগুলি ওয়ার্ড হেলথ এ্যাসোসিয়েশনকে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের মতন রোগ নিরাময়ের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকি।

আশা করি আমি অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য জাহির করছি না। আমার মন থেকে কোন কিছুই বাদ যায় না। আর মনের ভিতরকার সেই খণ্ড চিত্রগুলি নিয়ে নাড়া-চাড়া করাই আমার উদ্দেশ্য।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে,

আপনার
স্নেহভাজন
সুভাষচন্দ্র বসু

পুঃ—বন্ধুদের কাছে আমার কথা বলবেন।

স. চ. ব।

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(বিভাবতী বসুকে লিখিত)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

১৩৭

মান্দালয় জেল
ইং ৯।৪।২৬

পূজনীয়া বৌদিদি,

আপনার দুইখানি পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম কিন্তু আজ পর্যন্ত উত্তর দেওয়া হয় নাই।

সেজদাদার চিরুনী ও দেশলাই পাইয়াছি। বেশ ভালই হইয়াছে। আশা করি ক্রমশঃ আরও ভাল হইবে।

এখানে খুব গরম পড়িয়াছে—দিনের বেলায় আমরা চিংড়ি মাছ ভাজার মত হই। তবে এখনও রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পড়ে; তাই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

আপাততঃ কবিরাজী ওষুধ খাইতেছি না। প্রয়োজন হইলে কিছুদিন পরে খাইব।

অশোক ও অরুণার সুতাতে বোনা দুইখানি ধুতি পাইয়াছি—বেশ হইয়াছে। সেই পার্শ্বেলে এক বাণ্ডেল পাঁপড়ও পাইয়াছি। যাহারা সুতা কাটে তাহাদের জন্য এই সুতা দিয়া কাপড় অথবা জামা করাইবেন—নিজের সুতায় তৈয়ারী জিনিস পাইলে তাহাদের উৎসাহ আরও বেশী হইবে।

জীবনটা যখন একঘেয়ে বোধ হয় তখন মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যের দরকার হয়। এই নূতনত্বের জন্যই পাখী ও পায়রা পোষা। কাল আমরা একটা টিয়া পাখী জোগাড় করিয়াছি—আগামী মাসে ময়না জোগাড় করিব।

আমার শেষ পত্রের সঙ্গে যে কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলাম—তাহা কেন পান নাই বুঝিতে পারিতেছি না। এই রকম গোলমাল মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

গোপালীর পরীক্ষা কেমন হইয়াছে জানাইবেন। অশোক এখন কোন ক্লাসে পড়িতেছে?

এ সপ্তাহে আমি মেজদাদাকে পত্র দিতেছি না। আজকাল মনে হয় যে জেলখানা আমাদের কায়েমী স্বত্ব হইয়া গিয়াছে। জেলখানা হইতে যে সহজে আমাদের কেউ তাড়াইতে পারিবে তাহা মনে হয় না।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। বাবা ও মা কেমন আছেন? আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি—
শ্রীসুভাষ

(শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১৩৮ মান্দালয় জেল
২৩· ৪· ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার এ মাসের ৫ তারিখের চিঠি ১৩ তারিখে পেয়েছি। এখানে দিন দিন গরম বেড়েই চলেছে। মনে হয় গত বছরের চাইতে তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

সময়ের আগেই ধর্মঘট প্রত্যাহারের অবশ্যম্ভাবী ফল সম্পর্কে আমার পূর্ব ধারণা সত্য প্রমাণিত।

জেনে খুশী হলাম, কলকাতার গণ্ডগোল অবশেষে মিটেছে। এই গণ্ডগোলের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারী তদন্ত অনুষ্ঠিত হবে, যেটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এটি বিচার করবে।

আপনাদের ওখানে এখন গরম কেমন? বাবা-মা এখন কোথায় এবং কেমন আছেন?

জানি না ভবিষ্যতে আপনাকে চিঠি লেখা সম্ভবপর হবে কি না। যতক্ষণ অনুমতি পাব, লিখব।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন। আমি একপ্রকার।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত)

১৩৯

Censored and Passed
স্বাঃ অস্পষ্ট
3-5-26
for D.I.G., I.B., C.I.D.
Bengal.

Mandalay Jail
[C/o D.I.G., I.B., C.I.D.
(Bengal)
13, Elysium Row, Calcutta]
ইং ২৬।৪।২৬

শ্রীচরণেষু—

মা, আপনার ৬ই ফেব্রুয়ারীর পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম—নানা কারণে উত্তর দিতে পারি নাই। আপনার নিকট হইতে পত্র পাইব—এই ভরসায় আমি পত্র দিই নাই। তবে বহুকাল পরে আপনার হাতের লেখা দেখিয়া হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু পত্র পড়িতে পড়িতে সে আনন্দ শুকাইয়া গেল। মনে হইল, হয়তো বাহিরে থাকিলে কিছু সান্ত্বনা দিতে পারিতাম। আজ প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল আমরা সকল রকমে মা-ছাড়া। কবে যে এই দীর্ঘ প্রবাসরজনীর অবসান হইবে তা শুধু ভগবানই জানেন। আমরা ক্রমশঃ যেন এই অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। বাহিরের আলোক যেন দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়িতেছে। কারাবাসের প্রথমদিকে যে বন্ধনের জ্বালা হৃদয়ে অনুভব করিতাম তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং তার পরিবর্তে এক নির্বিকার ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতেছে, কোন্ দিকে চলিতেছি তা সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদিগকে প্রবাসী করিয়া তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য সার্থক হইতেছে তাহা মন যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। তাই সর্বদা তাঁর নিকট এই প্রার্থনা করি—যেন এই সব বিপদ ও বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া আমার এই অসার, অপূর্ণ ও নীরস জীবনকে তিনি তাঁহার পানে টানিয়া তোলেন।

তিনি যে তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আমাদিগকে সকল রকমে অবলম্বনহীন করিয়াছেন তা' বুঝিতে পারি। কিন্তু এই দীর্ঘ দেড় বৎসরকাল অসহায় অবস্থায় থাকিয়াও কি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিয়াছি?

যাক্—কি বলিতে গিয়া কি বলিতেছি। কবে আবার যে আপনার শ্রীচরণের দর্শন পাইব তাহা জানি না। তবে আপনার কথা চিন্তা না করিয়া পারি না, বোধ হয় এমন একদিনও যায় না, যে দিন আপনার কথা না মনে আসে। নিজের সর্বস্ব দিয়া যদি আপনাদের কিছুমাত্র সান্ত্বনা বা সেবা করিতে পারিতাম তাহা হইলেও ধন্য হইতাম। কিন্তু তাহা বুঝি হইবার নয়।

আজ যেন কলমে আর কথা আসিতেছে না—তাই আজ এই পর্যন্ত থাক। এখন তবে আসি মা। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম জানিবেন।

ইতি—
আপনার সেবক

(সন্তোষকুমার বসুকে লিখিত)

১৪০

মান্দালয় জেল
(এপ্রিল ১৯২৬)

প্রিয়বরেষু—

শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। রাস্তার আলো ইত্যাদি বিষয়ে যা লিখেছেন, তা পড়ে স্বস্তি বোধ না করে পারিনি। আমি আনন্দিত হয়েছি বিশেষ করে আরও এই কারণে যে, আপনি বিষয়টি P. U. Committee-র কাছে পেশ করতে যাচ্ছেন এবং কোনও সন্দেহ নেই যে এটি আপনার সতর্ক মনোযোগ আকৃষ্ট করবে। আশা করি রাস্তার আলো (গ্যাসই হোক আর বিদ্যুৎ-ই হোক) পৌরসভার অধীনে আনার বিষয়টি

কর্পোরেশন সহজে ছাড়বে না, যদি না এর বিরুদ্ধে জোরালো কোন যুক্তি উপস্থাপিত হয়।[১] যদি প্রয়োজন হয়, গেজেটের পাতায় জনমত আহ্বান করবেন, সুযোগ পাওয়া গেলে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এ কাজের দায়িত্ব কোন বেসরকারী সংস্থার হাতে ছেড়ে দিতে হয় তা হলে শুধু ইংলণ্ডেই নয়, অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশেও টেণ্ডারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থির হবে আশা করি। এ কাজ সময়সাপেক্ষ, আর সেজন্যই যত শীঘ্র সম্ভব একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পৌরসভার অধীনে আনার প্রস্তাব আলোচনার কালে উপজাত জিনিসগুলিকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবার সম্ভাবনার বিষয়টি দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

নতুন সব রাস্তায়—বিশেষত যে সব অঞ্চল কর্পোরেশনের অধীনে এসেছে, সেগুলিতে বিদ্যুতীকরণের নীতি আমি আন্তরিকভাবে অনুমোদন করি। জানি না, C. E. S. Corporation-এর কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে Central office, Market ইত্যাদিতে আলোর ব্যবস্থা করলে আমাদের বিশেষ কোন সুবিধে হবে না। যতক্ষণ না খরচ কমানো যায় বা বৃহত্তর কোন সুবিধালাভ হয়, ততক্ষণ বিভাগীয় কাজে তা ব্যবহার করা সঙ্গত নয়; এর দ্বারা লাইটিং সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বেতন বৃদ্ধির দাবীকেই জোরদার করা হবে।

রাস্তার কুকুর মারবার জন্য Central Chamber Scheme বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে হয় না। বিষয়টি এখন কি অবস্থায় রয়েছে?

আশা করি আপনি ঠাণ্ডাঘর পরিকল্পনাটি সহজে ত্যাগ করবেন না। যদি দরকার মনে করেন—মাছ, মাংস, ফল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন—যন্ত্রটি বসলে তাঁরা লাভবান হবেন কি না। যদি তাঁরা লাভবান হন তা হলে বর্ধিত ব্যয় মিটাতে তা ব্যবহারের জন্য ভাড়া খাটাতে পারি। জানি না আমাদের Market Office[২] সারা মাসে যে সব খাদ্য দরকার হয়, তার গড় মূল্য তৈরী করেছেন কি না। আমার মনে হয়, মাসিক খরচের গড় হার তৈরী করে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বছরের সেই সেই মাসের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখতে হবে। এর ফলে এক নজরেই বোঝা সম্ভব হবে মূল্য বাড়ছে না কমছে। এই গড় তালিকা P. U. ও Markets Comm.-এর কাছেও পেশ করা যেতে পারে এবং গেজেটেও প্রকাশ করা চলবে। বছরের শেষে বাৎসরিক গড় মূল্য তৈরী করা সম্ভব হবে। এই মূল্যহার কর্পোরেশনের সমস্ত বাজারে চালু করা উচিত এবং Market Controller তা থেকে সারা কলকাতার জন্য সর্বনিম্ন মূল্যতালিকা স্থির করতে পারলে ভাল হয়। Market Controller-এর কর্তব্য এই গড়হার মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে দেখা; এবং বিভিন্ন বাজারে দরের কেন তারতম্য হয় এবং তা রোধের উপায় কি—তা খুঁজে বের করা। জানি না Market Controller খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি বা দ্রব্যমূল্য হ্রাসের জন্য এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কি না। এ বিষয়ে প্রথম করণীয় হবে প্রকৃত মূল্য জানা এবং ব্যবসায়ীরা যাতে অধিক মুনাফা না করতে পারেন, সেজন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা। সর্বাপেক্ষা সহজ রাস্তা হল, যে যে অঞ্চলে সে সব জিনিসের চাহিদা খুব বেশী সেই সব অঞ্চলের বাজারে বাজারে খাদ্যদ্রব্যের জোগান বৃদ্ধি করা; তাহলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে। এই জোগান ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে করা যেতে পারে অথবা কর্পোরেশনের পক্ষেও এর দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব—যদি না আইনগত কোন বাধা থাকে।

ইচ্ছা থাকলেও কি কলকাতার জন্য একটি আদর্শ Central Market তৈরী করা সম্ভব নয়, যেখানে সব রকম জিনিস[৩] পাওয়া যাবে। মাংস ও ফলের জন্য হগ মার্কেট Central Market হতে পারে। মাছের জন্য—যা এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য—কলেজ স্ট্রীট মার্কেটকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। বৈঠকখানা বাজার দুধের পক্ষে সবচাইতে

[১] দরকার হলে লাইটিং সুপারিন্টেণ্ডেন্টের হিসেব দেখতে পারেন। তাঁর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হয় নি; আলাদা বিশেষজ্ঞ দিয়ে তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। —স. চ. ব

[২] ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের বিষয়টি নিয়ে শ্রীযুক্ত এস সি রায় (ডঃ এক্স অফিসার)-এর সঙ্গে আলোচনা করাই সমীচীন হবে। এই তথ্যগুলি পরে কাজে লাগবে। কর্পোরেশনের কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির যাথার্থ্যও এর দ্বারা বিচার করা যাবে। বিলাসদ্রব্যের কথা বাদ দিয়ে, আমার মনে হয়, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যতালিকা তৈরী করাই যথেষ্ট হবে। —স. চ. ব

[৩] জিনিস বলতে আমি এখানে খাদ্যের কথাই বোঝাতে চাইছি, অন্য কোন জিনিস নয়।

ভাল Central Market হতে পারে। এ ভাবেই কলকাতার বাজারগুলি গড়ে ওঠা উচিত। যাই হোক, কলকাতার বাজারগুলি[৪] গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয়নি বলেই আমার আশঙ্কা হচ্ছে। যে রকম মনে হয় তাতে আমরা এখনও পর্যন্ত অন্ধকারেই হাতড়িয়ে মরছি।

Education Officer-কে কিরকম মনে হচ্ছে? বিভাগীয় কাজকর্ম ছাড়া তাঁকে আরও চারটি জিনিস করতে হবে: (১) বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দরুন তাঁর বিভাগের খরচের পরিমাণ এবং এই বাধ্যতামূলক পরিকল্পনা ইত্যাদিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ তৈরী করতে হবে। (২) কিন্ডারগার্টেন প্রথা ও শিক্ষার সমস্যা বিশেষতঃ শিশুদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তাকে বিশেষভাবে পরিচিত হতে হবে। (৩) বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুদের জন্য আদর্শ পাঠ্যপুস্তক তৈরী করে, উপযুক্ত লোকের দ্বারা তা লিখিয়ে নিতে হবে। (৪) শিক্ষকদের জন্য একটি Training School প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেহেতু কাজ অনেক বেড়ে যাবে সেজন্য Education Officer-এর বেতন যতদিন না অন্যান্য বিভাগের প্রধানদের সমান হয়, ততদিন বর্ধিত হারে দিতে হবে। শিক্ষা বিভাগকে একটি পূর্ণ বিভাগে পরিণত করতে অবশ্য কয়েক বছর সময় লাগবে, কিন্তু তা-ই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কলকাতার অল্পবয়স্ক গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দানের দায়িত্ব যে বিভাগের উপর, গুরুত্বের বিচারে তা অন্য কোনও বিভাগ থেকে কোনও মতেই কম নয়।

কর্পোরেশনের ব্যাংক সম্বন্ধে আমার মনে হয়, আমাদের এখনও আরও কিছুদিন এটি এড়িয়ে যেতে হবে, এবং এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

ঝাড়ুদারদের স্টোর বিভাগ কিরকম কাজকর্ম চালাচ্ছে? ঐ বিভাগের কোন খবরই আমি পাচ্ছি না।

দুটি বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কর্পোরেশনের যোগাযোগ রক্ষা করে চলা উচিত বলে মনে হয়। প্রথমটি হল কলকাতার সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্বন্ধে। দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলনের ব্যাপারে একটি শাখা-বিভাগ খোলা বিষয়ে। ইউরোপ ও আমেরিকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কোনও ধারণাই নেই। বিশেষতঃ আমেরিকা পৌরশাসনকে আলাদা একটি বিজ্ঞানরূপে স্বীকার করে নিয়েছে এবং এর নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে রাশি রাশি বই সেখানে লেখা হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে পৌরশাসনকে অন্তর্ভুক্ত করার মস্ত বড় একটা সুবিধা আছে। এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান দিতে পারবে এবং পৌরসভার কাজ কিভাবে চলে ও তার আর্থিক ব্যবস্থা কি রকম—সে সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আমরা সাহায্য করতে পারব। এ সম্বন্ধে আপনি কাউন্সিলার রমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে আমার মত এই যে, যদি বছরে একবার সম্ভব না-ও হয় তাহলে অন্তত ২ অথবা ৩ বছর অন্তর একবার পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর ফলে আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে যে, ভবিষ্যৎ ছাত্রসমাজের শারীরিক উন্নতি হচ্ছে কি অবনতি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কর্পোরেশন ও স্বাস্থ্য বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় এ কাজ সম্ভব হতে পারে।

১৬. ৪. ২৬

এ চিঠি লেখা শুরু করেছিলাম দু-মাসেরও আগে, কিন্তু এটি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ইতিমধ্যে গঙ্গা ও ইরাবতীতে অনেক জল বয়ে গেছে। এবার চিঠিটা শেষ করে ডাকে দেব।

মেজদাদার চিঠি থেকে জেনে দুঃখিত হলাম যে, কলকাতার কোন কোন অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে।

শহরে শিক্ষা সম্বন্ধীয় একটি সমীক্ষাকার্য চালাবার প্রস্তাব কর্পোরেশন অনুমোদন

[৪] কোন বাজার চালু থাকার অনুমতি দানের আগে তা কিরকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ছবি আমাদের মনশ্চক্ষে থাকা উচিত। তা না থাকলে বাজার লক্ষ্যহীন, এলোমেলোভাবে গড়ে উঠতে বাধ্য এবং এর কাজ যখন শেষ হবে তখন দেখা যাবে কোন সুব্যবস্থাই সেখানে নেই। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ক্ষেত্রে তা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে।

করেছে, এজন্য আমি আনন্দিত। গত বছরই একাজ করা উচিত ছিল তবে একেবারে না করার চাইতে দেরীতে করাও অনেক ভাল।

বিদ্যাধরীর বিষয়টি নিয়ে আপনি যেভাবে লড়ছেন তা আমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। আশা করি আপনি বিস্মৃত হবেন না যে, এ সমস্যা সমাধান করার আগে আপনাকে বিদেশ থেকে একজন যোগ্য নদী বিশেষজ্ঞকে আনাতে হবে। এখন থেকেই কেন ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন না? একজন যোগ্য ইঞ্জিনিয়র পেতে হলে কয়েক বছর না লাগলেও অন্ততঃ কয়েক মাস সময় লাগবে।

ইতিমধ্যে আমি মডেলের সাহায্যে বিদ্যাধরী সম্বন্ধে পরীক্ষার সম্ভাবনীয়তা বিষয়ে ডাঃ বেন্টলীর সঙ্গে পত্রালাপ করব যাতে লবণহ্রদ এলাকায় তার ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ বা অনুমান করা সম্ভব হতে পারে। ইউরোপে (দৃষ্টান্তস্বরূপ Mersey নদীর কথাই বলা যেতে পারে বোধহয়) এই রকম পরীক্ষাকার্য চালানো হয়েছে তাতে ভাল ফল পাওয়া গেছে। কর্পোরেশনকে মনে রাখতে হবে যে, প্রধান পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে নতুন পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার আগে বিদ্যাধরীর ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের অনুমান ভুল হতে পারে—কিন্তু এর উপরেই প্রধান পয়ঃপ্রণালীর পরিকল্পনাটি গড়ে উঠবে।

Mr. Wilkinson কি আবার ফিরে আসবেন, না কি তিনি একেবারেই দেশে চলে যাচ্ছেন? তিনি চলে গেলে আমি দুঃখিত হব।

Motor Vehicles Dept-এর নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট কিরকম কাজকর্ম চালাচ্ছেন? ওয়াছার সময় থেকে অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে কি?

ভাল কথা, কয়েক মাস আগে ৪নং ডিস্ট্রিক্ট গোখানায় জাব, ছোলা প্রভৃতি চুরির বিষয়ে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম। E. G. P. Committee-র অনুরোধেই তা পাঠানো হয়েছিল। কমিটি আমার রিপোর্টটি বিবেচনা করে দেখেছেন কি না অথবা সেটি চেপে রাখা হয়েছে—এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি?

Mr. Coats কি ফিরে এসেছেন?

Roads Dept.-কে আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে হবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। যদিও নীতিগতভাবে আমি কেন্দ্রীয়করণের পক্ষপাতী নই, তবু একথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আগামী কয়েক বছরের জন্য অন্তত Roads Dept.-কে আলাদা একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত Roads Engineer-এর অধীনে কেন্দ্রীভূত করতেই হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রশংসনীয় যোগ্যতার মান তৈরী করা সম্ভব নয়। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রগণ ও Mr. Coats এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন জানি কিন্তু কাজ না দেখিয়ে যে অর্থ আদায় করা হচ্ছে নতুন পরিকল্পনায় তা বন্ধ হওয়াই উচিত।

অনুগ্রহ করে বসন্ত মহামারীর কথাও ভুলবেন না। প্রতিবছরই একটা বিশেষ সময়ে এর প্রাদুর্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

Retrenchment Officer-এর পূর্ণ বিবরণ এর মধ্যে পেয়েছেন কি?

আমাদের Accounts Dept. আশ্চর্য যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে থাকে। একথা বলতে আমি গর্ববোধ করছি যে কখনও কখনও তাঁরা অত্যুৎসাহের পরিচয় দেন। আমি যখন কর্পোরেশনে ছিলাম তখন মাঝে মাঝেই আমাকে Chief Accountant-কে সামলাতে হয়েছে।

পুনরায় দাঙ্গা হয়েছে জেনে দুঃখিত হলাম—আমাদের দুর্ভাগ্যের পাত্র পূর্ণ হয়েছে। ভেবে আশ্চর্য হই যে জাতির অন্তরাত্মা কি চায়। দাঙ্গার প্রকৃত কারণ ও যারা একাজ ঘটিয়েছে, সে সম্বন্ধে জেল থেকে বের হবার আগে কিছু জানতে পারব বলে আশা হয় না। ভেবেছিলাম সাম্প্রদায়িক অশান্তি থেকে বাঙ্গলাদেশ মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু তা হবার নয়।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আজ এখানেই শেষ করছি। শুভেচ্ছা জানবেন।

ইতি—
আপনার সহোদরপ্রতিম
সুভাষচন্দ্র বসু

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(পরবর্তী ৭টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১৪১

মান্দালয়
৩০. ৪. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ১৭ই এপ্রিলের চিঠি ২৪ তারিখে আমার কাছে পৌঁছেছে। মার্চ মাসে আমি 'বুক কোম্পানী'কে নিম্নলিখিত বইগুলি পাঠাতে লিখেছিলাম :

১) প্রাণতোষিণী—রামতারণ ভট্টাচার্য
২) তন্ত্রসার—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়
৩) বৃহৎ তন্ত্রসার—আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ
৪) শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ গিরি
৫) শ্যামারহস্য—শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ পরমহংস
৬) তারারহস্য— " "
৭) পুরোহিতদর্শন—
৮) Shakti and Shakta—Woodroffe
৯) Woodroffe-এর তন্ত্র বিষয়ক আর একটি বই।

তাঁরা আমাকে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম বইগুলি পাঠিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে Woodroffe-এর এমন পাঁচটি বই পাঠিয়েছেন, যেগুলি আমি চাইনি। তাঁরা আমাকে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের "Principles of Tantra" বইটির দু'টি খণ্ড (ইংরেজী অনুবাদ) পাঠিয়েছেন যেগুলির দাম কুড়ি টাকা। শিবচন্দ্রের মূল বাংলা লেখাটি (তন্ত্রতত্ত্ব) আমার কাছে আছে এবং আমি সেটি পড়েছি। কেবলমাত্র অনুবাদকের মুখবন্ধের জন্য কুড়ি টাকা খরচ করে ইংরেজী অনুবাদটি কেনার কোন অর্থ হয় না। মূল বাংলা বইটির দাম মাত্র দু' টাকা। এ অবস্থায় আপনি অনুগ্রহ করে বুক কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং আমাকে জানাবেন ঐ খণ্ড দু'টি ফেরৎ পাঠাব কিনা। Woodroffe-এর যে পাঁচটি বই আমাকে পাঠানো হয়েছে সেগুলি তন্ত্র বিষয়ক নয়। তবে যেহেতু বইগুলির সর্বমোট দাম মাত্র এগারো টাকা, খুব ইচ্ছে না থাকলেও আমি সেগুলি রাখতে পারি। আমার হয়ে ইতিমধ্যেই যদি বুক কোম্পানী বইয়ের অর্ডার দিয়ে না থাকেন, তাহলে তাঁদের জানাবেন যে Woodroffe-এর আর কোন বই আমাকে না পাঠানো হয়, যদি তাঁরা ইতিমধ্যেই অর্ডার দিয়ে থাকেন তাহলে Woodroffe-এর "Shakti and Shakta" এবং তন্ত্রবিষয়ক আরও একটি বই যেন আমাকে পাঠান। আমি ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছি যে Woodroffe-এর তন্ত্রবিষয়ক বইটি (নাম বোধ হয় "Tantra Shastras") ঠিক আমার কাজে আসবে না। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে Woodroffe-এর সমস্ত বই আমাদের লাইব্রেরীর প্রয়োজন—সে কথা আলাদা।

অনুগ্রহ করে বুক কোম্পানীকে জানাবেন যে উপরিলিখিত বইগুলির মধ্যে ১, ২ এবং ৩ নম্বর আমার চাই। প্রথম এবং দ্বিতীয়টি নাও পাওয়া যেতে পারে, তবে তৃতীয়টি আছেই। বসুমতী প্রেস এ বইটি প্রকাশ করেছেন এবং তাদের বইয়ের তালিকায় আমি এটি বিজ্ঞাপিত হতে দেখেছি। গোপালী বা অন্য কাউকে বলবেন, এ ব্যাপারে বুক কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে যত শীঘ্র সম্ভব দেখা করতে।

গ্রীষ্মে আমাদের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় স্থানান্তরিত হাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

আপনি আমাকে জানাবেন এই মুহূর্তে আপনি কোন কোন বই পড়তে আগ্রহী। সেই মত এখান থেকে আমি বইগুলি পাঠাব।

রেঙ্গুন ও কলকাতার সংবাদপত্রে Chotzner-এর বিচারের রায় পড়েছি। আমি জানলাম যে ক্যাথলিক হেরাল্ডের বিরুদ্ধে আনীত মানহানির মামলার রায়ে বিচারপতি Gregory চার হাজার টাকা ও আনুষঙ্গিক মামলার খরচ ক্ষতিপূরণ হিসেবে মঞ্জুর করেছেন। উভয়ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ আশানুরূপ নয়—তবু আমাদের নীতিই জয়ী হয়েছে।

আমার মনে হয় স্টেট্‌সম্যান তাদের বিবৃতিতে লিখেছে যে আমি কলকাতা কর্পোরেশনের C. E. O ছিলাম, এখন নই। তাদের মন্তব্যের বিরুদ্ধে তথ্য সম্বলিত সাক্ষ্য হিসেবে বাংলা গভর্নমেন্ট প্রকাশিত Quarterly Civil List ও কর্পোরেশনের

বার্ষিক পুস্তিকা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

জেনে আনন্দিত হলাম যে বাবা এখন অপেক্ষাকৃত ভাল এবং অরুণার বিবাহ এই মাসেই, অর্থাৎ বৈশাখে, অনুষ্ঠিত হবে।

অশোক এখন কোন ক্লাসে পড়ে। তার হাতে বোনা সুতো নিঃসন্দেহে খুব মিহি। আমার মনে হয় সম্ভব হলে গান ও আঁকায়ও তার শিক্ষা নেওয়া উচিত।

আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন ইস্কুল পাশ করে সে কোন দিকে ঝুঁকবে?

চিরুণির সঙ্গে সঙ্গে জিবছোলা প্রস্তুতের উপদেশও আপনি সেজদাদাকে দিতে পারেন। ভারতবর্ষে তার ভালই কাটতি হবে। সেলুলয়েডের একটি ভাল জিবছোলা মান্দালয়ে দেড়-দু' টাকায় বিক্রী হয়।

ক্যাথলিক হেরাল্ডের পক্ষে কে এই ক্ষতিপূরণ দেবে? সম্পাদক মহাশয় ত এখন বিলেতে।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভালই আছেন। আমি একপ্রকার।

আপনার স্নেহের

সুভাষ

পুঃ—দক্ষিণ কলকাতা ন্যাশনাল স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের ছেলেদের জন্য একটি খেলার মাঠ চান (সম্ভবত হাজরা পার্ক)। আপনি কি তাঁদের সাহায্য করতে পারেন? C. E. O না জেলা কমিটি কার হাতে এখন বিষয়টি আছে আমার জানা নেই।

স. চ. ব

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৪২

মান্দালয় জেল

শনিবার, ১লা মে, '২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

ক্যাথলিক হেরাল্ডের বিরুদ্ধে আনীত মানহানির মামলা বিষয়ে রেঙ্গুনের পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরের কাটিং পাঠাচ্ছি। বিবাদীপক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন কি না, এই রিপোর্টে তা পরিষ্কার নয়। বাদীপক্ষের উকিল কে ছিলেন? আশা করি, মঙ্গলবার কলকাতার কাগজগুলো থেকে আমি সব প্রয়োজনীয় খবর পাব।

Statesman-মামলায় কোন পক্ষ সময় চেয়েছিলেন, তা-ও পরিষ্কার নয়। কোর্ট প্রেরিত কমিশনের পরীক্ষা কবে অনুষ্ঠিত হবে? এই মামলার সব কিছু আমি জানতে ইচ্ছুক।

বিবাদীপক্ষ কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে? লিখিত বিবৃতিতে তারা যা বলেছে, তা-ই কি অনুসরণ করবে?

কমিশন দ্বারা পরীক্ষিত হবার আগে সম্ভবত আমার উকিলদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন। যদি দরকার হয়, আশা করি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমার উকিলদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা গোপনে হওয়া বাঞ্ছনীয়, অন্যান্য আলোচনার মতন একজন সি আই ডি অফিসারের উপস্থিতিতে নয়। Statesman মামলা কার এজলাসে উঠছে?

আপনি কি পুরো গ্রীষ্মকালই কলকাতায় কাটাবেন? এবছর আপনি কেমন বোধ করছেন? অরুণার বিবাহ কবে?

বন্দীমুক্তি ত্বরান্বিত করার সবচেয়ে সহজ উপায় সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যা বলেছেন, সেটি পড়ে কৌতূহলী হলাম।

গত বছর আপনি যখন মান্দালয় এসেছিলেন, তখন কি কোন বর্মী শিল্পবস্তু কিনেছিলেন? বর্মার নিজস্ব কোন কোন জিনিস আপনার সুন্দর মনে হয়েছে?

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল। গোপালী পরীক্ষায় কেমন করেছে? আমি একপ্রকার।

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

মান্দালয়

১৪৩

৭. ৫. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

কিছুদিন হল আপনার কোন খবর পাই না। আশা করি দ্বিতীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এতদিনে থেমে গিয়ে কলকাতায় আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত ঘটনাটাই দুঃখজনক। ভয়ের বদলে সৌহার্দ্যের নীতির উপর ভিত্তি করে এবার এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করার জন্য গুরুতর প্রচেষ্টা চালানো হবে বলে আশা রাখি।

মান্দালয় ও ইনসিন জেলে বইপত্র কেনার জন্য ২০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। তবে আমাদের সঠিক অংশীদারী সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত নই।

গভর্নমেন্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য প্রতিবছরে মাথা পিছু ৩০ টাকা দিতে মনস্থ করেছেন। আদেশের প্রকৃতি এতই সর্বজনীন যে মনে হয় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। প্রকৃত লাভ হল এই যে নীতির প্রশ্নে গভর্নমেন্ট পরাজয় স্বীকার করেছেন। যথাসময়ের আগে ধর্মঘট প্রত্যাহার না করলে, ভাতার পরিমাণ হয়ত অনেক বেশী হত।

স্নানঘরে-ব্যবহারের সামগ্রী, কাগজ পত্র, স্টেশনারী জিনিস ও বিবিধ অন্যান্য ব্যবহারের জিনিস কেনার জন্য মাসিক ৭ টাকা হারে ব্যক্তিগত ভাতা বাড়িয়ে করা হয়েছে মাসিক ১৫ টাকা।

আগামী আগস্ট মাস পর্যন্ত, বিছানা-পত্র জামা-কাপড়, ইত্যাদির প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে, গড়ে মাথা পিছু ১০০ টাকার একটি অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হয়েছে। আগামী বছরে প্রাপ্য ভাতা অবশ্য বর্তমান বছরের ভাতা অর্থাৎ বছরে ২২৫ টাকার বেশী হবে না। কেবলমাত্র আমার ক্ষেত্রে এটি বাড়িয়ে বছরে ৩২৫ টাকা করা হয়েছে।

গত বছরের তুলনায় এ বছর আরও শুষ্ক যাবে বলে মনে হয়। এখনও পর্যন্ত এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি, অথচ গতবছরে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে তাপাঙ্ক নামিয়ে রেখেছিল। এর ফলে শহরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, জেলেও হয়েছে একজনের।

আপনারা সকলে কেমন আছেন? বাবা কার্সিয়ঙে কবে যাচ্ছেন? তিনি লিখেছিলেন যে, এ মাসের শেষের দিকে যেতে পারেন। নদুমামার কোন খবর আছে কি? পরীক্ষায় সে কেমন করলে?

জেনে আনন্দিত হলাম যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত, বাঙলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করছে। আমাদের চাইতে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছাত্রদের বাঙলা সাহিত্যে, আরও গভীর মনোনিবেশ করা উচিত। আমার শিক্ষায় যাকে আমি খুঁত বলে মনে করি তা হল বাঙলা সাহিত্যে আমার বিশাল অজ্ঞতা, এবং কেবল মাত্র এখনই আমি সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করছি। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য একটি রত্নভাণ্ডার—অনেক দিক থেকে আধুনিক কালের চাইতেও বেশী।

আমি একপ্রকার। এই চিঠি যখন আপনার কাছে পৌঁছবে, আশাকরি অরুণার বিবাহ ততদিনে সুসম্পন্ন।

ইতি—
আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনুদিত)

১৪৪

মান্দালয়
১৪. ৫. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার এ মাসের তিন তারিখের চিঠি ১১ তারিখে এবং ৫ তারিখের চিঠি ১২ তারিখে পেয়েছি। আপনার ১৭ই এপ্রিলের চিঠির আমি ইতিমধ্যেই জবাব দিয়েছি। বৌদিদির ২৯শে এপ্রিলের চিঠিও এসেছে।

সাম্প্রদায়িকতার ঝড় সমগ্র বাঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটিই অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক এবং চিন্তা করে দেখুন দেশবন্ধু পৃথিবী ত্যাগ করে যাওয়ার পর একটা বছরও অতিবাহিত হয় নি। আশা করি গণ্ডগোলের প্রকৃত কারণ

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁজে দেখা হবে। এই হাঙ্গামা যে নেহাতই দুর্ঘটনা নয়, তা পরিষ্কার। অস্বাভাবিক সম্পর্ক নিশ্চয়ই শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল, এবং অগ্নিকাণ্ডের জন্য দরকার ছিল একটি স্ফুলিঙ্গের। যে মানুষটি কেবল তাঁর হৃদয়ের প্রসারতা দিয়ে সাম্প্রদায়িক স্রোতকে বেঁধে রেখেছিলেন, বর্তমানে তিনি আর নেই। আমরা তাই অকূলে পাথারে।

রেঙ্গুনের খবরের কাগজে দেখলাম যে অল্ডারম্যান এবং কাউন্সিলাররা ডেপুটি মেয়রের পদত্যাগ দাবী করেছেন। তাঁর পুনর্নির্বাচনের একমাসের মধ্যেই কেন এই অভূতপূর্ব উপায় গ্রহণ করা হল জানতে উৎসুক হয়ে আছি। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সঙ্গে কি বিষয়টি সম্পর্কিত?

একদিকে আলি ভ্রাতৃদ্বয় অন্য দিকে স্বামী সারদানন্দ যখন উত্তেজক বক্তৃতা দিচ্ছেন, সাধারণ মানুষের তখন উচিত মাথা ঠাণ্ডা রাখা এবং একটি বোঝাপড়ার জন্য তৎপর হওয়া। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ব্যতিরেকে গঠনমূলক ঐক্য সম্ভব। সংস্কৃতিগতভাবে হিন্দু ও মুসলমান এতই স্বতন্ত্র যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে ঐক্য স্থাপন সম্ভব নয়।

আমার পক্ষ নিয়ে আদালতে দাঁড়াবার জন্য স্যার বি সি মিত্র এবং মিঃ সরকারকে মামলার বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে জেনে ভাল লাগল। খবরের কাগজে দেখলাম, মাননীয় বিচারপতি বাকল্যাণ্ড বর্তমান মামলায় 'বন্দী আইন' প্রযোজ্য হয়ে কি না জিজ্ঞাসা করলে, মিঃ সরকার বিষয়টি বিবেচনার জন্য সময় চেয়েছেন।

প্রতিবাদী পক্ষ কি ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, জানতে আগ্রহী হয়ে আছি। আপনি কি তার কোন আভাস পেয়েছেন? তাদের লিখিত জবাবে তারা জানিয়েছে যে তাদের বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে এবং সারগতভাবে সত্যি। তারা কি মানহানির অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে না কি কেবলমাত্র সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অফিসারদের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে সওয়াল করবে? আমার চোখে অভিযোগটিকে যুক্তিযুক্তভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ—(১) যে আমি একটি বিদ্রোহী ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর সদস্য (২) যে আমিই হলাম, এই ষড়যন্ত্রের পিছনে প্রকৃত মস্তিষ্ক ইত্যাদি। এটি অবশ্য প্রথমটিকেও বোঝায়। প্রতিবাদী পক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলতে পারে যে সরকারী পদস্থ কর্মচারীদের বক্তৃতা তাদের এই অভিযোগ স্থাপনকে সমর্থন করে—কিন্তু এমন কি তাদের মতামতের দৃষ্টিভঙ্গীর থেকেও, অভিযোগের দ্বিতীয় অংশটির কোন সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে এই ধরনের মন্তব্য করে (বিবাদের বিষয়) তারা হঠকারীর আচরণ করেছে।

আমার কাছে নালিশপত্রটি নেই কিন্তু প্রতিবাদী পক্ষ যে লিখিত অভিযোগটি উত্থাপন করেছে তার একটি কপি আছে। দয়া করে আমাকে নালিশপত্রের একটি কপি পাঠাবেন। এখানকার স্থানীয় নামজাদা আইনব্যবসায়ীরা সবাই বাঙালী বলে মনে হচ্ছে। তারা নিজেরা এমনিতে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন, তবে এই ব্যাপারে কতখানি যোগ্যতা দেখাতে পারবেন আমি জানি না। সে যাই হোক, কলকাতায় আমার আইনজ্ঞদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ রাখতে হবে, কারণ তাঁরা প্রতিবাদী পক্ষের ব্যাপারে আমার চাইতে ভাল জানবেন। আমি যদি তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায়টা জানতে পারি, হয়ত আমিও কার্যকরী উপদেশ দিতে পারব। জেরার সম্মুখীন হওয়ার আগে, আইন বিষয়ে আমার পরামর্শদাতাদের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার হওয়া প্রয়োজন। এই সাক্ষাৎকারটি অবশ্যই ব্যক্তিগত হওয়া দরকার। সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আগে থেকেই ব্যবস্থা পাকা করে নেওয়া ভাল, যাতে সাক্ষাৎকারের সময় কোন ঝামেলা না হয়। আগামী সোমবার আপনাকে আবার লিখব (আজ শুক্রবার), এবং ইতিমধ্যে আমি স্থানীয় আইনব্যবসায়ীদের সম্পর্কে আরও বিশদভাবে খবর নেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রতিবাদী পক্ষ কি কলকাতা থেকে উকিল পাঠাবে না কি আমাদেরই অনুসরণ করবে? তারা পাঠালে আমাদেরও অবশ্য পাঠাতে হবে। নিরপেক্ষতার সুনাম আছে এমন একজন উকিল দরকার নাকি যে কোন চালাক উকিল দিয়েই কাজ চলে যেতে পারে?

কি কারণে সমস্যার উদ্ভব হতে পারে বলে আমি আশঙ্কা করেছিলাম তা হল এই। বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যা কেবল কাগজে-কলমেই লেখা থাকে, কখনও বলবৎ করা হয় না। যদি সেই সব নিয়ম বলবৎ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে কোথাও না কোথাও সমস্যা দেখা দেবেই। জেলের সেলগুলিতে প্রত্যেকদিন তল্লাসি চালানো হবে, এইরকম একটি নিয়ম আছে। কিছুদিন আগে আই জি প্রিজনস্-এর

আদেশ পাওয়া গেল যে এই আইন এবার বলবৎ হবে। এই বিষয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি তাঁকে বলেছি যে এই আদেশটি অনাবশ্যক এবং অপ্রয়োজনীয়; এটি বলবৎ করা হলে অপ্রীতিকর ঘটনার সূচনা করা হবে। তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। তারপর থেকে বিষয়টি নিয়ে সম্ভবত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং আই জি প্রিজন্‌স্‌-এর মধ্যে লেখালেখি হয়েছে—কারণ এটির বিষয়ে আমরা আর কিছু শুনিনি এবং ইতিমধ্যে আইনটিও বলবৎ করা হয়নি। এছাড়া আরও দু-একটি বিষয় ছিল, যার কথা আমি পরের চিঠিতে লিখব।

এখানে প্রচন্ড গরম—কিন্তু তা নিয়ে আপনার কোন চিন্তা করার কারণ নেই। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে যখনই আমাদের কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, তখনই সেই পরীক্ষায় অক্ষত ভাবে উত্তীর্ণ হবার সামর্থ্য আমাদের থাকে। গত এক মাসের বেশী হল আমার ওজন ১৪৫ পাউণ্ডের কাছাকাছি স্থির হয়ে আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে কোন কষ্টস্বীকারের শক্তি তিনি আমাকে দিয়েছেন।

৪-এ কলেজ স্কোয়ারস্থ, 'মহাবোধি জার্নালের' ম্যানেজারকে দয়া করে বলবেন তারা যে সব বই বিক্রী করে তার একটি তালিকা দিতে এবং তালিকাটি পেলে আমার কাছে পাঠাবেন।

শ্রীযুক্তা দাশকে আমি ইতিমধ্যেই উত্তর দিয়েছি, দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছুটা দেরী হয়ে গেছে। দেশবন্ধুর একটি জীবনী লেখার জন্য আপনি কি তাঁর মনে প্রত্যয় জন্মাতে পারেন না? এর ফলে তিনি ব্যস্ত থাকবেন, মনটাও শান্ত হবে। তিনি নিজে যদি একটি বই লিখতে অসম্মত হন, তাহলে তিনি বই-এর আকারে উপকরণ সংগ্রহ করে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি লেখার দায়িত্ব নিতে পারি—যদিও, সেই মহৎ আত্মার প্রতি কতটা সুবিচার করতে পারব আমার জানা নেই।

'নারায়ণ' পত্রিকার সমস্ত সংখ্যাগুলি কি অর্থের বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব? কিংবা ধার করা? আমি এগুলি পেতে আগ্রহী। কোন কোন লোকের কাছে হয়ত এগুলি আছে, এবং চাওয়া হলে হয়ত তাঁরা ইচ্ছার সঙ্গে তা ধার দিতে পারেন। 'ফরোয়ার্ডে' একটি চিঠি লিখলে বা বিজ্ঞাপন দিলে কোন লাভ হবে?

হেমেন্দ্রবাবুর দেশবন্ধুর জীবনী কি প্রকাশিত হয়েছে? পৃথিশবাবু কবে মুক্তি পাবেন?

রেগুলেশান ১০৮ অনুসারে কলকাতার কয়েকটি কাগজের উপর নোটিশ জারি করা হয়েছে, দেখলাম। ব্যাপারটি কি এবং এখন তা কি অবস্থায়?

রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদের হট্টগোলে দেশবন্ধুর লক্ষ্য বিস্মৃত হতে চলেছে। তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্ম জনগণের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জনসাধারণের চোখে যতদিন রাজনীতি বিশালাকারে প্রতিভাত হবে, ততদিন তাঁর লক্ষ্যের প্রকৃত চরিত্রটি অনুদ্ভাসিত থেকে যাবে। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে—সাধারণভাবে বাঙলার সংস্কৃতির জগতে তাঁর কাজকর্ম—আমার মতে তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্থায়ী সম্পদ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যাঁরা তাঁর রাজনীতির অনুসারী বলে দাবী করেন, তাঁরা দেশবন্ধুর সাংস্কৃতিক লক্ষ্য সম্পর্কে একেবারেই অচেতন। অন্যদিকে, যাঁরা তাঁর সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের কথা উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁরা সর্বদাই রাজনীতি থেকে বহুদূরে বিচরণ করেছেন। এর ফলে সংস্কৃতি আর রাজনীতির মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, উভয়ের মধ্যে কোন সমন্বয় সাধিত হয়নি; যারই জন্য দেশবন্ধু অকৃত্রিম চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

আজ আমাদের কাছে যেটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় তা হল, ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্যের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বঙ্গসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সাধন করা। কেবলমাত্র এই ধরণের পুনরুজ্জীবনের উপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যতের সমাজ এবং জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন সম্ভব। এমনকি প্রাচীনকালের রচনাদির পুনরুত্থানেই আধুনিক ইউরোপের ভিত্তিপ্রস্তর রচিত হয়েছিল। স্বদেশী এবং অ-সহযোগ সত্ত্বেও, আমাদের বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতিতে এমন অনেক কিছু আছে যা বহিরাগত, এবং যার সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন কখনই সম্ভবপর নয়। এই বাড়তি জিনিসগুলি ছেঁটে ফেলে আমাদের অন্তর্মুখী হয়ে বাঁচতে হবে—এমারসন যাকে বলেছেন—"assimilating like a healthy organism all that is brought to us from outside". 'নারায়ণ' পত্রিকা এবং যে সমধর্মী দার্শনিক গোষ্ঠীর এটি প্রবক্তা—আমাদের সাংস্কৃতিক সচেতনতা পুনরুত্থানের জন্য সেটি প্রভূত চেষ্টা করেছে। তার জীবনে যদি এই ছেদ না পড়ত, আমাদের সাংস্কৃতিক

মতবাদের জগতে তাহলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যেত নিশ্চয়।

মনে হচ্ছে আমার বক্তব্য এলোমেলো হয়ে পড়ছে, এবং এখানেই আমার থামা উচিত।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন কেমন চলছে? · এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে কারা আছেন? শ্রীযুক্তা দাশ কি মিঃ হালদারের সঙ্গে বনিবনা করে থাকতে পারছেন? ভোম্বল কোথায়?

হ্যাঁ, ক্যাথলিক হেরাল্ডকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা যায় কি না, সে বিষয়ে আমিও ভাবছিলাম।

আশাকরি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমি একপ্রকার।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৪৫

মান্দালয়
১৭. ৫. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

দু-তিন দিন আগে, রেঙ্গুনের একটি খবরের কাগজে, Statesman-এর বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিষয়ে, একটি অনুচ্ছেদ লেখা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তার ভাষা এত গোলমেলে যে তার থেকে কোন কিছু বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। আমি অবশ্য এটুকু বুঝতে পারলাম যে কোর্ট বিষয়টি গভর্নমেন্টকে জানাবেন এবং মামলার শুনানী শুরু না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি মুলতুবি থাকবে।

'বুক কোম্পানী' এখনও পর্যন্ত যে বইগুলি পাঠিয়েছে, তার একটি তালিকা পেয়েছি। Neitzche-এর বই-এর বিষয়ে তাঁরা অবশ্য একটি ভুল করেছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন যে, ২৩।৯।২৫ তারিখে তাঁরা Nietzche-এর রচনাবলীর ৩, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১১, ১০ খণ্ডগুলি, ২৩।৯।২৫ তারিখে ১০, ১২, ৩ খণ্ডগুলি, এবং ২৫।১১।২৫ তারিখে, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৮ খণ্ডগুলি পাঠিয়েছেন। এইভাবে তাঁরা দ্বাদশ খণ্ড দুটি করে এবং তৃতীয় খণ্ড তিনটি করে পাঠিয়ে ফেলেছেন। আমি কিন্তু কেবলমাত্র ৩য় খণ্ডের দ্বিতীয় কপি পেয়েছি, যেটি রাঙ্গামামাবাবুর মাধ্যমে ফেরতও পাঠিয়েছি। রচনা-সংগ্রহে বই-এর সংখ্যা ১৮; আমি সর্বমোট ১৯টি খণ্ড পেয়েছি। কিন্তু তন্মধ্যে একটি ফেরৎ দেওয়ায় আমার কাছে বর্তমানে ১৮টি খণ্ডই আছে।

২১. ৫. ২৬

তাঁরা যে ভুল করেছেন, তার আরও একটি প্রমাণ আছে। এই অফিস একই সঙ্গে Nietzche-এর রচনার চারটি খণ্ড (১১, ১৫, ১৬, ১৩) এবং ১৯টি বাঙ্গলা বই পেয়েছে, যেগুলি আমাকে ঠিকমত দেওয়া-ও হয়েছে। এই বইগুলির সঙ্গে তারা তৃতীয়, দ্বাদশ এবং দশম খণ্ডগুলি পায় নি। অতএব একথা পরিষ্কার যে এই খণ্ডগুলি ১. ৯. ২৫ তারিখে প্রেরিত হয় নি; হয়েছে অনেক পরে, ২৩. ৯. ২৫ তারিখে। তাঁরা আমার কাছে যে চিঠিটি লিখেছেন, আপনার সুবিধার জন্য সেটি আপনাকে পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে কাউকে তাঁদের দোকানে গিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করে আসতে বলবেন।

সোমবার আপনাকে লিখতে পারি নি। তারপর আমি কলকাতার কাগজগুলো পেয়েছি এবং সেগুলি পড়ে Statesman মামলা এখন কি অবস্থায় সে কথা অপেক্ষাকৃত ভালভাবে বুঝতে পেরেছি। এখন একথা মোটামুটি পরিষ্কার যে তাঁরা বলবেন ন্যায্য মন্তব্য করার অধিকার তাঁদের আছে, যদিও শেষের দিকে মিঃ ল্যাংফোর্ড জেম্‌স তোত্‌লাচ্ছিলেন। মিঃ জেম্‌স যখন আশ্বাস দেন যে কেবলমাত্র ন্যায্য মন্তব্যের কথা তোলা হবে, তখন মিঃ সরকার প্রত্যাহার ক'রে নেওয়ার প্রস্তাব দেন; কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না তাই ব'লে মিঃ ল্যাংফোর্ড জেম্‌স কি ক'রে এই অসম্ভব দাবী করলেন যে আবেদনটি ক্ষতি-পূরণসহ বাতিল করে দেওয়া উচিত। মামলাটির শুনানী কবে নাগাদ শুরু হবে? বিবাদী-পক্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

তন্ত্র-বিষয়ক বই-এর সংকলক মিঃ Arthur Avalon এবং মিঃ Woodroffe একই ব্যক্তি কি না আমার জানা নেই। যদি তাই হয়, তাহলে মিঃ Avalon-এর তন্ত্র-বিষয়ক বই-এর অনুবাদ পাঠানোর জন্য 'বুক কোম্পানী'কে দোষী করা যায় না। আমি কেবলমাত্র Woodroffe-এর বই চেয়েছিলাম।

আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনেন? আমার মনে হয় বর্মার নথিপত্র থেকে আমি তাঁকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু অজ্ঞাত টুকরো খবর দিতে পারি।

সম্প্রতি এখানে দু' এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আবহাওয়া তাই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। আমার জন্মমুহূর্তের রাশি ও নক্ষত্র কি, মায়ের কাছ থেকে জেনে আপনি কি আমাকে জানাতে পারবেন? তন্ত্রচর্চা থেকে উদ্ভূত একটি সমস্যার জন্য এটির প্রয়োজন।

ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল চেয়েছিলেন যে আমাদের কাছে পাঠানো যাবতীয় কাগজ, খাতা ও বইপত্রের সঠিক হিসেব রাখা হোক্‌ এবং দৈনন্দিন অনুসন্ধান চালানো হোক্‌। তিনি বলেছিলেন আমরা যদি কঠোর বিধানের কাছে মাথা নত না করি, তাহলে বইপত্রের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাকে গত সপ্তাহেই লিখেছিলাম, আমার সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি মোটামুটি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোক, এবং বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য I. G-র কাছে পাঠানো হয়েছে। I. G আমাদের আরও জানিয়েছিলেন যে প্রয়োজন হলে জেল কোডের কোন কোন ধারা অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে (যেমন আমাদের কিছুকালের জন্য পৃথক বা একক সেলে আবদ্ধ করা হবে)। এই আদেশগুলি যথেষ্ট তিক্ততা ও বিরোধিতার কারণ হতে পারত, কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কৌশলে তেমনটি হয়নি। অবশ্য আমার মনে হয় অসন্তোষ স্তিমিত হয়ে এসেছে। এখন পর্যন্ত একটিও আদেশ বলবৎ হয়নি, কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাঁর মতামত জানিয়ে I. G-কে চিঠি দেবার পর আমরা আর কিছু শুনিনি। ইতিমধ্যে, I. G আমাদের আরেকবার দর্শন দিয়ে গেছেন, এবং ব্যবহারে ও কথায়-বার্তায় যথেষ্ট ভদ্রতা দেখিয়েছেন। সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি যে সমস্যাটির সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে গিয়েছে।

আপনি কি গ্রীষ্মে কয়েকদিনের ছুটি নেবেন? কলকাতায় এখন গরম কি রকম? মিঃ জে এন মল্লিক কবে বিলেত যাচ্ছেন? খবরের কাগজে দেখলাম যে শ্রীমতী মল্লিক তাঁর সঙ্গে যাবেন।

দেশবন্ধুর জীবনী লিখতে বা জীবনী লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে শ্রীমতী দাশকে অনুরোধ করুন। এ কাজের মধ্যে তিনি যথেষ্ট সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন।

চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের দায়িত্ব এখন কার হাতে? এটির পরিচালন ব্যবস্থায় কি শ্রীমতী দাশ সন্তুষ্ট?

আপনারা সকলে কেমন আছেন? আমি একপ্রকার।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৪৬

মান্দালয়
২৬. ৫. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

গতকাল রেঙ্গুনের খবরের কাগজগুলিতে দেখলাম যে স্টেটস্‌ম্যান মামলাটি হাই-কোর্টে এসেছে এবং তিন সপ্তাহের জন্য এটিকে মুলতুবী রাখা হয়েছে। জানি না, কেবল সওয়াল পড়ার জন্যই প্রতিবাদী পক্ষ কেন তিন সপ্তাহ মামলাটি মুলতুবী রাখার আবেদন জানালো। ২০শে মে-র 'ক্যাপিটাল' থেকে আমি একটি অনুচ্ছেদ তুলে দিচ্ছি :—

"Apropos de bother the application made by Mr. James before Mr. Justice Buckland synchronised with the publication by Forward of a very interesting epistle from Mr. I. A. Jones late editor of the Statesman to his successor in the Chowringhee Caserena, Mr. Ray Knight, about Mr. Subhas Chandra Bose, Chief Executive Officer of the Culcutta Corporation whom according to Mr. Justice Chotzner and Mr. Justice Gregory, the Catholic Herald and the Englishman defamed. To some......in College Square the seemingly hurried departure of Mr. James for Simla that night had something to do with the theory of Justification; but now

we know that they did not know." ঘনটাগুলি কতটা সত্যি দয়া করে আমাকে জানাবেন।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের বাৎসরিক অনুদান দেওয়ার সময় বোধহয় হয়ে এসেছে। সম্প্রতি আমাকে লেখা একটি চিঠিতে শ্যামাদাস কবিরাজ কথায় কথায় উল্লেখ করেছেন যে যামিনীবাবু কাউন্সিলারদের মধ্যে খুব তৎপরতার সঙ্গে সফলভাবে তাঁর পক্ষ গ্রহণ করার জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে নৃপেনবাবু এবং রমাপ্রসাদ তাঁর কলেজের ঘোরতর বিরোধী, প্রথমজন তো একেবারে খোলাখুলিভাবে। আপনি জানেন প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে যামিনীবাবু লোকটি একজন চতুর এবং ধূর্ত প্রচারক, এবং কয়েকজন কাউন্সিলার (যেমন বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র যাঁর ভাই একজন কবিরাজ) তাঁদের নিজেদের অনেক কারণে, যামিনীবাবুর কলেজ সম্পর্কে উৎসাহী। যামিনীবাবুকে আমার সব সময়ই হাতুড়ে বলে মনে হয়েছে—তিনি একজন আধা কবিরাজ এবং আধা অ্যালোপ্যাথ। যে কলেজের তিনি সর্বময় কর্তা সেই কলেজ থেকে ভাল ডাক্তার বের হয় বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু বিপদ হল এই যে আয়ুর্বেদের বিষয়ে কাউন্সিলারগণ যৎসামান্যই চিন্তিত, এবং বৈদ্য-শাস্ত্রপীঠের সর্বনাশ করে যামিনীবাবুর পক্ষে ভোট প্রদান করার জন্য তাঁদের সহজেই প্রভাবিত করা সম্ভব।

আমরা পরের আগস্ট মাসে শীতের জন্য কাশ্মীরি জামা-কাপড় কিনব মনস্থ করেছি। আমাদের আর্থিক বছর আগস্টে শুরু হয় এবং ঐ সময়েই পোষাকের ভাতা পাওয়া যাবে। গতবছর আমরা স্বদেশী কাপড় কিনতে পারি নি. কারণ কাশ্মীর থেকে সেগুলি আনার মতন সময় ছিল না। এবছরে আমরা সময়মত ব্যবস্থা করতে চাই। আমরা কম করে সব মিলিয়ে ৭০০ টাকার জামা-কাপড় কিনব (জামা, কোট এবং শালের জন্য)। আপনি কি আমাদের কতকগুলি নমুনা ও তাদের সর্বশেষ দাম কত জানাতে পারেন? তাদের কাছ থেকে কি কম দামে এগুলি পাওয়া সম্ভব?

আমার গ্রেপ্তারের আগে একজন অজ্ঞাত লোক আমাকে সাবধান করে একটি চিঠি লিখেছিল। আমার গ্রেপ্তারের সময়, অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে এই চিঠিটিও পুলিশ নিয়ে যায়। তবে এর মধ্যে সেটি নিশ্চয় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টেটস্ম্যানের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় এটিকে কাজে লাগানো যায় কি না ভাবছিলাম। স্বরাজ্য দলের একমাত্র আমিই যে এইরকম চিঠি পেয়েছি, তা নয়। সরকারের অভিযোগমত আমি যদি একজন গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী দলের সভ্য হই, তাহলে আমাকে জীবনের ভয় দেখানো হবে কেন?

ফিট্‌জ্‌-উইলিয়াম হাউস থেকে যে চিঠিটি আমি পেয়েছি. এই চিঠির সঙ্গে সেটি ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার মনে হয়, সব মিলিয়ে যখন ৯·৩ পাউন্ড খরচ হবে, তখন আমি 'মাস্টারস ডিগ্রী' নিয়ে নিতে পারি। বারস্যারকে লেখা চিঠিটিও সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আপনি যখন টাকাটা পাঠাবেন, তখন এটি চালান হিসেবে কাজ করবে। টাকাটা পাঠাবার সময় দয়া করে চিঠিটি পোস্ট করতে ভুলবেন না।

কিছুদিনের মধ্যেই আমার কয়েকটি বই-এর প্রয়োজন হবে। দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি তার একটি তালিকা পাঠাব।

আশাকরি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমি একপ্রকার। গোপালী পরীক্ষায় কেমন করল?

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৪৭

বারস্যার,
ফিট্‌জ্‌-উইলিয়াম হাউস,
কেম্ব্রিজ

স্থায়ী ঠিকানা:
৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
২৬·

মাননীয়,

'মাস্টারস্ ডিগ্রী' পাওয়ার এখন আমি যোগ্য, এই সংবাদ দিয়ে আপনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটি পেয়েছি। আমি আপনাকে ৯-৩-০ পাউন্ড (ইউনিভার্সিটি—৩-০-০

পাউন্ড; ফিট্‌জ্‌ উইলিয়াম হাউস—৩-৩-০ পাউন্ড; এবং অনুপস্থিতিতে ডিগ্রী নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ৩-০-০ পাউন্ড) পাঠাচ্ছি, যাতে আমার পক্ষ থেকে আপনি প্রয়োজনীয় টাকাটা দিয়ে দিতে পারেন।

যেহেতু আমি বর্তমানে ইংলণ্ডের বাইরে এবং যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে আসার কোন সম্ভাবনা নেই, সেহেতু অনুপস্থিত থেকে ডিগ্রী নেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। আমি দুঃখিত। সেজন্য, আপনি যদি দয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে দেন, কৃতজ্ঞ থাকব।

ধন্যবাদ

আপনার অনুগত
এস· সি. বোস।

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৪৮

মান্দালয়
৭. ৬. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

মান্দালয়ের আইনজীবী ও বাসিন্দা, মিঃ U. Tha Gywe তাঁর এক আত্মীয়ের কারমাইক্যাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য সাহায্য করতে আমাদের অনুরোধ করেছেন। মিঃ Gywe আমাদের একজন বে-সরকারী পরিদর্শক, এবং অমায়িক। তাঁর আত্মীয় মিঃ M. S. Gywe, আমার ধারণা এখন কলকাতায় ভর্তির চেষ্টায়। কয়েকদিনের মধ্যে সম্ভবত আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুমতি নিয়ে আজ সকালে আপনাকে তার করেছি, মিঃ Gywe-কে সাহায্য করার কথা বলতে। আমার মনে হয় আপনি এখনও কারমাইক্যাল কলেজের গভর্নিং বডিতে কর্পোরেশনের মনোনীত সদস্য, এবং আপনি আপনার প্রভাব খাটাতে পারবেন। বিধান রায়-কেও আমি তার করেছি, এবং আজকের ডাকে তাঁকে লিখেছি-ও।

অনেক দিন হল আপনার কোন খবর নেই। আপনারা সকলে কেমন আছেন?

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(ডাঃ অমূল্যচরণ উকিলকে লিখিত)

১৪৯

Mandalay
[C/o. D.I.G., I.B., C.I.D.
13, Elysium Row
Calcutta]
(১১।৬।২৬ তারিখে প্রাপ্ত)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছে। মানুষের এমনই vanity যে লোকে আমাদের অভাব বোধ করে শুনলে একটু যেন আনন্দ হয়। এই দুর্বলতার উল্লেখ প্রবাসী Alexander Selkirk-এর কবিতায় পাওয়া যায়—

"My friends, do they now and then
Send a wish or a thought after me?"

আপনি যাহা লিখেছেন তাহা খুব সত্য—জেলখানায় এসে সাধনার খুব অবসর পেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শারীরিক অসুস্থতার দরুন এই সুযোগের আশানুরূপ সদ্ব্যবহার করতে পারি নাই। করবার মত কাজ এত রয়েছে কিন্তু তদনুরূপ শারীরিক সামর্থ্য আমার এখন নাই। এখানে আসার ফলে অন্য অনেক রকম শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি কিন্তু হজমশক্তি নষ্ট হওয়ার দরুন পরিশ্রম করবার ক্ষমতা কমে গেছে। এখানে থাকতে যে শরীরের বিশেষ উন্নতি হবে সে আশা কম।

কর্মীদের মধ্যে যে সংযম ও শৃঙ্খলার ভাব এখন কমে গেছে তা জেনে দুঃখিত হলুম।

খবর কাগজ থেকে আমার ঠিক ঐ কথাই মনে হয়েছিল। এখন বোধ হয় সবাই স্ব স্ব প্রধান হয়ে পড়েছে—তাই কোন নেতাকে মানতে চায় না। বাঙ্গলায় যে এখন নেতা বলে কেহ নাই—সে দোষ কাহার? নেতাদের না কর্মীদের?

Sincerity এবং tenacity আছে এইরূপ কর্মীর বড় অভাব একথা ঠিক। এবং এ কথাও সত্য যে যাহারা নিজেদের কর্মকে সাধনার অঙ্গীভূত করে নিতে পারে না—তাহারা খাঁটি কর্মী হতে পারে না। তবে মানুষ ভিন্ন মানুষ সৃষ্টি আর কে করবে? Congress Politics এখন এত unreal হয়ে পড়েছে যে কোনও খাঁটি লোক ঐ কাজে সন্তুষ্ট হতে পারে না। এই অবস্থা দেখে যাহারা কিছু কাজ করতে চায় তাহারা বোধ হয় আর কাউন্সিলের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখবে না। আমাদের সামনে এখন তিনটি বড় সমস্যাঃ—(১) স্বাস্থ্য সমস্যা (২) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্ন সমস্যা (৩) কৃষি সমস্যা।

স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে Caullic-র Physical Efficiency, Macdougall-এর National Welfare and National Decay প্রভৃতি কয়েকখানা বই পড়ে আমি অনেক শিক্ষা পেয়েছি। ইংরাজ জাতির স্বাস্থ্য আমাদের চেয়ে অনেক ভাল কিন্তু তারাও আজ প্রায় ২০।২৫ বৎসর হ'ল উঠে পড়ে লেগেছে কি করে তাদের Physical and National efficiency আরও বাড়ে। এর মধ্যে কয়েকটা National Health Commission-ও বসেছে—এই তত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য যে ইংরাজ জাতির স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা উন্নত হয়েছে না খারাপ হয়েছে—এবং খারাপ হয়ে থাকলে কি কি কারণে খারাপ হয়েছে এবং ঐ সব কারণ কি করিয়া দূর হইতে পারে। এ বিষয় আমাদের দেশে সমবেত ভাবে কোনও গবেষণা হয় নাই বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অথচ দিন দিন আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে Muller's exercise-এর বহুল প্রচলন হওয়া উচিত। ইহার দ্বারা বিনা ব্যয়ে শরীর সবল করতে পারা যায় এবং এই প্রণালী বোধ হয় আমাদের দেশের উপযোগী হবে। আমি নিজে কিছু উপকার পেয়েছি বলে বলতে ভরসা হয়। Muller-এর আর একটা গুণ এই যে পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যায়াম প্রণালী নির্দিষ্ট হয়েছে! অবশ্য প্রণালীগুলি মূলতঃ এক। আপনি এ বিষয় কিছু Propaganda করলে পারেন।

দেশের সব Scientist ও Industrialist-দের একত্র করে, তাহাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্ন সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা না করলে অদূর ভবিষ্যতে বোধ হয় আমাদের অনাহারে মরতে হবে। দেশের বর্তমান অবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোপ পেলে জাতি চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে।

আমাদের কৃষিসমস্যার সমাধান Co-operation-এর দ্বারা হতে পারে—অন্য পথ নাই। Co-operative Bank তো চাই-ই কিন্তু শুধু Bank-এর দ্বারা কার্যোদ্ধার হবে না। সমবায়ের দ্বারা বীজ, সার, লাঙ্গল, চাষের গরু প্রভৃতি ক্রয় করিয়া চাষীদের Cost of Production কমাইয়া Production বাড়াইতে হইবে। তার পর monopolist-কে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় না করে সমবায়ের দ্বারা বেশী দরে শস্য বিক্রয় করবার চেষ্টা করতে হবে। অন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য দেশের জনসাধারণ যদি সহযোগিতা ও একতা অভ্যাস না করে তবে কোনও মহৎ কাজের জন্য তাহারা সহযোগে কাজ করতে পারবে না। এবং পেটের ভাতের জন্য তাহারা যদি সহযোগিতা অভ্যাস করে হাতে হাতে ফল পায়—তাহা হলে তাহারা যে-কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে কাজ করতে পারবে। Co-operation-এর দ্বারা যদি কৃষি ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান না হয় তবে দেশের উন্নতি হবে না। আমাদের সব চেয়ে বড় অভাব initiative-এর। সহযোগিতায় কাজ করতে করতে initiative-এর বৃত্তি সকলের মধ্যে স্ফুরিত হয় এবং জাতীয় initiative জাগরূক হ'লে জাতিগঠনের আর বিলম্ব থাকে না। State-এর সাহায্যে চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে গেলে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না—কারণ তার দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে initiative জাগরূক হবে না। তাহারা কর্মপ্রেরণা লাভ না করে, গভর্নমেন্টের উপর আরও বেশী নির্ভর করতে শিখবে, অবশ্য............হিসাবে এবং সাময়িক প্রয়োজনের নিমিত্ত হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি খুব ভাল, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশবাসীর মধ্যে কর্মের প্রেরণা জাগিয়ে তোলা এবং তাহারই সাহায্যে প্রধানতঃ সমবেত চেষ্টার দ্বারা স্বাস্থ্য, অন্ন ও কৃষি সমস্যার সমাধান করা।

শ্রমজীবী শিক্ষণ পরিষৎ, বঙ্গীয় স্বাস্থ্য সমিতি এবং এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যদি সৎপথে পরিচালিত হয় তবে তাদের দ্বারা উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে বলে

আমি ভরসা করি। সুতরাং এই সব প্রতিষ্ঠানের কাজে যথাসাধ্য করা উচিত। এইসব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হয়তো একদিন বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

কর্পোরেশন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তা সত্য। ওদের স্বাস্থ্য বিভাগ প্রধানতঃ সরকারী বিভাগের মত। ঐ বিভাগকে democratize না করা পর্যন্ত কোনও কাজ হবে না। Ward Health Association-কে কেন্দ্র করে কাজ করে যেতে হবে—কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনও Ward Health Association আজ পর্যন্ত সজীবতা প্রাপ্ত হল না। তার কারণ ঐ—সহযোগিতা ও কর্মপ্রেরণার অভাব।

আমি যখনই খালাস হই না কেন ভবিষ্যৎ কাজ সম্বন্ধে খুব clear-cut ideas নিয়ে যেতে পারব।

খদ্দরের অবস্থা কি? দাম বাড়ছে, না কমছে? এখানে তো দুর্মূল্য।

বিধু ফিরে এসেছে শুনে সুখী হলুম। সে এখন কোথায় কাজ নেবে?

জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পত্রিকা পেয়ে সুখী হয়েছি। পত্রিকাটি বেশ সুন্দর হয়েছে। মেডিকেল বা কারমাইকেল কলেজে এরূপ পত্রিকা আছে বলে কখনও শুনি নাই। কতকগুলি প্রবন্ধ বেশ গবেষণাপূর্ণ বলে মনে হ'ল। ছাপাও ভাল। আশা করি এই পত্রিকা এক-জনের বা কয়েকজনের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে না—এবং সকলেই ইহাতে যোগদান করবে। ছাত্রদের লিখতে দেওয়াতে খুব ভাল হয়েছে। ছাত্রদের প্রবন্ধ (ভাল হউক অথবা মন্দ হউক) একটা permanent feature হওয়া উচিত।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমার শরীর একরকম। অবসর মত পত্র পেলে খুব সুখী হব বলা বাহুল্য। আমার শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি—

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

পুনঃ

শুনলাম যে জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ধর্মঘট করে কর্তৃপক্ষদের জানিয়েছেন যে তাদের কলেজ affiliate করা উচিত। আমি নিজে affiliation-এর বিরোধী এবং affiliation হলে কলিকাতা কর্পোরেশন যে কেন ঐ কলেজকে এত সাহায্য করবে তার কোনও কারণ দেখছি না। এ বিষয় ছাত্রদের dictate করবার অধিকার নাই। কারণ তাহারা যখন ভর্তি হয়েছিল তখন কলেজের অবস্থা জেনে শুনে ভর্তি হয়েছিল। তাহারা জানত যে কলেজ affiliated নয় বা affiliated হবার আশা নাই। কলেজের অবস্থা যত ভাল হচ্ছে তত slave mentality দেখা দিচ্ছে। সুন্দরীবাবু ও কুমুদশঙ্করবাবুকে আমার মত জানাবেন।

ইতি—

সুভাষ

(শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১৫০

মান্দালয়

১৭. ৬. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২৭শে মে তারিখের চিঠি, ৩১ তারিখে সেন্সর করে পাশ করে দেওয়ার পরেও, এ মাসের ৮ তারিখে পেয়েছি। আপনার চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে কোন কোন সময় আমার চিঠি আপনার কাছে পৌঁছতে পনেরো দিন সময় লাগে। ইংলণ্ডে থাকাকালীন, বাড়ির চিঠি আমি এক পক্ষকালের মধ্যেই পেয়ে যেতাম। অবশ্য অভিযোগে ফল হওয়ার নয়।

খবরের কাগজে দেখলাম মিঃ বাকল্যান্ড এবং আরও কয়েকজন বিচারপতি খুব সম্প্রতি ছুটীতে যাচ্ছেন। এ অবস্থায়, অন্য কোন বিচারপতিকে হয়ত স্টেটসম্যান মামলার সুরাহা করতে হতে পারে। পরবর্তী শুনানি কবে হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

রাজনৈতিক মামলার বিচারাধীন বন্দীদের তাদের উকিলদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ করার সুযোগ দানই নিয়ম। এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত, কেননা এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে যাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদের সঙ্গে আমার অভিমত আমি মিলিয়ে দেখেছি। এমতাবস্থায় সরকারের আমার প্রতি, ষড়যন্ত্রের মামলায় বিচারাধীন

বন্দীর চাইতেও খারাপ আচরণ করার কোন কারণ দেখি না।

মিঃ কে সি রায় দিল্লীর যে গল্পের কথা উল্লেখ করেছেন সেটি শুনে বেশ মজা লাগল। আপনি যেমন বলেছেন, এটি কেবলমাত্র একটা অভিনব আবিষ্কারই নয়—একটা কাব্যিক কল্পনাও বটে। দিল্লী হিমালয়ের কাছে, আর সিমলা একেবারে পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত—এবং বরফাচ্ছাদিত হিমালয় আবহমানকাল ধরে কল্পনাশক্তি জাগিয়ে তোলার সুনাম বহন করে চলেছে। মান্দালয় থেকে কোন খবর ফাঁস হয় নি—সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে এই তথ্য পরিবেশন করার পর, এই সরকার কিভাবে দিল্লীর এই রোগনির্ণয় উপভোগ করবেন ভেবে কূল পাচ্ছি না।

কয়েকদিন আগে কাগজে দেখলাম যে লেডি মিটার স্যার বি. সি-র সঙ্গে ইউরোপে গেছিলেন এবং ফিরে এসেছেন। এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠকে প্রভাবান্বিত করছে কি না ভাবছিলাম। দশজনের মধ্যে একজন, লেডি মিটার নিশ্চয়ই শ্রীমতী সরকারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাঁদের অনুসরণ করে শ্রীমতী মল্লিক-ও, ইংলণ্ড যাত্রায় এবার তাঁর স্বামীর সঙ্গ নিয়েছেন। আমাদের পর্দানসিন মহিলারা এবার পর্দা ছিঁড়ে নিজেদের চোখে পৃথিবীটাকে একটু দেখে নিতে বের হচ্ছেন—এটি নিঃসন্দেহে একটি স্বাস্থ্যকর ইঙ্গিত।

এখানে আমার কাছে কাশ্মীরি কাপড়ের কিছু নমুনা আছে, তবে এগুলি দু-বছরের পুরোনো। সেই জন্যই আপনাকে সর্বশেষ দামের সঙ্গে কিছু নতুন নমুনা পাঠাতে বলেছিলাম।

আমার এম এ ডিগ্রীর জন্য টাকা এবং সঙ্গের চিঠিটি কি আপনি পাঠিয়েছেন? বিড়লা-ভাইদের মামলায় কি নতুন কোন উন্নতি হয়েছে?

রাঙামামাবাবু যখন এখানে ছিলেন, তাঁকে আমি বলেছিলাম যে, সতীশ রোজ সাইকেল চড়ে যাদবপুরে যাক, তা আমার পছন্দ নয়। সতীশের শরীর সাইকেল চালানোর মতন যথেষ্ট ভাল নয়, এবং সাইকেল চালক হিসেবেও সে যথেষ্ট দক্ষ নয়। তাছাড়া রসা রোড চওড়া হলেও সেখানে সবসময়ই গাড়ী-ঘোড়া চলাচল করে। বালিগঞ্জ স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত ট্রামলাইনের কাজ খুব শীগ্‌গিরই শেষ হয়ে যাবে (যদি না ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়ে থাকে); এবং তখন সে ট্রামে করে গিয়ে তারপর ট্রেনে যাদবপুরে যেতে পারে। ততক্ষণ পর্যন্ত সে কি কলেজ-সংলগ্ন হোস্টেলে থাকলেই ভাল করবে না? অবশ্যই সে সপ্তাহের শেষে নিয়মিত বাড়ি আসতে পারে।

তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা শ্রী পি কে চক্রবর্তীকে ধরতে সক্ষম হল? হাইকোর্টে তাঁর আবেদনের কি ফল হবে বলে আপনার মনে হয়?

নতুন মামাবাবু এখন কেমন আছেন?

দেখলাম কয়েকটি কাগজ, মিঃ চক্রবর্তীর বন্ড সই করার বিরূপ সমালোচনা করেছে।

১৮. ৬. ২৬

আপনার ১১. ৬. ২৬ তারিখের চিঠি গতকাল পেয়েছি। মিঃ উইলকিনসন দর্শকদের কক্ষে থাকবেন জেনে উৎসাহিত বোধ করছি। মিঃ জোন্‌সের চিঠি কিভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল বুঝতে পারছি না। চিঠি প্রথমে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাই নয় কি? ফরোয়ার্ডের কর্মচারীরা সত্যিই জাদু জানে। আপনার প্রেরিত কাটিং-টি এখনও পাইনি। তবে সেটি পাওয়ার অধীর অপেক্ষায় আছি।

আদালতের সভ্যদের মধ্যে উড্রফ কি এমন কোন 'চেলা' বা 'গুরুভাই' রেখে যান নি যাঁরা তাঁর অবর্তমানে, তাঁর আরম্ভ করা কাজ চালিয়ে যেতে পারেন? বেনারসের শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার তাঁর বই-এর একটি চমৎকার মুখবন্ধ লিখেছেন। বরদাবাবুকে আপনি জানেন?

"Ancient Indian Colonies in the Far East" এই নামে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন। আমি এই বইটি সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি। যদি দেখি যে আমার নজরে যে সব নথিপত্র এসেছে, সেগুলি তিনি ব্যবহার করেন নি, তবে সে কথা রাখালবাবুকে জানাব। আমি এই চিঠির সঙ্গে কয়েকটি বিষয় লিখে পাঠাচ্ছি যেগুলির উপর রাখালবাবু কিছুটা আলোকপাত করতে পারেন। আপনি যদি রাখালবাবুকে এই কাগজটা পাঠিয়ে দেন, তিনি হয়ত আমাকে তাহলে সাহায্য করতে পারেন।

আমি এখন অনেকটাই আগের মত আছি। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ার জন্য এ মাসে

আবহাওয়া ভাল ছিল।

আশাকরি আমার দীর্ঘ চিঠিগুলি আপনাকে বিরক্ত করে না। আপনি অবসর সময়ে এগুলি পড়তে পারেন। আশাকরি সেখানে সব ভাল।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৫১

মান্দালয় জেল
২৬. ৬. ২৬

পরমপূজনীয় মেজদাদা,

যতদূর মনে হয় আপনাকে লেখা আমার শেষ চিঠি ১৮ তারিখের। Statesman-এর সম্পাদককে লেখা মিঃ জোন্স-এর চিঠিটির জন্য আমি উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষায় আছি, কারণ সেটির সঙ্গে আমার মামলার একটি সম্পর্ক আছে। কেন সেটি আমার কাছে পৌঁছয় নি, আমি জানি না। কাটিং না পাঠিয়ে আমাকে কি আপনি তার একটি কপি পাঠাতে পারেন। এটিকে আটক রাখার কারণ আমি সম্যক উপলব্ধি করতে পারছি না, যেহেতু এটি আমার মামলার সঙ্গে জড়িত একটি আইন সম্পর্কিত ব্যাপার। অন্তত আমার কাছে তো এটির গুরুত্ব ততটুকুই। চিঠিটি কবে পাঠিয়েছেন, দয়া করে আমাকে জানাবেন (ইতিমধ্যেই যদি পাঠিয়ে থাকেন)। যদি এটি শেষ পর্যন্ত না পৌঁছয়, আমি C. I. D-অফিসকে এ বিষয়ে লিখব।

বেশ কয়েকমাস আগে শুনেছিলাম, ডঃ কার্তিক বোস, তাঁর কাচ তৈরীর কারখানাটি বিক্রী করে দেবেন, যদিও এ কথা সেই সময় আপনাকে লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। ফ্রান্সে (বা বিদেশে কোথাও) তাঁর ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ায়, এবং নিজের স্বাস্থ্যও ভাল না যাওয়ায়, তিনি তাঁর কারখানাটি তুলে দেবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন কারণ সেটি বিশেষ লাভজনক ছিল না। এই খবরটি (অবশ্য এর মূল্য কতখানি জানি না) আমি সেজদাদাকে জানাতে চেয়েছিলাম, যাতে তিনি খোঁজখবর নিয়ে এটির ক্রয়-বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে কি না দেখতে পারেন। ভাল কথা, তাঁর ব্যবসা কেমন চলছে?

যদি হেমেন্দ্রবাবুর (দাশগুপ্ত) সঙ্গে আপনার কোথাও দেখা হয়, তাঁকে বলবেন এখন পর্যন্ত তাঁর কোন বই আমরা পাই নি। আমার মনে হয় দেশবন্ধুর জীবনীর চার-কপি তিনি C. I. D-র মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন।

এত রকম কাজের চাপে আপনি নিশ্চয়ই এখন খুব ব্যস্ত। আশাকরি, আপনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না, বিশেষত যখন এতগুলি বিষয় আপনার উপর নির্ভরশীল। কলকাতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপনি পুরী অথবা কার্সিয়ঙে অল্প কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে পারেন। মিঃ পি কে চক্রবর্তীর বিষয়টি রেঙ্গুনের সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে, এবং এই বহুল প্রচারের জন্য দায়ী তিনি নিজেই। আমার মনে হয় না এর ফলে তাঁর নিজের খুব একটা সুবিধে হয়েছে। আশা করি আপনি তাঁর জায়গায় একজন যোগ্য ব্যক্তিকে বেছে নেবেন। সাংবাদিক জগতে একদিকে যেমন অনেক ভণ্ড লোক আছেন, তেমনি অন্যদিকে আছেন শিক্ষিত অথচ নির্ভরযোগ্য নয় এমন লোকেরা। অতএব সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। সর্বোপরি, যে কোন পেশার চাইতে সাংবাদিকদের সম্পর্কে বিচার করা, বিশেষত এত দূর থেকে বোধ করি খুবই কঠিন। বোম্বাই-এর সাংবাদিকরাই বোধ হয় এঁদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু মানের। বাগাড়ম্বর-ই তাঁদের ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ কথা। সদ্য পাস করা কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবককে নিযুক্ত করে সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ দিলেই ভাল হয় না কি? এই রকম বহু সংখ্যক যুবককে শিক্ষানবীশ হিসেবে আপনি পাবেন, এবং এদের কয়েকজনকে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি করিয়ে দিতে পারলে আপনার দেশের প্রতি কর্তব্যও পালন করা হবে। আচ্ছা, চক্রবর্তী মশাই-এর সুমতি কি ফিরিয়ে আনা যায় না?

কিছুটা দুর্বল বোধ করি, তাছাড়া শরীর আগের মতই। বর্তমানে আমার ওজন ১৪৪ পাউণ্ড। গত চার-পাঁচ বছরে আমার পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। তাই সেই অসমাপ্ত পড়াশুনা সম্পূর্ণ করতে কিংবা তাকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে, আগামী ছয় মাসে কঠোর পরিশ্রম করতে চাই। কিন্তু শরীর সায় দিতে চায় না। কিছুদিন বেশ ভাল কাজ করি, তারপরেই উদ্যমে ভাঁটা পড়ে। কখনও কখনও মনে হয় যে পৌরশাসন

সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বিশদ পড়াশুনা অর্থহীন, কেননা সম্ভবত ভবিষ্যতে আমি অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করব।

গোপালী সম্ভবত বি-এস-সি পাশ করবে। ভবিষ্যৎ-নির্ধারণ করতে সে বোধ হয় অক্ষম। যদি সে সেজদাদার সঙ্গে যোগ না দেয়, তাহলে আমি তাকে ভূতত্ত্ব বিদ্যা কিংবা কাপড়-উৎপাদনের দিকে যেতে পরামর্শ দেব। প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত যুবকদের এই দুটি ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল সম্ভাবনা। বাংলাদেশে সুতো ও পাটকলের সংখ্যা বছরে বছরে বৃদ্ধি পাবে, সেই সঙ্গে চাকরীর রাস্তাও যাবে খুলে। অন্যদিকে সমগ্র ভারতবর্ষে এমনকি বর্মাতেও ভূতত্ত্ববিদের প্রয়োজন হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং একই রকম বাঞ্ছনীয় জীবিকা। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কোন একটি বিভাগে (যেমন পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, সেতু নির্মাণ কিংবা জাহাজ নির্মাণ) তার বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠা উচিত। তবে আসল কথা হল, উচ্চাভিলাষ ও আত্ম-বিশ্বাস থাকা চাই।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল। বাবা-মা কেমন আছেন? এইমাত্র (বিকেল পাঁচটায়) Statesman মামলার বিষয়ে আপনার তার পেলাম। উত্তরে আমি নিম্নলিখিত তার পাঠিয়েছি, আপনার বিচার বুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করুন। মামলার সমস্ত তথ্য বিশেষত সর্বশেষ পরিস্থিতি আমার জানা না থাকায় এর চাইতে সঠিক উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল। যতটা বেশী আদায় করা যায়, সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে এবং আপনি-ই বিচার করে দেখবেন মামলার অবস্থা অনুযায়ী আমরা সবচাইতে বেশী কি আদায় করতে পারি। উদার হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত)

১৫২

Censored and Passed
স্বাঃ অস্পষ্ট

for D.I.G., I.B., C.I.D.,
Bengal.

Mandalay
[C/o. D.I.G., I.B., C.I.D.
13, Elysium Row
Calcutta]
ইং ২১।৭।২৬

শ্রীচরণেষু—

মা, অনেকদিন হইল পাটনার ঠিকানায় আপনাকে পত্র দিয়াছি—আশা করি যথাসময়ে তা পাইয়াছেন। ১৬ই জুন তারিখে আপনাকে পত্র লিখিতে বসি, কিন্তু কিছুদূর লিখিয়া আর কলম চলিল না। সে পত্র আজও পর্যন্ত শেষ করিতে পারি নাই, তাই নূতন করিয়া লিখিতে বসিয়াছি। ইতিমধ্যে আপনার মাথার উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিলেও বুক কাঁপিয়া ওঠে। ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর? এমনই ভাবে কি মানুষকে পরীক্ষা করিতে হয়? ২৯শে জুন বৈকালের কাগজে যখন দুর্ঘটনার সংবাদ পাই, তখন সকলের ইচ্ছায় একটা টেলিগ্রাম করি আপনার নিকট, তারপর আপনাকে পত্র দিবার ইচ্ছা হইয়াছে—কিন্তু লিখিতে বসিয়া ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই। কি লিখিব? কি বলিব? কি করিয়া সান্ত্বনা দিব? কি করিয়া শোকের গুরুভার লাঘব করিবার চেষ্টা করিব? কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়—কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইবার নয়। জীবনে কখনও হইবে কিনা—তাহা জানি না। আমরা তো এখানে Permanent Settlement-এর জন্য প্রস্তুত। জননী, বঙ্গজননী, বিশ্বজননী এ সব অত্যন্ত আপনার জিনিষ কারার বন্ধনের মধ্যে আমাদের নিকট সহস্র গুণে পবিত্র, সুন্দর ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিবে। মানস জগতে তাঁহারা নিত্য বিরাজ করিতেছেন ও করিবেন কিন্তু তাঁহাদের মানস সত্তা বাস্তব জগতের বিচ্ছেদকে আরও তীব্র করিয়া তুলিবে।

আকাশের তারার ন্যায় পুণ্য ও মহিমান্বিত সেই সব মূর্তির দিকে মানস জগতে চাহিয়া চাহিয়া কত দিন, কত মাস, কত বৎসর কাটাইতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের আত্মা সত্য, তার জীবন সত্য এবং মানুষের সঙ্গে

মানুষের সম্বন্ধ সত্য। এ জীবনের শেষ হইলেও জীবনের শেষ নাই—জীবনের সম্বন্ধগুলিরও শেষ নাই। পার্থিব শক্তি আমাদিগকে কারারুদ্ধ করিতে পারে, সর্বস্ব অপহরণ করিতে পারে কিন্তু জীবনের শেষ করিতে পারে না—জীবনের নিত্য পবিত্র সম্বন্ধগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আমাদের গৌরবময় ভবিষ্যতের কল্পনায় ও ধ্যানে আমরা বর্তমানের সকল দুঃখ ও বন্ধন অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ ও প্রস্তুত। ভবিষ্যৎ আলোর দর্শনে আমরা বর্তমানের নিবিড় অন্ধকার সহ্য করিতেছি। তাই নিতান্ত অসহায় হইলেও আমরা সুস্থির ভাবে সেই সুপ্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

জগতের মূলে যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এ কথা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তাই আমি বিশ্বাস করি যে আমাদেরও একদিন আসিবে। তখন আমরা বর্তমান শূন্যতা ও অভাবের শোধ কড়ায় গণ্ডায় তুলিয়া লইব। এই বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা বাস্তবের চাপে নিষ্পেষিত হই নাই বা হইব না।

যাক্ অনেক বাজে বকিলাম, আপনার জন্য সর্বদা চিন্তা হয়। আপনি কেমন আছেন? মেজদাদা ও বৌদিদি আপনার সহিত দেখা করিতে যান শুনিয়া সুখী হইলাম। এখানকার নূতন খবর কিছু নাই।

ইতি—
আপনার সেবক
সুভাষ

(গোপবন্ধু দাসকে লিখিত)

১৫৩

মান্দালয়
প্রযত্নে ডি আই জি, আই বি, সি আই ডি,
(বাঙ্গলা)
১৩, ইলসিয়াম রো
কলকাতা

প্রীতিভাজনেষু
গোপবন্ধুবাবু,

২৬. ৭. ২৬

গত ৭ই এপ্রিল আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু এখনও তার কোন উত্তর পাই নি। আশা করি আপনি ঠিকমত আমার চিঠিটি পেয়েছেন। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গতবছর যে বইগুলি আপনি পাঠিয়েছিলেন, আমি সেগুলি পেয়েছি। এতদিন বইগুলি অফিসেই পড়েছিল, কারণ সেগুলি কেউ পড়তে সক্ষম হয় নি। তাই দেরীতে খুঁজে পাওয়া গেল। বইগুলি হল (১) ত্রি-ভাষী (২) বর্ণবোধ (৩) উড়িয়া ব্যাকরণ, (৪) শিশুবোধ (৫) পিলাঙ্করামায়ণ। আপনি বই-এর কোন দ্বিতীয় পার্শেল পাঠিয়েছেন কি না জানতে উদ্বিগ্ন আছি। উপরে লেখা বইগুলিই কি সব, যা আপনি প্রথম পার্শেলে পাঠিয়েছেন? যদি স্থানীয় দোকানে উড়িয়া বই না মেলে, তাহলে এই বইগুলি শেষ করে আপনাকে লিখব। আপনি তখন কোন বই বিক্রেতাকে ভি পি করে আমার ঠিকানায় কয়েকটি প্রয়োজনীয় বই পাঠিয়ে দিতে বলতে পারেন। বইগুলি যদি ভি পি ডাকে আসে, তাহলে পথিমধ্যে সেগুলির ঠিকমত না চলাচলের এবং আমার কাছে দেরী করে পৌছনোর কোন কারণ নেই। যেহেতু টাকা দিতে হবে, সেজন্য বইগুলি পৌছনো মাত্র আমাকে খবরটা জানানো হবে।

আমার আগের চিঠির জবাবের প্রতীক্ষায় আছি। আপনারা সকলে কেমন আছেন? আমি একপ্রকার। আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন এবং বন্ধুদের কাছে আমার কথা বলবেন।

আপনার
সুভাষ

পুঃ—শ্রী বিজয় মজুমদারের বই "Orissa in the Making", কি আপনি পেয়েছেন? বইটি সম্পর্কে আপনার কি মন্তব্য? আমি নিজে বইটি দেখিনি তবে এর কতকগুলি সমালোচনা পড়েছি।

সুভাষ

(পরবর্তী দুইখানি পত্র বিভাবতী বসুকে লিখিত)

১৫৪

মান্দালয় জেল
২৭।৭।২৬

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ১৪ই জুলাইর পত্র আজ পেয়েছি, অশোকের পত্র আমি ইতিপূর্বে পেয়েছি। শীঘ্র উত্তর দিব। ন'দাদা এখন কি চাকরী করছেন? তিনি কি পুরান চাকরী নিয়ে সিজুয়ায় গেছেন, না নূতন চাকরী নিয়ে? সেজদিদি গোরক্ষপুর গেলে কি গোরাকে রেখে যাবেন, না ছেলেমেয়েদের সকলকে নিয়ে যাবেন? মা ও বাবার পত্র অনেকদিন হ'ল পাই নাই। গেজেটে দেখলুম গোপালী পাশ করেছে। সে এখন কি করবে? আপনি মা বাসন্তী দেবীর নিকট মধ্যে মধ্যে যান শুনে আমি সুখী হয়েছি। তিনি এখন কোন্ বাড়ীতে থাকেন? তাঁকে একবার দেখতে আমার বড্ড ইচ্ছা হয়—কিন্তু উপায় নাই। সরকারের খোসামুদী আমার দ্বারা হবে না। তাঁর উপর্যুপরি এই রকম বিপদের সময়ে আমি তাঁর কোনও রকম সেবা করতে পারলুম না, ইহাই আমার দুঃখ ও দুর্ভাগ্য।

এখানে বৃষ্টি খুব সামান্য হয়। কিন্তু তবুও গরম এ মাসটা কম আছে। এখানকার স্বাস্থ্য এখন ভাল নয়—অসুখ-বিসুখ জেলখানায় এবং সহরে খুব হচ্ছে। আমাদের মধ্যে একজনের ইনফ্লুয়েঞ্জার মত অসুখ হয়—তার নাম Sandfly fever, একরকম মশা কামড়ালে নাকি হয়। তারপর আর একজনের এ্যাপেন্ডিসাইটিস (Appendicitis) হয়। তারপর আর একজনের ডেঙ্গু জ্বর হয়। আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল বুঝি টাইফয়েড হবে কিন্তু ষষ্ঠ দিনে জ্বর ছেড়ে গেল। এ সময়টা কারও স্বাস্থ্য ভাল নয়—কাজকর্মে মন লাগে না। গুরুতর অসুখ আমার কিছু হয় নাই।

আপনারা সকলে কেমন আছেন? পূজার ছুটি কবে আরম্ভ হবে? আপনারা ছুটিতে কি কার্শিয়াং যাবেন, না অন্যত্র?

এখানে আপাততঃ গুরুতর অসুখ কাহারও নাই। এখানে আমাদের দলপুষ্টি হবে—এখানকার সব কথাবার্তা ও ব্যবস্থা থেকে মনে হয়। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—
সুভাষ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

১৫৫

মান্দালয় জেল
২৮-৭-২৬

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ২৭শে এপ্রিলের চিঠির উত্তর আজ পর্যন্ত দিই নাই। গোপালীর পরীক্ষার খবর কি বেরিয়েছে? অশোকের ও অরুণার পত্র আমি দেরীতে পাই—তার উত্তরও দিয়েছি। আশা করি তারা যথাসময়ে পেয়েছে। দিদির পত্রে জানলাম যে অরুণা এখন শ্বশুর বাড়ীতে। বড়দিদিরা এখন কোথায়? বিমল কোথায় ও কেমন পড়ছে?

এবার এখানে জুন জুলাই মাসে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা তবে এরপর আবার গরম পড়বে কিনা জানি না। কিন্তু এ দুই মাসে এখানকার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। এখানে একে একে সকলে শয্যা গ্রহণ করেছেন। আমি অবশ্য খাড়া আছি, তবে শীত না পড়লে আমার পেটের অবস্থা যে সারবে বা ভাল হবে তা মনে হয় না। গত বৎসরের মত এখন আর কোন কাজে মন লাগে না—কোন রকমে দিন কাটান হচ্ছে। শীতটা যখন আসবে তখন আবার পড়াশুনায় ঝোঁক দিব মনে করছি। কাগজে দেখলুম যে এবার ওখানে খুব গরম; এবং গরমের দরুন লোক মারাও গেছে। এখন গরমটা কি রকম?

আমি মেজদাদাকে লিখেছিলুম যাতে ছেলেমেয়েদের গানবাজনা ও চিত্রাঙ্কন শেখান হয়—বাড়ীতে মাষ্টার রেখে। প্রথমে তারা হয় তো স্বেচ্ছায় শিখতে চাইবে না এবং জোর করে শেখাতে হবে। কিন্তু এর ভাল ফল তারা সারাজীবন ভোগ করবে। আমি যদি গানবাজনা বা চিত্রাঙ্কন জানতুম তাহলে এখানকার দিনগুলি আরও আনন্দে কাটাতুম। তিনু গোপালী প্রভৃতি দেখে বড় হয়েছে—কিন্তু তারা কাইতে যে শিখবে তার কোনও লক্ষণ

দেখছি না। পায়রার বংশ বেড়েই চলেছে—এখন ছয় জোড়ায় দাঁড়িয়েছে। দুই জোড়া সাদা কালো মেশান, এক জোড়া লাল, এক জোড়া সাদা এবং দুই জোড়া ময়ূরপঙ্খী। ময়ূরপঙ্খী পায়রা দেখতে বেশ সুন্দর। ময়ূরের মত প্যাখম ধরে সর্বদা ঘুরে বেড়ায়। ডিম দুই জোড়া হয়েছে—তা দেওয়া হচ্ছে। এগুলি ফুটলে বংশ আরও বাড়বে। আমাদের এখানে যে ছোট্ট পুকুর বা চৌবাচ্চা আছে তার ধারে যখন সকাল বেলা পায়রার পাল সারি দিয়ে বসে তখন বড় সুন্দর বোধ হয়।

মা ও বাবা কোথায় ও কেমন আছেন? আমি অনেকদিন হল তাঁদের কোন পত্র পাই নাই। ছোট মামার পরীক্ষার ফল কি বেরিয়েছে? তিনি ও ছোট দাদা কবে ফিরবেন। মীরার টায়ফয়েডের কথা আমি ইতিপূর্বে শুনি নাই—দিদির পত্রে জানলাম। মীরা এখন কেমন আছে? ন'দাদা এখন কি চাকরী করছেন? চাকরী কি পাকা না অস্থায়ী? লাল-মামাবাবুর প্র্যাক্‌টিশ কেমন হচ্ছে? অন্যান্য মামাবাবুরা কোথায় ও কেমন আছেন। লাল-মামাবাবুর শরীর কেমন? গোপালী কোথায় আছে এখন? সে আমায় পত্র লিখলে পারে। দিদি কি ওখানেই থাকবেন, না কটকে যাবেন? পলির শরীর এখন কি রকম? সেজদাদার কারখানার জিনিষপত্র কি বাজারে বেরিয়েছে?

(শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত)

১৫৬

মান্দালয় জেল (১৯২৬)

প্রিয়বরেষু,—

আপনার ২।৫।২৬ তারিখের পত্র পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা করিবেন—আমি এখন অনেক বিষয়ে নিজের মালিক নহি—তা তো বুঝিতেই পারিতেছেন। আপনার পত্রে ভবানীপুরের সকল সমাচার অবগত হইয়া একসঙ্গে সুখী ও দুঃখিত না হইয়া পারি নাই। আজ বাঙ্গলার সর্বত্রই কেবল দলাদলি ও ঝগড়া এবং যেখানে কাজকর্ম যত কম, সেখানে ঝগড়া তত বেশী। ভবানীপুরের কাজকর্ম কিছু হইতেছে, তাই ঝগড়া-বিবাদ অপেক্ষাকৃত কম—তবুও যা আছে তাহাতে নিরপেক্ষ লোক ম্রিয়মাণ না হইয়া পারে নাই। আমি শুধু এই কথা ভাবি—ঝগড়া করিবার জন্য এত লোক পাওয়া যায়—কিন্তু মিলাইতে পারে, মীমাংসা করিয়া দিতে পারে—এ রকম একজন লোকও কি আজ সারা বাঙ্গলার মধ্যে পাওয়া যায় না? এই দলাদলির জন্য বাঙ্গলা আজ শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের মত স্বদেশসেবক হারাইয়াছে—আরও কয়জনকে হারাইবে তা কে বলিতে পারে? বাঙ্গালী আজ অন্ধ, কলহ-বিবাদে নিমগ্ন, তাই একথা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। নিঃস্বার্থ আত্মদানের কথা আর তো কোথাও শুনিতে পাই না। অত বড় একটা প্রাণ নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া মহাশূন্যে মিশিয়া গেল; আগুনের ঝলকার মত ত্যাগ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল; সেই দিব্য আলোকের প্রভাবে বাঙ্গালী ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের পরিচয় পাইল; কিন্তু আলোকও নিবিল, বাঙ্গালীও পুরাতন স্বার্থের গণ্ডীতে আশ্রয় লইল। আজ বাঙ্গলার সর্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্য কাড়া-কাড়ি চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতা বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে, "দেশোদ্ধার যদি হয় তবে আমার দ্বারাই হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই।" এই ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিকবৃন্দের ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া, নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্মী কি বাঙ্গলায় আজ নাই?

নিজেদের intellectual ও spiritual উন্নতি অবহেলা করিয়া যাহারা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহারা যে এই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কলহবিবাদে সকলকে মত্ত দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ হইয়া রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? নিজেদের মানসিক ও পারমার্থিক কল্যাণকে তুচ্ছ করিয়া যাহারা জনহিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে তাহারা কি শেষে এই ক্ষুদ্র ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিবে? জনসেবার আশায় নিরাশ হইলে তাহারা যদি পুনরায় নিজেদের পারমার্থিক কল্যাণে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে কি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়? আমি আজ স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, সমাজের বর্তমান অবস্থা যদি চলে, তবে বাঙ্গলার বহু নিঃস্বার্থ কর্মী ক্রমে ক্রমে অনিলবরণের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে।

আজ বাঙ্গলার অনেক কর্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ জমিয়া

উঠিয়াছে। তাহারা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "আমাকে ক্ষমতা দাও—নতুবা আমি কাজ করিব না।" আমি জিজ্ঞাসা করি—নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারিতে, Contract-এ কবে পরিণত হইল? আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই—

"দাও দাও ফিরে নাহি চাও
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

যে বাঙ্গালী এত শীঘ্র দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে—সে যে কতদিনের আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' ভুলিবে—ইহা আর বিচিত্র কি?

দুঃখের কথা, কলঙ্কের কথা ভাবিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়। প্রতিকারের উপায় নাই—করিবার ক্ষমতা নাই—তাই অনেক সময় ভাবি—চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করিয়া বাহ্য জগতের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ করিয়া দিই। পারি তো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোক-চক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব। তারপর মাথার উপরে যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমাদের হৃদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝিবেই বুঝিবে। দেশের নামে এতবড় একটা প্রহসনের অভিনয় দেখিব—বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেশে যে 'Nero is fiddling while Rome is burning' কথার একটা নূতন দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে—কোনও দিন ভাবি নাই।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম—হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আপনাদের নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করি তাই এত কথা বলিতে সাহস করিলাম। আপনারা গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত—আশা করি, আপনারা এই দলাদলির পঙ্কিল আবর্তে আকৃষ্ট হইবেন না।

বিদ্যালয়ের কথা পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বাড়ীর কথা শুনিয়া অবশ্য দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না। তবে এ কথা আমি পূর্ব হইতে জানি এবং চণ্ডীবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে কয়েক বৎসর পূর্বেই বাড়িটির পরিণামের কথা বলিয়াছিলাম। আমার সর্বদা মনে হইত যে স্কুলের কর্তৃপক্ষরা unbusinesslike ভাবে জমির "লিজ" লইয়া বাড়ী নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তার ফলে পরিণামে জমিদারেরই লাভ হইবে। যাক্, এখন ত "গতস্য শোচনা নাস্তি।" আপনারা যে কিছুমাত্র নির্ভরসা না হইয়া 'গৃহ নির্মাণ' ভাণ্ডার সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা খুব আশাপ্রদ। আপনাদের চেষ্টা যে সফল হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কারণ

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি।"

সমিতির সকল সংবাদ পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। আপনারা যদি মেথর মুচি প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় করিতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এ বিষয়ে অমৃতের সহিত পরামর্শ করিবেন—আমি অনেক দিন হইল তাহার পত্র পাইয়াছি, দুঃখের বিষয় উত্তর দিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ কুলদাকে দিলাম—আশা করি আগামী সপ্তাহে অমৃতকে লিখিতে পারিব।

বলা বাহুল্য আমি থাকিলে আপনাদের আলাদা হইতে দিতাম না। অবশ্য ভিন্ন শাখা গঠনের সহায়তা আমি করিতাম কিন্তু একেবারে ভিন্ন নাম দিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান করিতে দিতাম না। যাক্, এখন আর উপায় নাই। যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে—এই বলিয়া কাজে লাগিতে হইবে। আপনারা Constitution করিয়া ভালই করিয়াছেন।

আশা করি চাউল ও চাঁদা গ্রহণ লইয়া বালক সমিতির সহিত আপনাদের গণ্ডগোল হইবে না। এক জায়গায় যদি অনেক সমিতি চাঁদা ও চাউল গ্রহণ আরম্ভ করে তবে গৃহস্থেরা উত্যক্ত হইয়া ওঠে, সুতরাং সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার।

আমার মনে হয় যে, আপনারা যদি ২।১ জন কর্মী বা শিক্ষককে কাশীমবাজার পলিটেকনিক (Cossimbazar Polytechnic) স্কুলে শিখাইয়া লইতে পারেন তবে technical শিক্ষার খুব সুবিধা হইবে। আমি একবার কাশীমবাজার স্কুলে গিয়াছিলাম। আমার বেশ ভালই লাগিয়াছিল—তাহারা কয়েকটি নূতন জিনিস শেখায় যাহা সাধারণ স্কুলে হয় না—যেমন বেতের কাজ, clay modelling, পুতুল নির্মাণ, কামারের কাজ, সেলাই, electroplating ইত্যাদি। আমি যখন যাই তখন electroplating-এর জন্য machinery-র আমদানি হইতেছে। আপনার প্রেরিত বিদ্যালয় ও সমিতির Constitution আমি পাইয়াছি।

স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ ভাল হইতেছে না—ইহা দুঃখের বিষয়। এর কারণ এই যে জনসাধারণকে ঠিকভাবে ডাকা হয় নাই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তাহারা সাড়া না

দিয়া পারিবে না। তাহাদের মধ্যে intuition ও কর্ম-প্রেরণা জাগানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্দেশ্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহাদের মধ্যে কর্ম-প্রেরণা জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে ভালবাসার দ্বারা আপনার করিতে হইবে।

আপনারা হয়তো জানেন না যে দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের ত্রুটির জন্য আমি প্রধানতঃ দায়ী। বাহিরে থাকিতে আমি ভাল রকম organise করিতে পারি নাই। তারপর হঠাৎ আমার গ্রেপ্তার। যখন সেবাশ্রম কালীঘাটে ছিল তখন বাড়ী ভাড়া ও সহকারী সম্পাদকের বেতন আমি নিজে দিতাম। শুধু বালকদের ভরণপোষণের খরচ সাধারণের দেওয়া চাঁদা হইতে নির্বাহিত হইত। সেবাশ্রম সম্বন্ধে আমার clear conscience আছে, কারণ Public-এর দেওয়া টাকার একটি পয়সারও আমি অসদ্ব্যবহার করি নাই। আমার গ্রেপ্তারের পর আমার দেয় অংশ আমার দাদা (শরৎবাবু) দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি খরচ কমিয়াছে এবং আয় বাড়িয়াছে বলিয়া তাঁহাকে আর পূর্বেকার মত টাকা দিতে হয় না। আমি যখন মাসে মাসে দুই শত টাকা করিয়া সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় করিতাম, তখন অনেক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, আমি বৃথা ছয়-সাতটি বালকের জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতেছি। এ টাকার সদ্ব্যবহার অন্য ভাবে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, আমি খেয়ালের বশবর্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২।১৩ বৎসর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মত আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি—তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। "দরিদ্র নারায়ণের" সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব। এই সেবাশ্রমের পেছনে কত ইতিহাস লুক্কায়িত আছে—কবে এই চিন্তা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেন প্রবেশ করে—কি করিয়া আমি চিন্তারাজ্য ছাড়িয়া কর্ম-রাজ্যে প্রবেশ করি—সে কথা অন্য সময় বলিব। পত্রে লিখিবার চেষ্টা করিলে গ্রন্থ হইয়া যাইবে।

অনেক কথা লিখিলাম, এখন শেষ করি। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব? রবিবাবুর একটি কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। কবির ভাষায় উত্তর দিলে কি ধৃষ্টতা হইবে? কবির এত আদর এইজন্য যে আমাদের অন্তরের কথা কবিরা আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতর ও স্ফুটতর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন। তাই বলি—

"এখনো বিহার কল্প জগতে
জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী।
* * *
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে
* * *
গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি কাজে।
* * *
কবে প্রাণ খুলি বলিতে পারিব
'পেয়েছি আমার শেষ!'
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ!"

শরীর তত ভাল নাই, তবে তার জন্যে চিন্তাও নাই। আমার ভালবাসা ও প্রীতি সম্ভাষণ জানিবেন। অমৃত প্রভৃতি ভাইরা কেমন আছেন? আপনাদের কুশল সংবাদ পাইলে অত্যন্ত সুখী হইব। তবে কাজের সময় নষ্ট করে পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

(পরবর্তী ১৭টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১৫৭ মান্দালয়
৭. ৮. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার জুলাই মাসের ১০, ১৭ ও ৩১ তারিখের চিঠি যথাক্রমে ১৭ই জুলাই ২৭শে জুলাই এবং ৭ই আগস্ট পেয়েছি। গত দুই-তিন সপ্তাহে আপনাকে লিখিতে পারিনি বলে দুঃখিত।

আপনার ১০ই জুলাই-এ লেখা চিঠির সঙ্গে মিঃ জোন্সের চিঠির টাইপ করা কপি, তার নোট, ইত্যাদি পেয়েছি। সেগুলি পড়ে সবিশেষ কৌতূহল ও কৌতুক বোধ করেছি।

অনশন ধর্মঘটের সময় আমার ওজন কমে হয়েছিল ১৩৮ পাউন্ড। পরে বেড়ে হয় ১৪৫ (বা ১৪৪) এবং কয়েক সপ্তাহের জন্য তা ১৪৩ পাউন্ডে স্থির ছিল। ধর্মঘটের ঠিক আগে ওজন ছিল ১৫৫ পাউন্ড আর বহরমপুর থাকাকালীন ১৮৩। আপনার ১৭ই জুলাই-এর চিঠিতে আমাকে বলেছিলেন গভর্নমেন্টের কাছে এই মর্মে আবেদন করতে যেন আমাকে উত্তর ভারতের কোন পাহাড়ী শহরে বদলি করা হয়। আমি বিষয়টি সযত্নে বিবেচনা করে দেখেছি। মনে হয় না গভর্নমেন্টের সহজ অস্বীকৃতি ছাড়া এর ফল অন্য কিছু হবে, যা আমার কাছে আরও বিরক্তির কারণ হবে। আমার পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতি ঠান্ডা মেজাজে মেনে চলাই শ্রেয়। আমার মানসিক শান্তি ত আর কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

কিছুদিন আগে স্টেট্সম্যানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা যায় কিনা সে ব্যাপারে আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম এই বলে যে আমি সমস্ত বিষয়টি আপনার হাতে ছেড়ে দিয়েছি, বিশেষত যখন বিষয়টির খুঁটিনাটি অনেক কিছুই আমার অজানা। তার পর থেকে এ বিষয়ে আমি আর কোন খবর পাইনি।

শ্রীমতী দাস এখন কার সঙ্গে বাস করছেন? ভোম্বলের পরিবার এখন কাদের সঙ্গে আছে, তাদের দেখাশোনাই বা করছে কে? শ্রীমতী দাসকে সান্ত্বনা দেবার সব রকম চেষ্টা আপনারা করছেন জেনে আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। দেশবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পুরনো বন্ধুবান্ধবেরা এখন কি রকম ব্যবহার করছেন?

কাশ্মীরের কাপড়ের কোন নমুনা পেয়েছেন কি? যদি না পেয়ে থাকেন, কবে পাবেন আশা করেন?

কিছুদিন আগে ইতিহাস-বিষয়ক যে নোটটি আমি পাঠিয়েছিলাম সেটি সম্পর্কে আপনি কি করবেন ভাবছেন? রাখালবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ না হলে আপনি বাবু বিজয় মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে পারেন। তিনি (বিজয়বাবু) ল্যান্সডাউন রোডে বাস করেন (অন্তত আগে করতেন)। জীবনে মাত্র একবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু সম্ভবত বাবার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে কারণ দীর্ঘদিন তিনি সম্বলপুরে ছিলেন। বিজয়বাবু নিঃসন্দেহে একাধিক বিষয়ে সুপণ্ডিত, এবং রাখালবাবুর চাইতে কোন অংশে কম প্রাজ্ঞ নন। শ্রীব্রজেন্দ্র শীল তাঁর সুউচ্চ প্রশংসা করেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে রাখালবাবুর সঙ্গে বিজয়বাবুর সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল নয়। বলা হলে বিজয়বাবু অনায়াসেই সাহায্য করতে পারেন. অবশ্যই যদি তিনি ইচ্ছুক হন। জানি না সত্যবাবু তাঁকে চেনেন কিনা?

আপনার রাজশাহী যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে জেনে সুখী হলাম।

আশা করি দক্ষিণ কলকাতা ন্যাশনাল স্কুলের ছেলেদের জন্য মুখার্জী একটি খেলার মাঠের ব্যবস্থা করতে পারবে। আমি স্কুল কর্তৃপক্ষকে লিখব যাতে তাঁরা আপনার চিঠি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

আবহাওয়া ভাল থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক সপ্তাহে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারিনি। ঠান্ডা পড়ার আগে আমি এ কাজ করতে পারব বলে মনে হয় না। সর্বোত্তম ব্যবহার না করে এই ভাবে দিন কাটানো সত্যিই বেদনাদায়ক। জেলের বাইরে এই রকম শান্ত পরিবেশে পড়াশুনা করার সুযোগ পাব কিনা সন্দেহ।

আপনাকে জানিয়েছি কিনা ঠিক মনে নেই যে স্থানীয় গভর্নমেন্টের আদেশ অনুসারে রাত্রে তালা-বন্ধের ব্যবস্থা আমাদের ক্ষেত্রে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নিঃসন্দেহে

কিছুটা স্বস্তি বোধ করি। অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে আমি এখন বারান্দায় শুই যাতে দক্ষিণের হাওয়া গায়ে লাগে।

খাতায় দেখছি আপনাকে আমি শেষ চিঠি লিখেছি ৩০ জুন তারিখে। তার পরে মেজবৌদিদিকে লিখেছি ২১শে জুলাই। তিনটির পরিবর্তে আমরা এখন সপ্তাহে চারটে চিঠি লিখতে পারি। এর ফলে অনেক দিন থেকে জমে থাকা চিঠির উত্তর দিতে কিছুটা সুবিধে হচ্ছে।

আপনার হজমের গোলমাল হচ্ছে জেনে আমি উদ্বিগ্ন। এর কারণ অবশ্যই অতিরিক্ত পরিশ্রম ও শারীরিক ব্যায়ামের অভাব। প্রাতঃভ্রমণে বেরোন না কেন? শুরুতেই হয়ত খুব উপকার হবে না, কিন্তু এর সুফল হবে দীর্ঘস্থায়ী। কবিরাজী ওষুধেও উপকার পেতে পারেন। গত শীতে দু'মাস ধরে আমি কবিরাজী ওষুধ ব্যবহার করেছি, যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। পরের চিঠিতে আপনাকে আমি মেমিও সম্পর্কে লিখব। আমার মনে হয় যে চা-পান হজমের গোলমালে ক্ষতিকর, যদিও যতই হজমের গোলমাল বাড়ে চা-তৃষ্ণাও বেড়ে চলে একই সঙ্গে। বিকেল পাঁচটা-ছ'টার পর চা-পান বিশেষ করে ক্ষতিকর। রাত্রে খাওয়ার ইচ্ছে এর ফলে চলে যায়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে আমি উত্তর কলকাতার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক কি না আপনি জানতে চেয়েছেন। আমি প্রস্তাবটি অন্য কোন মহল থেকে আশা করছিলাম এবং আপনার কাছ থেকে পেয়ে একটু অবাক হই। এই ধরনের একটি প্রস্তাব আসার সম্ভাবনার কথা ভেবে আমি আগেই মনস্থির করে ফেলেছিলাম, কিন্তু আপনি জিজ্ঞেস করায় নতুন করে চিন্তা শুরু করি। গভীর ভাবে চিন্তা করার পর, গত ৫ই আগস্ট উক্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত আমি জানিয়ে দিই। কি কারণের বশবর্তী হয়ে আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা বলা নিষ্প্রয়োজন, সেগুলি আপনি সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন। সহকারী সম্পাদকের পদে প্রার্থী, ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরের অসহযোগী আইনজীবী বাবু সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (প্রাক্তন রায়-সাহেব) আপনার কাছে এবং সুকুমারবাবুর কাছে তাঁর সম্পর্কে সুপারিশ করতে অনুরোধ করেছেন। তাঁর অনুরোধের ফলে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছি। অন্যান্য প্রার্থী কারা তা না জেনে এবং কর্পোরেশনের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হয়ে আমি কর্পোরেশনের কাছে বা কর্পোরেশনের কোন সদস্যের কাছে কারুর নাম সুপারিশ করা পছন্দ করি না। আমি সেই মর্মে সুরেনবাবুকে লিখব। তাঁর যোগ্যতা কি আছে তা তিনি সহজেই লিখিত ভাবে পেশ করতে পারেন, তার চেয়ে বেশী আমি আর কি বলতে পারি? সম্ভবত আমাকে নয়, অস্থায়ী C. E. O-কে তাঁর মতামত সরকারীভাবে জানাতে বলা হবে। বোধকরি প্রার্থী-দের ইন্টারভিউ করবে এবং তাদের মতামত স্থির করবে। সুরেনবাবু ছিলেন একজন রায়সাহেব, মাদারিপুরের একজন প্রভাবশালী আইনজীবী, প্রায় বারো বছর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি জেলে গিয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের জন্য কাজ করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি মাদারিপুরে ত্রাণকার্যের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বছর দুই আগে কোন একটি চাকরীর জন্য দরখাস্ত করেছিলেন এবং সে সময়ে তাঁর সার্টিফিকেটের মূল কপিগুলি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি বাড়িতে আমার চিঠি ও কাগজপত্রের সঙ্গে সেগুলি রেখেছিলাম। অনুসন্ধানের পর পুলিশ সেগুলি নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। সে যাই হোক, এগুলি সেখানে থাকা সম্ভব। রাঙামামাবাবু শেষ যখন এখানে এসেছিলেন তখন আমি তাঁকে সেগুলির কথা বলে-ছিলাম, এবং অনুরোধ করেছিলাম তিনি যেন সার্টিফিকেটগুলো খুঁজে বের করে শ্রীযুক্ত সেনকে ফেরৎ দিয়ে দেন। তিনি বোধহয় ব্যাপারটির কথা ভুলে গেছেন। কাউকে বলবেন, আমার ঘরে এগুলো খুঁজে দেখতে।

শ্রীযুক্ত সেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি, তাঁর সম্বন্ধে আমার সঠিক কোন ধারণাও নেই।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আমি যখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তখন অধ্যাপক বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন, এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাস করেন (যদি আমার সঠিক মনে থাকে); এবং লেকচারার হিসেবেও তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা ভালই। তাঁর পদ ছিল অস্থায়ী, তাই তিনি রঙপুরের কার-মাইকেল কলেজে চলে যান। রঙপুরে ইউরোপীয় অধ্যক্ষ ও জেলাশাসকসহ কর্তৃপক্ষের

সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধে। এই বিবাদ বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয় এবং শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় জেলা শাসকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনেন। মামলার বিশদ বিবরণ বা তার পরিণতি আমার মনে নেই। এই বিবাদ চলাকালীন অবস্থায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কলেজ ছেড়ে দেন (বা তাঁকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়; কোনটা ঠিক জানি না) এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। অসহযোগী হিসেবে তাঁর কাজ মোটামুটি রঙপুর জেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে তিনি জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতি অর্জন করেন। আন্দোলনের সময় তিনি কারাবরণ করেন। রঙপুর থেকে তাঁকে বদলী করা হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, তখন দেশবন্ধু ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমি সেখানে ছিলাম। আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন গোঁড়াপন্থী এবং আমি বলব একজন কঠোর অসহযোগী। তিনি জুতো পরতেন না, বিলিতী নুন খেতেন না, এবং গান্ধী-টুপি পরতেন। বছরখানেক তিনি জেলে ছিলেন। ছাড়া পাওয়ার পর তিনি জনসমক্ষে ছিলেন না এবং তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। মোটের উপর তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা তিনি একজন দক্ষ, সাধাসিধে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সম্ভবত তিনি তাঁর হাস্যরস হারিয়ে ফেলে বড় বেশী গম্ভীর প্রকৃতির হয়ে পড়েছিলেন। তবে এখন তিনি কি রকম, সে সম্বন্ধে আমার কোনই ধারণা নেই। আমি জানি না অন্যান্য প্রার্থীরা কারা। তবে এই কাজের জন্য তাঁর চাইতে অধিকতর দক্ষ প্রার্থী পাওয়া সহজ হবে না। আপনি জানতে না চাইলে, আমি এত সব কথা লিখতাম না।

আমি এই চিঠি আর দীর্ঘ করব না, কারণ আমি চাই এটি তাড়াতাড়ি পাঠাতে। পরের বুধবার আপনাকে আবার লিখব।

আশা করি আপনাদের সকলের কুশল।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৫৮

মান্দালয়
১১. ৮. ২৬
বুধবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আমার ৭. ৮. ২৬ তারিখের চিঠিতে আপনার গত তিনটি চিঠির সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিলাম। আজ, আপনার চিঠিতে উল্লেখিত হয়েছে, এমন কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

জোন্‌স, রে নাইটকে যে সব কাগজ এবং চিত্রিপত্র পাঠিয়েছিল, আমি সেগুলি ভাল করে পড়েছি। মিঃ ডানের প্রস্তাব মত, ইংলিশম্যান এবং স্টেট্‌সম্যান বেঙ্গল গভর্নমেন্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কি না ভাবছি। এটি লক্ষ্য করার মতন বিষয় যে মিঃ র‍্যাটিগান, মিঃ হোসের এবং ইন্ডিয়া অফিসের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়ার আশায় পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের অনুরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ বিফল হন নি। মিঃ হোস বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে দেওয়ার জন্য যে খসড়া টেলিগ্রামটি লিখেছিলেন, জানি না লর্ড বারকেনহেড-ও তাতে সম্মতি জানিয়ে এটি পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না। সমস্ত ব্যাপারটিই অত্যন্ত উৎসাহ-ব্যঞ্জক, কেননা, এর মধ্যে দিয়েই ইন্ডিয়া অফিস এবং অ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ান খবরের কাগজগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা যাচ্ছে।

অর্ডিন্যান্স এবং রেগুলেশানের কপিগুলি যিনি সরবরাহ করেছিলেন, সেই লর্ড ইভান্স ব্যক্তিটি কে? তিনি কি 'আন্ডার সেক্রেটারী?'

জোনসের মন্তব্য যে "some Indian judges are scarcely to be trusted more than Indian juries"—প্রণিধানযোগ্য।

• আর একটি মন্তব্য যে "true is no documentary evidence against Bose but only the testimony of highly credible witness etc"—খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মোটের উপর, স্টেটসম্যানের বিরুদ্ধে যে মামলাটি এখন মুলতুবী আছে, সেই মামলায় এই সব কাগজপত্র আমাদের অনেকভাবে উপকারে আসতে পারে।

(ডি আই জি, আই বি,, সি আই ডি, বেঙ্গল এই চিঠির কিছু অংশ কেটে দিয়েছেন।)

বেঙ্গল কাউন্সিলের নির্বাচনে আপনি কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন? যদি করেন, তাহলে

কোথা থেকে? বেহালার সুরেন্দ্রনাথ রায়ের কি কেউ বিরোধিতা করছেন? আমার মনে হয় তিনি এখন ২৪ পরগণার সদর, বারাসত, বসিরহাট মহকুমার মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি।

বাৎসরিক অনুদানের প্রশ্নটি আবার উঠলে, আশা করি আপনি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের কথা ভুলবেন ন। সময় থাকতে, সন্তোষবাবু এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন।

হ্যাঁ, চক্রবর্তীর বন্ড-সই করার ব্যাপারটি সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। সত্যবাবু এখন বিচারের সম্মুখীন। যদি তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে অক্ষত অবস্থায় নিজেকে বের করে আনতে পারেন, তবে তাঁর ভবিষ্যত তৈরী হয়ে যাবে। ঈশ্বর তাঁকে এ ক্ষেত্রে শক্তি দিন। এই মামলায় আপনার আবির্ভাব এবং যে অভিনব রাস্তা আপনি গ্রহণ করেছেন, তা নিশ্চয় সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। এখানেও ব্যাপারটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে—রেগুলেশনের নিয়ম অনুসারে যিনি আমাদের সরকারী পরিদর্শক, সেই ডেপুটি কমিশনার কয়েকদিন আগে যখন এখানে এসেছিলেন, তখন এই বিষয়টির উল্লেখ করছিলেন। সত্যবাবুর পরিবর্তে অন্য একজনকে খোঁজার সময় হয়েছে।

ভবিষ্যতে মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ রাহাজানি-মামলা আপনার হাতে না নেওয়ার কোন কারণ নেই। হাইকোর্টে এই ধরণের মামলার দিকটা এতই দুর্বল যে, নতুন প্রতিভার আবির্ভাব অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ ব্রাউন, কমিশনার হয়ে আরাকানে বদলী হয়ে গেছেন। অফিসার হিসেবে তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ, আর তাঁর ব্যবহার ছিল চমৎকার। তিনি এবং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দু-জনে লক-আপ আইনকে মুলতুবী রাখার চেষ্টা করেছিলেন, এবং তাঁদের জন্যই স্থানীয় সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত হন। দেখে শুনে মনে হল নবাগত ব্যক্তিটির ব্যবহারও ভদ্র।

তাঁর পেশার কাজের বাইরে ডঃ জে এম দাশগুপ্ত আজকাল কি কাজ করছেন? তিনি কি রাজনীতি করা ছেড়ে দিয়েছেন? কাউন্সিল নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হচ্ছেন না? বিজয় ক কা কি বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে দাঁড়াচ্ছেন? ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা থেকে কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন?

আপনাকে লেখা আমার চিঠিগুলি সংরক্ষণ করা হলে ভাল হয়। পরে এগুলি উপকারে আসতে পারে।

কাগজে পড়ে বিস্মিত হলাম যে, মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানপদে শ্রী শাসমলের নির্বাচন গভর্নমেন্ট অগ্রাহ্য করেছেন। গভর্নমেন্ট যদি একটি জেলা পরিষদের বিষয়ে এভাবে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে অন্যান্য জেলা পরিষদগুলি এবং মিউনিসিপ্যালিটিতেও তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন না এমন কোন কথা জোর করে বলা যায় না।

ছোটদাদা ফিরে এলে, নাদুমামার খবর জানাবেন। নাদুমামা এখন কি করেছেন? ফিরে এসে কি ছোটদাদা বেলগাছিয়াতে যোগ দেবেন?

গোয়ের কোন খবর আছে? সে কি কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারল?

সমুদ্রোপকূল থেকে ৩৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত মেমিও একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। স্থানীয় গভর্নমেন্টের এটি গ্রীষ্মকালীন-কার্যালয়। আমি শুনেছি, সেখানে আবহাওয়া মনোরম, পানীয় জল সুস্বাদু এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। অনেক দিক থেকে জায়গাটি দার্জিলিঙের মতন। জায়গাটি বাস করার পক্ষে দুর্লভ সন্দেহ নেই, বাড়ি ভাড়াও মোটের উপর সস্তা। ফলের গাছে আচ্ছাদিত জায়গাটিতে সারাবছর ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি পাওয়া যায়। মান্দালয় এবং মেমিওর মধ্যে একটি সড়ক আছে; লোকে অনবরত গাড়ী চড়ে সে রাস্তা দিয়ে ওঠা-নামা করে। দিনের বা মাসের হিসাবে শুনেছি ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। মেমিও শহরটা প্রধানত দু-ভাগে বিভক্ত—'সিভিল লাইন্স'—এখানে সব বিলাসবহুল বাড়িগুলো আছে, আর এর মাইলখানের দূরে সদর শহর। বাজারটি শহরের মধ্যে। স্থানীয় জায়গা থেকেই রান্নার লোক এবং চাকর পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। মিঃ গাঙ্গুলী নাকে এক ভদ্রলোক জায়গাটির একজন নামকরা আইনজীবী, তিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও বটেন। প্রথম সারির উকিলদের মধ্যেও কয়েকজন বাঙ্গালী আছেন, আর 'আপার বার্মা টেনিস' চ্যাম্পিয়ন হলেন মেমিওর দুই বাঙ্গালী ভদ্রলোক; মৈত্র-ভ্রাতৃদ্বয়।

আপনার নির্ধারিত সিংহল যাত্রা যদি বাতিল হয়ে যায় এবং আপনি যদি মেমিওতে

আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে দয়া করে আমাকে একটি তার পাঠাবেন, যাতে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে রাখতে পারি। সুসজ্জিত বাঙ্গলো বাড়ি পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। দিন পনেরোর মতন সময় পেলে আমি প্রয়োজনীয় আয়োজন করে উঠতে পারব বলে মনে হয়। আমাকে সম্পূর্ণভাবে অন্যদের উপর নির্ভর করতে হবে বলে যথেষ্ট সময় চাইছি। আপনি মেমিওতে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে, এখানে এলে আমার সঙ্গে মাঝে-মাঝেই সাক্ষাৎকারের সুবিধা পাওয়া যাবে কি না, সরকারের সঙ্গে তা ঠিক করে আসা বাঞ্ছনীয়। সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা প্রতি সপ্তাহে একটি সাক্ষাৎকার করতে পারি। যেহেতু কদাচিৎ আমরা এই অধিকার ব্যবহার করে উঠতে পারি; সেহেতু আপনি মেমিওতে এলে কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধে দেওয়াই সঙ্গত। সাক্ষাৎকারের বিষয়ে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট যদি কোন ব্যবস্থা করেন, বার্মা সরকার তাতে কোন আপত্তি জানাবেন বলে মনে হয় না।

মেমিও সম্পর্কে আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলে আগামী শুক্রবার আবার আপনাকে লিখব, কেননা শুক্রবার ডাকের দিন।

আপনি মেমিওতে এলে, মেজবৌদিদি ও ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে আসবে বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে স্টীমারের ভাড়া যে বেশ বড় রকমের হবে সেটা মনে রাখা দরকার। আপনি এখানে এলে, আপনার পেশাগত উপদেশের প্রয়োজন হবে কি না জানি না।

সন্তোষবাবুর চিঠি পড়ে বিস্মিত হলাম যে হেলথ কমিটি অষ্টাঙ্গর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের জন্য ৫০০০ টাকা, বাইরের কাজকর্মের জন্য ৩০০০ টাকা এবং ১৫০০০ টাকা মূল অনুদান হিসেবে মঞ্জুর করেছে, অথচ বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের জন্য সর্বমোট ৩২০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। গতবছর অষ্টাঙ্গকে ৩৫০০ টাকা এবং বৈদ্যশাস্ত্রপীঠকে ২৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করার কথা উল্লেখ করে, হেলথ কমিটির কাছে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে কর্পোরেশন ঠিক-ই করেছে। আমার মনে হয় যে ই জি পি কমিশনের এই অবস্থায় এগিয়ে আসা উচিত এবং হেলথ কমিশনের মঞ্জুরি বৃদ্ধির প্রস্তাবটি ব্যর্থ করা উচিত। সে যাই হোক, আপনারা যদি যামিনীবাবুর গোষ্ঠীর দৌত্য ব্যর্থ করতে চান, তবে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিন। হেলথ কমিশন কেবল একটি কলেজের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন, এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে ন্যক্কারজনক। ভয় হয়, হেলথ কমিশন হয়ত তাদের প্রথম প্রস্তাবটিই আবার উত্থাপন করবে; এবং বিষয়টি কর্পোরেশনের প্রায়শূন্য কক্ষে পাশ হয়ে যাবে। আপনি কলকাতা ছাড়ার আগে এ বিষয়ে যা করার করে আসবেন।

এখানেই শেষ করছি। পরের চিঠিতে আরও লিখছি।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৫৯

মান্দালয়
১৩. ৮. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ৬ই আগস্টের চিঠি ১১ তারিখে পেয়েছি। আমি ঠান্ডা মাথায় বিষয়টি চিন্তা করে দেখেছি, নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নিয়ে আপনাকে ভেবে দেখতে বলছিঃ—

১। আমি কাউন্সিলগুলি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছি, কারণ আমি লক্ষ্য করে দেখছি যে সব লোক সেখানে যান তাদের দেশের জন্য সত্যিকার কাজ করবার কোনই ইচ্ছে নেই। কাউন্সিল-বিরোধী কার্যকলাপ আবার শুরু করার সময় এসেছে।

২। আমার দাঁড়ানো যদি নিতান্তই প্রয়োজন বলে মনে হয়, কলকাতা শহর বা প্রেসিডেন্সি ডিভিশন থেকে এসেমব্লীতে নির্বাচিত হলে তার গুরুত্ব বেশী হবে না কি? আমার নাম ভোটের তালিকায় না থাকলেও, কোন লিমিটেড্ কোম্পানী বা কর্পোরেশনের পক্ষে ভোট দেবার অধিকার হয়ত আমার থাকতে পারে।

৩। আমার নির্বাচনের জন্য যদি অনেক অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে এম-এল-সি হওয়ার বিলাসিতা আমি ভোগ করতে চাই না।

৪। পরবর্তী কাউন্সিলে আমার থেকে আপনার থাকাটা অনেক বেশী জরুরী। আপনার জেতার ভাল সম্ভাবনা থাকলে, উত্তর কলকাতা থেকে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে

আমি খুশী হব, অবশ্য যদি তার চেয়েও ভাল কেন্দ্র আপনি না পান।

৫. আমার নির্বাচনী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে, এমন নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির কথা আমার মনে আসছে না। সমস্ত হবু এম এল সি-গণ নিজেদের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, এবং নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ নির্বাচনী এজেন্টের অভাবে হয়ত আমি ভরাডুবি হব।

৬. আপনার স্বাস্থ্য আমার কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়ার চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভয় হয়, আমি যদি প্রার্থী হই তাহলে যাবতীয় ভার আপনার কাঁধে এসে পড়বে, সেক্ষেত্রে আপনার আর বাৎসরিক বিশ্রাম নেওয়া হবে না। আপনার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করলে, তা হবে মারাত্মক।

৭. কিরণবাবু ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা যে আমাকে প্রার্থী হিসেবে চান তার কি গ্যারান্টী আছে? এখন পর্যন্ত আমার প্রার্থীপদ নিয়ে তাঁদের বিশেষ উৎসাহ আছে বলে মনে হচ্ছে না। কাউন্সিল অব্ স্টেট নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি হবে না কি?

৮. শেষে উল্লেখ করলেও এ কথা বলা কর্তব্য যে উপেনবাবু বা তাঁর দলের অন্য কারুর প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আমি কিছুতেই উত্তর কলকাতার আসনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে পারি না। এমন কি, এসেম্ব্লী বা কাউন্সিল কোনটিতেই আমি প্রার্থী হতে পারি না যদি কর্মী সঙ্ঘের নেতৃবর্গ আমার প্রার্থীপদ সুনজরে না দেখেন।

এ সব সম্ভাবনা আমি বর্তমানে ভেবে দেখছি। এগুলি বিবেচনা করে দেখবেন এবং যদি আপনি মনে করেন যে জনসাধারণের স্বার্থে আমার নির্বাচনে দাঁড়ানো প্রয়োজন কিংবা আমার নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করবে, তাহলে সেইমত আমাকে জানাবেন; আমি আপনার কথা মেনে চলব। বহির্জগতের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল নই, তাই শেষ কথা আপনার হাতে সঁপে দিয়েছি। কাউন্সিলের কাজ আমার C. E. O-র কাজে কোন ব্যঘাত ঘটাবে না বলে আপনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা নিষ্প্রয়োজন। আগামী মে মাসেই আমার C. E. O-র কাজেরও মেয়াদ শেষ হবে, এবং ততদিন পর্যন্ত যে আমি এখানেই থাকব সে বিষয়ে আপনি স্থিরনিশ্চিত থাকতে পারেন।

আমার প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে দেখার পরও যদি মনে করেন আমার নির্বাচনে দাঁড়ানো উচিত, দয়া করে একটি তার করবেন। অন্যথায় আমি ধরে নেব যে, বিষয়টি একেবারেই চাপা পড়ে গেছে।

পরের চিঠিতে আপনাকে মেমিও সম্পর্কে লিখব। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৬০

মান্দালয়
১৬. ৮. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

ক্যাপ্টেন স্মিথের সঙ্গে কয়েকদিন আগে আমার মেমিও (Mamyo) সম্পর্কে কথা হয়েছে, এবং তাঁর কাছ থেকে আমি যা জানতে পেরেছি তা এইরকম। দার্জিলিং-এর মতন, মেমিও ততটা মনোরম নয়। সেপ্টেম্বরে এর আবহাওয়ায় আর্দ্রতা থাকে, কিন্তু অক্টোবরে, বিশেষ করে শেষের দিকে এবং নভেম্বরে, শুষ্ক থাকে। সরকারী দপ্তর অক্টোবর মাসে মেমিওতে উঠে আসে এবং দেড় মাসের জন্য থাকে (আগের চিঠিতে লিখে-ছিলাম এক সপ্তাহ, তা নয়)। স্থানটির জলও বিশেষ ভাল নয়। সেখানে লোকে প্রায়ই পেটের ব্যাধিতে ভোগে (অনেকে অসুখটির নাম দিয়েছেন Maymiyitis)। এতৎসত্ত্বেও মোটের উপর জায়গাটি সুন্দর এবং সেখানে গেলে লোকের ক্ষিদে বাড়ে। ক্যাপ্টেন স্মিথ নিজে মেমিও খুব পছন্দ করেন, এবং প্রায়ই সপ্তাহের শেষে ছুটি কাটাতে সেখানে যান। তাঁর ধারণা, মেমিওর উত্তরে উপরের দিকের জায়গাগুলি আরও মনোরম, যদিও সেগুলি ঠিক রাস্তায় পড়ে না। মেমিওর বিশেষ সুবিধা হল এই যে, তাকে কেন্দ্র করে, ইরাওয়াদীর (Irrawady) উপরে ও নীচে বেড়াতে পারা যায়, উপরে ভামো বরাবর এবং নীচে প্রোম-এ। আমার এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য যে ইরাওয়াদীতে নিয়মিত স্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা আছে এবং নদীতে ভ্রমণ সবিশেষ সুবিধেজনক।

ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে আপনার মেমিও যাত্রা সম্পর্কে মনস্থির করা শক্ত। মেমিও যে মোটের উপর একটি স্বাস্থ্যকর স্থান এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। একথাও সত্যি যে, বর্মায় যাওয়া-আসার পথে সমুদ্রযাত্রা এবং ইরাওয়াদীতে স্টীমার-ভ্রমণ হয়ত কিছুটা উপকারী। নতুন দৃশ্যাবলী, নতুন মুখ এবং নতুন অভিজ্ঞতা, হয়ত আপনাকে উৎসাহিত করবে। যখন মেমিও আর ভাল লাগবে না, (যদি আদৌ তেমন হয়), সেক্ষেত্রে আপনি অনতিদূরেই অন্যান্য আকর্ষণের জায়গাতেও যেতে পারবেন। এতৎসত্ত্বেও আমার মনে হয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আপনাকে আপনার বর্তমান কাজকর্ম ও দায়িত্বের কথা ভেবে দেখতে হবে। দার্জিলিং কিংবা কার্সিয়ঙ বেছে নেবার বিশেষ সুবিধে এই যে, জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে আপনি অনায়াসেই কলকাতায় নেমে আসতে পারেন। তাছাড়া, সেখানে থাকলেও, আপনি কলকাতায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারবেন। আপনি যদি কাউন্সিলের নির্বাচনে প্রার্থী হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আমার মনে হয় আপনার পক্ষে বাঙলাদেশ ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

খুকুর নতুন আত্মীয়স্বজনদের আপনাদের সকলের পছন্দ হয়েছে জেনে ভাল লাগল। মেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে মেজদিদি সর্বদাই ভাগ্যবতী।

পাটনা থেকে লিখিত দেশবন্ধুর একটি চিঠি এখানে আমার কাছে আছে। সম্ভবত এটিই আমার একমাত্র চিঠি, এবং এটি আমি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সংরক্ষণ করতে চাই। একটি পাতার দুটি পৃষ্ঠাতেই এই চিঠিটি লেখা। এই চিঠিটির ছবি তুলে রাখবার জন্য এটিকে কলকাতায় পাঠাবার কথা ভাবছি। তাহলে আমরা ছবিগুলি সুদৃশ্য ফ্রেমের ভিতর রেখে, সযত্নে তাকে রক্ষা করতে পারি। এই চিঠিটি নিয়ে আমি কি করব, দয়া করে সে বিষয়ে আপনার মতামত জানাবেন। আমি মূল চিঠিটিও রক্ষা করতে চাই, যাতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালি আবছা না হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন স্মিথকে আপনি যে টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন, গতকাল সেটি তিনি পেয়েছেন এবং আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন।

২৩. ৮. ২৬
সোমবার
সকাল দশটা

মেমিওর বিষয়ে, বিশেষত সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে সেখানকার আবহাওয়া কেমন থাকে, তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি আবার আলোচনা করেছি। তাঁর ধারণা সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সেখানে অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এবং কেউ যদি মেমিওতে মাত্র দুই-এক মাস থাকে, তাহলে তার কোলাইটিস হওয়ার ভয়ও নেই। জায়গাটি সম্পর্কে আমি পুনরায় আশ্বস্ত হয়েছি, এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে একটি সুসজ্জিত বাংলোর বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করার চেষ্টা করছি, এই মর্মে একটি তার সুপারিন্টেন্ডেন্টের মাধ্যমে আমি এখুনই প্রেরণ করছি। সম্ভবত বাড়ি ভাড়া আগাম মিটিয়ে দিতে হবে, এবং বাড়ি ঠিক করার ব্যাপারে কাউকে মেমিওতে পাঠানোর খরচও আমাকে বহন করতে হবে। ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ হলে আমি আবার আপনাকে তার করব, এবং প্রয়োজন হলে টাকার জন্যও।

অনুগ্রহ করে, বিষয়টি পুনরায় ভেবে দেখবেন, এবং ভেবে দেখার সময় আপনার কাজকর্মের কথা চিন্তা করবেন। দার্জিলিং কিংবা কার্সিয়ঙে গেলে আপনার পক্ষে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব, এবং জরুরী কাজে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনও। চিঠি পেতে দেরী হয় বলে, এখানে আপনি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন না। তদুপরি, আমি নিজে যখন ব্যবস্থা করি নি, তখন আপনি এই রকম অদ্ভুত জায়গায় স্বস্তি বোধ করবেন বলে আমার কখনোই বিশ্বাস হয় না। দার্জিলিঙ ও কার্সিয়ঙের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন ঝুঁকি নেই। মান্দালয়-রেঙ্গুনের মধ্যে যোগসূত্র গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছিল। আমাদের চিঠিপত্র পাঠানো স্থগিত থাকায়, তাই এতদিন এই চিঠিটি আমি পোস্ট করি নি। অবশ্য আজ আমি এটি পোস্ট করব, এবং ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখব। আমি শুনেছি যে পুনরায় যাত্রী চলাচল শুরু হতে সপ্তাহখানেক সময় লাগবে। যদি কোন কারণে আপনি মনে করেন যে আপনার মেমিও যাত্রা স্থগিত রাখা প্রয়োজন কিংবা বাঞ্ছনীয়, দয়া করে তাহলে তা করতে ইতস্ততঃ করবেন না। মেমিও আসার জন্য, কোনমতেই নিজেকে অসুবিধেয় ফেলা বা দরকারী কাজকর্ম বিসর্জন দেওয়া আপনার উচিত হবে না, এই মনে করে আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন আছি। সত্যি কথা বলতে কি, এ সবের বিনিময়েও আপনি

যদি মেমিও যাত্রা স্থির করেন, আমি দুঃখিত হব। আমার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বা ভীত হওয়ার কোনই কারণ নেই।

যতক্ষণ না পর্যন্ত এই চিঠিটি পড়ে, আপনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখছেন, ততক্ষণ সমস্ত বন্দোবস্ত করেও আমি আপনার মেমিও যাত্রা 'পাক্কা' বলে মনে করছি না।

আপনাকে যদি হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদল করতে হয়, আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে অগ্রিম বাড়ি ভাড়ার টাকা খোয়া গেলেও, তা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৬১

মান্দালয়
২৬. ৮. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

গত সোমবার আপনাকে শেষ চিঠি লেখার পর মেমিও সম্পর্কে আর কোন খবর পাই নি। আমি প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালাচ্ছি, এবং এই সপ্তাহের শেষদিকে কাউকে সেখানে পাঠাব। আগামী সোমবার কিংবা মঙ্গলবার, সম্ভবত আপনাকে আমি একটি তার পাঠাতে সক্ষম হব। এর আগে আপনাকে লিখেছি যে এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও, আমি যেমন বলেছি সেইভাবে পুনরায় আপনার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা উচিত। আপনি যদি নিজেকে অসুবিধের সম্মুখীন করে এবং জনসেবামূলক কাজ স্থগিত রেখে, মেমিওতে আসেন আমি দুঃখ পাব। আপনার অনুপস্থিতিতে ফরোয়ার্ড মামলার কি হবে? পুজোর আগে যদি কোন বিরূপ রায় দান করা হয়, সেক্ষেত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে শূন্যপদ পূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দীর্ঘ ছুটিতে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকবে, যেগুলিতে মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং আপনি যদি কার্সিয়ঙ বা দার্জিলিঙে থাকেন তা হলে সেই সব বিষয়গুলির প্রতি সুবিচার করতে পারবেন। এমন কি যদি বাড়ি ভাড়া ঠিকও হয়, তাহলে শেষ মুহূর্তেও সিদ্ধান্ত বদল করতে আপনি ইতস্ততঃ করবেন না, যদি আপনার মনে হয় যে নিজের সুবিধের জন্য বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে আপনার তেমনটি করা দরকার।

তাহলে, শেষ পর্যন্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। ময়মনসিংহের বাংলা সাপ্তাহিক চারুমিহিরে, পুনঃ প্রকাশিত, তাঁর বিখ্যাত চিঠির বঙ্গানুবাদের এক-টুকরো অংশ পড়ে আগ্রহ বোধ করলাম।

জেনে বিস্মিত হলাম যে, মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে মিঃ শাসমলের নির্বাচন গভর্নমেন্ট বাতিল করে দিয়েছেন এবং দেবেন্দ্রলাল খানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। সমস্ত স্থানীয় সংস্থার কাছে এটি একটি খারাপ নজির হয়ে থাকবে, এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের মূল শর্তও এক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে। এই রকম কাজ করার জন্য গভর্নমেন্ট কি কোন কারণ দেখিয়েছেন?

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের কাজ কি রকম চলছে? প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব কাদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে? প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কি কোন ট্রাস্টির হাতে না তার চাইতে ক্ষুদ্রতর কোন গোষ্ঠীর?

মফঃস্বলে এত রকম সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার একটি কারণ হল, মফঃস্বলের কথা কলকাতার নেতৃবর্গ একরকম ভুলেই গেছেন। তাঁরা কদাচিৎ বাইরে যান, এবং তাঁদের ও মফঃস্বলবাসীর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ কোন সম্পর্ক নেই। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও মারদাঙ্গা বাঁধানো যাঁদের উদ্দেশ্য, কেবল মাত্র তাঁরাই মফঃস্বলবাসীদের মধ্যে কাজ করছেন, তাই ফল স্বভাবতই এমন সর্বনাশা। কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দও তাঁদের নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে সেবামূলক কাজ করার প্রয়োজনীয়তা কদাচিৎ উপলব্ধি করেন। নেতৃবর্গ যদি জনসেবা-মূলক কাজে আরও বেশী সময় না দেন এবং সক্রিয় না হয়ে ওঠেন, তাহলে এ সমস্যার কোন প্রতিকার হবে বলে আমার মনে হয় না।

দেশবন্ধু পল্লী পুনর্গঠন কমিটি কেমন কাজ করছে? কতগুলি জায়গায় তাঁরা এখন কাজ করছেন? তাঁরা কি সঞ্চিত মূলধন থেকে অর্থ সংগ্রহ করছেন, না সুদের টাকাই কেবল-মাত্র ব্যয় করছেন?

আমার দৃঢ় অভিমত এই যে সম্প্রদায়ভিত্তিক ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী উঠে

যাওয়া আবশ্যক। ইংলন্ডে জনমত এই ধারণার ক্রমশ অনুকূলে আসছে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমার সঙ্গে রেঙ্গুনের সংবাদপত্রের একটি কাটিং আছে, যাতে এই বিষয়ে Manchester Guardian-এর নেতার মতামতের অংশবিশেষ ছাপা হয়েছে। Manchester Guardian-এর মতামত যুক্তিপূর্ণ। তদুপরি, যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি আসন মুসলমানদের জন্য আলাদা করে রাখা হয়, তাহলে মুসলিম স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার কোনই আশঙ্কা থাকবে না এবং মিশ্র নির্বাচকমণ্ডলীর পরিকল্পনায় বহুসংখ্যক মুসলমান আমাদের সমর্থন করবে বলে আমরা আশা করতে পারি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকৃত অশুভ পরিণতিগুলি উপলব্ধি করতে পারলেই, আমার বিশ্বাস মুসলমান মতামত ক্রমশ, এই ধারণার নিকটবর্তী হবে। এই চিঠির সঙ্গে, উপরে উল্লেখ করা কাটিং-টি আপনাকে পাঠাচ্ছি।

আপনি কি জানেন 'আত্মশক্তি' কেমন চলছে? এখন এর সম্পাদক কে, কোন নীতিই বা এটি অনুসরণ করছে? অর্থনৈতিক দিক থেকে এই কাগজের কি উন্নতি হচ্ছে. কিংবা প্রভাবের দিক থেকে?

আমার প্রার্থীপদ বিষয়ে, আমার জেলের একজন সহ-বন্দী নলিনীবাবুকে একটি চিঠি লিখেছেন। যদি নলিনীবাবু এই চিঠির উল্লেখ করেন, আপনি তাঁকে বলবেন যে এই চিঠি লেখায় আমার কোনই হাত নেই, এবং তাঁর চিঠি লেখার আমি নিশ্চিত বিরোধী ছিলাম, যদিও চিঠিটির বিষয়বস্তুর যাথার্থ্য সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন বলে আমার মনে হয় না।

আপনি যদি মেমিও আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে গোস্বামী, নলিনীবাবু অথবা অন্যান্য বন্ধুবর্গকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য এক সপ্তাহ বা একপক্ষকাল এখানে কাটিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করতে পারেন। তাঁরা ব্যয়ভার অনায়াসেই বহন করতে সক্ষম, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমরা সবিশেষ আনন্দিত হব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, যাত্রার আগে, আপনি এখানে সত্যেনবাবু, সুরেনবাবু, (মোহন ঘোষ) এবং অন্যান্য সহ-কারা-বন্দীদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারেন।

আপনি বোধহয় জানেন যে বর্তমান নিয়মানুযায়ী আমরা সপ্তাহে মাত্র একটিমাত্র সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাই। গভর্নমেন্টের বিশেষ অনুমতি পেলে যতবার খুশী সাক্ষাৎ করা যায়, এবং আপনার বোধহয় মনে আছে যে আমি যখন কলকাতার জেলে ছিলাম তখন রোজই সাক্ষাৎ করতাম। সাধারণভাবে এই অধিকার আমাদের থাকে না, এ কথা চিন্তা করে, আমার পক্ষে একথা মনে করা সঙ্গত যে আপনি যদি মেমিও আসা স্থির করেন, বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট সেক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের সংখ্যার বিষয়ে বিশেষ সুবিধে দেবেন। বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট আপত্তি না করলে, যতগুলি সম্ভব সাক্ষাৎকারের সুযোগ দিতে স্থানীয় গভর্নমেন্ট কোন আপত্তি করবেন বলে আমার মনে হয় না। সে যাই হোক, কলকাতা ত্যাগের আগে আপনি বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের সঙ্গে এ সব বিষয় স্থির করে আসবেন। আপনার যাত্রী-দলের সকলের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিষয়ে বিশেষ অনুমতি নিতে দয়া করে ভুলে যাবেন না।

আপনার জন্য যদি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়, দয়া করে একটি তার পাঠাবেন (যেমন ঠাকুর ও চাকর জোগাড় করা, কিংবা সবসময়ের জন্য একটি ট্যাক্সি ঠিক করা. ইত্যাদি)। আমার মনে হয় আপনি সঙ্গে করে সব বাসনপত্র ইত্যাদি নিয়ে আসবেন।

আপনি আপনার সঙ্গে কিছু সন্দেশ ও দার্জিলিঙের চা আনবেন। মেমিও যাবার পথে আপনি মান্দালয় স্টেশনে পৌঁছলে, এবং যদি আপনার সঙ্গে আমাদের জন্য চা কিংবা সন্দেশের কোন পার্সেল থাকে তো আপনার সঙ্গে দেখা করে সেটি সংগ্রহ করার জন্য, আমরা একজন জেলার বা ওয়ার্ডারকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে পারি। আমার মনে হয় না, মেমিও যাওয়ার সরাসরি কোন ট্রেন আপনি পাবেন; মান্দালয় স্টেশনে বদল করতে হবে। এবং এখানে এক ঘন্টার বিরতি।

এম এ ডিগ্রীর জন্য আপনি কি কেম্ব্রিজে টাকা পাঠাতে পেরেছেন?

আশা করি আপনি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের কথা বিস্মৃত হবেন না। যামিনীবাবু হঠাৎ মারা যাওয়ায় আমি দুঃখিত হয়েছি। কেউ এমনটি আশা করেনি, বিশেষ করে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স যথেষ্টই কম ছিল। লোকে যে এখন তাঁর সম্পর্কে সহানুভূতি প্রদর্শন করবে, তা খুবই স্বাভাবিক, এবং তাঁর বন্ধুবর্গ অষ্টাঙ্গ স্কুলের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী মঞ্জুরি লাভের উদ্দেশ্যে এই সমবেদনাকে কাজে লাগাতে পারেন। এই অবস্থায়, স্বাস্থ্য বিষয়ক

কমিটি, অষ্টাঙ্গের জন্য, সর্বমোট ২৩,০০০ টাকা মঞ্জুরির পূর্ব সুপারিশ পুনরায় অনুমোদন করতে পারেন, এমনকি অনুমোদিত মঞ্জুরির পরিমাণ বাড়িয়েও দিতে পারেন। এই সমবেদনার আবহাওয়া থাকাকালীন যদি এই সুপারিশ কর্পোরেশনের সামনে আসে, তাহলে সভা কর্তৃক এটি গৃহীত হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে একত্রীকরণের প্রশ্নটি আবার উত্থাপিত হওয়া উচিত। সর্বশক্তি নিয়োগ করে কোন এক ভাবে একত্রীকরণ করা গেলেই কেবলমাত্র কলকাতায় একটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর আয়ুর্বেদ কলেজ হতে পারে। কেবলমাত্র কলকাতায় একটি প্রথমশ্রেণীর আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেই, আমরা যামিনীবাবুর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত মর্যাদা দেখাতে পারি। এমতাবস্থায় পুনরায় একত্রীকরণের প্রস্তাবটি তোলা সময়োপযোগী বলে মনে হয়। একত্রীকরণ সম্ভব না হলে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের উপর।

আপনি কি মিঃ এস. কে. সেনের সার্টিফিকেটগুলি খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছেন? যদি হয়ে থাকেন, তাহলে দয়া করে তাঁকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন।

শুনলাম মিঃ ভাস্কর মুখার্জী সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি মস্তিষ্কের ব্যাধির আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন। আপনি কি তাঁকে ছুটি দিয়ে দেবেন, না অন্য কাউকে তাঁর জায়গায় বহাল করবেন? ভাস্করের খবর কি, এখন সে আছে কেমন?

শ্রীমতী দাস এখন কোথায় এবং কেমন আছেন? ভোম্বলের বেদনাদায়ক মৃত্যুর পর, ভাস্করের অসুস্থতা তাঁর পক্ষে আরও একটি দুঃখের ঘটনা। দুর্ভাগ্যের এই ক্রমিক গতি কখন এবং কোথায় শেষ হবে জানি না। ঈশ্বর তাঁকে শক্তি দিন!

আশা করি, তাঁর প্রতিষ্ঠান যাতে দিনকে দিন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হয়ে ওঠে, সেদিকে রাঙামামাবাবু দৃষ্টি দিচ্ছেন। সংবাদপত্র প্রথমত এবং প্রধানত একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং তার রাজনৈতিক স্বার্থের চাইতে অর্থনৈতিক স্বার্থ সবসময়ই বড়। অকারণ, দলের কোন অংশের মনোভাব ক্ষুণ্ণ না করে, আশা করি কাগজটি জনমতের স্রোতে ভেসে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, পত্রিকাটির আর্থিক অবস্থা কি রকম? মিঃ আই বি সেন কার্যভার গ্রহণ করার পর কি বেঙ্গলী প্রচুর বাড়াতে সক্ষম হয়েছে?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্রের Revising authority আমাকে নিম্নলিখিত তারটি পাঠিয়েছেনঃ—

"Mr. Subhas Chandra Bose obtained his first degree of (Calcutta University) in 1919 and is therefore not qualified under Rule eleven of Schedule II of the Electoral Rules (quoted in the margin) as an elector for the Calcutta University constituency of the Bengal Legislative Council."

"A person shall be qualified as an elector for the Calcutta University Constituency who has a place of residence in Bengal and is a member of the Senate or an Honorary Fellow of tht University or a graduate of the University of not less than 7 years' standing."

I have the honour to be Sir
Your most obedient servant
Sd/ Ahsanullah

আমার ধারণা অনুযায়ী স্নাতক হওয়ার পর সাত বছর অতিক্রান্ত হওয়াতে, এ বছর আমার ভোটাধিকার থাকার কথা। আপনার কি মনে হয়? যদিও আশু নির্বাচনে আমি প্রার্থী হব না, তবুও ভোটার তালিকায় আমার নাম থাকা বাঞ্ছনীয়। আপনি যদি মনে করেন যে Revising authority-র ব্যাখ্যা ভ্রান্ত, তবে আদালতই তার প্রতিকার করতে পারে—অন্যথায় Revising authority-র সিদ্ধান্তই শেষ কথা।

আপনারা কেমন আছেন? আমি একপ্রকার।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

পুঃ—বাবা কি পাটনা যাবেন? সেখানে তিনি থাকবেন কতদিন?

সু. চ. ব

পুঃ—National Medical Institute-এর চতুর্থ বর্ষে বিপিন উন্নীত হয়েছে। তার

চিকিৎসা বিষয়ক কিছু বইপত্র ও যন্ত্রপাতির দরকার হবে। আমি তাকে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। আপনার যদি প্রয়োজনীয় মনে হয়, তাহলে আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে তার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন, যাঁরা একটি সম্ভাবনাপূর্ণ এবং দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করতে আগ্রহী হবেন।

স. চ. ব

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৬২

মান্দালয়

১. ৯. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২১ আগস্টের চিঠি গতকাল পেয়েছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র সম্বন্ধে আপনার সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি জানার জন্য উদ্বিগ্ন আছি। আমার নির্বাচনী প্রচারের ব্যাপারে আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তা জানতে পারলে আনন্দিত হব। মুখ্য উদ্যোক্তা কে হবেন?

২৭শে আগস্ট তারিখের Statesman-এ পড়লাম যে, ২৬শে আগস্টের স্বরাজ্য-পন্থীদের কাগজে আমার নাম উত্তর কলকাতা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থীরূপে ঘোষিত হয়েছে। ২৭ তারিখের টেলিগ্রামে আমি আমার শেষ কথা জানিয়েছি; এখন আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছি, সে যা-ই হোক না কেন। সলিসিটর, শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোভাব কি, আমি জানতে ইচ্ছুক। গত নির্বাচনে তিনি শ্রীযতীন বসুর মুখ্য নির্বাচনী প্রচারক ছিলেন এবং বাবু হরিশংকর পাল ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-লাল দত্তের। বাবু যোগেশচন্দ্র সেনের লোকেরা শ্রীযতীন বোস বিশেষত তাঁর ভাই-এর উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে গতবারের মতন এবারও বাবু মন্মথনাথ সেন এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন, শ্রী বোসকেই তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে সমর্থন করবেন। আমাদের প্রাক্তন সলিসিটর বাবু মণিমোহন সেনকে তাঁর জামাতা শরৎবাবুর (মিত্র) মাধ্যমে আমাদের দিকে প্রভাবান্বিত করা যায় কি না ভাবছিলাম। আমার মনে হয় যে ডঃ শশীকুমার সেনগুপ্ত আমাদের জানাতে পারবেন ঠিক কোন্ কোন্ লোক গতবার তাঁকে সমস্যায় ফেলেছিলেন। হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাবু যতীন্দ্রনাথ পাল-ও (মনে হয় একজন ব্যবসায়ী) শ্রীযুক্ত যতীন বোসের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। এঁদের যদিবা আমাদের স্বপক্ষে টেনে আনা না যায়, তবুও এঁদের নিরপেক্ষতা আমাদের খুবই সহায়ক হবে।

এক জোরদার প্রচারকার্য শুরু করা ও অব্যাহত রাখা বাঞ্ছনীয়। যদি শ্রীযতীন বোস তাঁর বিরোধী পক্ষের শক্তি উপলব্ধি করতে পারেন (যার সম্মুখীন তাঁকে হতে হবে), এবং যদি তিনি দেখেন যে তাঁর পরাজয় সুনিশ্চিত, তাহলে তিনি হয়ত সম্মানের সঙ্গে তাঁর নাম প্রত্যাহার করবেন। যদি তাঁর পরাজয় মোটামুটি সম্মানজনক হয়, হয়ত তাঁর আক্ষেপের কোন কারণ থাকবে না। কিন্তু গত বছরের সাফল্যের পর, তিনি হয়ত খারাপ ভাবে হেরে যাওয়ার সম্মুখীন হতে চাইবেন না, অবশ্যই যদি তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করে তোলা যায়। সুতরাং যদি আপনি মনে করেন যে আমরা অতি সহজেই জয়ী হব, তবুও জোরদার প্রচার চালানো প্রয়োজন।

আপনার ও আমার নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ামাত্র আমাকে পাঠাবেন। সেগুলি, তাড়াতাড়ি পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে, C. I. D অফিসে প্রেরণ করা যেতে পারে। আপনার নির্বাচন কেন্দ্র সম্পর্কে বলতে পারি যে সমগ্র রাজ্যের লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র সদস্যদের অনুরোধ করলেই, আপনি প্রত্যেকটি বার লাইব্রেরী থেকে যথেষ্ট সংখ্যক নিশ্চিত ভোট পেতে পারেন। আপনার প্রার্থীপদ সমর্থন করার জন্য প্রতিটি জেলায় ও মহকুমায় বার লাইব্রেরীগুলিকে অনুরোধ করা যেতে পারে, এবং অন্তত একজনের দায়িত্ব হবে এইসব বার লাইব্রেরী-গুলির ভোট-সংগ্রহ। অন্যান্য অবস্থা সমান থাকলে, আইনজীবীগণ একজন আইনজীবীকে সমর্থন করবেনই, এবং যে কোন লোক যে সমগ্র রাজ্যের আইনজীবীমহলের সুনিশ্চিত সমর্থন পাবেন, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে জয়ও সুনিশ্চিত। আইনজীবী-গণের পরেই গুরুত্বপূর্ণ হলেন শিক্ষক-সম্প্রদায়। আমি যতদূর জানি, শিক্ষকদের দুটি ইউনিয়ন আছে; একটি সরকারী ইস্কুলগুলির, অন্যটি বেসরকারী ইস্কুলগুলির। তাঁদের সমর্থনও চাইতে হবে। গতবার, হেয়ার স্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক, বাবু ঈশানচন্দ্র

ঘোষ, তাঁর প্রার্থীপদ সমর্থন করা হবে, এই মর্মে শিক্ষক ইউনিয়নে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। প্রচারকার্য শুরু হলে তিনি মঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ালেন, এবং তাঁর প্রত্যাহার অন্যান্য প্রার্থীদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল। যদি কোন কারণে, শিক্ষক ইউনিয়ন সম্মিলিতভাবে আপনার প্রার্থীপদ সমর্থন করতে না-ও পারেন, তবে অন্তত আপনার বিরোধী পক্ষকে সমর্থন করবেন এই মর্মে কোন প্রস্তাব পাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। কে কে সম্ভবত বিরোধী প্রার্থী হবেন আমি জানি না, তবে আমার মনে হয় গতবার যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সেই বাবু দেবপ্রসাদ ঘোষ আবার মঞ্চে আবির্ভূত হবেন। আইনজীবী মহলের কোন সমর্থনই তিনি আশা করতে পারেন না। তাই শিক্ষকদের সমর্থন লাভের চেষ্টায় তিনি কোন কৌশলই বাদ দেবেন না। অতএব তাঁকে সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা আবশ্যক। এটি খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে বিজয়কাকা, গত তিন বছরে শিক্ষকদের স্বার্থরক্ষা করতে বা তাঁদের শান্ত করতে, কিছুই করেন নি। অন্যথায়, স্বরাজ্যপন্থী প্রার্থীকেই সমর্থন করতে হবে, এই পূর্ব ধারণা নিয়েই তাঁরা কাজকর্ম শুরু করতেন। যেখানেই ভোট আছে, সেখানেই স্থানীয় এজেন্ট নিযুক্ত করার জন্য আপনাকে কয়েকজন ভ্রাম্যমান প্রচারক নিযুক্ত করতে হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনি পরে বড় বড় কেন্দ্রে যেখানে অনেক ভোট থাকার সম্ভাবনা যেমন ঢাকায় এবং ময়মনসিংহে যেতে পারেন।

খুলনা নির্বাচন কেন্দ্র সম্পর্কে আপনাকে ইতিমধ্যেই আমি তার করেছি। আপনি যদি ওই আসনের প্রার্থীর নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা না করে থাকেন, তাহলে এখানকার সতীশবাবুর (চন্দ্র চক্রবর্তী) কথাটা ভেবে দেখতে পারেন। কলকাতার লোকেরা যা-ই ভাবতে চান না কেন, তাঁর জয়ের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। তাঁর লোকেরা এ যাবৎ শৈলজাবাবুর সমর্থক, এবং তাঁর (শৈলজাবাবুর) জয়ের পিছনে এঁদের অবদান সামান্য নয়। আমি জানি যে হরেনবাবু (চৌধুরী), শৈলজাবাবুর প্রার্থীপদের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন, কিন্তু শৈলজাবাবুর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলার আছে। আমি জানি না পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেন শৈলজাবাবু এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়কে প্রার্থীর মনোনয়ন দেওয়া হবে। গতবার আমরা শৈলজাবাবুকে সরাতে পারি নি, কারণ আমাদের প্রার্থীটি বিশেষ খারাপ ছিল।

মেমিও-য় হোটেলে থাকার ব্যাপারে আমি এখনও কোন অনুসন্ধান করি নি। আপনি তা-ই পছন্দ করেন যখন, তখন আমি তা-ই করব, এবং কি হল আপনাকে তার করে জানাব। মেমিও সম্পর্কেও আমি আমার মতামত জানিয়েছি। আপনার সুবিধে-অসুবিধের কথা ভেবে দেখবেন, এবং দয়া করে মেমিও আসার ফলে যেন আপনার জনসেবামূলক কাজের ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আগামী মাসগুলি একজন জনসেবকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ! আপনার সঙ্গে শ্রীগোস্বামী এবং শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের সঙ্গে একবার দেখা হলে আমার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। যদি আপনি আসেন, তাঁদেরও সঙ্গে আনার চেষ্টা করবেন, এবং এখানে আমার সহ-বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি পাবার জন্যও দয়া করে সচেষ্ট হবেন। আপনাকে আগেই জানিয়েছি যে, আপনি যদি শেষ পর্যন্ত মেমিও আসার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যতবার সম্ভব আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি পাবার চেষ্টা করবেন। বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেলে আপনি বর্মা সরকার কিংবা I. G. of Prisons কে জানাতে পারেন। প্রায়ই এমন হয় যে, রেঙ্গুনের লোকেদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছুই জানানো হয় না এবং সেটা তাদের অসুবিধের সৃষ্টি করে।

আমার বদলীর বিষয়ে বাঙ্গলা গভর্নমেন্টকে এখন কিছু লিখছি না। যদি প্রয়োজন হয়, আপনার সঙ্গে দেখা করার পর লিখব।

রণেন কাকা কেন অন্তত একজন Incorporated Accountantও হলেন না? তাহলেও কিছু কাজের কাজ হত।

গত শনিবার আমি নিম্নলিখিত বইগুলি পেয়েছি—

১) Corporate life in Ancient India.
২) Dravidian India.
৩) Kshatriya tribes of Ancient India.
৪) Asoka.

৫) History of the Deccan.
৬) Evolution of Indian Polity.
৭) Indo-aryan Races.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্রের Revising Officer-এর বিষয়ে আপনাকে আগেই লিখেছি। যদি আপনার মনে হয় যে ভোটার তালিকায় আমার নাম থাকা উচিত, তাহলে দয়া করে আইনের আশ্রয় নেবেন। ভোটার তালিকায় শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারেও তিনি আপত্তি তুলেছেন। এ'রা উভয়েই গত নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় আসনের ভোটার ছিলেন—কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আপত্তি তোলা হয়েছে।

খবরের কাগজে সেবক সমিতির ঘটনার বিবরণ পড়ে আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি। আশা করছি যে, অভিযুক্ত যাতে ভালভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে, তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীমতী দাসের সঙ্গে পুরুলিয়া যাবেন কে?

হোটেলে থাকার সুযোগ পান বা না পান, যে কোন অবস্থাতেই আপনি মেমিও আসছেন কি না সেকথা আমি সুনিশ্চিতভাবে জানতে আগ্রহী। আপনার ৩০ তারিখের টেলিগ্রাম থেকে একথা পরিষ্কার যে, কার্সিয়ঙে কয়েকদিন কাটানোর পর, এ মাসের শেষের দিকে আপনি (সেপ্টেম্বর), বর্মায় আসতে চান এবং মেমিওতে সমস্ত অক্টোবর মাসটা কাটাতে চান। থাকার ব্যাপারে আপনি কোন কিছুই উল্লেখ করেন নি। আমি সেজন্য ধরে নিচ্ছি যে ২১শে আগস্ট তারিখে আপনি যা বলেছিলেন, তাই ঠিক রয়েছে; অর্থাৎ, বাড়ি ভাড়া করার চাইতে, হোটেলে থাকাই পছন্দ করবেন।

আমরা মূর্তি তৈরীর কাজ শুরু করেছি এবং দুর্গাপুজোর জন্য তৈরী হবার চেষ্টা করছি।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমি একপ্রকার।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

পুঃ—M. S. Gywe-এর খবর কি? তিনি কি কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পেরেছেন?

ক্যাপ্টেন স্মিথের সঙ্গে আমার এখনই কথা হল। তিনি বললেন যে মেমিওতে উল্লেখ করার মত তেমন কোন হোটেল নেই।

পুঃ—খবরের কাগজ থেকে বুঝতে পারলাম যে আপনি কর্মচারীদের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় এসেছেন। আপনি ঠিক কাজ-ই করেছেন।

স. চ. ব
(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৬৩

মান্দালয় জেল
৩. ৯. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২৭শে আগস্ট তারিখে লেখা চিঠি গতকাল পেয়েছি। আপনার স্পষ্ট উত্তর আমাকে সন্তুষ্ট ও পুনরাশ্বস্ত করেছে। আমার এ্যাসেম্বলির আসন, বিশেষ করে কলকাতা শহরের নির্বাচন কেন্দ্র পছন্দ করার দুটো কারণ আছে। প্রথমত আমি মনে করেছিলাম যে, এর গুরুত্ব অনেক বেশী, এবং দ্বিতীয়ত এর ফলে আমাদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ও কম হবে। উত্তর কলকাতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এত সহজ হবে বলে ভাবি নি, যদিও এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহও ছিল না। সে যাই হোক, বিষয়টি এখন আপনার হাতে।

আপনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু কি হবে কেউ বলতে পারে না—শেষ মুহূর্তে কেউ হয়ত হঠাৎ এগিয়ে এসে চিন্তার কারণ ঘটাতে পারেন। স্যার নীলরতন সরকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছুক বলে আমার মনে হয় না। যদি তিনি সত্যিই ইচ্ছুক হন, সেক্ষেত্রে ডাঃ বিধান রায় হয়ত তাঁকে নিরস্ত করতে সক্ষম হবেন। অন্য কোন কারণে না হলেও, কেবলমাত্র আপনাকে কতকটা বিড়ম্বনায় ফেলার জন্য এবং খরচপত্র বাড়াবার জন্য, অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবেন, এ

বিষয়ে আমি মোটামুটি নিশ্চিত। Responsive Co-operation Party আমার যতদূর ধারণা, আসনটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছেড়ে দেবে না। আপনি যদি শ্রীযুক্ত আই বি সেন এবং শ্রীযুক্ত বি চক্রবর্তীকে বোঝাতে পারেন (যিনি প্রার্থী নির্বাচনের জন্য দায়িত্বশীল); এবং কেউ যদি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কিংবা শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী কিংবা স্যার পি সি. রায়ের মাধ্যমে অধ্যাপক দেবপ্রসাদবাবুকে প্রভাবিত করতে পারেন, তাহলে হয়ত ঐ পক্ষ থেকে কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে না। আমার বিশ্বাস, অধ্যাপক দেবপ্রসাদবাবুর উপর স্যার পি. সি. রায়ের যথেষ্ট প্রভাব আছে, কতকটা আছে B. P. C. C-র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস-এরও (ললিতবাবু এবং দেবপ্রসাদবাবু দুজনেই বরিশালের লোক)। যদি রায়বাহাদুর যোগেন্দ্র ঘোষ দাঁড়ান, কেউ তাঁকে আমল দেবে না।

প্রথম দিকে আমি বুঝতে পারি নি, কি করে আপনি এই রকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে—যখন দুটো নির্বাচনের দায়িত্ব আপনার হাতে—বাঙলাদেশের বাইরে থাকার কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি মুসলমান প্রার্থীদের সম্পর্কে এতখানি আশাবাদী জেনে আনন্দ পেলাম। কিন্তু আসল কথা হল কাউন্সিলের সভায় প্রবেশের পরেও কি তাঁরা এতটা বিশ্বস্ত থাকবেন? যাই হোক, আমার মনে হয় দুটো ক্ষতিকর বিষয়ের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত কমটি বেছে নেওয়া উচিত এবং এইভাবে একটি অশুভ অবস্থা থেকে যতখানি সম্ভব লাভবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। মিথ্যে কিংবা অবাস্তব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন আছি, কেননা তা ফলবতী হবে না। দেশবন্ধুর কথায় বলতে গেলে, শক্ত পাথরের ভিতের উপরই আমাদের 'প্রাসাদ' নির্মাণ করা উচিত—নিকটতম ভবিষ্যত যদি কুসুমাকীর্ণ না হয়, কিংবা পিছিয়ে পড়ার লোকের সংখ্যাধিক্য যদি অবশ্যম্ভাবী হয়—এমন কি তবুও।

রায় ললিতকুমার মিত্র সম্পর্কে আপনার ধারণার সঙ্গে আমি একমত—অন্তত আমার তো তেমনই মনে হয়। তাঁর নামের শেষে, আরও কতকগুলি অক্ষর যুক্ত হলে, তাঁর কি হবে আমি সত্যিই জানি না। খবরের কাগজে দেখলাম যে তিনি তাঁর নামের শেষে F. R. E. S এই উপাধিটি ব্যবহার করছেন। এই উপাধি চাঁদা দিলেই মেলে, এবং এটি মূল্যে এবং গুরুত্বে, সম্মানজনক উপাধি M. R. A. S-এর প্রতিযোগী। ভয় হয় এই দ্রুত আরোহণ হয়ত তাঁর সর্বনাশ করবে। তিনি চালাকি করে তাঁর মনোনয়ন সম্পর্কে আঁচ করতে পেরে আগেভাগেই তাঁর প্রার্থীপদের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

এ্যাসেম্বলির নির্বাচনে, কলকাতার আসনে আপনি একজন যোগ্য প্রার্থী মনোনীত করবেন আশা করি। অপেক্ষাকৃত ভাল কাউকে না পেলে আপনি শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়কে দাঁড় করাতে পারেন।

আপনার ভবিষ্যত কর্মসূচী স্থির করার সময়, দয়া করে মনোনয়ন এবং নির্বাচনের দিনগুলোর কথা মনে রাখবেন।

সন্দেহ নেই যে মেমিও একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় না। মেমিও ও মান্দালয়ের মধ্যেই গভর্নর এবং তাঁর কর্মচারীরা বছরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন, এবং মান্দালয়ে তাঁরা একমাসের বেশী সময় দেন না। উল্লেখযোগ্য কোন হোটেল সেখানে নেই, এবং কর্মচারীরা সাধারণত বাঙলো বাড়িগুলোতে থাকেন। গত চিঠিতে আপনি, এ-মাস শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত, মেমিওতে কোন বাড়ি ঠিক না করতে বলেছেন। খুব দেরী হলেও, এই চিঠি এ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ আপনার কাছে পৌঁছবে। যদি এ মাসের শেষাশেষি আপনার মেমিও আসা শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, তাহলে বাড়ি ঠিক করার নির্দেশ দিয়ে এ মাসের মাঝামাঝি আপনার কাছ থেকে একটা তার পাব আশা করছি। Jamnadas Umechand Jhaveri আমাদের বেসরকারী পরিদর্শকদের মধ্যে একজন, এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন বলেছেন। তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং এ শহরে জহরতের ব্যবসায়ী। যদিও তিনি একজন Honorary Magistrate এবং যদিও গভর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তবু ভদ্র এবং সহজ সরল লোক বলেই তাঁকে আমার মনে হয়। অন্যান্য অফিসাররা থাকলেও বাড়ি ঠিক করার ব্যাপারে আমি সম্ভবত তাঁর উপরই নির্ভর করব। ওঁকে তার করবার ঠিকানা "Osval", মান্দালয়।

আয়ুর্বেদিক কলেজগুলির অর্থমঞ্জুরির ব্যাপারে আপনি কি করলেন? অষ্টাঙ্গ-কে অধিক অর্থ মঞ্জুরির ব্যাপারে Health Commission-এর কাছে আবার যে উল্লেখ করা হয়েছিল, সে বিষয়ে কি তাঁরা পুনরায় রিপোর্ট দাখিল করেছেন?

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমি একপ্রকার।, বাবা কবে কার্সিয়ঙ যাচ্ছেন? এখন তিনি কোথায়?

আপনার স্নেহের
সুভাষ

১৬৪

মান্দালয়
৩০. ৯. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

শৈলেশের রেঙ্গুনযাত্রার খবর দিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে আপনার টেলিগ্রাম এখানে গত শুক্রবার (২৪শে) পেঁাছেচে। সোমবার ২৭ তারিখে শৈলেশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে তার রেঙ্গুনে পেঁাছবার খবর জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছে। এর পর পরই আপনার কাছ থেকে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে টেলিগ্রাম এসেছে যে বাংলা সরকার যে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়েছে সেকথা বর্মার সরকারকে জানাতে বিলম্ব হয়েছে। এই টেলিগ্রামটি রাত প্রায় ৯টা নাগাদ পেঁাছয়। তারপর আমরা সাক্ষাৎকারের সরকারী খবর জানাবার জন্য এবং রেঙ্গুন থেকে একজন সি আই ডি অফিসার পাঠাতে অথবা একজন স্থানীয় অফিসারের সামনে সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের অধিকার দিতে বলার জন্য—জেলের ইনস্পেক্টর জেনারেলকে একটি টেলিগ্রাম করতে সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে অনুরোধ করি। (সেইদিনই সকালের দিকে শৈলেশের টেলিগ্রাম পেয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জেলখানার আই জি-র কাছে নির্দেশ প্রার্থনা করে টেলিগ্রাম করেছিলেন।) আমাদের হিসেবমত শৈলেশ যদি বুধবার বিকেলের দিকে মান্দালয় থেকে ট্রেন ধরে তাহলেও চলবে; কারণ খুব দেরী হলেও যদি বুধবার সকাল দশটার মধ্যে অর্ডার এসে যায় বুধবার সকালে সাক্ষাৎকারের সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা যা আশা করেছিলাম সবই গোলমাল হয়ে গেল যখন শৈলেশ খবর দিল ট্রেন দেরীতে চলছে তাই বৃহস্পতিবার রেঙ্গুন থেকে জাহাজ ধরতে হলে ওকে মঙ্গলবার রাত্রের ট্রেন ধরতেই হবে। শৈলেশকে খুব দেরী হলে বুধবার বিকেলের ট্রেন ধরতে হবে তাই যদি স্থানীয় অফিসার চলবে না মনে করেন তাহলে মঙ্গলবার দুপুরের ট্রেনে সি আই ডি অফিসার পাঠাতে হবে—জেল আই জি-কে একথা বলে আমরা নিজেদের অজান্তে ভুল পথে চালিত করেছিলাম। যাহোক, শৈলেশ রাজনৈতিক দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারীকে সি আই ডি অফিসার ছাড়াই সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়ে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করে কারণ রাত আটটার মধ্যে ওকে মান্দালয় ছেড়ে যেতেই হবে; তাছাড়া ও শুধু নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনাই করতে চায়। রাত দেড়টায় এর জবাব আসে। কিন্তু দুপুরে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অন্য কাজ থাকায় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সাক্ষাৎকারের সময় স্থির হয়। অতএব শেষ পর্যন্ত আমার শৈলেশের সঙ্গে দেখা হল এবং ঘন্টাখানেক তাড়াহুড়ো করে আলোচনাও হল। সাক্ষাৎকারের খুঁটিনাটি বিবরণ দেবার আর প্রয়োজন নেই। শৈলেশ আমার সব নির্দেশ লিখে নিয়েছে এবং সময়মত আপনার কাছে সেগুলো পেঁাছবে। সাক্ষাৎকার না-হওয়া পর্যন্ত আমি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। বিশেষত আমার মনে হয়েছিল অজানা জায়গায়, এইরকম পরিস্থিতিতে শৈলেশ খুব অসহায় বোধ করবে। জেলের কর্মচারীরা এই জটিল পরিস্থিতিতে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারিকে সরাসরি অনুমতির জন্য টেলিগ্রাম করার উপদেশ খুবই কাজে লেগেছিল। প্রসঙ্গত আপনি জানেন কিনা জানি না গভর্নমেন্ট এখন মেমিওতে আর জেল আই জি অফিসার রেঙ্গুনে। আমরা মেমিও থেকে ডেপুটি সেক্রেটারীর অনুমতি সোজাসুজি পেয়ে যাওয়ার পর জেল আই জি-র কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম যে ও'র কাছে তখন পর্যন্ত মেমিও থেকে কোন নির্দেশ আসেনি, তবে উনি মঙ্গলবার দুপুরের ট্রেনে সি আই ডি অফিসার পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক সচিবকে টেলিগ্রাম করে বলেছেন সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত নির্দেশ যেন সোজা জেলে জানিয়ে দেন। অবস্থা যা ছিল তাতে দেখা যাচ্ছে উনি ও'র সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। বর্মা সরকারকে খবর দেবার বিলম্বের কথা যদি আমি বা সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আগে জানতাম তাহলে এতসব গণ্ডগোল এড়ানো যেত। আমি তাহলে শৈলেশ আসবার আগেই সোজা ডেপুটি সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে মেমিও থেকে নির্দেশ আনিয়ে

রাখতাম। এমন কি যদি শৈলেশ ওর রেঙ্গুন থেকে করা টেলিগ্রামেও জানাত যে ওকে মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে যেতে হবে, আমি সোমবার বিকেলে মেমিওতে ডেপুটি সেক্রেটারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশের জন্য টেলিগ্রাম করতাম, (জেল আই জি-কে রেঙ্গুনে টেলিগ্রাম করার জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বলতাম না)। আমি আরো ভুল বুঝেছিলাম কারণ আমি ভেবেছিলাম শৈলেশ কলকাতা থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে আসবে আর আগে আগে যেমন হয়েছে রেঙ্গুন থেকে সি আই ডি অফিসার ওর সঙ্গেই আসবে। গত মার্চ মাসে যখন রাঙামামাবাবু এসেছিলেন—ও'র সাক্ষাৎকারের আগে কোন সরকারী নির্দেশ জেল অফিসে এসে পৌঁছয়নি—কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা হয়নি, সি আই ডি অফিসার রেঙ্গুনেই ও'র সঙ্গে যোগ দেন আর দুজনেই পকেটে করে সরকারী অনুমতিপত্র নিয়ে এসেছিলেন। যাই হোক, আশাকরি এবারে এই অভিজ্ঞতার শিক্ষা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আমি এখনো জানতে উৎসুক কেন একেবারে শেষ মুহূর্তে একজনকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শৈলেশ এ বিষয়ে সন্তোষজনক কিছু বলতে পারল না. শৈলেশের রেঙ্গুনযাত্রার খবর দিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে আপনার টেলিগ্রামেও এ বিষয়ে কিছু নেই। এবার কাজের কথায় আসা যাক্

(১) শৈলেশের কাছে যা শুনলাম তাতে ধরে নিচ্ছি মেমিওতে আসার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছে।

(২) ......(সেন্সর কর্তৃপক্ষ বাদ দিয়ে দিয়েছেন)

(৩) ইউনিভার্সিটির ভোটার তালিকায় দেখছি সংশোধন অফিসার খানবাহাদুর আস্‌হানউল্লার হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও মিত্র ও চক্রবর্তীর নাম মূল তালিকাতে রয়েছে। ও'দের ক্রমিক সংখ্যা হল ৪২২১ ও ১৬৭৯। ব্যালট পেপারগুলি যেন ঠিকমত মান্দালয় পাঠানো হয়, তা দেখবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলিতে সইসাবুদ করিয়ে ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা আমরা করব। ব্যালট পেপারগুলি পাঠানোর খবর দিয়ে যদি একটা টেলিগ্রাম করে দেন আমাদের সুবিধা হয়।

(৪) বিজয়কাকা কি আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন?

দেবপ্রসাদের কি হল? সে কি বীরত্বপূর্ণ পশ্চাদপসরণ করতে চায়, না রিটারনিং অফিসারকে পরাজিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

(৫) এর আগের একটি চিঠিতে জনসভা ও শোভাযাত্রা করার প্রয়োজনীয়তার বিষয় যা লিখেছিলাম তার পুনরুল্লেখ করতে চাই। দুর্গাচরণবাবু হয়ত এর গুরুত্ব বুঝবেন না কারণ ও'র কাজের ধারা একটু অন্যরকম। আমি ও'র কর্মধারা ছোট করে দেখতে চাই না কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের কাজের ধারাও যুক্ত করতে চাই। উত্তর কলকাতা কংগ্রেস কমিটির লোকেদের জনসভা ও শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করতে পারা উচিত। অন্যান্য এলাকার চাইতে ১ নম্বর ওয়ার্ডে মিটিং করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। আপনারা যদি আধ-ডজন সার্থক জনসভা করতে পারেন তাহলে দেখবেন শ্রীযুক্ত বসুর সংগঠন ভেঙে পড়েছে। আমরা যদি ১ নম্বর ওয়ার্ড ভালভাবে দখল করতে পারি তাহলেই শ্রীযুক্ত বসু তার পরিস্থিতির দুর্বলতা বুঝতে পারবেন। যতক্ষণ উনি নিজের ওয়ার্ডের ভাল সমর্থন পাবেন ততক্ষণ উনি সব ভাল হবে এই আশায় থাকবেন।

(৬) আমার এলাকার ভোটের একটা বিশ্লেষণ পাঠালাম। এর থেকে দেখতে পাবেন সমগ্র ভোটের ৫০% হচ্ছে এক নম্বর ওয়ার্ডের। সুতরাং স্বভাবতই শ্রীযুক্ত বসু ভাবছেন তিনি দৃঢ়ভাবে সেখানে প্রতিষ্ঠিত।

(৭) জেনে সুখী হলাম যে যাদের কথা লিখেছিলেন তারা ছাড়াও আপনি বাগ-বাজারের উপেন্দ্রনাথ বসু, কুমার মন্মথনাথ মিত্র ও সতীশ চৌধুরীর সমর্থনও যোগাড় করতে পেরেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা যাতে আমার প্রার্থীপদ সমর্থন করে সে চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না হয় দেখবেন। আপনি সক্ষম হবেন কিনা জানি না কিন্তু সমর্থন পেয়ে গেলে ভালই হয়। অতীতে যা-ই ঘটুক না কেন আমার মনে হয় না গোপাললাল ঘোষ, মৃণালকান্তি বসু এ'রা আমার প্রতি একান্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন। আশা করি, নির্মল চন্দ্রর মাধ্যমে আপনি বাবু নন্দলাল বসুর পরিবারের সমর্থন যোগাড় করতে পারবেন। আপনি নিশ্চয় জানেন নলিনীর ভাই বিলি ওদের পরিবারে বিয়ে করেছে। আমার মনে হয় রায়-বাহাদুর ফণীন্দ্রলাল দে শ্রীযুক্ত মন্মথ সেনের মতই শ্রীযুক্ত বসুর একজন মস্ত বড় সমর্থক। তবু তাঁর উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করা যায় না কি? আমি আপনাকে কাশীপুরের এম-এল-সি ডি এন রায় বার-অ্যাট-ল সম্বন্ধে আগেই লিখেছি।

(৮) আমি নলিনীমোহন চ্যাটার্জি ও জিতেন্দ্রিয় বসুকে এর মধ্যে চিঠি লিখেছি। আমি আরো কাউকে কাউকে এ সপ্তাহেই লিখব এবং প্রত্যেক সপ্তাহেই লিখতে থাকব। যোগেশ সেনকে কি আমার চিঠি লেখা প্রয়োজন?

(৯) আমার কিছু টাকা বিশেষ দরকার।

(১০) আমাদের একমাত্র নমঃশূদ্র এম-এল-সি ডাঃ মোহিনী দাসকে এবার প্রার্থী-পদে পুনরায় মনোনয়ন দেওয়া হয়নি কেন? আমি জে এম সেনগুপ্ত ও এন আর সরকারকে এ বিষয়ে তার করেছিলাম কিন্তু কোন জবাব পাইনি। আশা করি আপনারা সকলে মিলে চেষ্টা করবেন যাতে নাটোরের মহারাজা শিবশেখরেশ্বর রায়কে পরাজিত করতে পারেন। হুগলি মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন কেন্দ্রে বাবু অমূল্য দত্তকে মনোনয়ন দেওয়া আমার মতে মস্ত বড় ভুল হয়েছে। কি করে তাকে বেছে নেওয়া হল কিছুই বুঝলাম না। বাবু শৈলজা রায়কে মনোনয়ন দেওয়াও আর একটি ভুল হয়েছে তা সকলে কালে কালে বুঝতে পারবেন। খুব সম্ভবত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—নিজে একজন সজ্জন ব্যক্তি ও'র হয়ে ধরাধরি করেছিলেন।

(১১) আমাদের হেলথ্ অফিসার ডাঃ ক্লেকের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হলাম। আশা করি ঐ পদে লোক নিয়োগের পূর্বে পদটি বহুলভাবে প্রচারিত হবে এবং একজন ভারতীয়কে ডাঃ ক্লেকের স্থলে নিয়োগ করা হবে। এ সম্বন্ধে পরে আরো লিখব। আপনি সময়মত আমার মতামত মিঃ সেনগুপ্তকে জানাতে পারেন।

(১২) আমি শৈলেশের কাছে জানলাম, গিরিশ ব্যানার্জি সেজদাদার সঙ্গে কোন ব্যবসায়ে পার্টনার হতে চান। সেজদাদাকে বলবেন ও'র সঙ্গে যেন কোন অর্থনৈতিক লেনদেন-এর ব্যাপারে না থাকেন।

(১৩) স্টেটসম্যান পত্রিকা তাদের লিখিত আবেদনের যে সংশোধন দিয়েছে তার একটা কপি আমার প্রয়োজন।

(১৪) নির্বাচন সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

(ক) প্রত্যেক বুথে একজন করে নির্বাচনী এজেন্ট থাকবে তাই যতগুলি বুথ তত-জন নির্বাচনী এজেন্ট প্রয়োজন। নির্বাচনী এজেন্টদের নাম আমার কাছে পাঠালে আমি তাঁরা যাতে বুথে উপস্থিত থাকতে পারেন তার জন্য যতগুলি প্রয়োজন চিঠি তৈরী করে পাঠিয়ে দেব।

(খ) নির্বাচনী এজেন্টকে সমস্ত খরচপত্রের হিসাব ভাউচার সহ রাখতে হবে।

(গ) গেজেটে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ৩৫ দিনের মধ্যে নির্বাচনের হিসাবপত্র দাখিল করতে হবে এবং দাখিল করার পূর্বে নির্বাচন প্রার্থী ও এজেন্ট কর্তৃক এগুলি শপথ নিয়ে সঠিক বলে ঘোষণা করতে হবে। অতএব নির্বাচনের পরেই আমার কাছে হিসাবপত্র পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন (নির্বাচনী এজেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হিসাবপত্র সঠিক ঘোষণা করার পর)। বিজয়ী ও পরাজিত উভয় প্রার্থীকেই হিসাব দাখিল করতে হবে। নির্বাচনের হিসাবপত্র দাখিলের নিয়ম লঙ্ঘন করা হলে নির্বাচন প্রার্থী ও নির্বাচনী এজেন্ট দুজনকেই পাঁচ বছরের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। নির্বাচনী হিসাব সময় থাকতে পাঠালে সময়মত কলকাতায় ফেরৎ পাঠানো নিয়ে কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

(ঘ) ইউনিভার্সিটির ভোটার তালিকায় সত্যেনবাবুর ঠিকানা ১১৩/১ বউবাজার স্ট্রীট—কংগ্রেস অফিসের পুরোন ঠিকানা দেওয়া আছে আর সতীশবাবুর (চক্রবর্তী) কেয়ার অফ্ ডি আই জি—সি আই ডি ইত্যাদি। সত্যেনবাবুর ব্যালট পেপার যাতে বউবাজার স্ট্রীট থেকে আসে তা দেখতে হবে। সময়মত ও ঠিকভাবে ব্যালট পেপার ভরে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠানো হল কিনা দেখার জন্য প্রত্যেকটি বার লাইব্রেরীতে ও স্কুল কলেজে একজন করে প্রতিনিধি থাকা উচিত।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনার কি নোয়াখালি যাওয়া হয়েছিল? রেঙ্গুনের খবর কাগজে এসোসিয়েটেড প্রেস বাংলাদেশের ঘটনার খুব কম খবরই আজকাল ছাপে।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

৩০. ৯. ২৬ তারিখের চিঠির সংযোজন

ভোট বিশ্লেষণ

ওয়ার্ড	পুং ভোট	স্ত্রী ভোট		ওয়ার্ডের যোগফল
১	২৪০৮	৪৫৮		২,৮৬৬
২	১২৪৮	২১৯		১,৪৬৭
৩০	২৮৩	৫৬	৩৩৯	
৩১	১২৩	২৩	১৪৬	৮২৭
৩২	৩০৬	৩৬	৩৪২	
	সম্পূর্ণ ৪৩৬৮ পুং ভোট	সম্পূর্ণ ৭৯২ স্ত্রী ভোট		পূর্ণ ৫১৬০ সংখ্যা

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৬৫ মান্দালয়
৪. ১০. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

যে যে তারিখে আপনাকে চিঠি লিখেছি সেগুলি হল (১) ৬ই সেপ্টেম্বর (২) ৯ই সেপ্টেম্বর (৩) ১৩ই সেপ্টেম্বর (৪) ২২শে সেপ্টেম্বর (৫) ২৪শে সেপ্টেম্বর (৬) ৩০শে সেপ্টেম্বর।

D. I. G আমাকে জানিয়েছেন যে আমার ১৩ই সেপ্টেম্বরের চিঠি আটক করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত তার কারণ জানতে পারিনি। এমন কি, পরের চিঠিগুলোর কি হল, তা-ও না। ইতিমধ্যে আমার চিঠির 'enclosure'-গুলির ভাগ্যে কি জুটল, তা জানতে উদ্বিগ্ন আছি। সেপ্টেম্বর মাসে আপনাকে লেখা আমার প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে মনোনয়নপত্র-গুলি জুড়ে দিয়ে পাঠিয়েছি। সেন্সর কোন জিনিসটিকে আপত্তিমূলক মনে করবেন তা না জানতে পারার ফলে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি।

আমার কিছু টাকার ভীষণ প্রয়োজন। আমার নামে, সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে দয়া করে ৫০ বা ১০০ টাকা পাঠিয়ে দেবেন। আশাকরি, শৈলেশ নিরাপদে যথাসময়ে পেঁছেছে এবং মনোনয়নপত্রগুলি জমা দিয়েছে।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে আপনি কোন্ কোন্ দিন আমাকে লিখেছেন জানাবেন। আমি একরকম।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৬৬ মান্দালয় জেল
৯. ১০. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২রা অক্টোবরের চিঠি আমার হাতে এসেছে। দেখলাম যে আপনি আমার ৯ই এবং ২০শে সেপ্টেম্বরের চিঠিগুলো পেয়েছেন। তার পরে আমি আপনাকে ২২শে, ২৪শে, ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ৪ঠা অক্টোবরে চিঠি দিয়েছি। সেগুলো আপনি যথাসময় পেয়েছেন কি না জানার জন্য চিন্তিত আছি।

আপনাকে আগেই জানিয়েছি যে, ১৩ই সেপ্টেম্বরে আপনাকে লেখা আমার চিঠিটি আটক করা হয়েছে। এটি একটি দীর্ঘ চিঠি এবং যেহেতু তাতে নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাই আমি D. I. G-কে তার করে এবং লিখে জানি-য়েছি যে, যে যে বিষয়গুলি আপত্তিকর বলে মনে হয় সেগুলি মুছে ফেলে যেন বাকি অংশটুকু পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আশা করছি, আমার অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করতে তিনি সক্ষম হবেন।

আপনার চিঠিতে আরও উল্লেখ করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের Revising

authority-র একটি চিঠি এবং কয়েকটি মনোনয়ন পত্র সম্বলিত একটি খামও আপনি পেয়েছেন। আমার নিজের নথিপত্র দেখে বুঝতে পারছি, এগুলি আমি আমার ১৩ই সেপ্টেম্বরের চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম।

মনোনয়নপত্রগুলি সঙ্গে করে শৈলেশকে পাঠানোর কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমার মনে হয় না। প্রার্থী কখন তাঁর স্বাক্ষর করছেন, আমার ধারণা—অবশ্য আমার ধারণা সঠিক কি না বলতে পারি না—সে বিষয়টি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দেশবন্ধুর নির্বাচনের মামলার সিদ্ধান্তটি কি ছিল?

আমার ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়েছে বলেই মনে হয়, এবং আপনাকেই এই দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। আমার সন্দেহ হয়, এখন আপনি আদৌ কার্সিয়ঙ যেতে সক্ষম হবেন কি না। নির্বাচনের সময় পর্যন্ত কি বড়দাদা কলকাতায় থাকছেন? অসংখ্য কাজকর্মের মধ্যে থেকে আপনি যদি একটুখানি বিশ্রাম চুরি করে নিতে পারেন, আমি বিশেষ আনন্দিত হব। কার্সিয়ঙের দায়িত্ব আপনি কার উপর ছেড়ে দিয়েছেন?

আমি আশা করি না, শ্রীযতীন বসু তাঁর নাম প্রত্যাহার করবেন, যদিও তা করতে তাঁকে উপদেশ দিলে ভাল হয়। তিনি নিজে ইচ্ছুক হলে, তাঁর 'মোসাহেবরা' তাঁকে এমনটি করতে দেবেন না।

আপনি সভা-সমিতি করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন শুনে আনন্দিত হলাম। যতবার সম্ভব ততবার সভা-সমিতি আহ্বান করা বাঞ্ছনীয়। নির্বাচনী প্রচারের এই বিষয়টির গুরুত্বের উপর আমি যথেষ্ট জোর দিতে পারছি না।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেবকে চিঠি লিখব মনে করছি, কিন্তু তাঁর ঠিকানা আমার মনে নেই। এক এবং দুই নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় আমি একবার চোখ বুলিয়েছি কিন্তু তাঁর নাম খুঁজে পাই নি। উত্তর কলকাতা কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়ের ঠিকানাটাও আমি ভুলে গেছি।

শ্যাম পার্কের জনসভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ৫ তারিখের স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হয়েছে।

এক নম্বর এবং দুই নম্বর ওয়ার্ডে কয়েকটি ছোট ছোট পার্ক আছে, আমার মনে হয় শ্রীমন্মথ সেনের বাড়ির সামনেও একটি পার্ক আছে। এ সব জায়গায় সভা অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার, যাতে শ্রীবসুকে তাঁর ঘাঁটিতেই আক্রমণ করা যায়।

আপনাকে কেউ বিরোধিতা করছে কি না জানতে আগ্রহী আছি। আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতার সংবাদপত্রগুলি থেকে এ খবর জানতে পারব।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের বিষয়ে আমি সন্তোষবাবুকে লিখেছি। জানি না তিনি কি করেছেন—তাঁর কাছ থেকে কোন উত্তর পাই নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটার তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আপনি কি কিছু করেছেন?

M. A. ডিগ্রীর জন্য কত টাকা আমাকে পাঠাতে হবে, সে সম্পর্কে কেম্ব্রিজের পাঠানো চিঠিটি আপনি দয়া করে রেখে দেবেন। এখনই টাকা পাঠানোর ব্যাপারে আপনাকে চিন্তিত হতে হবে না—আগামী বছরেও তা করা যেতে পারে।

শৈলেশ লিখেছে যে আপনি নোয়াখালি যাবেন। সতী এখন কোথায়?

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৬৭

মান্দালয়
১৬. ১০. ২৬
বিজয়া দশমী

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনাকে ৪. ১০. ২৬ তারিখে শেষ চিঠি লিখেছি। তারপর থেকে দুর্গাপূজোর প্রস্তুতি নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের ব্যবস্থাদি সন্তোষজনকই হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত পুজো সফল। ঘটনা বিবর্জিত এবং একঘেয়ে জীবনে অভ্যস্ত একজনের কাছে দুর্গাপুজোর মতন অনুষ্ঠান এর সাধারণ মূল্যের চাইতে অনেক

বেশী। সৌন্দর্যসম্বন্ধ আনন্দের জ্ঞানসম্বন্ধ আমোদ-প্রমোদের এবং ধর্মীয় অনুপ্রেরণার উৎস এই অনুষ্ঠান, যা স্থায়ী সান্ত্বনাও দেয়। আজ বিজয়া দশমী। সারা বাংলা দেশে, একই মায়ের সন্তান,—আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এমন কি শত্রুও—কিছুক্ষণ পরেই একে অন্যের সঙ্গে সৌভ্রাত্রের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে।

......(সেন্সর কেটে দিয়েছে)......

পুজোর ধুতি ও চাদর আমরা এ বছর ঠিক সময়ে পেয়েছি। আমার মনে হয়, ভুল করে, দু-জোড়া বেশী পাঠানো হয়ে গেছে। বিজয়ার অভিনন্দনের সঙ্গে আমাদের সকলের ধন্যবাদ জানিয়ে দিতে আমাকে বলা হয়েছে—কেননা উপহার এখানে সমাদরে গৃহীত হয়েছে।

খবরের কাগজে দেখলাম যে আপনি নোয়াখালি গিয়েছিলেন। আশা করি এতদিনে আপনি ফিরে এসেছেন। নির্বাচনী প্রচার আমার ধারণা এখন পুরোদমে চলছে। শ্রী জে এন বসু কিংবা শ্রীনীলরতন সরকার কেউ নাম প্রত্যাহার করবেন বলে আমি আশা করি না।

আমার বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করবেন, গুরুজনদের প্রণাম জানাবেন এবং ছোটদের ভালবাসা।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৬৮

মান্দালয়
২৩. ১০. ২৬
শনিবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ১১ই অক্টোবরের চিঠি গতকাল পেয়েছি। রেল-লাইনে বিঘ্ন ঘটায়, এই দেরী হল। এ বছরে তিনবার কি চারবার যোগাযোগ বিচ্যুত হল, এবং কেবল ঈশ্বরই জানেন, এ বারই শেষ কি না। আমার ধারণা রেঙ্গুন থেকে ডাক এখন স্টীমারে আসছে।

আপনি যে সব ভদ্রলোকের নাম পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চিনি না বলে রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র বল্লভ এবং ঠিকানা জানি না বলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব ছাড়া অন্য সবাইকে লিখেছি। কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সাউ, যিনি রায়বাহাদুরের সঙ্গে থাকেন, আমি তাঁকেও লিখেছি।

বাবা-মা কোথায় ছুটি কাটাবেন? বড়দাদা কি সবসময়ই কলকাতায় থাকবেন? আপনি কি কয়েকদিনের জন্য কার্সিয়ঙ যেতে পারবেন? মেজবৌদিদি এবং ছেলেমেয়েরা কবে কলকাতায় ফিরবেন?

যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা-মান্দালয় ডাক চলাচলে দেরী হবে বলে মনে হয়।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। গুরুজনদের সবাইকে আমার বিজয়ার প্রণাম এবং ছোটদের ভালবাসা জানাবেন। আমি আয়ুর্বেদ-ওষুধ চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি এতে আমার উপকার হবে। কলকাতা থেকে প্রেরিত ১০০ টাকা এই অফিসে এসেছে এবং আমার নামে জমা পড়েছে।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৬৯

মান্দালয় জেল
৬. ১১. ২৬
শনিবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ১৮ই অক্টোবরের শেষ চিঠিতে আপনি বলেছিলেন যে পরের ডাকে আমার নির্বাচনী প্রতিনিধিদের একটি তালিকা পাঠাবেন, নির্বাচন কেন্দ্রে যাদের উপস্থিতি

অনুমোদন করে আমি চিঠি দেব। গত পরশু ডাক পৌঁছেছে, কিন্তু আপনার কাছ থেকে কোন চিঠি পাইনি। আজও ডাক আসার দিন। যাই হোক, কোন কারণে দেরী হতে পারে ধরে নিয়ে আমি ১লা নভেম্বর তারিখে লেখা আমার শেষ চিঠির সংগে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে আমার নির্বাচনী প্রতিনিধিদের উপস্থিতি অনুমোদন করে রিটারনিং অফিসারের নামে কয়েকটি চিঠি দিয়েছি। এগুলি নিশ্চয়ই সময়মত আপনার কাছে পৌঁছবে এবং কাজে আসবে। অবশ্য আমার তালিকায় আপনি সমস্ত নির্বাচনী প্রতিনিধির নাম পাবেন না, কারণ আমি জানি না কারা আমার হয়ে কাজ করছেন। তার জন্যেই আপনাকে অনেক আগেই নির্বাচনী প্রতিনিধিদের একটি তালিকা আমাকে পাঠাতে বলেছিলাম। ভোটকেন্দ্রের ভিতরে আমার নির্বাচনী প্রতিনিধি না থাকলে যে কি অসুবিধা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

গত সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হই। গত শনিবার অসুস্থ হয়ে পড়ি, জ্বর ছেড়েছে মাত্র গতকাল। এখনও বেশ দুর্বল বোধ করছি, গলা ভেঙে গেছে, গলাব্যথা ও কাশিও চলেছে। অসুখ যতদিন ছিল ততদিন বেশ কষ্ট পেয়েছি, বিশেষ করে একেবারে ঘুমোতে পারিনি বলে। যাই হোক, এখন আমি আরোগ্যলাভের পথে—আশা করছি শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠব। মনে হয় আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনের ফলেই অসুখে পড়ি। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহেও বৃষ্টি পড়ছিল, যা কিনা মান্দালয়ের মত জায়গার পক্ষে খুবই অদ্ভুত ঘটনা, আর এ মাস শুরু হতেই কয়েকদিন বেশ ঠান্ডা পড়ে। এমন কি এখনও ভীষণ কালো মেঘ মাথার উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় দৈবজ্ঞের অভিমত, আরো এক পক্ষকাল বৃষ্টি আমাদের ভাগ্যে রয়েছে।

আমার বিশেষ ইচ্ছে, Calcutta Gazette-এ ফলপ্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি নির্বাচনী খরচপত্রের হিসেব আমায় পাঠিয়ে দেন। এই হিসেব পাঠানো ও ফেরৎ পাওয়ার জন্য আপনার দুই পক্ষকাল সময় ধরা উচিত—তার মানে হিসেব তৈরী করতে আপনি মাত্র এক সপ্তাহ সময় পাবেন। নির্বাচনের হিসেব ঠিক সময়ে জমা দেবার এই নিয়ম ভাঙলে প্রার্থী ও তাঁর নির্বাচনী প্রতিনিধি দুজনকেই মোটারকমের খেসারত দিতে হয়। হিসেব পাঠানোয় দেরী হওয়া মানে আবার অনেক খরচ করে লোকের হাতে পাঠাতে হবে।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভালো আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

পুনশ্চঃ আজকের ডাক এইমাত্র এল। কোন চিঠি নেই।

স. চ. ব

পুনঃ পুনশ্চঃ আমাকে জানানো হয়েছে যে আমার ১৩ই ও ২২শে সেপ্টেম্বরের দুটি চিঠি আটক করা হয়েছে। আপনি লিখেছেন যে আমার ২৪শে সেপ্টেম্বরের চিঠিটিও আটক করা হয়েছে। সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি যে ৯ই, ২০শে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ৪ঠা, ১০ই, ১৮ই, ২৩শে অক্টোবর ও ১লা নভেম্বর লেখা আমার বাকি চিঠিগুলি আপনি পেয়েছেন।

স. চ. ব

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৭০

মান্দালয়
১৩. ১১. ২৬
শনিবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ১।১১।২৬ তারিখের চিঠি কাল পেয়েছি। আপনাকে আমি ইতিমধ্যেই জানিয়েছি যে, সেপ্টেম্বরে লেখা আপনার সমস্ত চিঠি এবং ২রা, ১১ই ও ১৮ই অক্টোবরের চিঠিগুলি আমি পেয়েছি। ১৮ই অক্টোবর ও ১লা নভেম্বরের মধ্যে আপনি কোন চিঠি লিখেছেন কিনা আমি জানি না—সেরকম কোন চিঠি আমি পাইনি।

আপনার চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে আমার ১৬ই অক্টোবরের চিঠি আপনার

কাছে পৌঁছেছে যদিও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। আমার ২২শে সেপ্টেম্বর ও ১০ই অক্টোবরের চিঠি আপনি পেয়েছেন কিনা এখনও জানান নি, যদিও সি. আই. ডি অফিস আমাকে জানিয়েছে যে ১০ই অক্টোবরের চিঠিটি তারা পাশ করে পাঠিয়ে দিয়েছে। আপনি আমাকে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে, ১৩ই ও ২৪শে সেপ্টেম্বরের চিঠিগুলি আপনি পান নি। আপনার চিঠিগুলি থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ১৬. ১০. ২৬ পর্যন্ত লেখা আমার বাদবাকি চিঠিগুলি আপনি যথাসময়ে পেয়েছেন। ১৬ই অক্টোবরের পরে আমি আপনাকে ২৩।১০, ১।১১, ও ৫।১১ তারিখে লিখেছি। নির্বাচনী প্রতিনিধি নিয়োগ করে চিঠি আমি ১লা নভেম্বরের চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সকালবেলা নিম্নলিখিত তারটি আপনাকে করেছি—"নির্বাচনী প্রতিনিধি নিয়োগ করে চিঠি ১লা নভেম্বর ইন্‌টেলিজেন্সের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।"

যে সকল ভদ্রলোকের নাম আপনি আমায় জানিয়েছিলেন, তাঁদের সকলকেই আমি লিখেছি। জিতেন্দ্রিয়বাবুর কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি, আর কারুর থেকে পাইনি। এই-মুহূর্তে তাঁরা নিশ্চয় খুবই ব্যস্ত। রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রবল্লভের বদলে আমি কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার বাবু পুলিনবিহারী সাউকে লিখেছি।

রেঙ্গুনের যে খবরের কাগজগুলি কাল পেয়েছি, তাতে উত্তর কলকাতা নির্বাচনে আমাদের দল নির্বাচনী প্রচারের যে অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তার বর্ণনা আছে। রকেটের সাহায্যে রঙীন প্রচারপত্র ছড়ানো হচ্ছে—খুবই আশ্চর্য উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয়! গত মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্স ও ফ্ল্যান্ডার্সে উড়োজাহাজ থেকে প্রচারপত্র বিলি করার কথা মনে করিয়ে দেয়।

আপনার জানা থাকলে রাজেনবাবুর (দেব) ঠিকানা আমায় জানাবেন।

রেঙ্গুন-মান্দালয় রেললাইন এখনও অচল এবং সোজা যোগাযোগ এ মাসের শেষের আগে পুনরায় স্থাপন করা যাবে না। বর্তমানে রেঙ্গুন থেকে ডাক কিছু ট্রেনে, কিছু স্টীমারে আসছে। ঘুরে আসার দরুণ দু'তিন দিন করে দেরী হচ্ছে।

আমাকে জানানো হয়েছে যে জেলের ভিতর থেকে কোনপ্রকার নির্বাচনী প্রচার গভর্নমেন্ট করতে দেবে না। এমন কি নির্বাচনী প্রচারের বিষয়ে নির্দেশ লিখে পাঠানোও চলবে না।

নির্বাচনী খরচের হিসেবের ব্যাপারে আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিতে চাই। অনুগ্রহ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলি পাঠাবেন। শুধুমাত্র এইজন্যে যাতে মান্দালয়ে একজন প্রতিনিধি না পাঠাতে হয়, তার চেষ্টা করবেন, বিশেষত যখন রেল-বিভ্রাট ঘটেছে।

আপনাকে শেষ চিঠি লেখার পরে আমার আবার একদফা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়ে গেছে। গত শনিবার জ্বর ছেড়েছিল, কিন্তু সতেজ বোধ হচ্ছিল না, এবং দু'তিনদিন পরেই আবার জ্বরে পড়ি। গতকাল থেকে কিছুটা ভালো বোধ হচ্ছে।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভালো আছেন। বাবু সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া একটি চিঠি আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

পুনশ্চ ঃ শ্রীযুক্ত যতীন বসু ও আমার পক্ষে প্রকাশিত ম্যানিফেস্টো, প্রচারপত্র প্রভৃতির কপি আমাকে পাঠানোর জন্য আপনাকে কয়েকদিন আগে একটি তার করে-ছিলাম। সেগুলি পড়ার জন্য কৌতূহল বোধ করছি। সি আই ডি-র মাধ্যমে 'ভোটরঙ্গে'র কপিও আপনি আমায় পাঠাতে পারেন।

স. চ. ব
(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৭১

মান্দালয় জেল
১৮. ১১. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ১. ১১. ২৬ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পেয়েছিলাম—ইতিমধ্যেই উত্তর দিয়েছি।

পরশুদিন জানতে পেরে খুশী হলাম যে কিছুকাল আগে নির্বাচনী প্রতিনিধি নিয়োগ করে যে চিঠিগুলি দিয়েছিলাম সেগুলি আপনি পেয়েছেন এবং আমার জেতার

সম্ভাবনা বেশ ভাল। এই খবর খুবই উৎসাহিত হওয়ার মত, কারণ এখানে আমরা যে সংবাদপত্রগুলি পাই সেগুলি নির্বাচনে প্রকৃত অবস্থা কি তা প্রকাশ করে না।

Municipal Gazette-এর সম্পাদক আমার কাছে একটি বাণী চেয়েছিলেন, আমি সেটি পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করি সময়মত সেটি তিনি পেয়ে যাবেন।

লণ্ডনের L R C P, M R C S পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছু তথ্য ছোটদাদাকে আমায় জানাতে বলতে পারবেন কি ঃ—

(১) এই পাঠ্যসূচীটি কতদিনের?

(২) যে ছাত্র কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের State Medical Faculty পরীক্ষায় (যেমন, ক্যাম্পবেল স্কুলের সমান) উত্তীর্ণ হয়েছে তার জন্যে কি লণ্ডনে পাঠের সময়কাল সংক্ষেপ করা হবে?

(৩) যদি উক্ত ছাত্র কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ বা আই-এ পাশ না করে থাকে,, তাহলে L R C P, M R C S-এ বসার আগে তাকে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে?

(৪) L R C P, M R C S পাঠের যোগ্যতা অর্জনের জন্য কোনটি সহজতম পরীক্ষা? লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন না সিনিয়র কেম্ব্রিজ? যোগ্যতা অর্জনের পরীক্ষা কি লণ্ডনেই নিতে হয়, নাকি ভারতবর্ষে থাকাকালীনও এই পরীক্ষায় বসা যায়?

(৫) এ ধরনের যোগ্যতা অর্জনের পরীক্ষায় ল্যাটিন বা গ্রীকের মত ধ্রুপদী বিষয় কি বাধ্যতামূলক?

(৬) ল্যাটিন বা গ্রীক বা কোন ইউরোপীয় ভাষার পরিবর্তে কি কি ভারতীয় বিষয় (যেমন, সংস্কৃত বা আরবী বা ফারসী) নেওয়া যেতে পারে?

স্টেটস্‌ম্যান মানহানির মামলা আবার কবে হাইকোর্টে উঠছে? কমিশন হবে কিনা অনুগ্রহ করে আমায় সময়মত জানাবেন?

ইনফ্লুয়েঞ্জার ফলে আমার ৬ পাউণ্ড মত ওজন কমে গেছে। এই ক্ষতি পূরণ করে নেবার আশা রাখি, যদি না তৃতীয়বার আক্রান্ত হই। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ হচ্ছে না, তবে আশা করছি ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারব।

কিছুদিন আগে দুর্গাচরণবাবুকে চিঠি লিখেছিলাম, তিনি কি সে চিঠি পেয়েছেন? এখনও কোন উত্তর পাইনি।

নৃপেনবাবু (নৃপেন বসু) আমার চিঠির উত্তরে জানিয়েছেন যে তিনি আমাকে সমর্থন করে আসছেন।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন।

নির্বাচনের হিসেবপত্র তাড়াতাড়ি পাঠাতে দয়া করে ভুল করবেন না।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৭২

মান্দালয়
২২. ১১. ২৬
সোমবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

নির্বাচনের ফলাফল জানিয়ে আপনি যে বার্তাটি পাঠিয়েছেন, গত রাত্রে সেটি এখানে পৌঁছেছে। যদিও ফলাফল সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম, তবু এত গরিষ্ঠতা পাব ভাবি নি। যাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় এই ফল সম্ভব হয়েছে, কিভাবে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না। ঈশ্বর আমাকে তাঁদের ভালবাসা ও আস্থার যোগ্য করে তুলুন।

সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী, সমর্থক এবং বন্ধুদের তাঁদের সহানুভূতি ও সমর্থনের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেবার জন্য, আজ সকালেই আপনাকে একটি তার করেছি। অনেক কারণে, (যে কারণগুলি নেহাতই পরিষ্কার) ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রত্যেককে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এমন অনেক সদয় ব্যক্তি আছেন, যাঁদের জানার সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নি, অথচ যাঁরা স্বেচ্ছায় আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের জানি না বলে, ইচ্ছে থাকলেও লেখা সম্ভবপর নয়। আমি নিজে যেহেতু একজন কর্মী সেজন্য আমার ভালবাসা ও ভ্রাতৃসুলভ অভিনন্দন তাঁদেরই বেশী করে প্রাপ্য

যাঁদের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম, এই সাফল্যে অনেকাংশে সাহায্য করেছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী ধাক্কা আমি ক্রমশঃ কাটিয়ে উঠছি। আমাকে যত্ন করে পরীক্ষা করার জন্য মান্দালয়ের সিভিল সার্জেন, কর্নেল ব্রেইন কয়েকদিন আগে এসেছিলেন। তিনি বললেন, আমি নাকি 'এন্টেরোপটোসিস' রোগে ভুগছি যার সঠিক অর্থ হল যকৃতের গণ্ড-গোল। কর্নেল ব্রেইনের মতে এর ফলেই আমার কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ রোগ ইত্যাদি হচ্ছে। আরও ভাল ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার জন্য আমাকে রেঙ্গুনে পাঠানোর প্রস্তাব করা হয়েছে, যেমন এক্স-রে পরীক্ষা 'টেস্ট্ মিল' পরীক্ষা ইত্যাদি। রেঙ্গুনে যদি যেতে হয়, তবে তার আগে আপনাকে একটি তার পাঠাব। আমার এখন ওজন ১৩৯ পাউন্ড। সম্ভবত ইনফ্লুয়েঞ্জার ফলে।

রেঙ্গুন-মান্দালয় লাইন এখনও বিপর্যস্ত। ডাক আসে কতকটা রেলে, কতকটা স্টীমারে। থাজি হয়ে, মিসিরগান পর্যন্ত ডাক আসে রেলে, মিসিরগান থেকে স্টীমারে। এর ফলে আরও দিন দুয়েক দেরী হয়। যে ভগ্ন জায়গাটির এখনও সংস্কার হয় নি, সেটা মান্দালয়ের ৫০ মাইলের মধ্যে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ, সরাসরি যাতায়াত আবার চালু হবে বলে আশা করি।

অন্যান্য ফলাফলগুলি সম্পর্কে আমি জানতে আগ্রহী, কিন্তু কেউ জানায় না। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। সম্ভব হলে, আগামী কয়েকদিনে আপনার জনসেবামূলক কি কি কাজ আছে জানাবেন। স্টেটসম্যান মামলার কি হল? শুনানি আবার কবে শুরু হচ্ছে?

দয়া করে ডঃ ল'-কে বলবেন যে অসুস্থতার জন্য আমি তাঁর বইটি শেষ করে উঠতে পারি নি। আমি এখন তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলার চেষ্টা করব।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৭৩

মান্দালয়
২৭. ১১. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

কিছুকাল হল, আপনার কাছ থেকে কোনও চিঠি পাইনি। নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত ছিলেন।

কাগজে পড়লাম, ভোটের দিন মা, বৌদিদি ও অন্যান্যরা ভোট দিতে গিয়েছিলেন। সেখানে নিশ্চয়ই খুব উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল। যদি কেউ সময় করে আমাদের জন্য নির্বাচনী প্রচারের বর্ণনা দিতে পারত, তাহলে বেশ হত। সংবাদপত্রগুলি মোটামুটি স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে।

গত কয়েকদিন যাবৎ বিশ্রী স্যাঁৎস্যাঁতে আবহাওয়া চলছে। সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর ঝির্ ঝির্ বৃষ্টি। বর্ষাকালের সব চাইতে মন্দ আবহাওয়ার প্রতিরূপ! মান্দালয় পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ দু'-এক দিনের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু আবার বৃষ্টি হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় ছিন্ন হয়েছে। ফলে, ডাক পৌঁছতে ফের দেরী হচ্ছে। খুব শীঘ্র রেঙ্গুন-মান্দালয় যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা্ যাচ্ছে না।

আমার মনে হয় ডাক্তারি অনুসন্ধানের জন্য আমাকে স্টীমারে করে রেঙ্গুন যেতে হবে। সিভিল সার্জেন (সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁর সঙ্গে একমত) বিশেষ করে enteroptesis-এর জন্য এক্স-রে পরীক্ষার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু তিনি এখনও, enteroptesis-ই আমার অসুখের মূলে—এরকম নিদান দেননি। তাঁর মতে আমার সমস্যার মূলে আছে কোষ্ঠবদ্ধতা, যার ফল intestinal toxaemia। গত এক মাস যাবৎ আমার যে অল্প জ্বর ও রাত্রে ঘাম হচ্ছে, এটি তার কারণ হতে পারে। প্রথমে ভেবেছিলাম এই যে অল্প জ্বর ও রাত্রে ঘাম কিছুদিনের মধ্যে চলে যাবে, কিন্তু সেগুলি ছাড়ার লক্ষণ দেখছি না। এর সঙ্গে, শিরদাঁড়ায় ব্যথা, যেটি প্রায় চলে গিয়েছিল, আবার চেপে ধরেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হই ৩০শে অক্টোবর, কিন্তু তার কিছুদিন আগে থেকেই জ্বর হচ্ছিল। আমি সেটিকে আমল দিইনি, ভেবেছিলাম এ এমন কিছু নয়। আমার সেরে ওঠার পর্ব এখনও চলছে, এখনও পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছি না। যে সমস্ত রোগের লক্ষণ এখনও দেখা

যাচ্ছে সেগুলি হল রাত্রে ঘাম ও অল্প, জ্বর, এবং শিরদাঁড়ায় ব্যথা। অবশ্য উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কিছু হয়নি।

নির্বাচনের হিসেব পোস্ট করার আগে সে সময়ে আমার ঠিকানা কি তা তার পাঠিয়ে সঠিক জেনে নেবেন। যদি আমি রেঙ্গুনে থাকি, তাহলে আপনি কাগজপত্র I. G. of Prisons, রেঙ্গুন-এর কাছে পাঠাতে পারেন, তিনি সেগুলি আমায় পাঠিয়ে দেবেন। সহকারী সচিবের পদের জন্য প্রার্থী শ্রীযুক্ত এস. কে. সেনের সুপারিশপত্রগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন কি? যদি পেয়ে থাকেন, অনুগ্রহ করে সেগুলি তাঁকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। হঠাৎ মনে হল, ভাস্কর কি চাকুরীতে যোগ দিয়েছে?

নিম্নলিখিত বইগুলি কাউন্সিলে আপনার কাজে সহায় হবেঃ—

(১) Erskine May-র "Parliamentary Procedure".

(২) হ্যামণ্ডের "Electioneering in India" (বইটির সঠিক নাম সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত নই)। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নির্বাচনী নিয়ম, Case Law প্রভৃতি এ বইটির বিষয়বস্তু। নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণটি কুড়ি টাকামত দাম।

(৩) "Speakers of the House of Commons"। এ বিষয়টির ওপর দু'জন লোকের দু'টি আলাদা বই আছে—একটি পাওয়া যায় কাউন্সিল লাইব্রেরীতে, অন্যটি শ্রীযুক্ত নলিনী সরকারের কাছে।

সংবাদপত্রে পড়লাম কমিশনের জন্য আবেদন আমার কৌঁসুলী মিঃ এ. কে. রায় পরিত্যাগ করেন, তার ফলে মিঃ ল্যাংফোর্ড জেম্‌স মামলার খরচের দাবী জানান। স্টেটস্‌ম্যান যদি পূর্ণ রিপোর্ট দিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে মিঃ রায় মিঃ জেম্‌সের যুক্তি যতটা সাফল্যের সঙ্গে খণ্ডন করা উচিত ছিল, তা করতে পারেন নি। যাইহোক, বাক্‌ল্যান্ড বিষয়টি মুলতুবী রেখেছেন। পরবর্তী শুনানী বোধহয় ৬ই ডিসেম্বর, যেদিন মিঃ উইলকিন্‌সন সাক্ষী দেবেন।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনুদিত)

(অনাথবন্ধু দত্তকে লিখিত)

১৭৪

মান্দালয় জেল
ডিসেম্বর, ১৯২৬

সবিনয় নিবেদন

আপনার ৯ই নভেম্বরের পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হল ব'লে কিছু মনে করবেন না। নিজের ইচ্ছা অনুসরণ করলে হয়তো পত্র দিতুম না, কারণ রাজ-বন্দীর সহিত সম্বন্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় নহে, তবে আপনি বোধ হয় উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছেন এবং উত্তর পেয়ে সুখী হবেন—এই মনে ক'রে উত্তর দিতে বসেছি।

আপনারা যে সমবেতভাবে আমার কথা স্মরণ করে আমার স্বাস্থ্য ও মুক্তির কামনা করেছেন এবং হৃদয়ের সম্ভাষণ জানিয়েছেন, তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন। এর চেয়ে বড় পারিতোষিক কোন স্বদেশসেবী কামনা করতে পারে না। তাই আপনার পত্র এবং খবরের কাগজে আপনাদের সভার বিবরণ পাঠ করে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বলা বাহুল্য। তবে আমি বুঝি যে, এই আনন্দ পাওয়াটা খুব উচ্চস্তরের মনের নিদর্শন নয়। কি করি। স্বদেশসেবী হবার স্পর্ধা রাখলেও আমি মানুষ। ভালবাসা প্রীতি ও করুণার নিদর্শন পেলে কে না সুখী হয়? পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি হয় অথবা অতিক্রম করতে পারলেই ভাল হয়। উচ্চস্তরের কর্মীর পক্ষে সকল প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা জয় করা উচিত, কিন্তু সেটা এখনও আমার কাছে আদর্শ মাত্র। বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে, Alexander Selkirk-এর ভাষায় আমারও সময় সময় মনে হয়—

"My friends do they now and then
Send a wish or a thought after me"...

আজ ঠিক চৌদ্দমাস আমি জেলে। এর মধ্যে এগার মাস কাটলো সুদূর ব্রহ্মদেশে।

সময়ে সময়ে মনে হয় যে, দীর্ঘ চৌদ্দমাস দেখতে দেখতে গেল; কিন্তু অন্য সময়ে মনে হয় যেন কত যুগ ধ'রে এখানে রয়েছি। এ যেন আমার ঘর-বাড়ী, কারাগারের বাহিরের কথা যেন স্বপ্নের মত প্রহেলিকার মত বোধ হয়; যেন ইহজগতে একমাত্র সত্য হচ্ছে লোহের গারদ ও প্রস্তরের প্রাচীর। বাস্তবিক এ একটা নূতন বিচিত্র রাজ্য! আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, যে জেলখানা দেখে নাই সে জগতের কিছুই দেখে নাই। তার কাছে জগতের অনেক সত্য প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। আমি নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এই রকম চিন্তা ঈর্ষা-প্রসূত নয়। আমি প্রকৃতপক্ষে জেলখানায় এসে অনেক শিখেছি; অনেক সত্য যাহা এক সময় ছায়ার মত ছিল, এখন আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে, অনেক নূতন অনুভূতিও আমার জীবনকে সবল ও গভীর ক'রে তুলেছে। যদি ভগবান কোনও দিন সুযোগ দেন ও মুখে ভাষা দেন—তবে সে সব কথা দেশবাসীকে জানাবার আকাঙ্ক্ষা ও স্পর্ধা আছে।

জেলে আছি—তাতে দুঃখ নাই। মায়ের জন্যে দুঃখভোগ করা সে ত' গৌরবের কথা! Suffering-এর মধ্যে আনন্দ আছে, একথা বিশ্বাস করুন। তা না হলে লোক পাগল হয়ে যেত, তা না হলে কষ্টের মধ্যে লোক হৃদয়ের আনন্দে ভরপুর হয়ে হাসে কি করে? যে বস্তুটা বাহির থেকে suffering ব'লে বোধ হয়—তার ভিতর থেকে দেখলে আনন্দ বলেই বোধ হয়। অবশ্য বৎসরের মধ্যে ৩৬৫ দিন এবং দিনের মধ্যে ২৪ ঘন্টা এ ভাব আমার থাকে না, কারণ—এখনও শৃঙ্খলের দাগ গায়ের উপর রয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই অনুভূতি অল্পাধিক ভাবে যার নাই সে না পারে suffering-এর দ্বারা জীবনকে পরিপুষ্ট করতে না পারে suffering-এর মধ্যে প্রকৃতিস্থ থাকতে।

আমার শুধু দুঃখ এই যে, চৌদ্দমাস কাল অনেকটা হেলায় কাটিয়েছি। হয়তো বাঙ্গলার জেলে থাকলে এই সময়ের মধ্যে সাধনার পথে অনেকটা এগুতে পারতুম। কিন্তু তা হ'বার নয়! এখন আমার প্রার্থনা শুধু এই, "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" যখন খালাসের কল্পনা করি তখন আনন্দ যত হয়, তার চেয়ে বেশী হয় ভয়! ভয় হয় পাছে প্রস্তুত হতে না হতে কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছায়। তখন মনে হয়, প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত যেন খালাসের কথা না ওঠে। আজ আমি অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত নই, তাই কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছায় নাই। যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে কেহ আটকে রাখতে পারবে না। এসব ভাবের কথা; এর মধ্যে objective truth আছে কিনা জানি না! জেলখানায় থাকতে থাকতে subjective truth এবং objective truth এক হয়ে যায়। ভাব ও স্মৃতি যেন সত্যে পরিণত হয়ে পড়ে। আমার অবস্থা অনেকটা তাই। আপাততঃ ভাবই আমার কাছে বাস্তব সত্য; কারণ একত্ববোধের মধ্যেই শান্তি।

আপনি লিখেছেন, "দেশের ও কালের ব্যবধান আপনাকে বাঙ্গলা দেশের নিকট আরও প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।" কিন্তু দেশের ও কালের ব্যবধান সোনার বাঙ্গলাকে আমার কাছে কত সুন্দর, কত সত্য করে তুলেছে তা আমি বলতে পারি না। দেশবন্ধু তাঁর বাঙ্গলার গীতি কবিতায় বলেছেন, "বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে।" এ উক্তির সত্যতা কি এমন ভাবে বুঝতে পারতুম, যদি এখানে এক বৎসর না থাকতুম? "বাঙ্গলার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দেরে ধূপ-ধুনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটির প্রাঙ্গণ"—এসব দৃশ্য কল্পনার মধ্য দিয়াও কত সুন্দর!

প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটা বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ ব'লে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়—

"তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা,
বহিতে আমার সুখ।"

সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর লাভ ক'রে দিবালোক সৃষ্টি করে—তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সূর্যাস্তের দৃশ্য। এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য রয়েছে তা কে পূর্বে জানত!

প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিঙ্মণ্ডল আলোকিত ক'রে এসে নিদ্রালস নয়নের

পর্দায় আঘাত ক'রে বলে, "অন্ধ জাগো"—তখনও মনে পড়ে আর একটা সূর্যোদয়ের কথা, যে সূর্যোদয়ের মধ্যে বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গলার সাধক বঙ্গ-জননীর দর্শন পেয়েছিল।

থাক্—আমি বোধ হয় Pedantic হ'য়ে পড়েছি। তবে এটা Pedantry নয়—বাচালতা। ভাবের আদান-প্রদান বহুদিন বন্ধ থাকলে যা হয়—তারই একটা দৃষ্টান্ত। Engine যেমন মধ্যে মধ্যে তার খানিকটা Steam ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে—আমার অবস্থাও তদ্রূপ।

সেবক সমিতির কাজ ভাল চলছে শুনে সুখী হলুম। Lansdowne branch-এর সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটা উচিত নয়। আশা করি, তাঁরা কাজকর্ম ভাল করছেন। দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের orphanage-এর জন্য যদি কিছু করতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এটার তেমন উন্নতি হচ্ছে না বোধ হয়—অথচ কাজটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আপনাকে চিনতে আমার কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। আশা করি আপনাদের সকলের কুশল। আমার প্রীতি সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন গ্রহণ করবেন। ইতি—

(পরবর্তী ৩টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১৭৫

মান্দালয়
৪. ১২. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

২৭. ১১. ২৬ তারিখে আপনাকে শেষ চিঠি লিখেছি। আশা করি আমার সব চিঠিগুলি আপনি যথাসময়ে পেয়েছেন।

আবহাওয়া কিছুটা ভালর দিকে। রেল বিভ্রাট এখনও চলছে, ভগবানই একমাত্র জানেন কবে ঠিক হবে। রেঙ্গুন থেকে চিঠি পোঁছতে আগের থেকে দু'-তিন দিন বেশী সময় লাগছে। বর্মা গভর্নর সাধারণত শীতকাল মান্দালয়ে কাটান। রেল বিভ্রাটের দরুণ তাঁকে যাত্রা বাতিল করতে হয়েছে।

নির্বাচনের হিসেব আমি এখনও পাইনি। আশা করি অহেতুক দেরী হবে না। পরশুদিন আপনাকে এই মর্মে একটি তার পাঠিয়েছি:—"নির্বাচনের হিসেব এখনও পাইনি, উদ্বিগ্ন। অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি পাঠান কারণ রেল বিভ্রাটের দরুণ পেতে দেরী হচ্ছে। পাঠানোর আগে এই জেল থেকে আমার ঠিকানা সঠিক জেনে নেবেন কারণ মেডিকেল পরীক্ষার জন্য রেঙ্গুন যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।" নির্বাচনের হিসেব সোজা মান্দালয় থেকে কলকাতা পাঠানোর অনুমতি, হিসেবপত্র এখানে পাঠানোর সময় D I. G, C I D-র থেকে করিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। হিসেবপত্র পাঠানোর সময় C I D এই অনুমতির কথা সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জানিয়ে দিতে পারেন।

আমি আশা করছি যে আমার কোনও কোনও ব্যাধি (যথা, প্রতিদিন দুপুরবেলা জ্বর, শিরদাঁড়ায় ব্যথা ও রাত্রে ঘাম) ইনফ্লুয়েঞ্জার ফল এবং সেগুলি সময়ে কেটে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলি হাওয়া-পরিবর্তন না হলেও কেটে যাবে কিনা। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী লক্ষণগুলির জন্য ওষুধের কিছু পরিবর্তন হবে কিনা জানতে চেয়ে গতকাল শ্যামাদাস কবিরাজকে তার পাঠিয়েছি। উদ্বিগ্ন হওয়ার মত অবশ্য কিছু ঘটেনি।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠকে জমি দানের প্রশ্নটি শীঘ্রই কর্পোরেশনের (বা ফাইনান্স ইত্যাদি কমিটির) সামনে উঠবে। আপার সার্কুলার রোডের কাছে বোস ইন্‌স্টিটিউটের উল্টোদিকে যে জমিটি এ যাবত ধোবীখানা হিসেবে ব্যবহৃত হত, সেটি তারা চাইবে। আমার বিশ্বাস ধোবীখানা সাব-কমিটি ধোবীখানাটি তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছে, অতএব জমিটি পাওয়া যাবার কথা। দয়া করে যতটা পারেন চেষ্টা করবেন এবং সন্তোষবাবু ও অন্যান্য বন্ধুদের বলবেন। বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের লোকেরা গতবার নিরাশ হয়েছিল।

এ মাসের প্রবাসী-তে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির একটি কৌতূহলোদ্দীপক সমালোচনা আছে। সময় করে পড়বেন।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৭৬

মান্দালয়
৬. ১২. ২৬
সোমবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

I. G. of Prisons আমায় এইমাত্র জানালেন যে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য আমার রেঙ্গুন যাত্রা অনুমোদিত হয়েছে এবং ব্যবস্থাদি করা হচ্ছে। এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি যাব এবং খুব সম্ভব স্টীমারে যাব।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ার পর ওষুধপত্রে কোন পরিবর্তন হবে কিনা জানতে চেয়ে, ৩রা ডিসেম্বর ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে শ্যামাদাস কবিরাজকে তার করি। সেই তারে আমি বর্তমান লক্ষণগুলি উল্লেখ করি, যথা, শিরদাঁড়ায় ব্যথাসহ দুপুরবেলা জ্বর এবং রাত্রে ঘাম। বদহজম ও ক্ষিদের অভাব, এই দুটি রোগের চিহ্ন তো আগে থেকেই আছে। তারের উত্তর আমি যে কোন মুহূর্তে আশা করছি। এই চিঠির সঙ্গে কবিরাজ মহাশয়ের জন্য ১৩ই নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার শরীরের তাপমাত্রার চার্ট পাঠাচ্ছি। এটি অনুগ্রহ করে তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন। এ সপ্তাহে তাঁকে আমি লিখছি না। রেঙ্গুন যাত্রার আগে আপনাকে একটি তার পাঠাব। আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৭৭

মান্দালয়
১০. ১২. ২৬
শুক্রবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

মনে হয় এক মাসের ওপর আপনার কাছ থেকে চিঠি পাইনি, তাই খবরের জন্য কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। আপনি বোধহয় এখন খুবই ব্যস্ত। ৭. ১২. ২৬ তারিখে আপনাকে নিম্নলিখিত তারটি পাঠিয়েছিলাম এবং প্রতি মুহূর্তেই উত্তর আশা করছিঃ—"শীঘ্রই ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য স্টীমারে রেঙ্গুন রওনা হচ্ছি। রেল বিভ্রাটের দরুণ ইন্টারভিউ মান্দালয়ের থেকে সেখানেই বেশী সুবিধাজনক ও বাঞ্ছনীয়। ইন্টারভিউ করার ইচ্ছে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে রেঙ্গুন আসতে পারেন। রওনা হওয়ার আগে আবার তার করব।"

এই তার পাঠানোর পর হঠাৎই মান্দালয় ও রেঙ্গুনের মধ্যে সোজা ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে। আমাকে এখন জানানো হয়েছে আমি ট্রেনে যেতে পারি—যা বেশী সুবিধাজনক। আমি দু'-তিন দিনের মধ্যে রওনা হব এবং রেঙ্গুনে তিন-চার দিনের বেশী থাকব বলে মনে হয় না—অর্থাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে ফিরে আসব। রেঙ্গুন থেকে ফিরে নির্বাচনের হিসেব পাব আশা করছি। আমার পরিবর্তিত কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে, রেঙ্গুনে আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা না করতে অনুরোধ করে, রওনা হওয়ার আগে আপনাকে আরেকটা তার পাঠাব ভাবছি।

স্টেট্‌সম্যান মামলা সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন আমি তার সঙ্গে একমত। মিঃ জাস্টিস্ বাক্‌ল্যান্ডের কাছ থেকে আমার অনুকূলে রায় আমি আশা করি না।

আশা করি যথেষ্ট বিচার-বিবেচনার পর Health Officer নিয়োগ করা হবে। পদটি পূরণ করার জন্য একজন যোগ্য ভারতীয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হওয়া উচিত। আশা করি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের বিষয়টি আপনি ভুলবেন না। যে জমিটির থেকে ধোবীখানা উঠে যাচ্ছে, সেটির জন্যে তাঁরা আবেদন করবেন।

পরবর্তী আর্থিক বছরের মধ্যে একটি বাছাই করে নেওয়া এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা গেলে এবং তার জন্যে বাজেটে প্রয়োজনীয় সংস্থান করা গেলে খুবই ভাল হয়। আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন। আমি একপ্রকার।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত)

১৭৮

Censored and Passed
স্বাঃ অস্পষ্ট
for D.I.G., I.B., C.I.D.,
Bengal.

রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল
ইং ২০।১২।২৬

শ্রীচরণেষু,

মা, অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে শান্তি পেলাম। আমি ১৩ই সেপ্টেম্বরে আপনাকে পত্র দিয়েছি—তারপর ১৭ই নভেম্বরে আবার দিয়েছি। শেষ পত্র বোধ হয় এতদিনে আপনি পেয়েছেন। আপনার ৩রা ডিসেম্বরের পত্র আজ পেলাম। আজ ৫/৬ দিন হ'ল আমি ম্যাণ্ডেলে থেকে এখানে এসেছি—স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। বোধ হয় ২/৩ দিনের মধ্যে আবার ম্যাণ্ডেলে ফিরে যাব।

আমি প্রায়ই চিঠি লিখবার চেষ্টা করে কলম নিয়ে বসি কিন্তু কলম চলে না; তাই অগত্যা কিছু দূর লিখে লেখা বন্ধ করি। আমাকে চিঠি লিখে আমার কারাক্লেশ দুর্বিষহ করবার কোনও আশঙ্কা নাই। এখানে আমার কষ্ট নাই—এ কথা বললে সত্য বলা হবে না। কিন্তু কষ্ট যা আছে—পত্র না লিখলে তা কি কমবে? এবং পত্র লিখলে তা কি বাড়বে? পত্র পড়ে যে কষ্ট হয় না—তা নয়। কিন্তু শুধু কি কষ্টই পাই? আর এই সব সুখদুঃখময় স্মৃতি, যার মধ্যে ব্যথার অংশ এখন বেশী হয়ে পড়েছে—তা ছেড়ে আমি বাঁচব কি করে? সন্ন্যাসের মার্গ যখন নিই নাই—তখন বাহিরের স্মৃতি—দুঃখদায়ক হলেও—কি করে ভুলব? শত যন্ত্রণা পেলেও সে সব স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে।

আপনি নির্জন বাস করতে চান— কিন্তু নির্জন বাসেই কি শান্তি পাবেন? কে বলতে পারে? প্রাণটা যদি আরও ছোট হইত—তা হলে হয়তো বা পেতেন। আপনার শরীরের সংবাদ ২।৩ দিন হইল আমি প্রথমে সংবাদপত্রে পাই—তখন ইচ্ছা হল একবার টেলিগ্রাম করে খবর লই। তারপর ভাবলাম যে ২।১ দিনের মধ্যে যখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি তখন ম্যাণ্ডেলে ফিরে খবর পাবার চেষ্টা করব। তারপর আপনার চিঠি আমার হাতে এল।

বন্দী অবস্থায় আর কতদিন থাকতে হবে তা শুধু ভগবান জানেন। তবে যতদিন থাকতে হউক না কেন—আমাকে যে সহ্য করবার ক্ষমতা দিয়েছেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট। এক এক সময়ে, শুধু এক এক সময়ে কেন, প্রায়ই মনে হয় আমি এখন বাহিরে যাবার জন্য কায়মনে প্রস্তুত নই। যে উদ্দেশ্যে ভগবান আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তা এখনও সফল হয় নাই এবং আমার কারাবাসকালীন শিক্ষা এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে! স্থিরভাবে যখনই ভেবে দেখি তখনই মনে হয় যে আমার পক্ষে এখন কারাবাসই প্রশস্ত। তবে প্রাণ সব সময়ে মানতে চায় না। শুধু আপন জন নয়, আজ বাঙ্গলাদেশ, সমগ্র ভারতবর্ষ আমার কাছে যেন অশেষ মাধুরী-মাখা উজ্জ্বল স্বপ্ন। বাস্তব দূরে সরে রয়েছে—আমি এই স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে রয়েছি। এই স্বপ্নের পেছনে যে বাস্তব সত্য তার জন্য মধ্যে মধ্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠে। আমার মত কঠিনহৃদয় লোকের পক্ষে এই সাময়িক উদ্বেল ভাব চেপে রাখা সম্ভবপর—কিন্তু পূর্বেই বলেছি যে সন্ন্যাস মানি না—তাই দুঃখকে অস্বীকার করবার আমার অধিকার নাই।

মান্দালয় জেল
৩০।১২।২৬

যে সব পুরান স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে আসে এবং আমার এই সুদীর্ঘ অবসর কাটাবার সম্বলস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় সেগুলির মধ্যে ব্যথার অংশ যে বেশী তা মনে হয় না। তার মধ্যে সুখের ও শান্তির উপাদানই বেশী—তবে বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করলেই ব্যথার উদ্রেক হয়। সে ব্যথার মধ্যেও যে কোন সুখ নাই এ কথা আমি বলতে পারি না।

আমার একজন বন্ধু কিছুকাল পূর্বে আমাকে লিখেছিলেন—দেশবাসীর মিলিত অশ্রুরাশির মধ্যে নিজের অশ্রু মিশিয়ে আমরা ব্যথার গুরুভার লাঘব করছি কিন্তু সে সান্ত্বনা ভগবান আপনাদের দেন নাই। এ কথা সত্য। নীরবে ও নির্জনে অশ্রুমালা রচনা করা খুব কষ্টদায়ক; কিন্তু এ বিপদের সময়েও যে আমরা কোনও কাজে লাগলাম না, এ ভাবনা কম

কষ্টদায়ক নয়।

নিজেকে কর্ম-কোলাহল হতে দূরে রাখলেই যে "নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ লইয়া কাহাকেও ব্যস্ত করা" হইবে না এ কথা মনে করবার কোনও কারণ নাই—বরং উল্টাটাই ঘটিতে পারে। আপনি লিখেছেন—জানি না তোমাদের সাথে এ জীবনে দেখা হইবে কি না। আমি মোটেই নিরাশ নই যদিও আমি সকল ব্যথর জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি। আমার মনে হয় যে দেশমাতৃকার কল্যাণের জন্য যদি আমাকে সারাজীবন কারাগারে যাপন করতে হয় আমি তাতে মোটেই পশ্চাৎপদ হব না।

আমি আমার জীবনটাকে একটা adventure বলেই গ্রহণ করছি—জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা ভগবানের হাতে। আমার দুঃখ শুধু এই যে এখানে থাকতে যতটা উন্নতি সাধন করা উচিত ছিল তা করতে পারি নাই; তথাপি আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আপনি সত্যই বলেছেন—তোমাদের নির্যাতিত জীবনের প্রতিঘাত ভগবান নিজেই বহন করিতেছেন... একদিন এ দিনের শেষ আছেই। এ কথা আমরাও বিশ্বাস করি। আপনার ভাষায় "একদিন সফলতার গৌরবে জীবন গৌরবান্বিত" হইবেই। আপনার সান্ত্বনামাখা অমূল্য কথাগুলি আমাদের অন্তরের বাণী এবং সর্বাবস্থায় আমাদের পরম অবলম্বন স্বরূপ। আমার শুধু আরও একটু মনে হয়—সারাজীবন কাটাতে হলেও আমাদের জীবন ব্যর্থ হবে না—কারণ জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি তো অন্তরের বিকাশ, বাহিরের ক্রিয়াকলাপ নয়। আপনার স্নেহাশীর্বাদ আমাদের সর্বদা বর্মের ন্যায় রক্ষা করুক—এই প্রার্থনা করি—এবং প্রার্থনা করি যেন সর্বদা সত্যপথে চলিয়া আপনার ঐ অমূল্য স্নেহাশীর্বাদের কতকটা যোগ্য হতে পারি।

তাঁর জীবনী লিখবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে আছে—কিন্তু ভরসা হয় না। যে ২।১ বার ২।১ লাইন লিখবার চেষ্টা করেছি তাতে আরও নির্ভরসা হয়ে পড়েছি। তবু মনে হয় যে তাঁর গভীর ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রের যতটা আভাস আমি পেয়েছি—ততটা অনেকেই পান নাই। তাই আমার অভিজ্ঞতার ভাগ যে অপরকে দিতে ইচ্ছা হয় না—তা নয়। সত্যেন-বাবু বলেন যে, তিনি বলতেন যে শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁর ঠিক ঠিক জীবনী লিখতে পারবেন। তবে আপনি যদি কিছু উপাদান দিতে পারেন—তবে অসমর্থ হলেও আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। এই কাজের জন্য যে সময়ের অভাব হবে না—একথা আমি বলতে পারি। প্রকৃত অন্তরায় সময়ের অভাব নয়, সামর্থ্যের অভাব এবং অন্তর্দৃষ্টির অভাব। আর একটা কাজ আমার মনের সামনে রয়েছে—তাঁর কারাবাসের সময়ে তিনি যে সব notes লিখেছিলেন সেগুলি থেকে একটা পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত প্রবন্ধ বা পুস্তিকা প্রণয়ন করা।

কয়েকদিন হ'ল মেজদাদার পত্রে আপনার স্বাস্থ্যের সংবাদ পেয়ে চিন্তিত রয়েছি। আপনার নিজের মনের অবস্থা যাহা হউক না কেন—চিকিৎসা সম্বন্ধে অপর সকলের এবং ডাক্তারদের কথায় আপনার আপত্তি তোলা উচিত নয়। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আপনি গ্রাহ্য করেন না—এবং আপনার মনের কথা যে আমরা একেবারে বুঝি না তা নয়। তবুও আমাদের সকলের—এবং সমগ্র দেশবাসীর নিকট আপনার স্বাস্থ্যের মূল্য যে কত বেশী তাহা বোধ হয় আপনি জানেন না।

প্রায় ৭ দিন হ'ল রেঙ্গুন থেকে ফিরেছি—এখন এখানেই থাকব। আমাদের সকলের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। আমার শরীরের জন্য কোনও চিন্তার কারণ নাই—একথা রেঙ্গুনের ডাক্তার বলেছেন। এখন তবে আসি মা।

ইতি
আপনাদের সেবক
শ্রীসুভাষ

(পরবর্তী ৯টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১৭৯

মান্দালয়
২৪-১২-২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

কাল সকালে এখানে ফিরেছি। এতে আপনি নিশ্চয়ই বিস্মিত। গত রবিবার (১৯শে ডিসেম্বর) আমি I. G. of Prisons-কে অনুরোধ করেছিলাম তিনি যেন ইন্টেলিজেন্সের

মাধ্যমে আপনাকে তার করে জানিয়ে দেন আমি এখানে কতদিন থাকব। যতদূর মনে আছে, তিনি আমাকে লিখে জানান যে আমায় এখানে আটক রাখার কোন বিশেষ কারণ নেই, তবে তিনি তা করতে পারেন যদি কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান এবং আমি draft-টির সঙ্গে একমত হই। মঙ্গলবার সকলে (অর্থাৎ ২১শে) আমায় জানানো হয় যে I. G. P খবর পাঠিয়েছেন আমার ভাইয়েদের মধ্যে একজনের শুক্রবার (অর্থাৎ, আজ) জাহাজে রওনা হওয়ার কথা। I. G. P জানতে চান, আমি রেঙ্গুনে থেকে যেতে ইচ্ছুক না কি আমি ইতিমধ্যে মান্দালয় চলে যাব। আমি দেখলাম যে রেঙ্গুনে ইন্টারভিউ হলে আমায় সেখানে আরও আট-নয় দিন থাকতে হয়। রেঙ্গুন জেলে অস্থায়ী ব্যবস্থা মোটেই সুবিধেজনক ছিল না; আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল এবং আমি মানসিক চাপ অনুভব করছিলাম। তার ওপর, জ্বরের প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছিল। মান্দালয়ে থাকতে সাধারণত প্রতিদিন ৯৯° হত, কিন্তু রেঙ্গুনে জ্বরের তাপ ১০০° হতে শুরু করল—নিম্নলিখিত চার্টেই আপনি তা দেখতে পাবেন। তাই, ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি বিবেচনা করে খবর পাঠালাম যে আমি মান্দালয় ফিরে যেতেই ইচ্ছুক। আমি জানতাম যে আপনি আসছেন এই ধারণা নিয়ে যে আমাকে রেঙ্গুনে পাবেন। সুতরাং, বুধবার সকালে (২২শে ডিসেম্বর) রেঙ্গুন জেল ত্যাগের আগে I. G. of Prisons-এর সঙ্গে দেখা হলে আমি তাঁকে অনুরোধ করি তিনি যেন আপনাকে তার করে জানিয়ে দেন যে আমি মান্দালয় চলে যাচ্ছি। আমি তাঁকে বোঝাই যে তার করাটা খুবই জরুরী এবং বলি যে আমি আর রেঙ্গুনে নেই জানতে পারলে আপনি হয়ত আপনার পূর্ব পরিকল্পনা পাল্টাতে পারেন। তিনি বলেন যে নিশ্চয়ই সেদিন দুপুরেই তিনি তারটি পাঠিয়ে দেবেন। মিঃ ভট্টাচার্য (D S P, C I D) আমায় বিদায় জানাতে স্টেশনে আসেন। তাঁকে আমি বলি তারের বিষয়ে I. G. of Prisons-কে মনে করিয়ে দিতে এবং তাতে তিনি সম্মত হন। I. G. P-র তার নিশ্চয়ই গতকাল (অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার, ২৩শে) আপনার কাছে পৌঁছনর অব্যবহিত পর ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে এই মর্মে আপনাকে আরেকটি তার পাঠাইঃ—

"রেঙ্গুনে থাকায় অসুবিধার জন্য মান্দালয় ফিরে এসেছি। প্রয়োজন হলে বর্মা যাত্রা পুনর্বিবেচনা করুন। আজকের জাহাজে নির্বাচনী খরচপত্রাদি রেঙ্গুন ছাড়ছে।"

এই তার নিশ্চয়ই কাল সন্ধ্যেবেলা আপনি পেয়েছেন। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আমায় জানালেন যে আমি মান্দালয় ফিরে এসেছি কিনা জানতে চেয়ে আপনি গতকাল তাঁকে তার পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে বড়দিনের ছুটিতে আপনি মান্দালয় আসতে পারবেন না। এখন বর্মা যাত্রার কথা পুনর্বিবেচনা করতে আমি ইতিমধ্যেই আপনাকে তার পাঠিয়েছি এবং আমি চাই না যে এখানে আসতে গিয়ে আপনার প্রোগ্রাম ওলট-পালট হয় বা আপনার জনহিতকর কাজে ব্যাঘাত ঘটে। তা যদি হয়, আমি সত্যিই দুঃখিত হব।

আমার স্বাস্থ্যের বিষয় পরের চিঠিতে আরও লিখব। আমি আজকের ডাক ধরতে চাই, তাই তাড়াতাড়ি করছি। আমি শুধু রেঙ্গুনে থাকাকালীন আমার জ্বরের চার্ট এর সঙ্গে পাঠাচ্ছি। সেখানে থাকার প্রথম কয়েকদিন, শরীরের তাপ দেখা হয়নি। এ সপ্তাহে কবিরাজ মহাশয়কে লিখছি, তাই অনুগ্রহ করে তাঁকে চার্টটি পাঠিয়ে দেবেন। তাঁকে একথাও জানিয়ে দেবেন যে আমার ৩রা ডিসেম্বরের তার পেয়ে তিনি ওষুধের যে পার্সেল পাঠিয়েছিলেন সেটি আমি পেয়েছি।

আপনি বাইরে থাকবেন মনে করে, নির্বাচনের খরচপত্রাদি বড়দাদাকে পাঠিয়েছি। খরচপত্রের বইয়ের (expenses book) শেষ পৃষ্ঠায় আমি সই করিনি কারণ সেটি শুধু তাঁদের জন্য যাঁরা ভারতবর্ষের বাইরে আছেন বলে হিসেব ঠিক সময়ে জমা দিতে পারছেন না।

টেম্পারেচার চার্ট

শনিবার ১৮ই ডিসেম্বর		রবিবার ১৯শে ডিসেম্বর	
সকাল ১০·৩০	৯৮·৯°	সকাল ৭	৯৭·৬°
বিকেল ৩	৯৯°	সকাল ১১	৯৯·২°
সন্ধ্যে ৭	৯৮·৪°	বিকেল ৩	৯৮·৬°
		সন্ধ্যে ৭	৯৮·৪°

সোমবার ২০শে ডিসেম্বর			মঙ্গলবার ২১শে ডিসেম্বর		
সকাল	৭·৩০	৯৮°	সকাল	৭·৩০	৯৮·২°
সকাল	১১·৩০	৯৯·৬°	সকাল	১১·৩০	৯৯·৬°
বিকেল	৩·৩০	৯৮·৮°	বিকেল	৩	১০০°
সন্ধ্যে	৭	৯৮·৮°	রাত	৮·১৫	৯৮·২°

বুধবার ২২শে ডিসেম্বর

সকাল	৭·০০	১০০°
সকাল	১১·৩০	৯৯·২°

আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা একই রকম। আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনুদিত)

১৮০ মান্দালয়
৩১. ১২. ২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ১১. ১২. ২৬ তারিখের চিঠি আমি গতকাল পেয়েছি। চিঠিটি এখান থেকে পাঠানো হয়েছিল রেঙ্গুনে, কিন্তু সেখানেও আমার কাছে ঠিক সময়ের মধ্যে পেঁছয়নি—তাই এত দেরী।

নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই দুই মাসে আমি আপনাকে নিম্নলিখিত তারিখগুলিতে চিঠি দিয়েছিঃ—(১) ১লা নভেম্বর (২) ৬ই নভেম্বর (৩) ১৩ই নভেম্বর (৪) ১৫ই নভেম্বর (৫) ২৩শে নভেম্বর (৬) ২৭শে নভেম্বর (৭) ৪ঠা ডিসেম্বর (৮) ৬ই ডিসেম্বর (৯) ১০ই ডিসেম্বর (১০) রেঙ্গুন থেকে ১৭ই ডিসেম্বর (১১) রেঙ্গুন থেকে ২০শে ডিসেম্বর (১২) মান্দালয় থেকে ২৪শে ডিসেম্বর। নির্বাচনের জন্য অর্থ পাঠানোর সময় বড়দাদাকেও রেঙ্গুন থেকে ২১।১২।২৬ তারিখে চিঠি লিখেছি। আশা করি উপরোক্ত চিঠিগুলি যথাসময়ে পেয়েছেন।

ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তারগুলি আমি পাঠিয়েছিলামঃ—১১।১২।২৬—নির্বাচনের হিসেব পাঠনো হয়েছে কিনা তার করুন, হয়ে থাকলে কবে ও কোন ঠিকানায় (Reply Prepaid Re. 1/-) ১৩।১২।২৬—আজ রেঙ্গুন থেকে ট্রেনে রওনা হচ্ছি. পেঁছে সেখানে ক'দিন থাকব তার করব, রেঙ্গুন জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঠিকানায় খবর পাঠাবেন ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে।

রেঙ্গুন থেকেও ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ১৫।১২।২৬ তারিখে একটি তার করেছিলাম এবং সেদিনই Inspector General of Prisons-এর মাধ্যমে তার উত্তর পাই। ইন্টেলিজেন্স ও রেঙ্গুন জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মাধ্যমে আমি ১৭।১২।২৬ তারিখে আপনার একটি তার পাই। টেলিগ্রামের তারিখ ছিল ১৬।১২।২৬। আমার মনে হয় না তার কোন উত্তর আমি পাঠিয়েছি। ১৯।১২।২৬ তারিখে Inspector General আপনাকে তার পাঠিয়ে জানান যে আমায় রেঙ্গুনে আটক রাখার কোন বিশেষ কারণ নেই যদি না কেউ আমাকে সেখানে ইন্টারভিউ করতে চান।

আশা করি তারগুলি আপনি যথাসময় পেয়েছেন।

রেঙ্গুন থেকে আমি এখানে আসি ২৩।১২।২৬ তারিখে। সেদিনই ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আমি আপনাকে তার পাঠাই এই বলে যে রেঙ্গুনে থাকতে অসুবিধা বোধ করায় আমি ফিরে এসেছি এবং আপনি যেন আমাকে ইন্টারভিউ করতে রেঙ্গুন আসার পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করে দেখেন। রেঙ্গুন ত্যাগের পূর্বে Inspector General of Prisons-কে আমি অনুরোধ করি তিনি যেন আমার চলে আসার খবর আপনাকে তার পাঠিয়ে জানিয়ে দেন।

আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের মতই। এখানে ফেরার পর দু'দিন আমার জ্বর হয় নি, কিন্তু গত পাঁচ-ছয় দিন ধরে আবার হচ্ছে। দুপুরের দিকে শরীরের তাপমাত্রা ৯৯° হয়।

রেঙ্গুন জেলে থাকাকালীন মিঃ জাস্টিস জে আর দাস সরকারীভাবে জেল পরিদর্শনের সময় আমার সঙ্গে দেখা করেন।

আমার ওজন এখন ১৩৯ পাউন্ড, অর্থাৎ, রেঙ্গুন যাবার আগে যা ছিল তাই।

আমি আজকের ডাক ধরতে চাই, তাই চিঠি এখানেই শেষ করছি। পরের চিঠিতে আরও লিখব।

আশা করি আপনারা সকলেই বেশ ভাল।

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৮১

মান্দালয়

৫. ১. ২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ১১ই ডিসেম্বরের চিঠির উত্তর আমি ইতিমধ্যেই অন্তত আংশিক ভাবে দিয়েছি।

বড়দিনের ছুটিতে আপনি একেবারেই বিশ্রাম নিতে পারেননি জেনে দুঃখিত হলাম।

স্টেট্‌সম্যান লাইবেল মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা আপনি সঙ্গত মনে করেন কিনা জানতে আমি ব্যগ্র। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার আগে আমাকে আর জানানোর প্রয়োজন নেই, কারণ বিষয়টি আমি সম্পূর্ণ আমার আইন-উপদেষ্টাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। মামলার বিবরণী চোখ বুলিয়ে দেখতে গিয়ে আমার মনে হল যে দুটি তথ্যের উপর আরও জোর দিলে বোধ হয় অসঙ্গত হত নাঃ—(১) আমি সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম না এবং কাগজে প্রকাশিত হওয়া অবধি সম্মেলনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। এই সম্মেলনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চাঁদের মানুষের চেয়ে বেশী ছিল না। চীফ্ এগ্‌জিকিউটিভ্ অফিসারের কর্মভার আমি ১৬. ৫. ২৪ তারিখে গ্রহণ করি এবং সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় তার পরে, সম্ভবত ১৯২৪-এর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। চীফ্ এগ্‌জিকিউটিভ্ অফিসার হওয়ার আগে আমি ফরওয়ার্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করি। এমন কি, ১৬. ৫. ২৪-এর আগেও আমার কাগজটির সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। স্যার বি সি মিত্র এই দুটি পয়েন্ট উল্লেখ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্ট বিশ্বাস করতে হলে মনে হয় বিবাদীপক্ষ এ দুটি বিষয়ের ওপর এতই গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে আরও বেশী জোর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হত।

শ্রীমতী দাসের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন। আমি তাঁকে গত পরশু লিখেছি।

আপনার ২৪. ১২. ২৬ ও ৩০. ১২. ২৬ তারিখের চিঠিগুলি গতকাল পেয়েছি। এর মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন কি কারণে আমি রেঙ্গুন ত্যাগ করতে বাধ্য হই। আমি এখানে ২৩শে তারিখ সকালে পৌঁছাই, এবং সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছসংবাদ দিয়ে Intelligence-এর মাধ্যমে আপনাকে তার পাঠাই। রেঙ্গুন ছেড়ে এসে আমি এক দিক থেকে খুশীই হয়েছি, নয়ত বাবাকে নিয়ে আপনাদের সকলকে কষ্ট করে বর্মা আসতে হত।

আমার মনে হয় ডাক্তারি পরীক্ষার খুঁটিনাটির কথা আমি লিখেছি, কিন্তু কর্নেল কেল্‌সলের লিখিত রিপোর্টের কপি আমার কাছে নেই। আমি শিরদাঁড়া ও ফুস্‌ফুস্ এক্স-রে করাতে চেয়েছিলাম এবং সেকথা জেলের আই, জি, কে জানিয়েও ছিলাম, কিন্তু কর্নেল কেল্‌সল তা প্রয়োজন মনে করেননি। আমি বিশেষ করে শিরদাঁড়া এক্স-রে করাতে চেয়েছিলাম, কারণ ব্যথাটা সেখানেই। যেহেতু আপনি স্যার নীলরতন, ডাঃ বিধান, শ্যামাদাস কবিরাজ ও অন্যান্য বড় চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে চান, আমি জেলের আই, জি, কে লিখছি ভিসেরার এক্স-রে ছবি সহ রিপোর্টের একটি কপি আপনাকে পাঠিয়ে দিতে। আপনিও তাঁকে লিখতে পারেন।

তাপমাত্রা এখনও উঁচুর দিকে। গতকাল ৯৯·৬° হয়েছিল, তার আগের দিন ৯৯·৪°।

১০ই জানুয়ারী কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগ দেবার শমন আমি পেয়েছি। বাংলার গভর্নরকে লিখছি আমাকে যোগদানের অনুমতি দিতে।

বর্মা গভর্ণমেন্ট আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন এবং সেটি কলকাতার সংবাদপত্রেও বেরিয়েছে। আমার বিশ্বাস আপনি ইতিমধ্যে সেটি দেখেছেন।

আমার ১৩. ১১. ২৬ তারিখের চিঠির সঙ্গে, ফরওয়ার্ড থেকে কিছু পাওনা সংক্রান্ত শ্রীযুক্ত সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আশা করি সেটি যথাসময়ে পেয়েছিলেন।

মিঃ এস কে সেনের (ভোম্বলের শ্বশুর) যে সুপারিশপত্রগুলি আমার কাছে ছিল, সেগুলি কি আপনি খুঁজে বের করতে পেরেছেন? যদি পেয়ে থাকেন, তাঁকে সেগুলি ফেরৎ দিয়ে দেবেন।

অনুগ্রহ করে দেখবেন বাবা-মা যেন খুব বেশী শঙ্কিত না হয়ে পড়েন। দুঃখের বিষয়, তাঁরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারবেন না।

আপনারা সকলে কেমন? এ বছর ঠাণ্ডা কি রকম পড়েছে?

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৮২ মান্দালয় জেল
১২. ১. ২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ৬ই জানুয়ারীর চিঠি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র গতকাল পেয়েছি। আমার ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টের একটি কপি ও এক্স-রে ছবির কপি আপনাকে পাঠানোর জন্যে আমি জেলের আই জি-কে লিখেছি।

কবিরাজ মহাশয় আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি আপাতত দশ দিনের মত ওষুধ পাঠাচ্ছেন এবং আমার বর্তমান অবস্থার বিশদ বিবরণ পাওয়ার পর আবার ওষুধের কথা জানাবেন। ২৩শে ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত আমার শরীরের তাপের chart-এর একটি কপি সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট আজকের ডাকে তাঁকে পাঠাচ্ছেন। প্রয়োজন হলে, chart-এর বিষয় কবিরাজ মহাশয় ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অন্যান্য খুঁটিনাটি কথা আমি আগের চিঠিতেই তাঁকে লিখেছি।

আমার মনে হয় শ্যামাদাস কবিরাজের সব কটি চিঠিই আমি পেয়েছি। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠির তারিখগুলি তাঁকে আমার পরবর্তী চিঠিতে জানিয়ে দেব।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সচিবের কাছ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি পাচ্ছি। জেনে খুশী হলাম যে আমার নির্বাচনী খরচের হিসাবপত্র যথাসময়ে জমা পড়েছে।

আমার আগের একটি চিঠিতে আইনসভার প্রথা সম্বন্ধীয় কয়েকটি বইয়ের উল্লেখ করেছিলাম যেগুলি কাউন্সিলের কাজে ভবিষ্যতে আপনার দরকারে লাগতে পারে। ফেব্রুয়ারী ১৯২৫-এ **ক্যালকাটা রিভিউ**-এ প্রকাশিত মিঃ টি চক্রবর্তী, এম এ-র লেখা "Parliamentary Privilege"-এর ওপর প্রবন্ধটিও পড়ে দেখতে পারেন। প্রবন্ধটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ, এবং আপনার পড়তে আধ ঘন্টার বেশী লাগবে না।

কর্পোরেশন ফাইনান্স কমিটিতে বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের বিষয়টি মনে রাখবেন। আমি শুনলাম যে অষ্টাঙ্গ আবার একটি অতিরিক্ত বৃহৎ অনুদান পেতে চলেছে।

আমার অবস্থা একই রকম চলছে—কাল বিকেলে শরীরের তাপ ৯৯·৪° হয়েছিল। উদ্বিগ্ন হবেন না—বিশেষ করে যখন প্রতিকারের উপায় কিছুই নেই। আশা করি ভালই আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৮৩ মান্দালয় জেল
১৯-১-২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

১১ তারিখের পর আপনার কোনও চিঠি পাইনি। বাবার চিঠি গতকাল পেয়েছি।

যেদিন থেকে আমার অসুখ গুরুতর রূপ নিয়েছে সেদিন থেকেই আমি গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম, আমার চিকিৎসকের থেকে আমি এত দূরে যে এই অবস্থায় কবিরাজী চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা। আমি খুবই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম কারণ

আয়ুর্বেদে আমার বিশ্বাস আছে, এ বিশ্বাস না থাকলে আয়ুর্বেদ ত্যাগ করতে আমার কোনই দ্বিধা হত না। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম এত দূর থেকে চিকিৎসা করতে বলা আমার কবিরাজের প্রতি অবিচার করা হয় আর আমার দিক থেকেও একজন অনুপস্থিত চিকিৎসকের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাই স্থির করলাম আপাতত কবিরাজী চিকিৎসা বন্ধ রেখে আমার স্থানীয় medical officer-এর চিকিৎসাধীন থাকা উচিত। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি নতুন কোন ওষুধ পাঠাতে না করে কবিরাজ মহাশয়কে তার পাঠাই। এ বিষয়ে আপনার ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের মত জানতে পারলে খুশী হব। ইতিমধ্যে কবিরাজ মহাশয়কে বুঝিয়ে বলবেন যাতে উনি কিছু মনে না করেন। আমিও তাঁকে এবারের ডাকে লিখছি।

মাসখানেক আগে গভর্নর-জেনারেলের কাছে আমার পরিবার ও বাড়ী প্রভৃতির ভাতা সংক্রান্ত একটি নিবেদন পাঠিয়েছিলাম। এখন পর্যন্ত কোন উত্তর পাইনি।

কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তি ও কাগজপত্র নিয়মিতভাবে পাচ্ছি। আমি এখন পর্যন্ত কোন প্রশ্ন বা প্রস্তাব পাঠাইনি কিন্তু এই ডাকেই, কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত থাকার অনুমতি চেয়ে গভর্নরের কাছে একটি নিবেদন পাঠাচ্ছি।

১৩ই জানুয়ারী অবধি আমার শরীরের তাপের chart দুই ভাগে কবিরাজ মহাশয়কে পাঠানো হয়েছে। অনুগ্রহ করে তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে সেটির বিষয় ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে আলোচনা করুন। নীচে যে তথ্য দিচ্ছি তার থেকে আপনি আমার দৈনিক শরীরের তাপের হেরফের সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেনঃ—

৬ই জানুয়ারী—৯৯·৬°; ৭ই জানুয়ারী—৯৯·৪°; ৮ই জানুয়ারী—৯৯·৪°;
৯ই জানুয়ারী—৯৯°; ১০ই জানুয়ারী—৯৯°; ১১ই জানুয়ারী—৯৯·৪°;
১২ই জানুয়ারী—৯৯·৪°; ১৩ই জানুয়ারী—৯৯·৪°; ১৪ই জানুয়ারী—৯৯·২°;
১৫ই জানুয়ারী—৯৮·৬°; ১৬ই জানুয়ারী—৯৯·৪°; ১৭ই জানুয়ারী—৯৯·৪°;
১৮ই জানুয়ারী—৯৯·৪°।

আমার অবস্থা একই রকম, পুরোনো লক্ষণগুলি এখনও দেখা যাচ্ছে। আমার রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করার ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন। জেলের আই জি আমাকে বলেছিলেন যে রেঙ্গুন থেকে ফেরার দু'সপ্তাহ পর আমার স্বাস্থ্যের বিষয় আরও একটি রিপোর্ট পেলে রেঙ্গুনের চিকিৎসকেরা একটা চূড়ান্ত মতামত দিতে পারবেন। সেই রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টকে আমি বলেছি তাঁকে মনে করিয়ে দিতে। রেঙ্গুন চিকিৎসকদের চূড়ান্ত মতামত শীঘ্রই পাব ব'লে আশা করছি

রেঙ্গুন থেকে ফেরার পর আমি টেনিস খেলা শুরু করেছিলাম, এই ভেবে যে আমার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হতে পারে। কিন্তু শরীর এত ধকল সহ্য করতে পারল না, তাই ছেড়ে দিতে হল।

আমার অসুখের জন্য বাবা খুবই উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। দয়া করে দেখবেন যেন তিনি এ ব্যাপারে খুব বেশী চিন্তা না করেন।

আপনারা সকলে কেমন? ছেলেমেয়েরা ও বেবী কেমন আছে? মা বোধ হয় এখন কলকাতায়। তাঁকে আমি শীঘ্রই চিঠি লিখব।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৮৪ মান্দালয় জেল
২১. ১. ২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ১৩ই জানুয়ারীর চিঠি ও তার সংযুক্ত কাগজপত্র গতকাল পেয়েছি। শ্রীমতী দাসের চিঠি পেয়েছি এবং ইতিমধ্যেই উত্তর দিয়েছি। উনি এখন কেমন আছেন সে বিষয় আপনি কিছু লেখেননি। উনি কি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় থাকবেন? আমি বিজ্ঞপ্তি-গুলি থেকে দেখলাম যে ভাস্কর তার পদে যোগ দিয়েছে। সে কেমন কাজ করছে?

সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমায় আজ সকালে বললেন যে আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে ও আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে ছোটদাদাকে মান্দালয় পাঠানোর জন্য আপনি I. G.

of Prisons-কে তার পাঠিয়েছেন। ছোটদাদা যদি আসেন, তিনি যেন সঙ্গে ব্লাড-প্রেসার মাপার যন্ত্র নিয়ে আসেন।

বেবীর শরীর ভালো নেই জেনে আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি। আশা করি আপনি তার ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন।

গতকল আমার শরীরের তাপ ৯৯° ও আগের দিন ৯৯·৪° হয়েছিল। অন্যান্য চিহ্নগুলি একই আছে। কঠিন ব্যায়াম শরীরের দুর্বলতার দরুণ একেবারেই ছেড়ে দিতে হয়েছে, কোনো খেলা এখন আর খেলি না। এখন আমি স্থানীয় সুপারিন্টেন্ডেন্টের চিকিৎসাধীন আছি।

বাবা আমায় একট চিঠি লিখেছেন যাতে তিনি আমার স্বাস্থ্যের খুঁটিনাটি বিষয় প্রশ্ন করেছেন। আমি মুস্কিলে পড়েছি। এখন আমাকে লিখতেই হবে—কিন্তু আমি জানি এর ফল হবে বাবার মনে উদ্বেগ, যদি না ভীতি, সঞ্চার করা।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৮৫

মান্দালয় জেল
২৮. ১. ২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২০শে জানুয়ারীর চিঠি (ও তার সংযুক্ত সমস্ত কাগজপত্র) এবং ২২শে জানুয়ারীর চিঠি গতকাল পেয়েছি।

জাস্টিস্ বাক্‌ল্যাণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার যে সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন তার সঙ্গে আমি একমত। আশা করি এবার অন্তত ভাগ্য আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হবেন।

শ্রীমতী দাস এখন ভাল আছেন জেনে খুশী হলাম। কর্নেল কেল্‌সলের রিপোর্ট থেকে একথা পরিষ্কার যে এখনও তিনি চূড়ান্ত মতামত না দিয়ে, সতর্ক পর্যবেক্ষণে রাখার সুপারিশ করেছেন মাত্র। আপনি ত জানেন, আমি বর্তমানে সুপারিন্টেন্ডেন্টের চিকিৎসাধীন আছি, তিনি আমার স্বাস্থ্যের উপর সতর্ক নজর রাখছেন। তিনি আমাকে একাধিকবার বলেছেন যে আমার স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। গত নভেম্বরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আক্রমণের পর থেকে প্রতিদিন জ্বর হওয়া অব্যাহত আছে এবং রেঙ্গুন যাত্রা সত্ত্বেও এই জ্বরের কোন বিরতি নেই। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২৬ থেকে ৬ই জানুয়ারী শরীরের তাপের chart কবিরাজ মহাশয়কে ১২ই জানুয়ারী পাঠানো হয়েছিল এবং ৭ই থেকে ১৩ই জানুয়ারীর chart ১৪ তারিখে। তার পর থেকে, প্রত্যেক দিন দুপুরেলার জ্বরের হিসেব এইরকমঃ—

১৪ই জানুয়ারী—৯৯·২°; ১৫ই জানুয়ারী—৯৮·৬°; ১৬ই জানুয়ারী—৯৯·৪°;
১৭ই জানুয়ারী—৯৯·৪°; ১৮ই জানুয়ারী—৯৯·৪°; ১৯শে জানুয়ারী—৯৯·৪°;
২০শে জানুয়ারী—৯৯°; ২১শে জানুয়ারী—৯৯·৬°; ২২শে জানুয়ারী—৯৯·৪°;
২৩শে জানুয়ারী—৯৯·৬°; ২৪শে জানুয়ারী—৯৯°; ২৫শে জানুয়ারী—৯৯·৪°;
২৬শে জানুয়ারী—৯৯·৪°।

দুই দিন দুপুরে প্রতিঘন্টায় জ্বরের হিসেব নিয়ে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়ঃ—

২৫শে জানুয়ারী, ১৯২৭

১—৯৮·৮°; ২—৯৯·৪°; ৩—৯৯·২°; ৪—৯৯·৪°; ৫—৯৯·২°; ৬—৯৯°;
৭—৯৯°; ৮—৯৮·৪°;

২৬শে জানুয়ারী, ১৯২৭

১—৯৮·৮°; ২—৯৯·৪°; ৩—৯৯°; ৪—৯৯·২°; ৫—৯৯·৪°; ৬—৯৯·২°;
৭—৯৮·৪°।

মধ্যাদিনে সাধারণত শরীরের তাপ স্বাভাবিক, অর্থাৎ ৯৮·৪° থাকে।

এক্স-রে ছবির কপি পেয়েছেন কি?

অন্যান্য ব্যাধিগুলি একই রকম আছে।

বেবী কেমন আছে জানতে আমি উদ্বিগ্ন। আশা করি সে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠেছে।

পরশুদিন বাবাকে লিখেছি। আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল।

আপনার স্নেহের

(ইংরেজী থেকে অনুদিত)

সুভাষ

১৮৬

মান্দালয় জেল
২. ২. ২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২০শে ও ২২শে জানুয়ারীর চিঠিগুলির আমি ইতিমধ্যেই আংশিকভাবে উত্তর দিয়েছি।

অতীতে তাঁদের মনোভাব বিচার করে দেখলে মনে হয় না যে বাংলা গভর্ণমেন্টের আমার নিজের পছন্দমত কোন ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করানোতে কোন আপত্তি থাকবে। যখন আমি ১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে মৌলানা আজাদের সংগে বন্দী ছিলাম, মৌলানা সাহেবের চিকিৎসা করতেন তাঁর নিজের চিকিৎসক—ডাঃ কে, আহ্মেদ। কর্নেল হ্যামিল্টন তখন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। দেশবন্ধু প্রেসিডেন্সি জেল ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকাকালীন তাঁর চিকিৎসা করতেন নিজস্ব চিকিৎসক, ডাঃ ডি এন্ রায়। তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর স্যালিস্‌বারি। যখন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মিত্র আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী এবং ডাঃ ইয়াং ও মেজর স্যালিস্‌বারি যথাক্রমে সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তখন তাঁর নিজের কবিরাজ তাঁর চিকিৎসা করতেন। আমি যতদূর জানি, গভর্ণমেন্ট সব সময়ই এ ব্যাপারে উদার।

নতুন মামাবাবু এখন একেবারেই শয্যাশায়ী জেনে আমি দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন। তাঁর সর্বশেষ খবর কি? কোন উন্নতি কি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আমি বুঝতে পারছি না কেন শ্রীযুক্ত এস কে সেনের সুপারিশপত্রগুলি খুঁজে পাওয় যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই সেগুলি আমার কাগজপত্রের সঙ্গে মিশে রয়েছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে কি? ন'মামাবাবু বা শৈলেশ হয়ত সেগুলি খুঁজে বের করতে পারে। আমি শ্রীযুক্ত সেনের জন্য দুঃখিত—গত দু'বছরের ওপর তিনি নিশ্চয়ই সুপারিশপত্রগুলির অভাব খুব বেশী ক'রে অনুভব করেছেন।

ছোটদাদা যদি আসেন, তাঁর সঙ্গে একজন স্বতন্ত্র ডাক্তার পাঠানোর বাঞ্ছনীয়তা ও প্রয়োজনীয়তার কথা আপনি চিন্তা করে দেখতে পারেন।

পার্লামেন্টারি অধিকারের উপর বিতর্ক আমার মতে যথেষ্ট উন্নত মানের হয়নি, আরও বেশী মাল-মশলা থাকা উচিত ছিল। পয়েন্টগুলি প্রায় সবই ছিল, প্রয়োজন ছিল তথ্যের।

আমি খুশী যে E. G. P কমিটি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের জন্য জমির সুপারিশ করেছেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা কলেজের জন্য জমিটি যথেষ্ট বড় নয়, অন্তত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে ত তাই মনে হয়। বাণী ভবনকে জমির ভাগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? বাণী ভবনকে অন্যত্র জমি দেওয়া যেত। বাণী ভবন বোধ হয় বিধবাদের একটি বাসস্থান। বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের মত কলেজের সঙ্গে এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের নৈকট্য কলেজটির পক্ষে খুব ভাল হবে না।

আপনাকে বোধহয় বলেছি যে আমার ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্নটি তুলে আমি বাংলার গভর্ণর ও মাননীয় প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়েছি। ২১শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যোগদান করার জন্য গভর্ণরের কাছ থেকে শমন পেয়েছি।

Health Officer ডাঃ টি এন মজুমদার তাঁর কাজ সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চেয়ে চিঠি লেখেন। তাঁর অনুরোধে আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার মতামত জানিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিই। আমার মনে হয়েছিল যে যদি C. E. D-র ক জ করার থেকে বঞ্চিত না হতাম তাহলে আমার কাছ থেকে সুপারিশপত্র পাওয়ার তাঁর অধিকার থাকত এবং আমারও তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হত না। আমি অবশ্য তাঁকে জানিয়েছি যে আমার মতামত সরকারীভাবে জানতে চাওয়া হলে ভাল হত এবং তাঁকে অনুরোধ করেছি সম্ভব হলে তিনি যেন আমার মন্তব্যগুলি সরকারীভাবে ব্যবহার না করেন। তবে আমি

বলতে পারি যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সম্বন্ধে ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা ভালই।

আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের মতই এবং রোগের লক্ষণগুলি এখনও বর্তমান। আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৮৭

মান্দালয় জেল
৪. ২. ২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২৯-১-২৭-এর চিঠি ও তার সংযুক্ত কাগজপত্র ২রা ফেব্রুয়ারী হাতে পেয়েছি। গত দু'মাসে আপনার ১১-১২-২৬, ২৪-১২-২৬, ৩০-১২-২৬, ৬-১-২৭, ১৩-১-২৭, ২০-১-২৭ এবং ২২-১-২৭ তারিখের চিঠিগুলি ঠিকমত পেয়েছি।

শ্রীমতী দাস এখন ভাল আছেন জেনে আমরা আনন্দিত।

আমার চিকিৎসা সম্বন্ধে আপনার মতামত আমি ইতিমধ্যেই জানতে চেয়েছি এবং আশা করি শীঘ্রই তা জানতে পারব। আমার বিশ্বাস আপনি এ বিষয়ে বাবা-মা ও কবিরাজ মহাশয়ের পরামর্শ নেবেন। আপনাকে বলেছি কিনা ঠিক মনে নেই, তিন মাসের ওপর আমি কবিরাজী ওষুধ ব্যবহার করেছি। যদিও উন্নতি বিশেষ হয়নি, এতদ্ব্যতীত আমার অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মেডিক্যাল অফিসার ও স্থানীয় গভর্ণমেন্টের জ্ঞাতসারে ও তাদের অনুমতি নিয়েই আমি গত সেপ্টেম্বর এই চিকিৎসা শুরু করি এবং জানুয়ারীর প্রথম দিক অবধি চালিয়ে যাই। গভর্ণমেন্টই আমার চিকিৎসার খরচ বহন করেন। ইহা সম্ভব যে গত নভেম্বরে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত না হলে, আমার বেশ উপকার হত।

শেষ যা লিখেছিলাম তার পর থেকে জ্বরের হিসেব এইরকমঃ—
২৯শে জানুয়ারী—৯৯·২°; ৩০শে জানুয়ারী—৯৯·৪°; ৩১শে জানুয়ারী—৯৯·৪°; ১লা ফেব্রুয়ারী—১০০°; ২রা ফেব্রুয়ারী—৯৯·৮°; ৩রা ফেব্রুয়ারী—১০০·৮°।

আমার মনে হচ্ছে আগের থেকে জ্বর বেশী হচ্ছে। তা ছাড়া, লক্ষণগুলি একই আছে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে জানিয়েছেন যে ছোটদাদা আগামী বুধ বা বৃহস্পতিবার আসবেন।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(সন্তোষকুমার বসুকে লিখিত)

১৮৮

মান্দালয় জেল
৪. ২. ২৭

প্রিয়বরেষু,
শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার ১০-১২-২৬ ও ১৯-১২-২৬ তারিখের চিঠি দুটি যথাসময়ে পেয়েছি এবং বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। নির্বাচন ও এ বিষয়ে জনগণের সহানুভূতি সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন তা আমার হৃদয়ে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আমি একজন মানুষ এবং ভগবদ্গীতার আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ভালবাসা ও ঘৃণা আমার কাছে এক বস্তু নয়। আমার মতন অবস্থার একদল লোক বিবেকের অনুশাসন মেনে এর বেশী আর কি প্রত্যাশা বা লাভ করতে পারে? আপনি অনুগ্রহ করে যে ভালবাসার বাণী পাঠিয়েছেন, যদিও অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে তবু এর জন্য আমার প্রীতি ও ভালবাসা জানাচ্ছি।

আশা করি, গত তিন বছর ধরে আপনি কলকাতার করদাতাদের যে মহৎ সেবায় ব্রতী আছেন, তার জন্য পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হবেন। আমার কোন সন্দেহ নেই যে আপনি যে অঞ্চল থেকে দাঁড়াবেন সেখানকার নির্বাচকমণ্ডলী আবার আপনাকেই ভোট দেবে। আমার নিজের শ্রদ্ধা বা আস্থাও কম নয়। একথা বলাই বাহুল্য।

জেনে আনন্দিত হলাম যে, ছুটী কাটাতে আপনি জামসেদপুর গিয়েছিলেন। আমি কখনও জামসেদপুরে যাইনি, তবে রাঁচীতে ছিলাম অতএব জামসেদপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমি কল্পনা করতে পারি।

খিদিরপুরের "মনসা" ও "মনসা মেলার" প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য আমি অপেক্ষা করব। এ বিষয়ে কিছু উৎসাহী যুবককে নিয়োগ করলে ভাল হয়। তারা এই অঞ্চলের প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে বা পুস্তিকা প্রকাশ করতে পারে।

দুটি কারণে ধোবীখানাকে বিভক্ত করা সঙ্গত হবে না বলে আমার মনে হয়। প্রথমতঃ, বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের পক্ষে আরও বৃহৎ একখণ্ড জমি দরকার; কেননা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিধবা আশ্রম থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়। কর্পোরেশনে যখন এ প্রশ্ন উঠবে, তখন অনুগ্রহ করে এই দুটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন। এ বিষয়ে মেজদাদাকেও একটি চিঠি দিয়েছি। বিধবা আশ্রমের জন্য আমার যথেষ্ট ভাবনা আছে; তাই বলছি অন্যত্র তাদের জন্য ভাল জমি খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য হবে না।

শহরে শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য যে অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছে তাতে Education Officer খুশী হতে পারেন নি বোধহয়।

Roads Department-এর কেন্দ্রীয়করণের কাজটা খুব সহজ হবে মনে হয় না। সমস্ত বিভাগ থেকেই একসঙ্গে বাধা আসবে। তবু করতেই হবে।

এ বিষয়ে আমি আনন্দিত যে, ডেপুটি মেয়রের প্রতি কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে সকলেই একমত হয়েছেন। আমি দুঃখিত, এই সময়ে সেখানে এমন কেউ উপস্থিত ছিলেন না, যিনি অসৌজন্য প্রকাশের ইচ্ছাটাকে দমন করতে পারতেন। রেঙ্গুনের পত্রিকাগুলিতে দেখলাম যে, তদন্ত কমিটি ডেপুটি মেয়রের অপসারণের প্রস্তাব করেছেন। এতে আমি খুব বেদনা বোধ করেছি। আশা করি, এরকম কোন সুপারিশ সত্যিই করা হলে, কর্পোরেশন তা প্রত্যাখ্যান করবে। কোনও বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও, কর্পোরেশনের সভা যে শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই যুক্তিটাই একাজ করার কারণ হিসেবে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে।

কয়েকদিন আগে অস্থায়ী H. O ডাঃ টি এন মজুমদার একখানি প্রশংসাপত্রের জন্য আমার কাছে লিখেছিলেন। প্রথমে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম এবং কি করব ঠিক করে উঠতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সাধারণভাবে একটি প্রশংসাপত্র লিখে পাঠানোই ঠিক করলাম এই ভেবে যে, যদি আজ আমি কর্মরত থাকতাম তাহলে তিনি অনায়াসেই এটি চাইতে পারতেন। না লেখাই আমার উচিত ছিল, এমন মনে হয় না। যা হোক, আমি তাঁকে সম্ভব হলে সেটি সরকারীভাবে কাজে না লাগাবার জন্য লিখেছি এবং জানিয়েছি যে, কর্পোরেশন সরকারীভাবে আমার মতামত চেয়ে পাঠালেই বরং ভাল হত।

আপনারা আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নতুন কোনও খবর জানবার জন্য হয়ত আশা করে আছেন কিন্তু আপনাদের নিরাশ করতে হচ্ছে। আমার অবস্থা আগের মত একই রকম তবে আজকাল জ্বর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ বিষয়ে মেজদাদাকে বিস্তারিতভাবে লিখেছি—তাই আপনাদের কোন খবর জানাতে পারলাম না বলে ক্ষমা করবেন। আজকাল আর দীর্ঘ চিঠি লিখতে পারি না এবং আগের চাইতে একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আমার মনের জোর ঠিকই আছে এবং থাকবে। আমার স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে কর্পোরেশনে যে বিতর্ক হয়ে গিয়েছে তার খবর কলকাতার পত্রিকাগুলিতে পড়েছি।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। গভীর শ্রদ্ধা জানবেন। ইতি—

আপনার প্রীতিভাজন

সুভাষচন্দ্র বসু

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(বিভাবতী বসুতে লিখিত)
শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

১৮৯ মান্দালয় জেল
৭।২।২৭

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ১৬ই জানুয়ারীর পত্র ২২শে তারিখে হস্তগত হয়েছে—সঙ্গে অশোকের পত্রও পেয়েছি। অনেকদিন পরে আপনার পত্র পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। এখানে এখনও শীত কিছু আছে—তবে এই মাসের মধ্যে বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে। মার্চ মাসটা বসন্তের হাওয়া বইবে, তারপর এপ্রিল মাসে রীতিমত গরম পড়ে যাবে। গত বৎসর এপ্রিল মাসেই সব চেয়ে বেশী গরম পড়েছিল।

আমাদের ফুলের বাগানে এবার নানা রঙের ফুল ফুটে বেশ শোভা ধরেছে। তবে এগুলি অধিকাংশই Season Flower। সুতরাং শীতের শেষে গরমের প্রতাপ আরম্ভ হ'লে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আপাততঃ বাগানের দিকে তাকালে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়।

গতকাল আমরা এখানে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা করেছি। মূর্তি এখানেই গড়ান হয়েছিল এবং বেশ ভালই হয়েছে। এ দেশে যাহারা সরস্বতী পূজা করে তাহারা গঙ্গায় (অর্থাৎ ইরাবতীতে) ভাসায় না।

আমার শরীরের অবস্থা মেজদাদাকে যে পত্র দিই তার থেকে পেয়ে থাকবেন। আগের থেকে খারাপ বই ভাল বোধ হয় না। ওজন কিছু কমেছে, এখন ১৩৮ পাউন্ড। ছোটদাদা আগামী বুধবার অথবা বৃহস্পতিবার এখানে এসে বোধহয় পেঁছাবেন।

নতুন মামাবাবু পূর্বের থেকে কিছু ভাল আছেন জেনে খুব সুখী হয়েছি। তিনি এখন কোথায় আছেন—ঠিকানা লিখবেন।

বাবা বোধ হয় সরস্বতী পূজার ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলেন।

আমাদের পায়রার খুব বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়রার খোপও বাড়াতে হচ্ছে। মুরগী মোরগের পালও খুব বেড়ে গেছে। (এতে হিন্দুয়ানী নষ্ট হবে না তো?) ২।৩ জোড়া বিলিতি মোরগ ও মুরগীর সাহায্যে কি করে অল্প দিনের মধ্যে এক পাল ভাল জাতের মোরগ ও মুরগী হতে পারে—তা আমরা হাতে হাতে দেখছি। পায়রায় সম্বন্ধেও ঐ এক কথা খাটে। তবে ময়ূরপঙ্খীদের বাঁচান গেল না—তারা ক্রমাগত মরে যায়। টিয়াপাখী বেঁচে আছে—মনের সুখে কি দুঃখে তা বলতে পারি না। নানাপ্রকার আওয়াজ করে এক শিস্ দেয়। কথা এখনও বলতে শিখে নাই তবে শিখতে পারে।

অভয় আশ্রমের দোকানে আপনার সুতা হারিয়ে গেছে শুনে খুব দুঃখিত হয়েছি। আশা করি আপনি তার জন্য নির্ভরসা হবেন না। অশোকের তো অল্পদিনের মধ্যে লম্বা ছুটী হবে—সেও তখন অবসর মত সুতা কাটতে পারে। অশোকের চিঠির জবাব আমি পরে দিব।

সরকার বাহাদুর আমাদের জানিয়েছেন যে জানুয়ারী ১৯২৫ থেকে দুই বৎসর অতীত হলেও অর্ডিনেন্স আটকের হুকুম এখনও চলবে। চাকরী বজায় থাকা উপলক্ষে এখানে ছোটখাট ভোজ হয়ে গেছে।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানবেন এবং গুরুজনদের জানাবেন।

ইতি—

পুনঃ—ছোটদাদার সহিত সাক্ষাৎ এবং ডাক্তারী পরীক্ষা এখানে হবে কি রেঙ্গুনে হবে—তাহা এখন স্থির হয় নাই। রেঙ্গুনে হয় তো যেতে হবে।

শ্রীসুভাষ

(পরবর্তী ২টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১৯০ মান্দালয় জেল
৮. ২. ২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আজ দুপুরে আমি রেঙ্গুন রওনা হচ্ছি, কাল সকালে সেখানে পৌঁছব। সেখানেই আমার ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। ছোটদাদাকে আমার জন্যে রেঙ্গুনে অপেক্ষা করতে বলা হবে বা হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমি এখানে ফিরে আসব।

খুব শীঘ্রই পুনর্নির্বাচন এসে পড়বে, কোন দিকে ভোট পড়বে কেউ বলতে পারে না। আমার শুধু এই ইচ্ছা, নির্বাচনের ফল থেকে দেখা যাবে যে একটি সুনিশ্চিত প্রোগ্রাম সম্বলিত একটি সুনির্দিষ্ট, শৃঙ্খলাবদ্ধ দল—তা তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক্ না কেন—ক্ষমতায় এসে শহরের পৌর শাসনকার্য হাতে নেবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাকে বলে যে পৌরশাসনে সাফল্য দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত, কাউন্সিলরদের সঙ্গে এগ্‌জিকিউটিভের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন এবং এগ্‌জিকিউটিভ্ এমন ভাবে বাছাই করা উচিত যেন তাঁরা কাউন্সিলরদের আস্থাভাজন হন। দ্বিতীয়ত, একটি যথার্থ জনকল্যাণমূলক প্রোগ্রাম সম্বলিত একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকা প্রয়োজন। দলটির মতাদর্শের থেকে একটি বিশেষ প্রোগ্রাম সম্বলিত দলের উপস্থিতি আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এগ্‌জিকিউটিভের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, এমন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অস্তিত্ব খুবই উৎসাহিত হওয়ার বিষয় কারণ এর ফলে তাঁরা বুঝতে পারবেন ঠিক কোথায় তাঁরা দাঁড়িয়ে এবং কি ভাবে তাঁদের কাজ করা উচিত। এ ধরণের দলের অনুপস্থিতিতে, অসামঞ্জস্যপূর্ণ সভার সম্মুখীন হয়ে, এগ্‌জিকিউটিভের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন কি ভাবে তাঁদের কাজ করা বা কোন পলিসি তাঁদের অনুসরণ করা কর্তব্য। নির্বাচকমণ্ডলীকে স্থির করতে হবে তাঁরা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ পছন্দ করেন—কিন্তু যদি পৌর কল্যাণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে তাঁদের দেখা প্রয়োজন যে এ ধরণের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জনগণের প্রদত্ত ক্ষমতা নিয়ে পরবর্তী তিন বছর পৌর উন্নতির কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

আপনি কি কাউন্সিলর পদের জন্য প্রার্থী হচ্ছেন? বেশীর ভাগ কাউন্সিলর নিশ্চয়ই আপনার পুনর্নির্বাচন চাইবেন।

আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা একই রকম। কাল ৯৯·৪° জ্বর হয়েছিল।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৯১ রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল
১৪. ২. ২৭
সোমবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

গত বুধবার (অর্থাৎ ৯ তারিখ) এখানে পৌঁছেছি। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঠিক হল যে ইন্টারভিউ রেঙ্গুনে হওয়া উচিত, যাতে কর্নেল কেল্‌সল (যিনি আমাকে গতবার পরীক্ষা করেছিলেন) উপস্থিত থাকতে পারেন। সেই অনুযায়ী ৮ তারিখ, মঙ্গলবার, আমি মান্দালয় ত্যাগ করি।

ছোটদাদা প্রতিদিন আমার সঙ্গে দেখা করছেন। ডাক্তারি অনুসন্ধান গত শনিবার হয়েছে। আজ সকালে ছোটদাদা কর্নেল কেল্‌সলের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন। তিনি আগামীকালের জাহাজে রওনা হচ্ছেন—সুতরাং এই চিঠি পৌঁছনর আগেই তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে এবং তাঁর কাছ থেকে সরাসরি আপনি রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।

বাবা উদ্বিগ্ন থাকবেন—তাই ছোটদাদা পৌঁছনর অব্যবহিত পরেই তাঁকে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। কবিরাজ মহাশয়ও উদ্বিগ্ন থাকবেন—তাই ছোটদাদাকে বলে দিচ্ছি পৌঁছে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। দয়া করে দেখবেন যেন ছোটদাদা তাঁর বাড়ী যেতে ভুলে না যান।

আমার পরবর্তী জায়গা-বদল সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত খবর আমার কাছে নেই। আমি এখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না, এবং মান্দালয় ফিরে যেতে পারলে খুশী হব। যদি তাড়াতাড়ি বদলি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ইন্‌সিন যেতে আমার আপত্তি নেই। পরের বার দেখা হলে আমি I. G. P-র সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব।

গতকালের রেঙ্গুনের সংবাদপত্রে বেরিয়েছে যে ব্যানার্জী, শাসমল ও অন্যান্য মহাশয়গণ তাঁদের পদে ইস্তফা দিয়েছেন।

৭. ১. ২৭ তারিখে আমি শেষ আপনাকে চিঠি লিখেছি।

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(পরবর্তী ২টি চিঠি বর্মার তদানীন্তন গভর্নরকে লিখিত)

১৯২ ১৯।৩।২৭

মহামান্য বর্মার গভর্নর সমীপেষু—

রেঙ্গুন জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ও আই জি অব্ প্রিজন্‌স্ মারফৎ প্রেরিত—

আজ সকালে যে ঘটনাটি ঘটে গেছে এবং যে ঘটনা আমার মনে গভীর বেদনার উদ্রেক করেছে, তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি চীফ জেলার মিঃ সলোমনকে সকালে নিম্নলিখিত চিরকুটটি পাঠাই—

"মিঃ সলোমন,

অনুগ্রহ করে ১৪ ও ১৫ই মার্চ তারিখের ইংলিশম্যান আনাবার ব্যবস্থা করবেন এবং এগুলি যাতে আপনি প্রাতঃরাশের জন্য অফিস ত্যাগ করবার আগেই আমার কাছে পেঁছয় অনুগ্রহ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এস সি বোস। ১৯।৩।২৭।"

প্রায় ঘন্টা দেড়েক পরে চিরকুটটি আমার কাছে ফেরত আসে। তার তলায় সুপারিনটেনডেন্টের হস্তাক্ষরে স্বাক্ষরসহ নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা ছিল—

"মিঃ বোসকে অনুরোধ করা হচ্ছে, তিনি যেন আমার চীফ জেলারকে হুকুম না করেন।

স্বাঃ—আর ই ফ্লাওয়ারডিউ
১৯।৩।২৭"

(স্বাক্ষর যদিও অস্পষ্ট, তবু আমার মনে হয় আমি ঠিকই উদ্ধার করেছি)।

আমি চীফ জেলার মিঃ সলোমনকে যে চিরকুটটি পাঠিয়েছিলাম, তার ভাষা উদ্ধত বা অসৌজন্যমূলক বলে আমার মনে হয় না। প্রায় আড়াই বছর যাবৎ বেঙ্গল অর্ডিনান্সে আমাকে আটক করে রাখা হয়েছে এবং বাঙ্গলা ও বর্মার বিভিন্ন জেলে আমাকে কাটাতে হয়েছে। আজ সকালে মিঃ সলোমনকে যেভাবে লিখে পাঠাই ঐভাবে অন্যান্য জেলের কর্তৃপক্ষের কাছেও আমার প্রয়োজনের কথা বার বার লিখে এসেছি। এমন কি রেঙ্গুন জেলেও, যেখানে আমাকে দেড় মাসের উপর থাকতে হয়েছে, সেখানেও আমি প্রায় প্রত্যহই ঐ একইভাবে লিখে পাঠিয়েছি। কিন্তু কেউ এধরণের মন্তব্য করেছেন বলে আমি কখনও শুনি নি বা দেখি নি যে, আমার ভাষ্য অসৌজন্যমূলক কিংবা Major Flowerdew যাকে হুকুম বলেছেন সেরকম 'হুকুম' আমি কখনও কাউকে করেছি।

আমি বিনীতভাবে বলতে চাই যে আমার ইংরেজী ভাষাজ্ঞান একেবারে সামান্য নয়; নতুবা আমি ১৯২০ সালে আই সি এস-এর মতন একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়, ইংরেজী রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করতে পারতাম না। একথা বললেও বোধহয় অন্যায় হবে না যে যদিও মেজর ফ্লাওয়ারডিউ জাতিতে ইংরেজ তবু ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান তাঁর চাইতে আমার অনেক বেশী।

একথা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমার সামাজিক মর্যাদা এবং দেশ-সেবক হিসেবে আমার ভূমিকা যাই হোক না কেন প্রাচীরঘেরা এই জেলের সীমানার মধ্যে আমাকে সুপারিনটেনডেন্ট থেকে শুরু করে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত জেলের প্রত্যেক কর্মচারীর অনুগ্রহের উপরই বেশী মাত্রায় নির্ভর করতে হয়। যদিও গভর্ণমেন্টের আমাকে সব-

রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্য (সংবাদপত্র সহ) সরবরাহ করা জেল কর্মচারীদের অবশ্য কর্তব্য এবং যদিও আমি জানি যে, গভর্ণমেন্ট সে সব কাজের জন্য তাদের মাইনে দিয়ে থাকেন তার মধ্যে আমার সুখ সুবিধা বিধানও অন্যতম, তবুও আমি এমন অবিবেচক নই যে তাদের হুকুম করব। কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে নিম্নতম কর্মচারীদের সংগে আমাকে যেমন ব্যবহার করতে হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলতে পারি। আপনি হয়ত জানেন যে, সেখানে আমার নিম্নতন কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইউরোপীয় ছিলেন; তাঁদের কেউ কেউ Major Flowerdew-এর দ্বিগুণ বেতন পেয়ে থাকেন। সুতরাং আমার জানা দরকার যে, কিভাবে ও কি ভাষায় নিম্নতর কর্মচারীদের নির্দেশ পাঠাতে হয় এবং আমার এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি কোনও বিবেকবান ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবেন না যে, চীফ জেলার মিঃ সলোমনকে উপরোক্ত চিরকুট পাঠিয়ে আমি কোন "হুকুম করেছি।"

চিঠি শেষ করবার আগে ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ হিসেবে আমি আরও কয়েকটি কথা আপনাকে জানাতে চাই। আইনানুসারে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংলিশম্যান পত্রিকাটি আমি পেয়ে থাকি এবং জেল কর্তৃপক্ষেরই এটি পাঠানোর কথা। যখন আমি মান্দালয় জেলে ছিলাম, তখন নিয়মিত এটি পেয়ে এসেছি। এর জন্য কাউকে কোনদিন কিছু বলতে হয় নি। কিন্তু এ বিষয়ে রেঙ্গুন জেলের কর্তৃপক্ষের অবহেলা অত্যধিক। ফলে কলকাতার ডাক এলে প্রতিবারই তাদের এই পত্রিকাটির কথা মনে করিয়ে দিতে হয়। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে যখনই আমি তাদের এ বিষয়ে মনে করিয়ে দিই নি, তারা আমাকে পত্রিকাটি পাঠান নি। এ পত্রিকা পাঠানোর ব্যাপারে কর্তব্যে অবহেলার জন্য আমাকে কয়েকবারই জেলারদের কাছে অভিযোগ করতে হয়েছে এবং এ বিষয়ে আমি নিজেই অন্তত Maj. Flowerdew-কে একবার বলেছিলাম। এই সব অসুবিধার দরুণ কলকাতার ডাক আসা মাত্রই প্রত্যেক বার চীফ জেলারকে চিঠি লেখা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এবং আজ সকাল পর্যন্তও এতে বেশ ভালভাবে কাজ চলে যাচ্ছিল।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, চীফ জেলার ও অন্যান্য কর্মচারী কারও কাছেই একথা অজ্ঞাত নয় যে, আমাকে কিরকম একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় এখানে দিন কাটাতে হয় এবং সংবাদপত্র পড়ে কোন রকমে সময় কাটানো ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। একথাও তাঁরা জানেন যে আমার কাছে বই ও সাময়িক পত্রও খুব বেশী নেই। কেননা মান্দালয় জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আমাকে বলেছিলেন যে, দুই-তিন দিন থাকতে হলে যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কিছু যেন আমি সংগে না নিই। অতএব জেল কর্মচারীদের অনুগ্রহে যখন যে পত্রিকা সংগ্রহ করতে পারি, তার সাহায্যেই আমাকে সময় কাটাতে হয়। চীফ জেলার মিঃ সলোমনকে চিঠি লেখার সময় আমি খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম এবং সেই কারণেই প্রাতঃরাশের জন্য তিনি অফিস ত্যাগ করার আগে (অর্থাৎ সকাল সাড়ে এগারোটার মধ্যে) পত্রিকা দুটি পাঠাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম।

আমার যতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে তা থেকে বলতে পারি যে, যদি আমার চীফ জেলারকে হুকুম করার কোনও ইচ্ছা থাকত তাহলে একই বাক্যে দুবার 'অনুগ্রহ করে' শব্দটি কষ্ট করে লিখতাম না। তা ছাড়া আমি মিঃ সলোমনকে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছি; সেরকম কোন অভিপ্রায় থাকলে আমি মিঃ সলোমনকে না লিখে, যা তাঁর সরকারী পদ সেই চীফ জেলারকেই লিখতাম।

আইনানুসারে একজন রাজবন্দী হিসেবে আমার পদমর্যাদার অনুরূপ ব্যবহার পাবার আমি অধিকারী। সুতরাং রেঙ্গুন জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট Major Flowerdew এই চিঠি লিখে অন্যায়ভাবে আমার সম্মানহানি করেছেন এবং অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন বলে আমার বোধ হয়। যে কোনও সহৃদয় ও যুক্তিনিষ্ঠ লোকই এ জাতীয় ব্যবহারকে শিষ্টাচারবর্জিত বা অপমানজনক বলে স্বীকার করবেন। বর্তমানে আমি ঠিক করতে পারছি না কিভাবে জেল কর্মচারীদের সংগে পত্রালাপ করতে হবে; ফলে আশঙ্কা হচ্ছে যে এভাবে চিঠি লিখে পুনরায় অপমানিত হওয়ার চাইতে আমাকে হয়ত বা প্রয়োজনের জিনিসগুলি ছাড়াই চালিয়ে নিতে হবে।

আমার ক্ষোভ যে অসংগত নয় তা আপনি এ থেকেই বুঝতে পারবেন যে, গত আড়াই বছরের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার একজন I. M. S অফিসারের অসৌজন্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আমাকে অভিযোগ করতে হচ্ছে। অতএব প্রার্থনা এই যে, Major Flowerdew-কে তাঁর

মন্তব্য পরিহার করে দুঃখ প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়ে আপনি আমার প্রতি সুবিচার করবেন। ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত
এস সি বি, বি-এ (ক্যান্টাব)
কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ
অফিসার ও বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য।

তারিখ ১৯শে মার্চ, ১৯২৭

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৯৩ তারিখ—রেঙ্গুন, ২১শে মার্চ ১৯২৭

মহামান্য বর্মার গভর্নর সমীপেষু—
রেঙ্গুন জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ প্রিজন্স্ মারফৎ প্রেরিত—

আমার ১৯শে মার্চ, ১৯২৭-এর চিঠিতে আমি আপনার কাছে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট Major Flowerdew-এর বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অভিযোগ করেছিলাম। যেহেতু বিষয়টিকে জটিল করে ফেলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সেজন্য আমি ঐ চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ থেকে নিজেকে ইচ্ছা করেই নিবৃত্ত রেখেছিলাম। আমার এই চিঠিতে রেঙ্গুন জেলে আশার পর এই অল্পদিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হয়েছে, তার উদাহরণ দিতে আরও কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে উপস্থিত করতে চাই।

২) গত ডিসেম্বরে যখন আমি এ জেলে আসি তখন প্রথম আলাপেই Major Flowerdew আমাকে বলেছিলেন কিংবা বলা যায় সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, বাইরের কারও সঙ্গে আমার যোগাযোগ করা চলবে না। যে সাবধানবাণী তিনি আমার প্রতি করেছিলেন এবং যে ভাবে ও যে ভাষায় তা প্রয়োগ করা হয়েছিল, সব মিলিয়ে গোটা পরিস্থিতিটাই একজন রাজবন্দী হিসেবে আমার কাছে অভিনন্দনসূচক তো ছিলই না, বরং অপমানজনক ছিল। আমি বাঙ্গলাদেশ ও বর্মার আরও কয়েকজন I. M. S অফিসারকে দেখেছি এবং আরও অনেক জেলে আমাকে কাটাতে হয়েছে কিন্তু Major Flowerdew আমাকে যেভাবে সাবধান করেছিলেন, এরকম অভ্যর্থনার দুর্ভাগ্য আমার কোথাও হয় নি। আমার মতন অবস্থার বা শ্রেণীর একজন লোকের এ জাতীয় ব্যবহার প্রাপ্য নয়, একথা বুঝবার শক্তি Major Flowerdew-এর আছে কি না জানি না। তবু আমি তখন উত্তেজিত হই নি, এবং এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকে যথাসম্ভব সহজ করার জন্য হেসে উত্তর দিয়েছিলাম—দীর্ঘদিন আমাকে যখন জেলে কাটাতে হয়েছে তখন তা আমার জানারই কথা।

৩) গত ডিসেম্বরে রেঙ্গুন জেলে স্থানান্তরিত হবার পর আমার রোগনির্ণয় বা চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি কোনও যত্ন নেন নি বরং তিনি আমার অসুস্থতাকে অস্বীকার করতেই যেন বেশী যত্নবান ছিলেন। যখন আমি তাঁকে বললাম যে, আমার রোজই জ্বর হচ্ছে এবং তাঁকে টেম্পারেচার চার্ট দেখালাম, তিনি মন্তব্য করলেন—জ্বর কোথায়? তিনি বোধহয় একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, ১০১ কিংবা ১০২ ডিগ্রী জ্বর না হলে তাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা চলে না। যা হোক, সৌভাগ্যবশতঃ রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র ফিজিসিয়ান কর্নেল কেলসল আমার চিকিৎসার ব্যাপারে অধিকতর যত্ন নিয়েছিলেন; এবং আমি এই ঘটনাকে তখনকার মতন ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম।

৪) গত ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বিতীয়বার রেঙ্গুন জেলে আসার পর আমি নিজেই সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি আমাকে এমন কি বসতে বলেন নি। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য আমি যথাশীঘ্র সম্ভব ভালয় ভালয় সেখান থেকে চলে আসি। আমার কারাজীবনের গত আড়াই বছরের মধ্যে এই প্রথম একজন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আমাকে বসতে বলার সৌজন্যটুকু পর্যন্ত দেখাতে পারলেন না। এ অভিযোগ করার প্রেরণা পাচ্ছি এই কারণে যে, আমি বিশ্বাস করি, গভর্ণমেন্ট তাঁদের অফিসারদের এই অসৌজন্যমূলক আচরণ নিশ্চয়ই অনুমোদন করেন না এবং এটি একটি নিয়মবহির্ভূত ব্যাপার।

৫) যদি খোঁজ নেওয়া হয়, গত ৪০ দিনের মধ্যে Major Flowerdew আমাকে কয়

বার দেখতে এসেছেন তাহলেই এবার এখানে আসার পর আমার প্রতি তাঁর মনোযোগ বা আমার চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ যথেষ্ট স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। সপ্তাহে অন্তত একবার অর্থাৎ প্রতি সোমবার আমাকে তাঁর দেখতে আসার কথা; সাধারণত এটিই নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম তিনি মেনে চলেন না। এমন কি পক্ষকাল কেটে গেলেও তাঁর দর্শন মেলে না। গত ১৪ তারিখে সোমবার তিনি যখন আমাকে দেখতে আসেন তখন আমার সেলের দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করেন—ভাল আছেন তো? আমার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় এ প্রশ্ন এতই হাস্যকর যে আমাকে হেসে জবাব দিতে হয়—হ্যাঁ ধন্যবাদ। এই রকম প্রশ্ন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি ইচ্ছ করেই আমার অসুখের গুরুত্ব লাঘব করার চেষ্টা করছেন কিংবা আমার যে রোজ জ্বর হয়, ওজন কমে যাচ্ছে এবং আমি যে অজীর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য ও সেই সঙ্গে শারীরিক কষ্ট ভোগ করছি এ সব বিষয়ে তিনি অবহিত নন। আমার শেষ অনুমানটিই যদি সত্য হয় তাহলে এতে তাঁর কোনও লাভ হবে না কারণ আমার ওজন নিয়মিত রেকর্ড্ করে রাখা হয়, প্রতি চার ঘন্টা অন্তর টেম্পারেচার চার্টও লেখা হচ্ছে, তাছাড়া মাঝে মাঝে সহকারী চিকিৎসকেরা আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। এরকম একজন নিষ্প্রাণ চিকিৎসকের কাছ থেকে উপযুক্ত মনোযোগ বা সহৃদয় ব্যবহার আশা করা কি করে সম্ভব আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। এ বিষয়ে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, গত ৪০ দিন যাবৎ রেঙ্গুন জেলে আসার পর থেকে আজ সকাল পর্যন্তও আমার আদৌ কোন চিকিৎসা হয় নি।

৬) নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে যে যদি কোনও বন্দী আমার সঙ্গে কথা বলে, তার শাস্তি হবে। এ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন আমাকে কি রকম নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়েছে। একবার এক বন্দী আমার সেলের রক্ষীর কাছে জানতে চায় যে, বিশেষ একটি স্নানাগার সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে পারে কি না; সে তখন সবেমাত্র এ জেলে এসেছে এবং এখানকার নিয়মকানুনও তার জানা ছিল না; কিন্তু এজন্য ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট Mr. Sutherland তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন।

৭) ইতিপূর্বে অন্যান্য I. M. S অফিসারেরা আমার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করেছেন, তার সঙ্গে এ ব্যবহারের পার্থক্য আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। এমন কি রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালের Major Conmack-ও, যিনি আমার X-ray করেছিলেন, এই জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের চাইতে আমার চিকিৎসার বিষয়ে অনেক বেশী যত্ন নিয়েছেন। যখনই তিনি আমাকে দেখতে এসেছেন তখনই প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তিনি আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজখবর করেছেন।

৮) এই সব তুচ্ছ বিষয়ের উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনও ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি অবস্থা যেরকম দাঁড়িয়েছে তাতে সব কথা আপনাকে না জানালে কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে বলেই মনে করি। যেহেতু আপনি গভর্ণমেন্টের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, সেজন্য আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য যে, রেঙ্গুন জেল আর যাই হোক আমার পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যকর নয়। ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত
এস. সি. বোস
(কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ
অফিসার ও বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য)

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১৯৪

রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল
২২. ৩. ২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

এখানকার জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট Major Flowerdew-র সঙ্গে আমার বনিবনা হচ্ছে না, কারণ তাঁর আচরণ অসৌজন্যমূলক। সেজন্য আমি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স্-কে জানিয়েছি যে চূড়ান্ত আদেশ না আসা পর্যন্ত আমাকে ইনসিন অথবা মান্দালয়

জেলে বদলি করা হোক। কাল আপনাকে লেখা নিম্নলিখিত তারটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের কাছে পাঠিয়েছি। সেটি আপনাকে সরাসরি অথবা কলকাতায় সি আই ডি মারফৎ পাঠাতে বলেছিলাম।

এস সি বোস। কলকাতা।

১০ই মার্চের টেলিগ্রামের পর কোনও সংবাদ না পেয়ে চিন্তিত আছি। আপনার উপদেশ সত্ত্বেও রেঙ্গুন জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য আমাকে, যতদিন না চূড়ান্ত আদেশ পাওয়া যায়, ইনসিন অথবা মান্দালয় জেলে বদলি করার জন্য বলেছি। আমার শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। কে কেমন আছে তার করে জানাবেন।—বসু

আমার মুক্তির(?) শর্ত সম্বন্ধে কাল বঙ্গীয় আইন সভায় প্রদত্ত মিঃ মোবার্লীর বক্তৃতা আজ রেঙ্গুনের পত্রিকাগুলিতে বের হয়েছে। এর পূর্ণ বিবরণ আমি পড়েছি। আমাকে সরকারীভাবে এখনও কিছু জানানো হয় নি। আপনার কাছ থেকেও কোন খবর পাই নি।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল। মা ও বাবা কেমন আছেন?

আমার স্বাস্থ্যের কথা জানিয়ে ছোটদাদাকে আলাদা খামে একটি চিঠি দিয়েছি।

ইতি—

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে লিখিত)

১৯৫

রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল
২৩. ৩. ২৭
ঠিকানাঃ—কেয়ার অব্ ডি আই জি,
আই বি, সি আই ডি,
১৩, এলিসিয়াম রো
কলকাতা

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী,

আপনার অবগতির জন্য লিখছি যে, ২৩শে মার্চ তারিখে আপনাকে লেখা নিম্নলিখিত তারটি রেঙ্গুনের আই জি অব্ প্রিজন্স্-এর কাছে পাঠিয়েছিলাম এই অভিপ্রায়ে যে, এটি সরাসরি অথবা কলকাতার সি আই ডি বিভাগ মারফৎ আপনার কাছে প্রেরিত হবে। আশাকরি এতদিনে আপনি সেটি পেয়েছেন।

টেলিগ্রাম

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। দিল্লী।

রেঙ্গুন জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের আচরণে সৌজন্যের একান্ত অভাব। আমাকে সত্বর অন্যত্র বদলী করার জন্য দয়া করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করবেন।—সুভাষ

বেশ কিছুদিন যাবৎ এই গণ্ডগোল চলছিল। কিন্তু ১৯ তারিখ, শনিবার, তা চরম আকার ধারণ করে। আমি সমস্ত ঘটনা খুলে লিখতে চাই না, কারণ তাহলে এই চিঠি আটক হতে পারে।

ইতিপূর্বে মহামান্য বর্মার গভর্ণরকে সব কথা জানিয়ে দুটি চিঠি দিয়েছি। আপনাকে লেখার উদ্দেশ্য এই যে, যদি বর্মা সরকার মনে করেন তাঁরা দিল্লীর অনুমতি ব্যতীত এ সম্বন্ধে কিছুই করতে অপারগ তাহলে আপনি স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এখানে থাকার চাইতে আমি ইনসিন অথবা মান্দালয়, অন্য যে কোনও জেলে যেতে প্রস্তুত আছি।

আশা করি, অধিবেশনের ব্যস্ততার মধ্যেও আপনার শরীর ও মন ভাল আছে। গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষচন্দ্র বসু

পুনঃ—রাজবন্দীদের সম্পর্কে এসেম্‌ব্লিতে স্যার আলেকজাণ্ডারের বিবৃতি ও বঙ্গীয়

আইন-সভায় গত ২১শে মার্চ তারিখে প্রদত্ত মিঃ মোবার্লীর বক্তৃতার বিবরণ রেঙ্গুনের পত্রিকাগুলিতে বার হয়েছে। আমি তা পড়েছি। স. চ. ব

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত)

১৯৬

রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল
২৩. ৩. ২৭

শ্রীযুক্ত জে এম সেনগুপ্ত
বি এ, এল এল বি (ক্যান্টাব)
এম এল সি,
মেয়র, কলকাতা কর্পোরেশন
১০/৪ এলগিন রোড, কলকাতা

ঠিকানাঃ—কেয়ার অব্ ডি আই জি
আই বি, সি আই ডি
১৩, এলিসিয়াম রো
কলকাতা

সবিনয় নিবেদন,

আপনার অবগতির জন্য লিখছি যে, ২১শে মার্চ সোমবার রেঙ্গুনের আই জি অব প্রিজন্স্-এর কাছে আপনাকে লিখিত নিম্নলিখিত তারটি পাঠিয়েছিলাম। এটি সরাসরি অথবা কলকাতায় সি আই ডি মারফৎ আপনার কাছে পৌঁছবার কথা। আশা করি, এতদিনে আপনি পেয়েছেন।

টেলিগ্রাম

কলকাতার মেয়র সেনগুপ্ত।

সুপারিন্টেন্ডেন্টের অসৌজন্যমূলক আচরণের দরুন আমাকে রেঙ্গুন জেল থেকে সত্বর বদলি করার জন্য অনুগ্রহ করে বাঙলা সরকারকে বলবেন। যদি প্রয়োজন মনে করেন দিল্লীতেও তার করবেন।—বসু। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার

এখানে জেলে আমার সঙ্গে যেরকম আচরণ করা হয়েছে তা জানিয়ে আমি মহামান্য বর্মার গভর্ণরকেও দুটি চিঠি দিয়েছি। আপনাকে লিখবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি বর্মা সরকার বাঙলা সরকারের নির্দেশ ব্যতীত কিছু করতে অসমর্থ হন তবে আপনি মিঃ মোবার্লীর সঙ্গে সাক্ষাতে অথবা চিঠি লিখে এ সম্বন্ধে আলাপ করতে পারেন। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকার চাইতে আমি ইনসিন অথবা মান্দালয়—অন্য যে কোনও জেলে যেতে রাজী আছি।

আমার মুক্তির শর্ত সম্বন্ধে ২১শে মার্চ তারিখে বঙ্গীয় আইন সভায় প্রদত্ত মিঃ মোবার্লীর বিবৃতি রেঙ্গুনের পত্রিকাগুলিতে বের হয়েছে। আমি এটি পড়েছি।

এখানকার জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেকদিন থেকেই বনিবনা হচ্ছিল না। এ মাসের উনিশে, শনিবার তা চরমে পৌঁছয়। ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত
এস সি বোস
(চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার)

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(পরবর্তী ২টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

১৯৭

ইন্সিন জেল
২৮।৩।২৭
সোমবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আশা করি আমার ৭ই, ১১ই, ১৪ই, ও ২২শে মার্চের চিঠি ইতিমধ্যেই পেয়েছেন।

আমি ২৫ তারিখ, শুক্রবার এখানে এসেছি।

আপনার ১৪ই মার্চের চিঠি কিছুদিন আগে রেঙ্গুনে পেয়েছিলাম। I. G. of Prisons-এর আপিসের মাধ্যমে ২১ তারিখ আপনাকে একটি তার পাঠাই। আশা করি যথাসময়ে সেটি পেয়েছিলেন।

বেবী এখনও ভাল হয়ে ওঠেনি শুনে দুঃখিত হলাম। আশা করি আপনি তার চিকিৎসায় কোন অবহেলা করবেন না। নতুন মামাবাবু এখন কেমন আছেন? কিছুদিন আগে আমাকে জানানো হয়েছিল যে তাঁর অল্প উন্নতি হয়েছে।

শেষ যখন ওজন নিই, তখন আমার ওজন ছিল ১৩১ পাউন্ড—অর্থাৎ রেঙ্গুন জেলে থাকাকালীন ৭ পাউন্ড কমে গেছে। জ্বরের হিসেব এই রকমঃ—

১১ই মার্চ—১০০·৬°; ১২ই মার্চ—১০০°; ১৩ই—৯৯·৬°; ১৪ই—৯৯·৮°;
১৫ই—১০০°; ১৬ই—১০০·২°; ১৭ই—৯৯·৬°; ১৮ই—১০০·৪°;
১৯শে—১০০·৪°; ২০শে—১০০·২°; ২১শে—১০১°; ২২শে—১০০·৪°;
২৩শে—১০০°; ২৪শে—১০০·৪°; ২৫শে—রেকর্ড করা হয়নি;
২৬শে—১০০·৬°; ২৭শে—৯৯·৬°।

এখানে সঙ্গী পেয়েছি, তাই রেঙ্গুনের থেকে কিছুটা ভাল আছি, কিন্তু এ ছাড়া অবস্থা মোটামুটি একই রকম। এখানে এখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু শুনলাম মে মাসে বৃষ্টি শুরু হবে এবং নভেম্বর পর্যন্ত অবিরাম বর্ষণ চলবে। আমি জানি না এখানে আমি কতদিন থাকব।

আমায় গাড়ী ধার দেওয়ার জন্য আপনি কি রফি ও চাঁদু মহাশয়দের ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখেছেন?

আপনারা সকলে কেমন আছেন?

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১১৮

ইনসিন সেন্ট্রাল জেল
৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

মিঃ মোবার্লীর প্রদত্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কি মত, তা জানবার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশের সময়ও এসেছে। জানি না, আমার মতের সঙ্গে আপনাদের মত মিলবে কি না, তবু আমার মতের মূল্য যা-ই হোক না কেন প্রকাশ করছি।

মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব আমি বার বার সযত্নে পড়েছি। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি কথা বার বার করে ভেবে দেখেছি। একথা স্বীকার করতেই হবে যে তিনি অতি সাবধানতার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যে বাক্য-সংযোজনা করে তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রস্তাবের দিক অতি ধীরভাবে চিন্তা করবার পর, আজ আমার নিজস্ব মত জ্ঞাপন করছি, ক্ষণিকের ঝোঁকের বশে হঠাৎ কিছু নির্ধারণ করি না। এখন আপনাকেও যা লিখছি তা বারংবার গভীরভাবে চিন্তা করার পর ঠিক করেছি। তবুও আমার যদি কোন ভুল হয়ে থাকে, কিংবা আমার তর্কনীতিতে যদি কিছু যোগ করতে ভুল করে থাকি, তাহলে অবশ্যই আমি তা স্বীকার করে পুনর্বিবেচনা করব।

প্রথমেই বলে রাখি যে, মিঃ মোবার্লীর স্পষ্টবাদিতার আমি খুব প্রশংসা করি এবং আমার মনে হয়—তাঁর মত আমিও যদি স্পষ্টভাবে সব কথা প্রকাশ না করি তাহলে অত্যন্ত অন্যায় হবে। আমার কর্তব্যও যথাযথভাবে পালিত হবে না! স্পষ্টবাদিতায় আমি সর্বদাই বিশ্বাসী এবং আমার ধারণা সব কথা খোলাখুলি বললে শেষে উভয়পক্ষেরই সর্বাপেক্ষা উপকার হয়।

মিঃ মোবার্লীর কয়েকটি কথায় আমি তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। যেখানে তিনি বলছেন যে, আমার অতীতের কার্যকলাপ বা ভবিষ্যৎ কার্যপন্থার কোন স্বীকারোক্তি তিনি চান না—যেখানে তিনি বলছেন যে আমি যদি প্রতিজ্ঞা করে বলি তাহলে তাঁরা আমাকে মুক্তি দেবেন—শেষের দিকে যেখানে তিনি বলছেন যে, তিনি এ প্রস্তাব প্রথমে আমার কাছে উত্থাপিত করেন নি, কারণ তাহলে মনে হতে পারে যে, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হতে আমাকে বাধ্য করানো হচ্ছে—এ সব কথা পড়ে বুঝলাম তিনি আমাকে আত্মসম্মান-বিশিষ্ট ভদ্রলোক হিসেবে যথেষ্ট মান্য করেছেন এবং উপরিলিখিত কারণগুলির জন্য তাঁর এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হতে না পারলেও তাঁর প্রস্তাবের সম্মানজনক অংশগুলি আমি উপলব্ধি

করি। পরিশেষে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হিসেবে আমি মাননীয় সভ্যের এরকম ব্যবহারকে প্রশংসা না করে থাকতে পারি না। কারণ আমার মনে হয় কাউন্সিলের সভ্যদের প্রতি আস্থা-স্থাপন করে কোন প্রস্তাব তাঁদের কাছে সর্বপ্রথম উপস্থাপিত করার নিদর্শন বোধহয় এইবারই প্রথম।

আমার মনে হয় মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাবের সপক্ষে আর বেশী কিছু বলবার নেই।

প্রথমেই একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা মন থেকে দূরীভূত করতে চাই—ছোটদাদার (ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর) রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে আমার মতভেদের কোনই সম্পর্ক নেই। কারণ তিনি রিপোর্ট লিখবার আগে বা পরে, কি লিখবেন বা আমার জন্য কি অনুমোদন করবেন সে বিষয়ে আমার সঙ্গে কোন কথা পরামর্শ করা হয় নি। আমাকে যদি আগে জানাতেন, তাহলে আমি অবশ্যই সুইট্‌জারল্যাণ্ডে পাঠাবার প্রস্তাব অনুমোদনের বিপক্ষে মত দিতাম।

এই রকম প্রস্তাব করে পাঠাবার পর যখন তিনি তা আমাকে জানালেন, আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম এর ফল ভাল হবে না। পরে আমার এ সন্দেহই সত্যি হয়েছে। অবশ্য ছোটদাদা আমাকে ডাক্তার হিসেবে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন এবং ডাক্তার হিসেবে তাঁর মতামত প্রকাশ করে তিনি আমার মনে হয় প্রকৃত সমদর্শী চিকিৎসক এবং অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের মতন ব্যবহার করেছেন। তাঁর অনুমোদনের কিরকম রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হতে পারে এবং সরকারই বা এই অনুমোদনকে কি রকম রাজনৈতিক চাল চালবার জন্য ব্যবহার করবেন, তা বিচার করবার কোন প্রয়োজন তাঁর ছিল না। এজন্য আমিও তাঁর এ কাজের নিন্দা করতে পারি না। তাঁর কয়েকজন রোগী সুইস স্বাস্থ্যাশ্রমে গিয়ে রোগমুক্ত হয়েছেন দেখেই, তিনি আমার সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রস্তাব করেছেন—অন্যান্য যক্ষ্মারোগীকেও যে রকম করে থাকেন। যে সব অর্থবান রোগী সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বাস ও শুশ্রূষার ব্যয় বহন করতে পারেন তাঁদের পক্ষে এ প্রস্তাবই শ্রেষ্ঠ। এ অবস্থায় আমি যে কোনরকমভাবে নিজেকে কোন প্রস্তাব পালনে বাধাস্বরূপ মনে করি নি তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

দেখা যাচ্ছে, সরকার ছোটদাদার পেশ করা রোগের বিবরণ গ্রহণ করেন নি, যদিও তাঁর প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জনের উপায় গ্রহণ করেছেন। কারণ মিঃ মোবার্লী স্পষ্টই বলেছেন যে "সুভাষচন্দ্র যে অত্যধিক পীড়িত হন নি এবং একেবারে কর্মশক্তিহীন হন নি তা সকলেই বুঝতে পারবেন।" আমার জানতে কৌতূহল হয়, সরকার কবে আমাকে "অত্যধিক পীড়িত" বা "একেবারে কর্মশক্তিহীন" মনে করবেন! যেদিন সব চিকিৎসক ঘোষণা করবেন, আমার রোগমুক্তি অসম্ভব এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আমার মৃত্যু হতে পারে সেইদিন কি? তা ছাড়া, ছোটদাদার রোগ বিবরণ যদি তাঁরা স্বীকার করতে রাজী না হন, তাহলে যা মাত্র বাহ্যতঃ তাঁর অনুমোদন—তা গ্রহণ করতেই বা সরকার এত ব্যস্ত কেন? ছোটদাদা এ অনুমোদন করেন নি যে আমাকে বাড়িতে যেতে দেওয়া হবে না, কিংবা বিদেশে যাবার আগে আমি আমার আত্মীয়স্বজনকে দেখতে পাব না। তিনি একথাও বলেন নি যে, আমি যে জাহাজে যাব তা কোন ভারতীয় বন্দরে নোঙর করতে পারবে না। তিনি একথাও বলেন নি যে, যদি আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হয় তাহলে যতদিন অর্ডিনান্স আইন থাকবে ততদিন দেশে থাকতে পারব না। এই সব দেখে আমার সন্দেহ হয়, সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা নয়।

মিঃ মোবার্লী প্রকৃতপক্ষে বলেছেন যে, দুটি পথ অবশিষ্ট আছে। তা (১) জেলে বন্দী হয়ে অবস্থান কিংবা (২) কোন বিদেশে গিয়ে স্বাস্থ্য অর্জনের চেষ্টা ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান।

কিন্তু সত্যিই কি এই দুয়ের মধ্যে অন্য কোন মধ্যপন্থা অবশিষ্ট নেই? আমার তা মনে হয় না। সরকারের ইচ্ছা যে আমি অর্ডিনান্স আইন উঠে না যাওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৩০-এর জানুয়ারী পর্যন্ত বন্দী থাকি। কিন্তু এই আইন যে ১৯৩০ সালের পরেও নতুন করে বহাল হবে না তা কে বলতে পারে? গত অক্টোবর মাসে, সি আই ডি পুলিশের কর্তা মিঃ লোম্যানের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল, তা মোটেই আশাদায়ক নয়, এবং ১৯২৯ সালে যদি এই অর্ডিনান্স আইন চিরদিনের জন্য বিধিবদ্ধ করে রাখার আন্দোলন হয় তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্যান্বিত হব না। তাহলে আমাকে চিরস্থায়ীভাবে বিদেশে বাস করতে হবে এবং এই ধরণের নির্বাসনের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করতে হবে। যদি এ সম্বন্ধে সরকারের সত্যিই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকত তাহলে আমি কবে বিদেশ থেকে ফিরে আসতে পারব, সে কথা এই প্রস্তাবে উল্লিখিত থাকত।

তারপর প্রবাসে আমি কি রকম স্বাধীনতা ভোগ করতে পারব, তার কোন স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায় নি। সুইট্জারল্যাণ্ডে ঝাঁকে ঝাঁকে যে সব সি আই ডি বিচরণ করে, ভারত সরকার কি আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন? এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমি রাজনৈতিক সন্দেহে অভিযুক্ত এবং যতদিন না মত পরিবর্তন করে পুলিশের গোয়েন্দা হচ্ছি ততদিন সরকার আমাকে সন্দেহের চোখেই দেখবেন এবং একথা ভাবা খুবই সঙ্গত যে, এই সব গোয়েন্দা আমাকে প্রতি পদক্ষেপে অনুসরণ করে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।

সুইট্জারল্যাণ্ডে শুধু ব্রিটিশ গোয়েন্দা নেই, ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত সুইস, ইটালীয়, ফরাসী, জার্মান ও ভারতীয় গোয়েন্দা আছে এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহী গোয়েন্দা, আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করবার জন্য মিথ্যা ঘটনার সুবিস্তৃত বর্ণনা দেবেন না, তারই বা প্রমাণ কি? আমি গত বছর মিঃ লোম্যানকে বলেছিলাম, গোয়েন্দা বিভাগ ইচ্ছা করলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে তাকে কোনরকম অর্ডিনান্সে বন্দী করে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারে। ইউরোপ থেকে এরকম করা আরও সহজ। বিদেশে যাঁদের সন্দেহের চোখে দেখা হত, তাঁদের ভারতে ফিরতে কিরকম অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে, সকলেই তা জানেন। বিলেতে পার্লামেন্টের ও মন্ত্রী-সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষভাবে চেষ্টা না করলে লালা লাজপৎ রায়ের মতন নেতাও দেশে ফিরতে পারতেন না। সরকার যখন একবার আমাকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন, তখন আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা কি রকম হবে সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি জানি, পুলিশের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে একটু বেশী কর্মতৎপরতা দেখিয়ে থাকেন। আমি ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং সাবধানতার সঙ্গে বাস করি না কেন, তাঁরা ভারত সরকারের কাছে আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোর্ট পাঠাবেন। আমি কিছু না করলেও এবং খুব শান্তভাবে থাকলেও তাঁরা আমাকে ভীষণ ষড়যন্ত্রের কর্তা বলে রিপোর্ট দেবেন। তাঁরা কি রিপোর্ট দিচ্ছেন তার কিছুই আমি জানতে পারব না। কাজেই কোন সময়েই সে সম্বন্ধে সত্য প্রকাশের বা আমার বিবরণ প্রদানের সম্ভাবনা থাকবে না। এই-রকম ভাবে খুব সম্ভবত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আসার আগেই তাঁরা আমাকে একজন বড় বল-শেভিক নেতা জাহির করে দেবেন এবং তার ফলে হয়ত আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে, কারণ ইউরোপের লোক বর্তমানে এক বলশেভিককেই ভয় করে। এই জন্যই আমি স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হতে ইচ্ছা। করি না। সরকার পক্ষও যদি আমার দিক থেকে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহলে আমার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

যদি আমার বলশেভিক এজেন্ট হওয়ার ইচ্ছে থাকত, তবে আমি সরকার বলা মাত্রই প্রথম জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করতাম। সেখানে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর বলশেভিক দলে মিশে সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে প্যারিস থেকে লেনিনগ্রাড পর্যন্ত ছোটাছুটি করতাম; কিন্তু আমার সেরকম কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নেই। যখন শুনলাম যে, আমাকে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল ফিরে আসতে দেওয়া হবে না, তখন বার বার মনে ভাবলাম, সত্যিই কি আমি ভারতে ব্রিটিশ শাসন রক্ষার পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, বাঙলা দেশ থেকে নির্বাসিত করেও সরকার সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, অথবা সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি?

যদি প্রথম কথা সত্যি হয়, তাহলে ব্যুরোক্রেসীর কাছে সেরকম ভয়ের কারণ হওয়া আমার পক্ষে শ্লাঘার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই যখন নিজের জীবন ও কার্যাবলীর কথা মনে মনে চিন্তা করি, তখন বুঝতে পারি যে, একদল স্বার্থান্ধ হিংসাপরায়ণ লোক আমাকে যে ভাবে দেখছেন আমি প্রকৃতই সেইরকম নই। আমি বাঙলার বাইরে কোন রাজনৈতিক কাজ করি নি এবং ভবিষ্যতে করব বলেও মনে করি না, কারণ বাঙলাকেই আমি আমার কার্যক্ষেত্র ও আদর্শের পক্ষে বিরাট বলে মনে করি। বাঙলা সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে বলে মনে হয় না। ছয় বছরের মধ্যে আমি কংগ্রেসে যোগদান ও পারিবারিক কারণ ছাড়া অন্য কোন কাজে বাঙলার বাইরে যাই নি। তবে কেন আমাকে সমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ, ও সিংহলে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হচ্ছে? সিংহল তো খাস বৃটিশ উপনিবেশ, ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞা আইনানুসারে সেখানে খাটবে কি না সন্দেহ।

বাঙলা সরকার এখন আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে চান। আমি যখন স্বাধীন

ছিলাম, তখনই বা আমার কি গতিবিধি ছিল? ১৯২৩-এর অক্টোবর থেকে ১৯২৪-এর অক্টোবর পর্যন্ত একবছরে আমি মাত্র দুবার কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। প্রথমবার খুলনা জেলা কনফারেন্সে যোগদান করার জন্য এবং দ্বিতীয়বার নদীয়া জেলার কাউন্সিল নির্বাচনে একজন প্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা করবার জন্য। ১৯২৪-এর ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও কলকাতার বাইরে যাই নি। আমাকে সিরাজগঞ্জ কন্-ফারেন্সের জন্যে জড়াবার নানারকম চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু সে কনফারেন্সের সময় কলকাতায় আমি কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার হিসেবে মিউনিসিপ্যাল কাজে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক কনফারেন্সের সময় কলকাতায় ঝাড়ু-দারদের ধর্মঘটের সম্ভাবনা হওয়ায় আমার পক্ষে এক মিনিটের জন্যও কলকাতা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৪-এর মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আমি যা করেছি সকলেই তা অবগত আছেন। সে সময় আমার সবরকম গতিবিধির কথা সরকার জানতেন। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করাই আমাকে যদি গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমি বলব, আমাকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মিঃ মোবার্লী একটি বিষয়ে বিশেষ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছেন। সরকার জানেন যে প্রায় আড়াই বছর আমি নির্বাসিত। এই সময়ের মধ্যে আমি আমার কোন আত্মীয় এমন কি বাবা-মার সঙ্গেও দেখা করতে পারি নি। সরকার প্রস্তাব করেছেন, আমাকে আরও আড়াই বা তিন বছর বিদেশে থাকতে হবে, সে সময়েও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন সুবিধে হবে না। আমার পক্ষে এটি কষ্টদায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাকে যাঁরা ভাল-বাসেন, তাঁদের পক্ষে আরও বেশী কষ্টদায়ক। প্রাচ্যের লোকেরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কিরকম গভীর স্নেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তা পাশ্চাত্য দেশীয় কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় এই অজ্ঞতার জন্যই সরকার এরকম হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয় নি, অতএব আমার পরিবার থাকতে পারে না এবং কারও উপর আমার ভালবাসাও থাকতে পারে না।

গত আড়াই বছর আমাকে কিরকম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, সরকার বোধহয় তা ভুলে গেছেন। আমি কষ্ট পেয়েছি—তাঁরা নন। বিনা কারণে তাঁরা এতদিন ধরে আমাকে আটক রেখেছেন। আমাকে তবু বলা হয়েছিল যে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রভৃতি আমদানি, সরকারী কর্মচারী হত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি অপরাধী। এ সম্বন্ধে অনেকে আমার বক্তব্য জানাতে বলেছিলেন। আমি উত্তরে জানাচ্ছি, আমি নির্দোষ। আমার বিশ্বাস পরলোকগত স্যার এডওয়ার্ড মার্শাল হল বা স্যার জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এর চাইতে বেশী কিছু বলতে পারতেন না। দ্বিতীয়বার অভিযোগগুলি আমার কাছে করা হলে, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এত লোক থাকতে পুলিশ আমাকে ধরল কেন? আমার মনে হয় এটিই সন্তোষজনক উত্তর। আমার গ্রেপ্তারের পর থেকে বাঙ্গলা সরকার আমার অধীন ব্যক্তিদের প্রতিপালনের জন্য বা আমার বাড়িঘর রক্ষার জন্য কোনরকম ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন নি।

এ বিষয়ে আমি বড়লাটের কাছে আবেদন করলে বাঙ্গলা সরকার সে আবেদন চেপে রেখেছিলেন। তারপর আবার আমাকে তিন বছর বিদেশে থাকতে বলা হচ্ছে। ইউরোপে নির্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ আমাকে চালাতে হবে। এ কেমন যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব বুঝতে পারি না। ১৯২৪-এ আমার স্বাস্থ্য যতখানি ভাল ছিল, আমাকে অন্তত সেইরকম স্বাস্থ্যবান করে সরকারের মুক্তি দেওয়া উচিত। কারাবাসের জন্য আমার স্বাস্থ্যহানি হলে সরকার কি তার ক্ষতিপূরণ দেবেন না? ইউরোপে যতদিন হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার না করতে পারি ততদিন আমার সমস্ত খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কতদিন সরকার এ সব বিষয়ে অনবহিত থাকবেন? সরকার যদি ইউরোপ যাবার আগে আমাকে একবার বাড়ি যেতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার সব ব্যয়ভার বহন করতেন ও রোগ-মুক্তির পর আমাকে বিনা বাধায় দেশে ফিরতে দিতেন, তাহলে এই দান সহৃদয়তার পরি-চায়ক বলে মনে করতাম।

মিঃ মোবার্লী বলেছেন, সরকার ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই বুঝতে পারছেন যে, অর্ডিনান্স আইনের কার্যকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকার সুভাষচন্দ্রকে আটক রাখতে পারতেন। এ বিষয়ে আমি মিঃ মোবার্লীর সঙ্গে একমত। আমি জানি, সরকার ইচ্ছা করলে যতদিন খুশী আমাকে আটক রাখতে পারেন। অর্ডিনান্স আইনের কার্যকাল শেষ হলে তাঁরা আমাকে তিন আইনে বা অন্য যে কোনও উপায়ে আটক রাখতে পারেন।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা যতই লাফালাফি করুন না কেন বা শাসন পরিষদের সদস্যদের সফরের ব্যয় না-মঞ্জুর করুন না কেন, আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করলে আমাদের যাবজ্জীবন আটক রাখতে পারেন। সরকার আমাকে চিরদিন আটক রাখতে চান কি না তা-ই আমি জানতে চাই। পরলোকগত দেশবন্ধু আমাকে যুবক-বৃদ্ধ বলে ডাকতেন। তিনি আমকে নৈরাশ্যবাদী বলে মনে করেছিলেন। একটি বিষয়ে আমি নৈরাশ্যবাদী বটে, কারণ আমি সব ঘটনারই অশুভ দিকটা বড় করে দেখি। বর্তমান ঘটনার সবচাইতে খারাপ ফল কি হতে পারে, তা-ও আমি চিন্তা করে দেখেছি, কিন্তু তবুও আমি স্থির করেছি, জন্মভূমি থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসনের চাইতে জেলে থেকে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। এই অশুভ ভবিষ্যতের কথা ভেবেও আমি নিরুৎসাহ নই। কারণ কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করিঃ

গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে যা কিছু বলবার ছিল, তা আমি সবই বলেছি। আমার মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে কেউ যেন দুঃখিত না হন। বাবা-মার কষ্ট সর্বাধিক। সে জন্য তাঁদের সান্ত্বন দিবেন। মুক্তিলাভের আগে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি নিজে শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে সব অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্র জাতির কৃতপাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি—এতেই আমার তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হয়ে থাকবে—আমাদের ভাবধারা জাতির স্মৃতি থেকে কখনও মুছে যাবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের প্রিয় কল্পনার উত্তরাধিকারী হবেন, এই বিশ্বাস নিয়ে আমি চিরদিন সব রকম বিপদ ও অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে কাল কাটাতে পারব।

অনুগ্রহ করে এই পত্রের শীঘ্র উত্তর দেবেন।

ইতি—

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(শ্রীগোপাললাল সান্যালকে লিখিত)

১৯৯ ইনসিন জেল

৫ই এপ্রিল, ১৯২৭

পরম প্রীতিভাজনেষু—

৫ই চৈত্রের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন—কি উত্তর দিব জানি না। অনেক কথাই ত লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু লেখা যায় কি?

শরীরের সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই—"যথাপূর্বং তথা পরং"। পরিণামে কি দাঁড়াইবে জানি না—এখন আর শরীরের কথা ভাবি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে আমার মনের গতি কোনও কোনও দিকে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, জীবনে ষোল আনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইলে মেরুদণ্ড ঠিক রাখা মুস্কিল হইয়া পড়ে। জীবন প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম—"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" ভবিষ্যতের কথা জানি না। তবে এখন পর্যন্ত ভগবান সে প্রার্থনা সফল করিয়া আসিতেছেন। তাই আমি বড় সুখী—সময়ে সময়ে মনে হয়, আমার মত সুখী জগতে আর কয়জন আছে? এখন এই বৃত্তাকার উন্নত প্রাচীরের বাহিরে যাইবার আশা যে পরিমাণে সুদূরপরাহত হইতেছে, সেই পরিমাণে আমার চিত্ত শান্ত ও উদ্বেগশূন্য হইয়া আসিতেছে। অন্তরের মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মবিকাশের স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে পরম শান্তি আছে এবং বেশীদিন রুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হইলে অন্তরের শান্তিই একমাত্র সম্বল—তাই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব শান্তি পাইতেছি। Emerson বলিয়াছেন, "We must live wholly from within" এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে।

আমার মত যাঁহাদের অবস্থা তাঁহারা যদি বাহিরের ঘটনার দ্বারা জীবনের সার্থকতা বা বিফলতা নির্ধারণ করেন তবে—"মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।" যে মাপকাঠির দ্বারা আমাদের (অর্থাৎ বন্দীদের) বিচার করিতে হইবে—তাহা অন্তরের, বাহিরের নয়। কারণ বাহিরের

মাপকাঠিতে হয়তো আমাদের জীবনের মূল্য শূন্যবৎ। এইখানেই যদি যবনিকাপাত হয় তবে বাস্তব সংসারের উপর আমাদের জীবনের স্থায়ী ছাপ না থাকিতেও পারে। কিন্তু জীবনে যদি আর কোনও কাজ না করিতে পারি—আদর্শকে বাস্তবের ভিতর দিয়া যদি ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ না পাই—তাহা হইলেও আমার জীবন ব্যর্থ হইবে না। মহান আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি—কায়মন যদি সেই মহান আদর্শের সুরে বাঁধিয়া থাকি—আদর্শের সহিত নিজের অস্তিত্ব যদি মিশিয়া থাকে—তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট—আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও, আমার (এবং বোধ হয় ভাগ্যবিধাতার) কাছে ব্যর্থ নয়। জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর—শুধু একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না—সে বস্তু—ভাব বা আদর্শ। আমাদের আদর্শ সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা। আমাদের চিন্তাধারা—অবিনশ্বর। ভাবকে প্রাচীরের দ্বারা কি কেহ ঘিরিয়া রাখিতে পারে?

ষোল আনা দিতে হইলে অপর দিকে আদর্শকে ষোল আনা পাওয়া চাই। অথবা আদর্শকে ষোল আনা পাইতে হইলে নিজের ষোল আনা দেওয়া চাই। ত্যাগ ও উপলব্ধি—renunciation and realisation একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। এখনই ষোল আনা পাওয়া ও ষোল আনা দেওয়ার জন্য আমার মনপ্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

যিনি এত দুর্বলতার মধ্য দিয়া আমাকে শক্তির উচ্চ শিখরে লইয়া আসিয়াছেন—তিনি কি দয়া করিবেন না? উপনিষদে বলে, "যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ"—এখন দেখা যাক্।

Systematic Study অনেক দিন হইল ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছি। জাতীয়তার ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি মূল সমস্যার সমাধানের জন্য লেখাপড়া ও গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলাম। আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। কবে আবার আরম্ভ করিতে পারিব জানি না। বাহিরে গেলে এই কাজ চাপা পড়িবে—তাই এখানে থাকিতে থাকিতেই কাজ শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল। আমার কারাবাসের কাজ বোধ হয় এখনও সমাপ্ত হয় নাই—তাই বোধ হয় যাইবারও বিলম্ব আছে।

ভগবান আপনাদের সকলকে কুশলে রাখুন এবং আপনাদের ক্রিয়াকলাপের উপর তাঁহার আশীষ নিরন্তর বর্ষিত হউক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

(শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

২০০

ইনসিন সেন্ট্রাল জেল
৮. ৪. ২৭
শুক্রবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২৪ ও ৩১শে মার্চের চিঠি যথাক্রমে ৫ই এপ্রিল ও ৭ই এপ্রিল আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। আশা করি আপনি আমার মার্চ মাসের ১৪, ২২, ২৮ ও এপ্রিলের ৪ তারিখে লেখা চিঠি কয়খানি পেয়েছেন। শেষ ছটি চিঠি আমি ইনসিন থেকে লিখেছিলাম।

আমার শেষ চিঠিতে মাননীয় মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছিলাম। এখানে তার পুনরুল্লেখ করার বোধহয় প্রয়োজন নেই। শর্তাধীন মুক্তির প্রস্তাব মেনে নেওয়ার অসুবিধে আছে। তাছাড়া কয়েকটি শর্ত অসন্তোষজনক, এবং প্রস্তাবটি যেভাবে রচনা করা হয়েছে তাতে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলে দিয়েছেন।

বঙ্গীয় আইন সভার সভাপতির কোনও উত্তর এখনও পাই নি।

আপনি যখন এ চিঠি পাবেন তখন অল্ডারম্যান, মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। যদি আপনার সময় হয় তাহলে অল্ডারম্যানের পদ গ্রহণের প্রস্তাবে কেন আপনি সম্মতি জানাবেন না?

২রা এপ্রিল শনিবার আপনাকে একটি তার করেছিলাম। তাতে জানিয়েছিলাম যে আপনার ২৪শে মার্চ তারিখের চিঠি আমি পাই নি।

এ মাসের ৫ই, মঙ্গলবার, আই জি প্রিজন্স্ গভর্নমেন্টের প্রস্তাব আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। বঙ্গীয় আইন সভায় যা উত্থাপিত হয়েছিল, এটি সেই একই প্রস্তাব। ঐদিনই আমি আপনাকে পর পর দুটি তার পাঠাই। যতদূর মনে আছে, সেগুলির বিষয়বস্তু আপনাকে লিখে জানাচ্ছি।

(১) "আপনার ২৪শে মার্চ তারিখের চিঠি পাই নি। আজ সকালে গভর্নমেন্ট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। সেটি বঙ্গীয় আইন সভায় প্রদত্ত বিবৃতিরই অনুরূপ। প্রস্তাবে কয়েকটি বিষয় অস্পষ্ট ও অসন্তোষজনক বলে মনে হচ্ছে। আপনি এলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারতাম।"

(২) "২৪শে মার্চের চিঠি পেয়েছি। এতে নতুন কোন সংবাদ নেই। গভর্নমেন্ট প্রস্তাবের কিছু কিছু অংশ সংশোধন না করলে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এই রকমই গভর্নমেন্টকে জানাব স্থির করেছি। এখন আপনার আসার বোধহয় প্রয়োজন হবে না। তার পাঠিয়ে উত্তর দেবেন।"

গত মাসের ২৯ তারিখ থেকে মোটরে করে এখানে একটু বেড়াচ্ছি।

ইনসিন শহরটা রেঙ্গুনের মতই—একটু উনিশ বিশ হতে পারে। যতদূর মনে হয় গ্রীষ্মকালে এখানে গরম খুব বেশী নয়। বৃষ্টিও হয় প্রচুর। মে মাসের শেষাশেষি থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত চলে। মান্দালয়ের মতন এখানে গরম হবে বলে মনে হয় না, বরং অনেকটা ঠাণ্ডা। মোটের উপর এখানকার আবহাওয়া মান্দালয়ের চাইতে ভাল হবে কি না বুঝতে পারছি না। ভাল হবে আশা করি না—অন্তত আমার পক্ষে।

রেঙ্গুন ছাড়ার আগে আই জি প্রিজন্স্ আমাকে বলেছিলেন যে, আমাকে পুনরায় মান্দালয়ে পাঠাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আমাকে হয়ত বর্মা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তিনি আমাকে রেঙ্গুন ও ইনসিনের মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে বলেছিলেন। রেঙ্গুন জেলের সেই ঘটনার পর আমার পক্ষে ইনসিনে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

সোমবার আবার আপনাকে চিঠি দেব! ছোটদাদাকে আজ আলাদা খামে এক চিঠি দিলাম। ৫ তারিখে আপনাকে যে তার করেছিলাম তার জবাবের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।

ছোটদাদা কি আমার ২২শে মার্চের চিঠি পেয়েছেন? জ্বর আগের মতই হচ্ছে—সাধারণতঃ ১০০-র নীচে নামে না। আশা করি আপনাদের খবর সব কুশল। ইতি—

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুকে লিখিত)

২০১

ইনসিন সেন্ট্রাল জেল
৮. ৪. ২৭
শুক্রবার

পরম পূজনীয় ছোটদাদা,

আপনি অবগত আছেন আমি ২৫শে মার্চ রেঙ্গুন জেল থেকে এখানে এসে পৌঁছেছি। ইনসিনে এখন বৃষ্টি নেই এবং অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে; তবে মে মাসের শেষ দিক থেকে বর্ষা শুরু হয়ে যাবে। মান্দালয়ের মতন এখানে তত গরম বোধ হয় না। সরকার আমাকে জানিয়েছেন যে, যদি আমি গভর্নমেন্টের প্রস্তাবে স্বীকৃত না হই, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমাকে আলমোড়া কিংবা ব্যাঙ্গালোর অথবা উটকামণ্ড জেলে স্থানান্তরিত করা হবে। সুতরাং এখানে বোধ হয় আমাকে বেশীদিন থাকতে হবে না।

আগের মত এখনও আমার রোজ জ্বর হয়—যেমন ২৬শে মার্চ ১০০·৬, ২৭শে ৯৯·২, ২৮শে ১০০·৪, ২৯শে ১০০°, ৩০শে ১০০·৪, ৩১শে ১০০·৪।

মেজর ফিণ্ডলে সেদিন ভাল করে আমাকে পরীক্ষা করলেন এবং কতগুলি খারাপ লক্ষণ নাকি পেয়েছেন—ডান কাঁধের ঠিক নীচে কেমন একটা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এর আগে সিনিয়র এস এ এস-ও আমাকে পরীক্ষা করে ঐ খারাপ লক্ষণগুলির কথা বলেছিলেন।

রেঙ্গুন ছাড়বার কয়েকদিন আগে, আমাকে একটা মিকশ্চার খেতে দেওয়া হয়েছিল। বোধহয় ক্ষিদের উদ্রেক যাতে হয় সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোন ফল হয় নি।

ওষুধ খাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কিনা জানি না। আমি এখন কোনও ওষুধ খাচ্ছি না। গত ২৯শে মার্চ থেকে আমি এখানে মোটরে চড়ে একটু একটু বেড়িয়ে আসছি।

মান্দালয়ের মতন এখানে খুব বেশী জায়গা নেই। তবে আমি মেজর ফিণ্ডলেকে

বলেছি যে, যদি আমাকে এখানে অল্প কিছুদিনের জন্য থাকতে হয়, তাহলে এ বিষয়ে আমি আপত্তি করব না। আমরা এখন যেখানে আছি সেখান থেকে কিছু দূরে অন্য ওয়ার্ডে আমাদের বাথরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি। বিচারাধীন বন্দীদের যে ওয়ার্ডে রাখা হয় আমরা তার ওপর তলায় আছি। জায়গা বেশ প্রশস্ত এবং হাওয়া আছে; তবে দিনের বেলায় একটু গরম বোধ হয়। এখানে কয়েকজন সঙ্গীও জুটেছে, রেঙ্গুন জেলে যার অভাব একান্তভাবে বোধ করতাম।

মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার মত মেজদাদাকে আগেই জানিয়েছি।

আশা করি আপনি আমার ২২শে মার্চের চিঠি পেয়েছেন। আপনার সময় হলে আমাকে চিঠি দেবেন। আশা করি আপনাদের সকলের খবর কুশল। নতুন মামাবাবু কেমন আছেন?

ইতি—
আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(বর্মার তদানীন্তন আই জি অফ্ প্রিজন্‌স্‌কে লিখিত)

২০২

ইনসিন জেল
১১ই এপ্রিল, ১৯২৭

বর্মার ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্‌স্‌ সমীপেষু—

বিষয়—বাঙলা সরকারের প্রস্তাব

গভর্নমেন্ট আমার কাছে যে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন, বিশেষতঃ আমার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যদের প্রতি যে আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে, এবং আমার অতীত ও ভবিষ্যত কার্যকাহিনীর স্বীকারোক্তির বিষয়ে সমস্ত শর্ত তুলে নিয়ে তাঁরা আমার মনোভাবের প্রতি যেরকম সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবু আমাকে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে প্রস্তাবে এমন কতকগুলি শর্ত আছে যা আপত্তিকর, এবং সেজন্য আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

২) প্রথম থেকেই আমি যে কথা বলে আসছি তা হল গভর্নমেন্ট আমাকে বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে আটক করে রেখেছেন, এবং একাজ যুক্তিহীন। ভারতবাসী বরাবরই বেঙ্গল অর্ডিনান্স, ১৯২৪ এবং তার পরিণতি বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ১৯২৫-কে বেআইনী আইন বলে মনে করেছে, যা এ দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। কোন সভ্য রাষ্ট্রেই এ ধরণের আইন ২৪ ঘন্টার বেশী টিঁকতে পারে না। বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হিসেবে আমি নির্বাচিত হওয়ার পর অবিচারের মাত্রা আরও বেড়ে চলেছে, আমার কারাবাসই তার প্রমাণ। পৃথিবীর সর্বত্র আইনসভার সদস্যেরা যে অধিকার ভোগ করে থাকেন—যা প্রাচীন ও তর্কাতীত—তা থেকে আমাকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এভাবে লোককে বিনা বিচারে ও বিনা যুক্তিতে অনির্দিষ্টকাল আটক রেখে গভর্নমেন্ট ফৌজদারী আইনের মূল নীতিকেই আগ্রাহ্য করেছেন। তাছাড়া বঙ্গীয় আইন সভা বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টকে অস্বীকার করেছে। এতৎসত্ত্বেও তাকে সুপারিশের বলে কার্যকরী করে গভর্নমেন্ট প্রমাণ করে দিয়েছেন ভারতবর্ষের আইনসভাগুলি কতটা অন্তঃসারশূন্য। তাঁরা আইনসভাসমূহের অধিকার সমূহ (যেমন গ্রেপ্তার, আটক, উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি) হরণ করায় তা প্রশাসকমণ্ডলীর অধীন হয়ে পড়েছে। ফলে শাসনযন্ত্রের এই দুটি বিভাগের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকা উচিত তা না থেকে বরং বিপরীত এক ধরণের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অতএব যে অন্যায় গভর্নমেন্ট করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন তার প্রতিবাদেই আমার মুক্তি দাবী করছি।

৩) আমি আগাগোড়াই বলে আসছি আমাকে বাধ্য হয়ে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে, আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ যা ভোগ করা ছাড়া উপায়ও নেই, সেজন্য গভর্নমেন্টের কর্তব্য ক্ষতিপূরণ করা। ন্যায়নীতি, সুবিচারের আদর্শ ইত্যাদি সবরকমের নৈতিক বোধ বিসর্জন না দিলে কারও পক্ষে এ দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এ সব কথা বিচার করলে গভর্নমেন্ট যে প্রস্তাব করেছেন, তার অপর্যাপ্ততা স্পষ্টতই চোখে পড়ে।

৪) গভর্নমেন্ট অথবা আমি এতখানি স্বল্পবুদ্ধি নই যে মনে করা যেতে পারে সুইস স্যানাটোরিয়ামে আমার চিকিৎসা সম্পর্কে ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর মতামতকে কার্যকরী করাই এ প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর অভিমত মূল্যবান সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার পক্ষে তা গ্রহণ করা তখনই সম্ভব যখন আমাকে স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছানুযায়ী কর্তব্য নির্ধারণ করতে দেওয়া হবে।

৫) নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কর্তব্য এবং দেশের কাজে আমার ভূমিকা, এর সঙ্গে সম্মানের প্রশ্নটিও জড়িত। এসব কথা চিন্তা করেই গভর্নমেন্ট প্রস্তাবে যে সব শর্ত আরোপ করেছেন তা গ্রহণ করতে পারছি না। তাছাড়া প্রায় আড়াই বছর যখন আমার জেলেই কেটে গেছে তখন এ সম্বন্ধে আর আলোচনার কোন প্রশ্ন ওঠে না। এখন যদি আমি তা মেনে নিই, তার অর্থ দাঁড়াবে গভর্নমেন্টের আচরণের বৈধতা স্বীকার করে নেওয়া, নীতিগতভাবে যা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমরা শাসনতান্ত্রিক অধিকারের জন্যই সংগ্রাম করছি; জাতির সম্মান রক্ষার দায়িত্বও আমাদের উপরই ন্যস্ত। সুতরাং একথা আমরা কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না। আমার জীবন আমার কাছে যত প্রিয়, তদপেক্ষা বেশী প্রিয় সম্মানরক্ষার প্রশ্ন এবং আমি আমার জীবনের বিনিময়ে এই পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য অধিকারসমূহ ত্যাগ করতে পারি না যা ভবিষ্যত ভারতের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মূল ভিত্তিস্বরূপ হবে। অবশ্য আমার এ মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমাকে যে আরও অনেক লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে তা আমি জানি। কিন্তু একথাও আমার অজ্ঞাত নয় যে পরাধীন দেশের মানুষ হিসেবে এ দুর্ভাগ্য আমি উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছি।

৬) আমি দুঃখিত যে, মন্ত্রীমণ্ডলের যে সব সদস্য মনে করেন তাঁরা এ প্রস্তাব উত্থাপন করে আমার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। কিন্তু মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে বলেই নিঃসন্দেহে বলতে পারি তাঁরাও তাঁদের একান্ত গোপন মুহূর্তে আমার এ সিদ্ধান্তকে শুধু সমর্থনই করবেন না, হয়ত প্রশংসাও করবেন।

৭) সবশেষে আমি পুনরায় গভর্নমেন্টের এই মুক্তির প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এটি যাতে গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য শর্তগুলি প্রত্যাহার করে নিতে অনুরোধ করি।

ইতি—
আপনার একান্ত অনুগত
এস. সি. বোস

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

২০৩

ইনসিন জেল
১৩. ৪. ২৭
বুধবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

গভর্নমেন্টের প্রস্তাবের যে উত্তর আমি ১১ই এপ্রিল সোমবার দিয়েছি, তার একটি কপি এই চিঠির সঙ্গে পাঠালাম। সোমবার বিকেলে কলকাতার Intelligence বিভাগ মারফৎ আপনাকে নিম্নলিখিত তারটি পাঠিয়েছে।

"আপনার ৮ তারিখের তার পেয়েছি। আজ গভর্নমেন্টকে জানিয়েছি যে প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এখন সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে না বোধহয়।"

আজকের ডাক ধরতে হলে সময় আর বেশী নেই। বেশী আর কিছু লিখলাম না। আশা করি সকলে ভাল আছেন।

ইতি—
আপনার চিরস্নেহাধীন
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(জানকীনাথ বসুকে লিখিত)

২০৪ ইনসিন সেন্ট্রাল জেল
১৩. ৪. ২৭
বুধবার

শ্রীচরণেষু বাবা,

রেঙ্গুন জেল থেকে ২১. ২. ২৭ তারিখে আপনাকে শেষ চিঠি দিয়েছিলাম। ২৫শে মার্চ রেঙ্গুন থেকে আমি এখানে এসেছি। রেঙ্গুন থেকে ইনসিন প্রায় দশ মাইল। ইনসিন একটি ছোট শহর, তবে দ্রুত উন্নতির পথে। রেঙ্গুন থেকে ইনসিন পর্যন্ত সুন্দর একটি রাস্তা আছে, ঘন ঘন ট্রেনও পাওয়া যায়। এখন এখানে বৃষ্টি নেই, মৃদু মন্দ হাওয়া বইছে, এবং গরমও খুব বেশী নয়। মান্দালয়ের মতন গরম তো নিশ্চয়ই নয়। তবে মে মাস থেকে বৃষ্টি শুরু হবে এবং অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।

আমার রেঙ্গুন জেল ত্যাগ করার কারণ, এবার বোধহয় আপনি বুঝতে পেরেছেন।

এ মাসের ৫ তারিখে গভর্নমেন্টের প্রস্তাব আমার কাছে যথারীতি পাঠানো হয়েছিল। আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করার জন্য কিছু সময় নিয়েছিলাম। ১১ তারিখে উত্তর লিখে আমি জানাই যে, এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটি যাতে গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য শর্তগুলি তুলে নেবার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধও করেছিলাম।

এই প্রস্তাব গ্রহণ না করার কারণ বিশদভাবে বর্ণনা করে আমি ৪ তারিখে মেজদাদাকে এক চিঠি লিখি।

সরকার আমার কাছে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন, তা ২১শে মার্চ তারিখে বঙ্গীয় আইন সভায় প্রদত্ত বিবৃতিরই অনুরূপ।

সরকার আমাকে জানিয়েছেন যে আমি যদি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হই তাহলে আমাকে আলমোড়া, কিংবা উটি কিংবা ব্যাঙ্গালোর জেলে বদলি করা হবে।

আমার শরীরের অবস্থা আগের মতন। এখানে কয়েকজন সঙ্গী পেয়েছি, রেঙ্গুনে যার অভাব ছিল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আপনি আমার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন এবং দেশবাসীর সমর্থনও আমি লাভ করব।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে? আশা করি কটক ও কলকাতার খবর সব কুশল। মা এলগিন রোডের বাড়িতেই আছেন বোধহয়।

আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(পরবর্তী ৪টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

২০৫ ইনসিন জেল
২০. ৪. ২৭
বুধবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

১১ তারিখ ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আপনাকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলাম:—"আপনার আট তারিখের টেলিগ্রাম। আজ গভর্নমেন্টকে উত্তর দিয়েছি প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। এর জন্য ইন্টারভিউ-এর প্রয়োজন নেই।"

তার পর ১৪ ও ১৬ তারিখে দুটি টেলিগ্রাম এসেছে; দ্বিতীয়টিতে আপনি বলছেন যে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোন নতুন প্রস্তাব পাওয়া গেলে আপনি ইনসিন আসবেন।

আমি আপনাকে ১৩ ও ১৪ তারিখে চিঠি লিখেছি। প্রথমটির সঙ্গে গভর্নমেন্টের প্রস্তাবের যে জবাব দিয়েছে তার একটি কপি আপনাকে পাঠিয়েছি।

আমার মনে হয় ছোটদাদা ও লেঃ কর্নেল তারাপোরের উপস্থিতিতে লেঃ কর্নেল কেল্‌সল পরিষ্কার করে বলেন যে তিনি আমার বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে এবং তাঁর মতামত জানাতে এসেছেন, আমার চিকিৎসার সমস্যা তাঁর চিন্তার বিষয় নয়।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি নাগাদ আমি কবিরাজী ওষুধ ছেড়ে দিই। রেঙ্গুনে ২০শে মার্চ ও তার পরবর্তী কয়েকদিন আমাকে একটি খিদে বাড়ানোর টনিক দেওয়া হয়।

চিকিৎসকদের উপদেশ অনুযায়ী গত সোমবারের আগের সোমবার থেকে আমি শয্যাগত। বুকে ব্যথা দিয়ে সমস্যার শুরু, অবশ্য এখন কমে গেছে। কিন্তু, ব্যায়ামের অভাবে দুর্বল বোধ করি এবং খিদে আরও কম হয়। মেজর ফিন্ডলে দেখতে চান সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলে জ্বরের ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া হয়—তাই অ রও কিছুকাল আমি বিছানাতেই কাটাব। জ্বরের মাত্রা আগের থেকে একটু কম, কিন্তু এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, নিম্নলিখিত হিসেব থেকেই তা প্রতীয়মান হবেঃ—১৩ই এপ্রিল ১০০°; ১৪ই—১০০·২; ১৫ই—৯৯·৮; ১৫ই—১০০°; ১৮ই—১০০·৫; ১৯শে—১০০·২।

আমার বর্তমান ওজন ১৩০ পাউণ্ড।

কর্নেল তারাপোর গতকাল এসে আমাকে বললেন যে প্লুরিসি আমার বুকের ব্যথার কারণ কিনা জানতে চেয়ে আপনি তাঁকে তার করেছেন। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট একই মর্মে একটি তার পেয়েছেন।

মিঃ জাস্টিস্ জে আর দাস শনিবার, ৯ই এপ্রিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

কাউকে বলবেন Bergson-এর Creative Evolution বইটি যেন আমাকে পাঠিয়ে দেয়।

শ্রীমতী দাস কেমন আছেন?

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

২০৬

ইনসিন জেল
২৯।৪।২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

বড়দাদা এসে চলে গেছেন। তাঁর কাছে আমার অভিমত জানতে পারবেন। যদি আগামী সপ্তাহে আপনাকে দীর্ঘ চিঠি লিখবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পারি, তাহলে আমার সিদ্ধান্তের বিষয় বিশদভাবে লিখে জানাব। বর্তমানে সে সামর্থ্য আমার নেই।

গত কয়েকদিন ধরে রোজই জ্বর বাড়ছে......; ওজন কমে দাঁড়িয়েছে ১২৮ পাউণ্ড। এখনও শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে খুব বিরক্তিকর মনে হয়, কিন্তু ধৈর্য আমাকে ধরতেই হবে।

যদি বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশের কোনও পরিবর্তন না হয়, তাহলে রোগ সারাবার চেষ্টায় কোনও সুফল হবে কি না সন্দেহ। বস্তুত, আমার অবস্থা দিন দিনই খারাপের দিকে। প্রতিকারের জন্য যোগাভ্যাস শুরু করব কি না চিন্তা করছি। অবশ্য তার বিপদও আছে অনেক; আর সেজন্যই ইতস্ততঃ করছি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই। একমাত্র যোগের দ্বারাই আমার জীবন রক্ষা হতে পারে। একথা গোপন করে লাভ নেই যে যক্ষ্মা মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধি। এবং এ রোগ একবার যাকে ধরেছে, তাকে বাঁচার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

আশা করি সকলে ভাল আছেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
সুভাষ

পুনঃ—কোনও কারণেই আমার জন্য চিন্তিত হবেন না। কারণ যে কোন খারাপ অবস্থার জন্য সবসময় প্রস্তুত হয়ে আছি।

স. চ. ব

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

২০৭

ইনসিন জেল
৬ই মে, ১৯২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

দীর্ঘ চিঠি লেখবার সামর্থ্য আমার নেই, আবশ্যক শক্তি সংগ্রহ করতে না পারা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে বড়দাদার সঙ্গে আমার অনেক আলাপ

আলোচনা হয়েছে। আমাকে এই আলাপের সুযোগ দেওয়ায় আমি আন্তরিক আনন্দিত। মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয় যে সৌজন্য দেখিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমার সঙ্গে এ পর্যন্ত যেরকম ব্যবহার করা হচ্ছিল, এই ব্যবহার তা থেকে স্বতন্ত্র ধরনের।

গভর্নমেন্টের উত্তর বড়দাদা ২৭শে এপ্রিল তারিখে আমাকে জানিয়েছিলেন। এই উত্তরে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই স্পষ্টতর হয়েছে। ১১ই এপ্রিল তারিখে গভর্নমেন্টের শর্তের আমি যে উত্তর দিয়েছিলাম, বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে আমি আবার সেই উত্তরটিই সঠিক বলে মনে করছি।

আমার সিদ্ধান্ত সহজ বিচারের ফল। ভাল করে চিন্তা করে দেখলে এই সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ়তর হয়। জীবনকে সহজভাবে বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। ভালভাবে বিচার করবার পর এই সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ় হয়েছে। কারাগারে আমার যতই দিন কাটছে, ততই আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হচ্ছে যে, জীবন-সংগ্রামের মূলে রয়েছে মতবাদের সংঘর্ষ—সত্য এবং মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ। কেউ কেউ একে সত্যের বিভিন্ন স্তর বলে থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করে থাকে। এই সমস্ত ধারণা নিষ্ক্রিয় নয়, ক্রিয়াশীল ও সংঘর্ষাত্মক।

হেগেলের Absoulte Idea, হৃপম্যান ও সোপেনহায়ারের Blind Will এবং হেনরী বার্গস-এর Lean Vital-এর মতই এই সমস্ত ধারণা ক্রিয়াশীল। এই সব ধারণা নিজেদের পথ নিজেরা সৃষ্টি করে নেবে। আমরা তো মাটির পুতুল মাত্র, ভগবানের তেজোরাশির কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র আমাদের মধ্যে নিবদ্ধ। আমাদের এই ধারণার কাছে আত্মোৎসর্গ করতে হবে।

ঐহিক ও জড়দেহের সুখ-দুঃখকে অগ্রাহ্য করে যে এই ভাবে আত্মনিবেদন করতে পারে জীবনে তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। আমাদের আদর্শ যে একদিন জয়ী হবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমার স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কোন চিন্তাই করি না।

গভর্নমেন্টের শর্তের উত্তরে আমি যা লিখেছে, তাতে আমি আমার মত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছি। আমি উৎকৃষ্টতর শর্ত পাবার জন্য পাটোয়ারী চাল দিচ্ছি বলে কোন কোন সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের নির্দয়তায় আমি দুঃখিত। আমি দোকানদার নই, দরকষাকষি আমি করি না। কূট চালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি, আমি একটি আদর্শ অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আছি। ব্যস, এইখানেই শেষ। আমি জীবনকে এতটা প্রিয় মনে করি না যে, তা রক্ষার জন্য আমি চালাকির আশ্রয় নেব। মূল্য সম্বন্ধে আমার ধারণা বাজারের ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। শারীরিক বা বৈষয়িক সুখের নিরিখে জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয় করা যায় বলে আমি মনে করি না। আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নয়। বৈষয়িক লাভও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নয়। সেন্ট পল বলেছেন—"আমরা রক্তমাংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি।' আমাদের সংগ্রাম উচ্চপদাধিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে।" স্বাধীনতা এবং সত্যই আমাদের আদর্শ, রাত্রির পর যেমন দিন আসে, আমাদের প্রচেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য—সত্য সফল হবেই। আমাদের শরীর নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু অটল বিশ্বাস ও দুর্জয় সংকল্পের বলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখবার মত সৌভাগ্য কার হবে, ভগবানই তার বিধানকর্তা। আমার সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে, আমার কাজ আমি করে যাব, তারপর যা হয় হবে।

আর একটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আমি সুইট্জারল্যান্ডে যাব কি না এখনও তা স্থির করতে পারি নি। বর্তমানে শারীরিক অবস্থার দিক থেকেই সুইট্জারল্যান্ড যাবার ক্লেশ সহ্য করতে আমি অক্ষম। বর্তমানে প্রথমত ভারতের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে বাস করে আমাকে স্বাস্থ্যলাভ করতে হবে। কতদিনে আমি সুইট্জারল্যান্ড যাবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য লাভ করব, তার কোন স্থিরতা নেই। যাই হোক, চিকিৎসকদের অভিমত এই যে, আমি অন্তত আরও অনেকটা সুস্থ হবার আগে সুইট্জারল্যান্ড যাওয়ার কথা উঠতেই পারে না। আবার আমি যদি ভারতের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে বাস করেই আশানুরূপ স্বাস্থ্য লাভ করতে পারি তাহলে এবং স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে না নিলে, সুইট্জারল্যান্ড যাবার আবশ্যকতাই বা কি?

তারপর সুইট্জারল্যান্ড যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমাকে আমার আর্থিক সমস্যা ও আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধেও বিবেচনা করতে হবে। পরিবারের সঙ্গে বিশেষ করে

বাবা-মা-এর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কয়েকমাসের মধ্যেই বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে, এ সমস্ত বিষয় ভাল করে বিবেচনা করে দেখতে হবে। যাই হোক, এ বিষয়ে কোনরকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে না গিয়ে আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই। যদি সরকার আমার সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বাস বাধ্যতামূলক বলে মনে করেন তাহলে আপনারা কোন রকম ইতস্তত না করে কথাবার্তা চালানো বন্ধ করুন। ঈশ্বর মহান—অন্তত তাঁর সৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা মহান—আমরা তাতে যখন বিশ্বাস স্থাপন করেছি তখন আমাদের দুঃখ করবার কারণ থাকতে পারে না।

আমার প্রতি অনুরক্ত ও সহানুভূতিসম্পন্ন অনেকের মনঃপীড়ার কারণ হওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু একথা মনে করে আমি সান্ত্বনা লাভ করছি যে যাঁরা একই মাতৃভূমির প্রতি আস্থাশীল তাঁরা পরস্পরের সুখের ও দুঃখের অংশ সমানভাবে গ্রহণের অধিকারী। আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি—

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

২০৮

ইনসিন জেল
৯।৫।২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

৬ই মে তারিখে আপনাকে শেষ চিঠি লিখি। ঐদিন ছোটদাদাকেও একটি চিঠি দিয়েছিলাম।

বর্তমানে যেরকম ব্যবস্থা স্থির হয়েছে তাতে কাল অথবা বৃহস্পতিবার আলমোড়ার পথে কলকাতা রওনা হওয়ার কথা। আমার বদলীর হুকুম এসেছে: আবহাওয়া প্রতিকূল না হলে আগামী কালই যাত্রা করব।

আপনি আমাকে যোগাভ্যাস শুরু করতে নিষেধ করে যে তার করেছিলেন, সেটি ৬ই মে তারিখে মেজর ফিণ্ডলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। পরদিন অর্থাৎ ৭ই মে আমি নিম্নলিখিত তারটি আপানাকে Intelligence বিভাগ মারফৎ পাঠাই—

"আপনার ৬ তারিখের টেলিগ্রাম পেয়েছি। শ্রীযুক্তা দাসের চিঠির আশায় আছি। আলমোড়ায় বদলী করেছে। মঙ্গলবার রওনা হচ্ছি।"

গতকাল অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হল। বুকে যন্ত্রণা হচ্ছিল খুব—দুধারেই। ঘন্টাখানেকের মতন ছিল। দম বন্ধ হয়ে আসবার জোগাড়। যন্ত্রণাটা যতক্ষণ ছিল, ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আগে এরকম তীব্র যন্ত্রণা আর কখনও অনুভব করি নি।

আপনি এ চিঠি পাবার আগেই হয়ত আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতে পারে। অন্য কোন সংবাদ না এলে ধরে নিতে পারি যে আলমোড়া যাওয়াই স্থির আছে। আশা করি সকলে ভাল আছেন।

ইতি—
আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

বিবিধ প্রবন্ধ

তরুণের স্বপ্ন

আমরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত—একটা বাণী প্রচারের জন্য। আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিবার জন্য গগনে সূর্য উদিত হয়, গন্ধ বিতরণের উদ্দেশ্যে বনমধ্যে কুসুমরাজি যদি বিকশিত হয়, অমৃতময় বারিদান করিতে তটিনী যদি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়—যৌবনের পূর্ণ আনন্দ ও ভরা প্রাণ লইয়া আমরাও মর্ত্যালোকে নামিয়াছি একটা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যে অজ্ঞাত গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে—ধ্যানের দ্বারা, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা।

যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভাসিয়া আসিয়াছি সকলকে আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্য, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ। আনন্দের মূর্ত বিগ্রহরূপে আমরা মর্ত্যে বিচরণ করিব। নিজের আনন্দে আমরা হাসিব—সংগে সংগে জগৎকেও মাতাইব। আমরা যেদিকে ফিরিব, নিরানন্দের অন্ধকার লজ্জায় পলায়ন করিবে, আমাদের প্রাণময় স্পর্শের প্রভাবে রোগ, শোক, তাপ দূর হইবে।

এই দুঃখসংকুল বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ-সাগরের বান ডাকিয়া আনিব।

আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ—সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। তনু, মন-প্রাণ, বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা সৃষ্টি করিব। নিজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শিব আছে—তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে।

কিন্তু আমাদের দেওয়ার শেষ নাই; কর্মেরও শেষ নাই, কারণ—

"যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ;
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর;
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"

অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপরিমেয় তেজ ও অদম্য সাহস লইয়া আমরা আসিয়াছি—তাই আমাদের জীবনের স্রোত কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের পর্বতরাজি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক অথবা সমবেত মনুষ্য-জাতির প্রতিকূল শক্তি আমাদের আক্রমণ করুক—আমাদের আনন্দময়ী গতি চিরকাল অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

আমাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম আছে—সেই ধর্মই আমরা অনুসরণ করি। যাহা নূতন, যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিত—তাহারই উপাসক আমরা। আমরা আনিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে। আমরা অতীত ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা সব সময়ে মানিতে প্রস্তুত নই। আমরা অনন্ত পথের যাত্রী বটে, কিন্তু আমরা অচেনা পথই ভালবাসি—অজানা ভবিষ্যৎ আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই "the right to make blunders" অর্থাৎ "ভুল করিবার অধিকার"। তাই আমাদের স্বভাবের প্রতি সকলের সহানুভূতি নাই, আমরা অনেকের নিকট সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া।

ইহাতেই আমাদের আনন্দ; এখানেই আমাদের গর্ব! যৌবন সর্বকালে সর্বদেশে সৃষ্টি-ছাড়া ও লক্ষ্মীহারা। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি—বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্যন্ত অবসর আমাদের নাই। ভুল করি, ভ্রমে পড়ি, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাৎপদ হই না। আমাদের তাণ্ডবলীলার অন্ত নাই, কারণ—আমরা অবিরামগতি।

আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সংকীর্ণতা—সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কন্টকশূন্য রাখা যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।

মনুষ্য জীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই—সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা—যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি—সে স্বাধীনতা সর্বতোমুখী! জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।

অনাদিকাল হইতে আমরা মুক্তির সঙ্গীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি সে ক্রন্দন শুধু পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য। শৈশবে ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের স্বারদেশে উপনীত হইলে বাহু ও বুদ্ধি আমাদের সহায় হয়। আর এই বুদ্ধি ও বাহুর সাহায্যে আমরা কি না করিয়াছি,—ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিসর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রুশিয়া, চীন, জাপান, হিন্দুস্থান—যে কোন দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—দেখিবে যে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীর্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সাহায্যে সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আবার আমাদেরই অঙ্গুলিসঙ্কেতে সভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন। আমরা একদিকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুরূপে তাজমহল যেমন নির্মাণ করিয়াছি, অপরদিকে রক্তস্রোতে ধরণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে; আবার রুদ্র করালমূর্তি ধারণ করিয়া আমরা যখন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে বড় আশা—তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে—তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন—এটা যেমন সর্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর সকল দেশে বিশেষতঃ যেখানে বার্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণ সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ভাসিত করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো, জাগো, ঊষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে!

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

বাঙ্গালীর অধঃপতন

আমি আজ একটা খুব বড় দুঃখের কথা বলবার জন্য কলম ধরেছি। এ দুঃখটা হয়ত অনেকের কাছে কাল্পনিক—কিন্তু আমার ক্ষুদ্র প্রাণের পক্ষে এ দুঃখটা সত্য ও গভীর।

গয়াতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির অধিবেশনে কার্যকরী সমিতি (Working Committee) গঠনের কথা যখন উত্থাপিত হয়, তখন বাঙ্গলাদেশ থেকে কাকে নির্বাচন করা হবে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। পূর্বরীতি অনুসারে যে প্রদেশের লোক সভাপতি হয় সেই প্রদেশ থেকে অন্তত পক্ষে একজন সম্পাদক হবার কথা। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও শাসমলের নাম সম্পাদক পদের জন্য প্রস্তাবিত হয়, কিন্তু তাঁরা ঐপদ গ্রহণ করতে রাজী হন না। তারপর বাঙ্গলাদেশের পরিবর্তনবিরোধীদের (No Changer) মধ্যে কাহাকেও সম্পাদক করা হয় না। পরিবর্তনবিরোধীগণও এ বিষয়ে এতদূর নিশ্চেষ্ট ও নিরপেক্ষ ছিলেন যে কার্যকরী সমিতিতে একজন বাঙ্গালীও সভ্যরূপে নির্বাচিত হন না। তার ফলে পরিবর্তনবিরোধীদের দলে নিখিল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালীর এখন কোনও স্থানই নাই।

ব্যাপারটা দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও নিখিল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালীর নাম লুপ্ত দেখতে আমরা চাই নি। বাঙ্গলাদেশে কি এমন কোন সভ্য ছিলেন না যিনি কার্যকরী সমিতির সভ্য হবার উপযুক্ত বা যিনি ঐ সমিতির সভ্য হতে পারতেন? যদি ছিলেন, তবে পরিবর্তনবিরোধীগণ তাঁকে উপেক্ষা করে নিজেদের এবং বাঙ্গালী জাতির মর্যাদাহানি ঘটালেন কেন? যদি এমন কোন ব্যক্তি না ছিলেন, তবে এই দল কোন্ সাহসে দেশবন্ধুর মত নেতার বিরুদ্ধাচরণ করে বাঙ্গলাদেশে কংগ্রেসের কাজ চালাবার ভরসা করেছিলেন? যে নিখিল ভারতীয় কার্যকরী সমিতিতে এক সময় বাঙ্গালীর গৌরবময় স্থান ছিল, সেই সমিতিতে আজ একজন বাঙ্গালীও নাই। বাঙ্গালীর এই অধঃপতনের জন্য কি পরিবর্তনবিরোধীগণ দায়ী নন!

ভূতপূর্ব আইন ব্যবসায়ীদের সাহায্যকল্পে শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজের টাকাতে একটা "ফন্ড" করা হয়; সেই 'ফন্ডের' নাম দেওয়া হয় "বাজাজ ফন্ড" (কংগ্রেস ফন্ড বা তিলক স্বরাজ্য ফন্ড নয়)। এই সাহায্য বিতরণের জন্য প্রত্যেক প্রদেশ থেকে একজন লোক মনোনীত হন। বাঙ্গলার ভার শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের উপর অর্পিত হয়। সেনগুপ্ত মহাশয় যখন ঐ পদ ত্যাগ করেন, তখন পরিবর্তন-বিরোধীদের দলে এমন একজন লোক পাওয়া গেল না যিনি ঐ ভার গ্রহণ করতে পারেন। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে লোক পাওয়া গেল কিন্তু বাঙ্গলার ভাগ্যবিধাতা হলেন শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ। সাহায্য বিতরণের প্রণালীতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বলে কয়েকজন অসহযোগী উকিল সাহায্য নেওয়া বন্ধ করলেন। কিন্তু পরের চাকরী করলে বা ইংরেজের আদালতে উকিল হ'লে মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে না ব'লে যাঁরা একদিন অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেক কর্মী শ্রীযুক্ত বাজাজের দেওয়া টাকা হাত পেতে নিলেন।

গয়া কংগ্রেসের পর পরিবর্তন-বিরোধীগণ কোমর বেঁধে কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সুদূর তামিল প্রদেশ, গুজরাট, যুক্ত-প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ থেকে নেতৃবর্গকে ডেকে এনে বাঙ্গলাদেশের প্রচারকার্য চালাতে হল। বোধ করি পরিবর্তন-বিরোধীদের এমন সামর্থ্য ছিল না যে তাঁরা নিজেদের শক্তির বলে কাজটা করেন। অ-বাঙ্গালী নেতারা যে টাকা তুললেন তা প্রধানতঃ অ-বাঙ্গালীদের কাছ থেকে। বঙ্গবাসীরা এই প্রচারকার্যের প্রহসন দেখে হাসতে লাগলেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন— "Stands Bengal where she was"?

অধঃপতনের শেষ এখনও হয় নি। বাঙ্গালীর কাছে আর কুমিল্লার তুলোর আদর নেই। বেশী দর দিয়ে দেড় টাকা সের হিসাবে ওয়ার্দা থেকে তুলো আনতে হবে, কারণ ওয়ার্দার তুলোর মালিক শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ এখন বাঙ্গলার—শুধু বাঙ্গলার কেন, সমগ্র ভারতের ভাগ্যবিধাতা। শ্রীযুক্ত বাজাজের তুলো আমরা বেশী দাম দিয়ে ক্রয় করি—তাঁর

দেওয়া টাকা আমরা দানস্বরূপ গ্রহণ করি। এরপর যদি তাঁর গুণ গাইতে আমরা আরম্ভ করি—তবে সে অপরাধ কি আমাদের?

সেদিন কাগজে দেখলাম নিখিল ভারতীয় কার্যকরী সমিতি থেকে বাঙ্গলা দেশের কয়েকটা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হয়েছে। আমরা এতদিন জানতাম সাহায্য বিতরণের ভার বংগীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির উপর ন্যস্ত আছে। কার্যকরী সমিতি তাঁদের দেয় টাকা। প্রাদেশিক সমিতির হাতে দিলে প্রাদেশিক সমিতি ঐ টাকা ব্যক্তিবিশেষকে বা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে ভাগ করে দিবেন। কিন্তু এখন দেখছি বংগীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির ন্যায্য অধিকার কার্যকরী সমিতি আর মানতে চান না। কার্যকরী সমিতিতে একজন বাংগালী সভ্যও নাই যে এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদ করেন। ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে পরিবর্তন-বিরোধীদের কৃপায় নিখিল ভারতে আজ বাঙ্গালীর কোন স্থান নাই।

কার্যকরী সমিতি বাঙ্গলা দেশের কর্মীদের সাহায্যের নিমিত্ত চৌদ্দ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই টাকা বিতরণ করবেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। বংগীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির বা ঐ সমিতির সভাপতির এ বিষয়ে কোনও হাত নাই। পরিবর্তন-বিরোধীদের মধ্যে গণতন্ত্রবাদের যে সব পুরোহিত আছেন তাঁরা গণতন্ত্রের এরূপ বিচিত্র অভিনয় দেখে কি মনে করেছেন তা আমরা বলতে পারি না। এই চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয়ের ভার যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের হাতে ন্যস্ত হয়েছে এবং এ বিষয়ে যে অন্য কাহারও অধিকার নাই এ কথা প্রফুল্লবাবু বরিশালে জনসভায় বলেছেন।

একদিন মনে হত শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু সেদিন ঘুচে গেছে। অল্পদিন পূর্বে দিল্লীতে মিটমাটের একটা প্রস্তাব হয়। সেখানে শ্রীযুক্ত রাজা-গোপালাচারী, মোয়াজ্জেম আলি, আনসার মাহমুদ ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সম্মত হয়ে বলেন যে কংগ্রেসের তরফ থেকে কাউন্সিল প্রবেশ করা যেতে পারে। মিটমাট এক রকম হয়ে গেছল শুধু শ্রীযমুনালাল বাজাজ ও বল্লভভাই প্যাটেলের মত নেওয়া হয় নি। রাজাগোপালা-চারী মহাশয় বোম্বাইয়ের দিকে রওনা হলেন তাঁদের মত জানবার জন্য। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্যাটেল ও বাজাজ রাজী হলেন না বলে মিটমাট আর সম্ভব হল না। এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে তেত্রিশ কোটি নরনারীর সুখ দুঃখ নির্ভর করছে শ্রীযুক্ত বাজাজ ও প্যাটেলের উপর।

অধঃপতন আর কতদূর গড়াবে তা শুধু ভগবানই জানেন। বাংগালী নিজেকে সস্তা দরে বিক্রয় করে একগালে চূণ আর একগালে কালি মেখে বসে আছে। বাঙ্গালীর অধঃপতন চরমে পৌঁছতে কত দেরী আছে তা আমরা জানি না। কে জানে কত দুঃখ, কত লজ্জা বাংগালীর কপালে আছে? তার এখনও সময় আছে প্রতিকার করবার। বাংগালীর গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে। নিখিল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালীর যে স্থান ছিল সে স্থান ফিরে পেতে হবে। পরিবর্তন-বিরোধীরা বাংগালীর নাম ভারতের সম্মুখে কলঙ্কিত করেছেন, এ কলংক আমাদের ঘোচাতে হবে। ভারতকে যেমন বাঁচাতে হবে, বাঙ্গলার নামও সেরূপ চিরকালের জন্য উজ্জ্বল রাখতে হবে। বাঙ্গলার নষ্ট খ্যাতি ও লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের কাজে যিনি সহায়তা করবেন বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।*

*২৫শে মে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০) 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ।

মান্দালয় থেকে বার্তা

"কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে"র প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আমি এটিকে অভিনন্দন জানাই। আরও ভাল করার যদিও অবকাশ আছে, তবু এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই যে এক বছরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্ম নথিবদ্ধ করার গর্ব এটি করতে পারে। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পত্রিকাটির কাজ চালানো হয়েছে, এবং তার জন্য সম্পাদক প্রশংসার্হ। অগ্রদূতের কাজ সর্বদাই পরিশ্রমের এবং স্বীয় ক্ষেত্রে এই 'গেজেট' অগ্রদূত-ই বটে। আমার আশা, অনতিদূর ভবিষ্যতে এই 'গেজেট', অন্যান্য দেশের অগ্রগণ্য কর্পোরেশনের পুস্তকাদির পাশাপাশি চলতে সক্ষম হবে এবং অন্যান্য ভারতীয় পৌরসভার কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠবে। বর্তমানের কৃতিত্ব সেই ভাবী পরিপূর্ণতা লাভের আশাব্যঞ্জক পূর্ব-সূচনা। পৌরশাসনের সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সচেতনতা এবং করদাতা ও পৌর-শাসকদের সহযোগিতার উপর। আমার বিশ্বাস, এই 'গেজেট' নাগরিকবৃন্দের সচেতনতা জাগ্রত করতে সাহায্য করতে এবং উভয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবে। এটি নাগরিকবৃন্দকে পৌরসভার কাজ ও সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত রাখবে এবং তাদের কাছ থেকে উন্নতির উপায় সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করবে। নতুন বছরে যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে 'গেজেটে'র, আলোচনা করা উচিত সেগুলি হলঃ—

(১) জলনিষ্কাশন-ব্যবস্থা এবং বিদ্যাধরী (২) রাস্তার আলোর কন্ট্রাক্ট (৩) সংযোজিত এলাকাগুলির উন্নতিসাধন (৪) Motor Vehicles বিভাগ ও পৌর রেল-ব্যবস্থার পুনর্গঠন (৫) নির্বাচিত এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (৬) মহামারী প্রতিরোধ ও কলকাতার জন্য একটি সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল (৭) বস্তি-উন্নয়ন ও দরিদ্র মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ (৮) দুগ্ধ-সরবরাহ (৯) বার্ধক্যগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসালয় এবং ভিক্ষাবৃত্তির বিলোপ (১০) বেশ্যালয়গুলির প্রশ্ন (১১) পৌর মিউজিয়াম ও রিসার্চ ব্যুরো (১২) পৌর রঙ্গমঞ্চ (১৩) শহর-পরিকল্পনা এবং উন্নতিসাধনের পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য উন্নয়ন-কমিটি (১৪) ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সমস্যা।*

নভেম্বর ১১, ১৯২৫

সুভাষচন্দ্র বসু

*ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে মান্দালয় জেল থেকে পাঠানো বার্তা।

দেশের ডাক

দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী বিদেশীকে ভারতের বক্ষে প্রবেশের পথ দেখিয়েছিল। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে করতে হবে। বাঙ্গলার নরনারীকে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। কি উপায়ে এই কার্য সুসম্পন্ন হতে পারে এটাই বাঙ্গলার সর্বপ্রধান সমস্যা।

জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্তক মাহাত্মা গান্ধী অবাঙ্গালী হলেও এই আন্দোলন সম্পর্কীয় কাজ বাঙ্গলাদেশে যে রকম প্রসার লাভ করেছে, অন্য কোনও প্রদেশে সে রকম করেনি। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ দেখার পর আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে অগ্রণী না হলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে, স্বরাজ-সংগ্রামে বাঙ্গলার স্থান সর্বাগ্রে। আমার মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার গুরুভার প্রধানতঃ বাঙ্গালীকেই বহন করতে হবে। অনেকে দুঃখ করে থাকেন, বাঙ্গালী মারোয়াড়ী বা ভাটিয়া হলো না কেন? আমি কিন্তু প্রার্থনা করি, বাঙ্গালী যেন চিরকালই বাঙ্গালীই থাকে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ"। আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি। বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ। ভগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে, কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। অর্থের জন্য লালায়িত হয়ে যদি প্রাণের সম্পদ হারাতে হয় তবে অর্থে আমাদের প্রয়োজন নেই।

বাঙ্গালীকে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষ কেন—পৃথিবীতে, তার একটা স্থান আছে—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত গড়ে তুলতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প-কলা, শৌর্য-বীর্য, ক্রীড়া-নৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য—এই সবের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীকে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় (cultural synthesis) করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙ্গালীর আছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষা, দীক্ষা, স্বভাব-চরিত্র এই সবের মধ্যে বাঙ্গালীর সেই বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সবুজ শ্যামল ক্ষেত্র ও তালগাছঘেরা পুষ্করিণী—এই সবের মধ্যে কি একটা বৈশিষ্ট্য নাই? আর প্রকৃতি দেবীর এই বৈশিষ্ট্য কি বাঙ্গালীর চরিত্রে একটা বিশিষ্টতা প্রদান করেনি? এমন নরম মাটিতে জন্মেছে বলেই বাঙ্গালীর এমন সরল প্রাণ! প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে বলেই বাঙ্গালী সুন্দরের উপাসক হয়েছে। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির অন্নজল সেবন করেই বাঙ্গালী কাব্যে ও সাহিত্যে এমন অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশল দেখাতে পেরেছে।

গত দুই তিন বৎসর ধরে বাঙ্গলা দেশে যে জাগরণের বন্যা এসেছিল সে বন্যা এখন ভাঁটার দিকে চলেছে বটে, কিন্তু জোয়ারের আর বেশী বিলম্ব নাই। বাঙ্গলা দেশে জাতীয়-তার স্রোতে আবার প্রবল বন্যা আসবে। সে বন্যার স্পর্শে বাঙ্গলার প্রাণ আবার জেগে উঠবে। বাঙ্গালী সর্বস্ব পণ করে আবার স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠবে; দেশ আবার স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হবে।

এই নব জাগরণের স্বরূপ কি হবে তা' কে বলতে পারে? এই নব যজ্ঞের পুরোহিত কে হবে তা' কে বলতে পারে? যে ভাগ্যবান পুরুষ এই যজ্ঞের পৌরোহিত্য-ব্রত গ্রহণ করবেন তিনি এখন কোথায় বা কিরূপ সাধনায় মগ্ন আছেন তা' কে বলতে পারে? এই আন্দোলনের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধী গ্রহণ করবেন অথবা কোনও নূতন মনীষী তাঁর আসনে বসবেন—তা' আমরা জানি না।

এই সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য বসে থাকলে চলবে না। এই নব জাগরণের জন্য এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে হবে। ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, কর্ম, ত্যাগ, ভোগ—এই সবের মাঝখান দিয়ে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে—যাতে ডাক এলে আমরা সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত থাকব।

বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্ম-বলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার—তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ভগবান যদি করেন, তোমরা যদি শেষ পর্যন্ত জীবিত থাক—তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করতে পারবে। আর যদি স্বদেশসেবার পুণ্য প্রচেষ্টায় ইহ-লীলা সম্বরণ করতে হয়, তবে মৃত্যুর পর স্বর্গের দ্বার তোমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে। তোমরা যদি প্রকৃত বীর সন্তান হও তবে এগিয়ে এসো।

হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই ত দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। আজ এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের দিনে স্বাধীনতার বাণী যখন চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে তখন কি তোমরাই ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরাই ত চিরকাল "জীবনমৃত্যু"কে "পায়ের ভৃত্য" করে রেখেছ—তোমরাই ত সকল দেশে আত্মদানের পুণ্য ভিত্তির উপর জাতীয় মন্দির নির্মাণ করেছ—তোমরাই ত যাবতীয় দুঃখ অত্যাচার সানন্দে গ্রহণ করে প্রতিদানে সেবা ও ভক্তি অর্পণ করেছ। লাভের আকাঙ্ক্ষা তোমরা রাখনি, ভয় তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বীর সৈনিকের মত তোমরা হাসতে হাসতে মরণকে আলিঙ্গন করেছ। তোমাদের শৌর্য, বীর্য ও চরিত্রবল দেখে মাতা বসুন্ধরা তোমাদের শুভ্র ললাটে জয়টীকা পরিয়ে দিয়েছেন।

ওগো বাঙলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশ-সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজি আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। চারিদিকে মায়ের মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঐ যে পূর্বগগনে ভারতের ভাগ্যদেবতা তরুণ তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন। স্বাধীনতার পুণ্য আলোক পেয়ে চীন, জাপান, তুরস্ক, মিসর পর্যন্ত আজ জগৎ-সভায় উন্নতশিরে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমরা কি এখনও মোহবশে ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরা ওঠো, জাগো, আর বিলম্ব করলে চলবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী বণিককে গৃহপ্রবেশের পথ দেখিয়ে তোমাদের পূর্বপুরুষরা যে পাপ সঞ্চয় করে গেছেন, এই বিংশ শতাব্দীতে তোমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ভারতের নব-জাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছে। তাই বলছি, তোমরা সকলে এসো, ভ্রাতৃবন্ধনের "রাখি" পরিধান করে, মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা করো যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘুচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃতসর্বস্বা ভারত-লক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করবে।

১১ই পৌষ, ১৩৩২

দেশবন্ধু স্মৃতি

মান্দালয় জেল
২০।২।২৬

জনসাধারণের পাঠের জন্য স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু লেখার মত সাহস আমার হয় নাই। কখনও হইবে কি না জানি না। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ এত গভীর রকমের ছিল যে, অত্যন্ত অন্তরংগ ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাঁহার বিষয় কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না। অধিকন্তু তিনি এত বড় ছিলেন এবং আমার হিসাবে আমি এত ক্ষুদ্র যে আমার সর্বদা মনে হয় যে, তাঁহার প্রতিভা কত সর্বতোমুখী, হৃদয় কিরূপ উদার ও চরিত্র কত মহান্ ছিল তাহা আজ পর্যন্ত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এরূপ অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়, ক্ষীণ চিন্তাশক্তি ও দীন ভাষার সাহায্যে সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে ইচ্ছা ও সামর্থ্য না থাকিলেও বন্ধুর অনুরোধে অনেক কাজ এ জীবনে করিতে হয়—তাই আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে আমার এই প্রয়াস। দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষভাবে যতটুকু জানি এবং গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার জীবনের ও তাঁহার পুণ্যময় কর্মের গূঢ় অর্থ আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিতে গেলেও একটি পুস্তক হইয়া পড়িবে। অত কথা লিখিবার মত ক্ষমতা বা মনের অবস্থা আমার নাই, এই জন্য বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত আমি মাত্র কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

দেশবন্ধুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সকল কথা আমি অবগত নই। জীবনচরিতের মধ্যে যে সব কথা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় আমি জানি না। তাঁহার জীবনের মাত্র তিন বৎসর কাল আমি তাঁহার সংগে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেও চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম, কিন্তু চোখ থাকিতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি? বিশেষতঃ দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অন্ততঃ আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিবেন এবং তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মর্ত্যলোকের কর্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন না। দেশবন্ধু নিজের কোষ্ঠীকে খুব বিশ্বাস করিতেন। আমি অবিশ্বাসী হইলেও তাঁহার বিশ্বাস যে আমার মনের উপর সংক্রামক প্রভাব বিস্তার করে নাই, এ-কথা বলিতে পারি না। আমার যতদূর স্মরণ আছে তিনি বহুবার আমায় বলিয়াছেন যে, সমুদ্রপারে দুই বৎসর কারাবাস তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে। কারাবাসের অবসানে তিনি সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করিবেন; কর্তৃপক্ষের সহিত মিটমাট হইবে এবং তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইবেন ; তারপর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। সে সময়ে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সহিত সমুদ্রপারে যাইতে আমিও প্রস্তুত। সত্য কথা বলিতে কি, সমুদ্রপারে আসার পর তাঁহার কোষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে সর্বদা আশঙ্কা হইত—পাছে তাঁহাকেও আসিতে হয়, কিন্তু সে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা শতগুণে দারুণ দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার, তথা ভারতের ভাগ্যে ঘটিল।

*　　*　　*

দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। আরোগ্য লাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দুইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার বহরমপুর জেলে বদলী হইবার পূর্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধূলো লইয়া বলিলাম, "আপনার সংগে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না।" তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, আমি তোমাদের

শিগ্‌গির খালাস করে আনছি।" হায়, তখন কে জানিত যে, ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না? সেই সাক্ষাতের প্রত্যেক ঘটনাটি, প্রত্যেক দৃশ্যটি, প্রত্যেক ভাষাটি পর্যন্ত আমার মানসপটে চিত্রের ন্যায় আজও অঙ্কিত আছে এবং বোধ করি, চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার সেই শেষ স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কি, অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে; সুতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না। যাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। কত বিভিন্ন রকমের লোক তাঁহার হৃদয়ের টানে নিকটে আসিত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাঁহার প্রভাব ছিল! সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় এই বিপুল জনসমাজে তিনি চারিদিক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন। তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এরূপ কত দৃষ্টান্ত এখন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। যাহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অার তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত ছিলেন? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না—এ-কথা একশো বার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহার অনুচরবর্গ এবং তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহার আদেশে কি না করিতে পারেন? কোনও ত্যাগ, কোনও কষ্ট, কোনও পরিশ্রম কি তাহাদের বিচলিত করিতে পারিত? অবশ্য জীবনদানের পরীক্ষা কোনও দিন হয় নাই—কিন্তু সে কথা বাদ দিলে* বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার কাজ করিতে গিয়া সানন্দে সকলপ্রকার দুঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাতে গৌরব অনুভব করিয়াছিল। দেশবন্ধুও জানিতেন যে, তাঁহার অহিংসা-সংগ্রামে তাঁহার এমন কতকগুলি সৈনিক আছে যাহাদের উপর তিনি সর্বাবস্থায় নির্ভর করিতে পারেন। আজ আমি গর্বের সহিত বলিতে পারি দেশবন্ধুর পুণ্যজীবনের শেষদিবস পর্যন্ত তাঁহার শান্তিসেনা অটল অচলভাবে সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে দেশবন্ধুর সুসংযত, কর্তব্যপরায়ণ, নির্ভীক অনুচরবৃন্দকে দেখিয়া অনেক তথাকথিত জননায়ক ঈর্ষাপরায়ণ হইতেন, তাঁহারাও হয়তো মনে মনে ঐরূপ অনুচরবর্গ পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু মূল্য দিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। সহকর্মী বা অনুচরকে ভাল না বাসিতে পারিলে বিনিময়ে তাহার প্রাণ পাওয়া যায় না। সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁহার বাড়ী সাধারণের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বত্র—এমন কি তাঁহার শয়নপ্রকোষ্ঠেও সকলের গতিবিধি ছিল। তাঁহার অন্তরের এবং বাহিরের সম্পদের উপর সকলের দাবি ছিল। তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালবাসিতেন তাহা নয়, তাঁহাদের জন্য লাঞ্ছনা সহিতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁহার একজন নিকটআত্মীয় তাঁহার কোনও সহকর্মীর দোষ ও ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "I hate him"—আমি তাকে ঘৃণা করি। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, "আমার মুস্কিল এই যে আমি তাকে ঘৃণা করিতে পারি না।" ইহা ব্যতীত বহিরঙ্গ লোকদের সহিত তাঁহার সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে অনেক ঝগড়া-বিবাদ করিতে হইত। এইরূপ বিবাদের সময় আমি স্বয়ং কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার অনুচরবর্গের প্রতি তাঁহার কত গভীর বেদনা, তাহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার কত লাঞ্ছনা!

যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন না তাঁহারা দেশবন্ধুর সঙ্ঘ গঠনের অপূর্ব শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন—হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। আমি এস্থলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তিনি যে পর্বতের ন্যায় অটল সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের

---

*তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে ও কংগ্রেসের কাজ করিতে করিতে কয়েকজনের দেহত্যাগও ঘটিয়াছিল।

মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষ-গুণ-নির্বিশেষে, ভালবাসিবার ক্ষমতার সাহায্যে এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও রুচির লোকদিগকে একত্র চালাইতে পারিতেন। তাঁহার দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন অথবা তাঁহার মত পোষণ করেন না এরূপ বহুলোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

অনেক তথাকথিত জননায়ক স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধুর অনুচরবর্গ বা সহকর্মীগণ দাসত্বপরায়ণ ছিলেন। দেশবন্ধুর মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা কখনও উপস্থিত ছিলেন তাঁহার এ-কথা আদৌ সমর্থন করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আলোচনা ও পরামর্শের সময়ে যাহারা নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিল, তাহাদিগকে আমি কি করিয়া দাসত্বপরায়ণ বলি? অধিকন্তু আলোচনার সময় নায়কের সহিত অনুচরবর্গের প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হইত, দেশবন্ধু আলোচনার সময় কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টবাদীর উপর তিনি কোনও দিন মনে মনে বিরক্ত হইতেন না। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল যে, যাহারা বেশী আপত্তি তুলিত তাহাদের কথা তিনি বেশী শুনিতেন। তবে এ কথা সত্য যে, মতভেদ হইলেও তাঁহার অনুচরেরা অসংযত বা উচ্ছৃঙ্খল হইত না অথবা নেতার উপর আক্রোশ-বশতঃ প্রকাশ্যে গালাগালি করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিত না। দেশবন্ধুর সঙ্ঘের প্রধান নিয়ম ছিল সংযম ও শৃঙ্খলা। পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিতে পারে কিন্তু ভোটের দ্বারা একবার কর্তব্য স্থির হইয়া গেলে সেই পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। সঙ্ঘের নিয়মানুবর্তী হওয়ার শিক্ষা এই পবিত্র ভারতভূমিতে নূতন নয়। ২৫০০ বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধ সর্বপ্রথমে ভারতবাসীকে এই শিক্ষা দিয়া থাকেন—

(ব্রহ্ম ভাষায়)
বৌঢান্দরণ গিম্‌সামি (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি)
ঢম্মান্দরণ গিম্‌সামি (ধম্মং শরণং গচ্ছামি)
তঙ্গান্দরণ গিম্‌সামি (সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি)

বস্তুতঃ, কি ধর্মপ্রচার, কি স্বদেশ-সেবা—সঙ্ঘ ও সঙ্ঘানুবর্তিতা ভিন্ন কোনও মহান্‌ কাজ এ জগতে সম্ভব নয়।

আর একটি অভিযোগ আমি শুনিয়াছি—রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া দেশবন্ধুকে নাকি শিক্ষাদীক্ষা হিসাবে নিম্নস্তরের লোকদিগের সাহচর্য করিতে হইত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত যে সকল কর্মীর সংস্পর্শে দেশবন্ধু আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতেন কি না আমি জানি না। কথাবার্তায় তিনি সেরূপ ভাব কখনও প্রকাশ করেন নাই। হইতে পারে যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না বলিয়া এবং তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ তিনি অন্তরের ভাব গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁহার কারামুক্তির পর কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য সভা করেন। অভিনন্দনপত্রে দেশবন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভক্তি ও ভালবাসার অর্ঘ্য যখন তাঁহার নিকট নিবেদিত হইল তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ছিলেন চির-নবীন চির-তরুণ; তাই তরুণের বাণী তাঁহার মরমে গিয়া আঘাত করিত। তিনি যখন সভায় অভিনন্দন-পত্রের উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে! নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বেশীদূর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। নির্বাক্‌ নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দুই গণ্ড বহিয়া পবিত্র অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।

যাহাদের জন্য তাঁহার এত সমবেদনা, যাহাদের প্রতি তাঁহার এত ভালবাসা তাহাদিগকে তিনি কি করিয়া নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতে পারেন তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

অবশ্য যাঁহারা দেশবন্ধুর কাজ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি অথবা আভিজাত্যের গর্ব নাই। আশা করি বিনয়রূপ পরম সম্পদ তাঁহারা কোনও দিন হারাইবেন না।

দেশবন্ধুর শেষ পত্র আমি পাই পাটনা হইতে, সে পত্র আজ সুদূর ব্রহ্মদেশে আমার নিকট তাঁহার অমূল্য শেষ স্মৃতি-চিহ্ন। তাঁহার সহকর্মী ও অনুচরদের গ্রেপ্তারের পর তিনি যেরূপ যন্ত্রণায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন সেই পত্রে ছিল। সে

যন্ত্রণা যে কত তীব্র তা শুধু তিনিই বুঝিতে পারেন যিনি তাঁহার প্রাণের পরিচয় পাইয়াছেন।

১৯২১ ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধুর সহিত আটমাস কাল কারাগারে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুই মাস কাল আমরা পাশাপাশি "সেলে" (ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে) প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম এবং বাকী ছয় মাস কাল আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের একটি বড় ঘরে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহার সেবার ভার কতকটা আমার উপর ছিল। আলিপুর জেলে শেষ কয়েক মাস তাঁহার একবেলার রান্নাও আমাদিগকে করিতে হইত। গভর্নমেন্টের কৃপায় আমি যে আট মাস কাল তাঁহার সেবা করিবার অধিকার ও সুযোগ পাইয়াছিলাম—ইহা আমার পক্ষে চরম গৌরবের বিষয়। ১৯২১ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আমি মাত্র ৩।৪ মাস কাল তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিলাম। সুতরাং সেই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ভাল রকম বুঝিবার সুবিধা আমার হয় নাই। তারপর যখন আট মাস কাল একত্রে বাস করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটিল তখন খাঁটি মানুষকে আমি চিনিতে পারিলাম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'familiarity breeds contempt'—বেশী ঘনিষ্ঠতা হইলে নাকি অশ্রদ্ধা জন্মায়, কিন্তু দেশবন্ধু সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শত-গুণে বাড়িয়াছে। এ-কথা বোধ হয় অন্যান্য সকলেই সমর্থন করিবেন।

দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রসিকতার অফুরন্ত ভান্ডার ছিলেন এ-কথা আমি জেলখানায় ভাল রকম বুঝিতে পারি। কত রকমের রসিকতার দ্বারা তিনি দিনের পর দিন সকলকে আমোদিত করিয়া রাখিতেন! প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের পাহারার জন্য সঙ্গীন-ধারী গুর্খা সৈনিক নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন গুর্খা সৈনিকের পরিবর্তে একজন রুলধারী হিন্দুস্থানী সিপাহী উপস্থিত। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি হে সুভাষচন্দ্র, শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশী; আমরা কি এতই নিরীহ!" তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া অথবা ভাবিয়া চিন্তিয়া রসিকতা করিতে হইত না। পর্বত-নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার রসিকতা আপনার প্রেরণায় আপনি ছুটিত। আমি তাঁহার এই গুণের বিশেষ উল্লেখ করিলাম তার কারণ এই যে, জাতি হিসাবে আধুনিক বাঙ্গালীর মধ্যে রসের বোধ কিছু কম! আমি অন্যান্য বিদেশীয় জাতিদের সহিত তুলনা করিয়া এ-কথা বলিতেছি; হইতে পারে ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা এখনও বাঙ্গালীর রসবোধ বেশী।

রসবোধ থাকিলে মানুষ প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে সহজে কাতর হয় না, সর্বা-বস্থায়ই মজা লুটিতে পারে। জেলখানার একঘেয়ে জীবনের আবর্তে পড়িলে এ-কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝা যায়। দেশবন্ধুর রসিকতা এত সহজ ও অনাবিল ছিল যে, বয়সের তারতম্য অথবা আমাদের সম্বন্ধের দরুন আমরা কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতাম না।

ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার গভীর পান্ডিত্য ছিল এবং ইংরাজ কবিদের মধ্যে তিনি ব্রাউনিং-এর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ব্রাউনিং-এর অনেক কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তথাপি কারাগৃহে ব্রাউনিং-এর কবিতাগুলি তিনি বারংবার পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। দৈনন্দিন কথাবার্তা ও রসিকতার মধ্যে তিনি সাহিত্য হইতে এত কথা উদ্ধার করিতেন যে, নিজে ভাষ্য করিয়া না দিলে আমার পক্ষে সময়ে সময়ে রসবোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তিনি মানুষের নাম ভাল মনে রাখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে যে তাঁর অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সাহিত্যের অবতারণা করিয়া তিনি যেরূপ সাহিত্যকে সজীব করিয়া সর্বসাধারণের উপ-ভোগের বস্তু করিতে পারিতেন, এরূপ আর কয়জন সাহিত্যিক করিতে পারিতেন বা পারেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।

তাঁহার কোনও আত্মীয়ের জন্য দেশবন্ধু একসময়ে শতকরা ৯৲ সুদ হিসাবে দশ হাজার টাকা ধার করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা শোধ দিতে পারেন নাই বলিয়া উত্তমর্ণের এটর্নি খত পরিবর্তন করিবার জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। দেশবন্ধু তখন আলিপুর জেলে এবং আমরা তাঁহার নিকটেই। তাঁহার পুত্র চিররঞ্জনও সেখানে ছিলেন; তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, এই ঋণের কথা পরিবারবর্গের মধ্যে আর কেহ ইতিপূর্বে জানিতেন না। যে আত্মীয়ের জন্য টাকা ধার করা হইয়াছিল, খত পরিবর্তনের সময়ে তিনি লক্ষপতি। কিন্তু দেশবন্ধু দ্বিরুক্তি না করিয়া নূতন খতে দস্তখত করিয়া দিলেন। স্ত্রী, পুত্র কিংবা অন্য কোন আত্মীয়কে না জানাইয়া এইরূপ ঋণ করিয়া তিনি অপরের সাহায্য করিয়া দিতেন।

দেশবন্ধুর নিন্দা ও কুৎসা না করিয়া যাঁহারা জলগ্রহণ করেন না এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি বিপদের সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে। এই জাতীয় কোন ভদ্র-

লোক এক সময়ে দুই শত টাকার দাবি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন—আমার তহবিলে মাত্র ছয় শত টাকা আছে, আমি কি করিয়া দুই শত টাকা দিই। ভদ্রলোকটি জিদ করিলেন—তিনিও বিলম্ব না করিয়া দুই শত টাকা তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। এই ব্যাপারটা দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর ঘটিয়াছিল।

যে আট মাস কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও অনুভূতি জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি কোনও দিন কোনও কাজে অথবা কোনও কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্যন্ত পাই নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার শত্রু অনেক ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের কথা জানিতেনও। কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না—এমন কি প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

কারাগারে দেশবন্ধু অধিকাংশ সময়ে অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক নূতন পুস্তক আনাইয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু সময়ের সংকীর্ণতার দরুন তিনি জেলখানায় থাকিতে পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্বার কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল বলিয়া তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার আরব্ধ কাজ শেষ করিতে পারেন নাই। সে সময়ে রাজনীতি ও জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই মতের অনুকরণ বা অনুসরণ পছন্দ করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের জাতীয়তা শিক্ষা ও জাতির প্রয়োজন হইতে আমাদের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ হইবে। এই জন্য তিনি বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন না এবং তিনি এ বিষয়ে কার্ল মার্কসের বিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে, ভারতের সকল ধর্ম-সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিপত্রের (pact) সাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে এবং জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে। অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে, চুক্তিপত্রের সাহায্যে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, কারণ উহা সমবেদনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, দর কষাকষির উপর নির্ভর করে না। দেশবন্ধু ইহার উত্তরে বলিতেন যে, আপসে মিটমাট না করিয়া লইতে পারিলে মানুষ একদিনও এ সংসারে বাঁচিতে পারে না এবং মনুষ্য-সমাজও একদিনও টিকিতে পারে না। কি পরিবারে, কি বন্ধুমহলে, কি সমাজ-জীবনে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে আপসে মিটমাট সাধিত না হইলে মানুষের পক্ষে একত্র বাস করাই অসম্ভব। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলে শুধু চুক্তিপত্রের উপর, তাহার মধ্যে ভালবাসার নাম গন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মত ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না—অথচ সেই দেশবন্ধুই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালবাসিতেন যে, তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। এই জন্য তিনি ইসলামকে ভালবাসিতে পারিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কয়জন হিন্দু-নায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা মুসলমানকে আদৌ ঘৃণা করেন না? কয়জন মুসলমান জননায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা হিন্দুকে ঘৃণা করেন না? দেশবন্ধু ধর্মমত হিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল। চুক্তিপত্রের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে, শুধু তাঁহারই দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা জাগরিত হইবে। তাই তিনি শিক্ষার (culture) দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন। হিন্দু শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষার (culture) মধ্যে কোথাও মিল পাওয়া যায় কি না এ বিষয়ে কারাগারে মৌলানা আক্রাম খাঁর সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত। আমার যতদূর স্মরণ আছে হিন্দু-মুসলমানের "শিক্ষার মিলনের" বিষয়ে মৌলানা সাহেব পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিতে রাজী হইয়াছিলেন।

ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য, এ-কথা যেরূপ দেশবন্ধু জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। "স্বরাজ জন-

সাধারণের জন্য" এ-কথা পৃথিবীতে নূতন নয়। ইউরোপে বহুকাল পূর্বেও এই মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এ-কথা নূতন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু স্বামীজির সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিধ্বনি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা যায় নাই।

তাঁহার কারামুক্তির পর হইতে দেহত্যাগ পর্যন্ত দেশবন্ধু যে সব কথা প্রচার করিয়াছিলেন সে সব বিষয়ে তিনি তাঁহার কারাবাসের সময়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে সে সকল বিষয়ে আমাদের সহিত আলোচনা হইত। কাউন্সিল প্রবেশের কথা তিনি সেখানেই স্থির করিয়াছিলেন এবং বহু তর্কের পর আমরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করি। কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব লইয়া তখন জেলখানার মধ্যে খুব দলাদলিও হইয়াছিল। দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্পও আমরা সকলে জেলখানায় করি। তবে দুঃখের বিষয়, তাঁহার কতকগুলি মহৎ সঙ্কল্প আজও কাজে পরিণত হয় নাই।

জেলখানার আর একটি ঘটনার উল্লেখ আমি এস্থলে না করিয়া পারি না—কয়েদীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা। আমরা যে সময়ে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হই, সে সময়ে আলিপুর জেলে আমাদের ওয়ার্ডে (ward) মথুর নামে একজন কয়েদী কাজ করিত। জেলের ভাষায় যাহাকে বলে "পুরানা চোর", মথুর তাহাই ছিল। তাহাকে বোধ হয় চোর বলিলে অন্যায় হয়, সে ছিল ডাকাত। আট দশ বার সে জেলখানায় ঘুরিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ডাকাতদের ন্যায়ই তাহার অন্তঃকরণ ছিল খুব সরল। কিছুদিন কাজকর্ম করিবার পর দেশবন্ধুর উপর মথুরের ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিল—সে তাঁহাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মথুরের প্রতিও দেশবন্ধুর সমবেদনা ও ভালবাসা জাগরিত হইল। ক্রমশঃ সে আমাদের সকলের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। রাত্রে অথবা দিনের বেলায় তাঁহার পা টিপিবার সময়ে মথুর তাহার জীবনের সকল ইতিহাস তাঁহাকে বলিত। মুক্তির সময় নিকটবর্তী হইলে দেশবন্ধু তাহাকে বলিলেন যে, তাহার খালাসের পর তিনি তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিবেন, যেন সে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া পুনরায় ডাকাতিতে মন না দেয়। মথুরও এই প্রস্তাবে যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং সে সঙ্কল্প করিল যে, অতঃপর সে অসৎ কাজ ও অসৎ সঙ্গ ছাড়িয়া দিবে।

মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠাইয়া তাহাকে জেলখানা হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসেন। তারপর প্রায় তিন বৎসর কাল মথুর তাঁহার নিকট ছিল। তাঁহার পরিচারক হইয়া সে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়াছে। দাগী চোর বলিয়া থানার পুলিশ কিছু কাল তার পশ্চাতে ঘুরিয়াছিল।—তারপর যখন দেখিল সে বাস্তবিকই দেশবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল। জমাদার তাহাকে দেখিলে প্রায়ই বলিত, "তুই বেটা মানুষ হয়ে গেলি!" আমার খুব ভরসা ছিল মথুরের আর পতন হইবে না, কিন্তু দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর পত্রদ্বারা যখন মথুরের খবর পাইলাম তখন শুনিলাম সে ইতিপূর্বে তাঁহার দার্জিলিং বাসের সময় রসা রোডের বাড়ী হইতে অনেকগুলি রূপার জিনিসপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এ অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমার Les Miserable-এর কথা মনে পড়িল। আমার এখনও বিশ্বাস যে, মথুর তাঁর সঙ্গে থাকিলে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের দরুন লোভের বশীভূত হইত না। ক্ষণিক দুর্বলতার বশে সে চুরি করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি জীবিত থাকিলে সে কোন দিন কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িত। এখন তাহার কি অবস্থা হইবে তাহা ভগবানই জানেন।

মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিস্টার, উদার প্রেমিক, পরম-বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিগ্বিজয়ী বীর হইতে পারে—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ সকলের মনে উদয় হয়। আমি নৃ-তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি—কৃতকার্য হইয়াছি কি না জানি না। আর্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটি জাতির রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকগুলি গুণ বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে, সুতরাং রক্তের সংমিশ্রণ হইলে গুণের সংমিশ্রণও হইয়া থাকে। রক্ত-সংমিশ্রণের ফলেই বাঙ্গালীর প্রতিভা এমন সর্বতোমুখী এবং বাঙ্গালীর জীবন এত বৈচিত্র্যপূর্ণ, আর্যের ধর্মপ্রবণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিদ্যা ও ভক্তিমত্তা এবং মঙ্গোলের বুদ্ধিকৌশল, অনুচিকীর্ষা ও বাস্তববাদ বাঙ্গলার সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে। বাঙ্গালী যে একসঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও ভাবুক, মায়াবাদবিদ্বেষী ও আদর্শবাদী, অনুকরণপ্রিয় ও সৃষ্টিক্ষম তাহা এই রক্তসংমিশ্রণের ফল। যে জাতির রক্ত কাহারও ধমনীতে প্রবাহিত হয় সে জাতির গুণ ও শিক্ষা (culture) জন্মের সময়ে সংস্কাররূপে তাহার চিত্তের মধ্যে

স্থান পায়। বাঙ্গালী যেরূপ এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে বাঙ্গলার শিক্ষাও (culture) তদ্রূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গলার ইতিহাস ও সাহিত্যের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তিনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গলার সভ্যতা আর্য-সভ্যতা হইলেও তাহা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। স্বামী দয়ানন্দ উত্তরভারত জয় করিয়া আর্যসমাজ আন্দোলন চালাইতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বাঙ্গলা দেশে আমল পাইলেন না কেন? আর কালীর ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সহস্র সহস্র শিক্ষিত বাঙ্গালী কেন এত ভক্তি করে বা অনুকরণ করে? বাঙ্গলায় দায়ভাগের প্রচলন কেন? বৌদ্ধধর্ম সর্বত্র বিতাড়িত হইলে অবশেষে বাঙ্গলা দেশে কেন শেষ আশ্রয় পাইল? বাঙ্গলা দেশে কেন নব্যন্যায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল? বাঙ্গলা শঙ্করের মায়াবাদ গ্রহণ করে নাই কেন? বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গলা দেশ হইতে বিতাড়িত হইলে শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের কেন সৃষ্টি হইল? এই সব প্রশ্ন তুলিলেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর শিক্ষাদীক্ষার একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গলার শিক্ষার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—(১) তন্ত্র, (২) বৈষ্ণব ধর্ম, (৩) নব্যন্যায় ও রঘুনন্দনের স্মৃতি। ন্যায় ও স্মৃতির দিক দিয়া আর্যাবর্তের সহিত বাঙ্গলার নাড়ীর সংযোগ আছে। বৈষ্ণবধর্মের দিক দিয়া দাক্ষিণাত্যের সহিত বাঙ্গলার প্রাণের সংযোগ আছে। তন্ত্রের দিক দিয়া তিব্বতীয়, ব্রহ্মদেশীয় ও হিমালয় প্রান্তবাসী জাতিদের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ আছে।

ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন বাঙ্গালীকে তার্কিক ও নৈয়ায়িক-প্রকৃতি করিয়াছে। এই প্রকৃতি দেশবন্ধুর চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে বড় ব্যারিস্টার করিয়া তুলিয়াছিল। কি নৈয়ায়িক, কি ব্যবহারজীবী উভয়েরই চুল-চেরা তর্ক লইয়া কারবার। দেশবন্ধু প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না আমি জানি না—তবে পাশ্চাত্ত্য ন্যায়শাস্ত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। খুব বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ন্যায় তিনি চুল-চেরা তর্ক করিতে পারিতেন এবং অবিরাম বাক্যস্রোতের দ্বারা শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। দুই তিন শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে বড় নৈয়ায়িক হইতেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ধর্ম ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে টানিয়া লইয়া নীরস বেদান্তের ভিতর দিয়া প্রেমমার্গে লইয়া গিয়াছিল, দার্শনিক মত হিসাবে তিনি অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদকে সবচেয়ে খাঁটি মত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অনেক বিষয়ে সন্ন্যাসীর মত হইলেও সন্ন্যাস তাঁহার ধর্ম ছিল না। ভগবান যেরূপ সত্য তাঁহার লীলাও তদ্রূপ সত্য; ব্রহ্ম সত্য বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয়। অতএব ভগবানকে পাইতে হইলে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এ সব বর্জন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ভগবানের লীলা অনন্ত; সে লীলার রঙ্গমঞ্চ শুধু বহির্জগতে নয়, মানুষের অন্তরেও। মনুষ্য-হৃদয় নিত্যবৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে জীবের সহিত ভগবানের, রাধার সহিত কৃষ্ণের অনন্ত লীলা চলিয়াছে। তিনি রসময়; তাই সকল রসের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। এরূপ মত যিনি পোষণ করেন তিনি যে নৈতিমার্গ হইতে পারেন না—এ কথা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ দেশবন্ধু বিশ্ব-সংসারকে, তথা মনুষ্য জীবনকে, পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সাহায্যে যে জীবনের সকল প্রকার বিরোধ দূর হইয়া যায় এবং সর্বত্র সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়—এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাই বৈষ্ণব-ধর্ম হইয়াছিল তাঁহার জীবনের শেষ আশ্রয়। তিনি কথাবার্তায় এবং বক্তৃতায় প্রায়ই বলিতেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম—এ সব আলাদা করিয়া দেখিলে চলিবে না, পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে এবং একটিকেও বাদ দিলে জীবন পূর্ণ হইবে না।

যে দার্শনিকতত্ত্ব তাঁহার ধর্মরাজ্যের সকল বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছিল তাহার বাস্তব-রূপ প্রেমের মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে সকলের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনে সামঞ্জস্য (synthesis) লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ম-ক্ষেত্রে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের মধ্যে কোনও প্রকার গোঁজামিল ছিল না বলিয়া তিনি অপরের মধ্যে বিরোধ বা গোঁজামিল সহ্য করিতে পারিতেন না।

জেলখানার আলোচনার মধ্যে তাঁহার নির্বিচার বদান্যতার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "দেখ, তোমরা মনে করিবে আমি নিতান্ত বোকা; লোকে আমাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু আমি সব বুঝিতে পারি, আমার কাজ দিয়ে যাওয়া, তাই

আমি দিয়ে যাই। বিচার করবার ভার যাঁর উপর তিনি বিচার করবেন।"

যে তন্ত্রের উপদেশে বাঙ্গালী শক্তিপূজা শিখিয়াছে সেই তন্ত্রের প্রভাবে দেশবন্ধু অসাধারণ তেজস্বী বীর হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু অবশ্য কোনও দিন তান্ত্রিক সাধনা করেন নাই, অন্ততঃ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু কুলাচার, বীরাচার, চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি সাধনা না করিলে যে শক্তিমান হওয়া যায় না—এ-কথা আমি স্বীকার করি না। তন্ত্রের সার কথা শক্তিপূজা। জগতের মূল সত্য আদ্যাশক্তি, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সেই আদ্যাশক্তিকে সাধক মাতৃরূপে আরাধনা ও পূজা করিয়া থাকে; বাঙ্গালীর উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব খুব বেশী বলিয়া বাঙ্গালী জাতিহিসাবে মায়ের অনুরক্ত এবং ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিতে ভালবাসে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও ধর্মাবলম্বীরা (যথা ইহুদি, আরব, খৃষ্টান) ভগবানকে পিতৃরূপে আরাধনা করিয়া থাকে। ভগিনী নিবেদিতার মতে যে সমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের প্রাধান্য, সেখানে ভগবানকে লোকে পিতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। অপর দিকে যে সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য, সেখানে লোকে ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালী যে ভগবানকে—শুধু ভগবানকে কেন, বাঙ্গলা দেশকে এবং ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে ভালবাসে—এ কথা সর্বজনবিদিত। দেশকে আমরা মাতৃভূমি কল্পনা করিয়া থাকি, মাতৃভূমির ইংরেজী তর্জমা—father land, আমরা অবশ্য mother land কথাটি চালাইয়া থাকি কিন্তু ইংরেজী ভাষার দিক হইতে তাহা শুদ্ধ নয়।

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে মাতৃভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাহিয়াছিলেন—

"যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ"

এবং রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছিলেন—

"ও আমার জন্মভূমি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

তখন তাঁহারা তন্ত্রোপদিষ্ট মাতৃরূপের প্রভাবই দেখাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু মাতৃরূপের অনুরাগী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তাঁহার মাতৃভক্তির কথা অনেকেই জানেন। আলিপুর জেলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমাদিগকে প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতেন। বঙ্কিম-লিখিত মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত তাঁহার মাতৃভক্তি কত গভীর। তাঁহার "নারায়ণ" পত্রিকায় বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইত, শাক্ত ধর্মেরও সেইরূপ অনুশীলন হইত। দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ "নারায়ণে" প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

দেশবন্ধুর ব্যবহারিক জীবনেও আমরা তন্ত্রের প্রভাব দেখিতে পাই। পারিবারিক জীবনে দেশবন্ধুর মাতৃভক্তির কথা অনেকে জানেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষায় ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় যে বিশ্বাস করিতেন, একথাও সর্বজনবিদিত। শঙ্করপন্থীদের উপদেশ "নারী নরকস্য দ্বারম্"—এ কথা তিনি আদৌ স্বীকার করিতেন না। বস্তুতঃ চিন্তাজগতে ও কর্মজীবনে তন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার সভ্যতা ও শিক্ষার সার সঙ্কলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন।

তাঁহার গুণ বাঙ্গালীর গুণ, তাঁহার দোষ বাঙ্গালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় গৌরব ছিল যে, তিনি বাঙ্গালী। তাই বাঙ্গালী জাতিও তাঁহাকে এত ভালবাসিত। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, বাঙ্গালীর দোষগুণ লইয়াই বাঙ্গালী—বাঙ্গালী। কেহ বাঙ্গালীকে ভাবপ্রবণ বলিয়া ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করিলে তিনি ব্যথিত হইতেন—তিনি বলিতেন—আমরা ভাবপ্রবণ ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। তার জন্য লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

বাঙ্গলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গলার প্রকৃতিরূপে, বাঙ্গলার সাহিত্যে, বাঙ্গলার গীতি-কবিতায়, বাঙ্গালীর চরিত্রে যে সে বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—এ কথা দেশবন্ধু যেরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে সেরূপ আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। অবশ্য এ ভাব তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। বঙ্কিম,

ভূদেব প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ এই ভাবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সাহিত্য ও শিক্ষার দিক দিয়া যে বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন দেশবন্ধু তাহা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য, দেশবন্ধু যেরূপ গভীরভাবে এই চিন্তার ধারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, "নারায়ণ" পত্রিকার ভিতর দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে তিনি এই ভাবের প্রচারের জন্য এবং তদ্বিষয়ে মৌলিক গবেষণার সহায়তার নিমিত্ত এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিতে পারি যে, বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি তাঁহার মুখের বাণী ও লেখা হইতে শিখিয়াছি।

মনুষ্য জাতির শিক্ষা (culture) এক, না বহু—এ প্রশ্ন অনেকে তুলিয়াছেন। কেহ বলেন যে, শিক্ষার মধ্যে ভেদ নাই—শিক্ষা একই—তাঁহারা অদ্বৈতবাদী। অপরে বলেন যে, শিক্ষার মধ্যেও জাতি আছে, অতএব শিক্ষা বহু—তাঁহারা দ্বৈতবাদী। দেশবন্ধু কিন্তু ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। শিক্ষা বহু বটে, একও বটে। মূলতঃ যদিও মনুষ্য জাতির শিক্ষা এক—তথাপি সেই একের বিকাশ বহুর মধ্য দিয়া, বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া। উদ্যানে যেরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ থাকে এবং সেই সকল বৃক্ষে বিভিন্ন রকমের ফুল ফুটিয়া থাকে, মানবসমাজের মধ্যেও তদ্রূপ নানাপ্রকার শিক্ষা (culture) বিকাশলাভ করে। এই সকল পুষ্প ও বৃক্ষ লইয়া যেরূপ একটা উদ্যানের সত্তা, বিভিন্ন শিক্ষার সমাবেশে সেরূপ মনুষ্য জাতির শিক্ষা। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিক্ষার বিকাশ সাধন করিলে তার ফলে বিশ্বমানবের শিক্ষা পরিপুষ্ট হয়। জাতীয় শিক্ষাকে বর্জন করিয়া অথবা অবহেলা করিয়া বিশ্বমানবের সেবা সম্ভবপর হয় না। দেশবন্ধুর স্বদেশপ্রেমের পরিণতি বিশ্বপ্রেমে; কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমকে বাদ দিয়া বিশ্বপ্রেমিক হইবার প্রয়াস পান নাই। অপর দিকে তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে আত্যন্তিক স্বার্থপরতার দিকে লইয়া যাইতে পারে নাই।

দেশবন্ধু তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে বাঙ্গালীকে ভুলিয়া যাইতেন না। অথবা বাঙ্গলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিতেন না। তিনি বাঙ্গলাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা বাঙ্গলার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গলার বাহিরে তাঁহার যে সকল সহকর্মী ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসিবার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-দেশে তিনি তিলক মহারাজের ন্যায় ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণও তাঁহার নিকট তদনুরূপ ভালবাসা ও সহানুভূতি পাইতেন।

দেশবন্ধু বলিতেন, বাঙ্গলাকে স্বরাজ আন্দোলনে অগ্রণী হইতে হইবে। ১৯২০ খৃঃ বাঙ্গলা স্বরাজ আন্দোলনের নেতৃত্ব হারাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গলা আবার ১৯২৩ খৃঃ নেতৃত্ব ফিরিয়া পায়। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে, কবে ফিরিয়া পাইবে ভগবানই জানেন।

আর একটি কথা দেশবন্ধু প্রায়ই বলিতেন—ভারতবর্ষের কোনও আন্দোলন বাঙ্গলা দেশে চালাইতে হইলে তার উপর বাঙ্গলার ছাপ দিয়া লইতে হইবে। তিনি বলিতেন যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন বাঙ্গলায় চালাইতে হইলে আগে বাঙ্গলার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বাস্তব জীবনের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহারা এই মত সমর্থন না করিয়া পারিবেন না।

জনসাধারণের উপর, এমন কি তথাকথিত বড়লোকদের উপরও দেশবন্ধুর আশ্চর্য প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহার প্রভাবের কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যখন যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন তখন তাহা সাধন করিয়াছেন। "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্‌ শরীরং বা পাতয়েয়ম্‌"।—এই বাণী তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে গাঁথা ছিল। দুর্বার বিক্রমে যখন যে পথে চলিতেন কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারিত না। সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলরাশির ন্যায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার বেগে আপন আদর্শের পানে ছুটিতেন। প্রিয়জনের আর্তনাদ অথবা অনুচরবর্গের সাবধানবাণীও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিত না। এই দিব্যশক্তি দেশবন্ধু কোথা হইতে পাইলেন ? সে শক্তি কি সাধনার দ্বারা লভ্য ?

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, দেশবন্ধু শক্তির সাধক হইলেও তিনি তন্ত্রমতে শক্তির সাধনা করেন নাই। তাঁহার প্রাণ ছিল বড়; আকাঙ্ক্ষা ছিল বড়। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"—এই কথা যেন তাঁহার অন্তরের বাণী ছিল। তিনি যখন যাহা চাহিতেন—সমস্ত প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়া চাহিতেন। তাহা পাইবার জন্য একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। পর্বতপ্রমাণ অন্তরায়ও তাঁহাকে ভীত বা পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না। নেপোলিয়ান

বোনাপার্ট যেরূপ এক সময়ে তাঁহার সম্মুখে আল্পস্ (Alps) পাহাড় দেখিয়া বলিয়াছিলেন —"There shall be no Alps"—আমার সম্মুখে আল্পস্ পাহাড় দাঁড়াইতে পারিবে না— তিনিও সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। কি সম্বল লইয়া তিনি "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা প্রকাশে ও কাউন্সিল-জয়ের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ যিনি জানেন তিনিই এই উক্তি সমর্থন করিবেন। আমরা কোনও প্রকার অসুবিধা বা বাধার কথা তুলিলে তিনি ধমক দিয়া বলিতেন—তোমরা একেবারে নির্ভরসা (তোমরা pessimist)। আমারও কাজ ছিল যেখানে কোন বিপদ বা অসুবিধার আশঙ্কা—সেই কথাটি তুলিয়া ধরা, তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন—"you young old men"—ওহে অকাল-বৃদ্ধ যুবকবৃন্দ। যাঁহারা মনে করেন যে, দেশবন্ধু মদরত প্রকৃতির ছিলেন এবং যুবকদের পাল্লায় পড়িয়া তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চরমপন্থীর ন্যায় কাজ করিতেন—তাঁহারা তাঁহার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন চির-নবীন—চির-তরুণ—তিনি তরুণদের আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিতেন; তাহাদের সুখদুঃখের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন। তিনি তরুণদের সঙ্গ ভালবাসিতেন—তাই তরুণরাও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়িতে চাহিত না। এই সব কারণে আমি পূর্বে দেশবন্ধুকে "তরুণের রাজা" বলিয়াছি।

তাঁহার ত্যাগ, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিকৌশল (tact) প্রভৃতি গুণের কথা দেশবাসী অবগত আছেন—সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের আর একটি কারণ বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। সে কারণের উল্লেখ ইতিপূর্বে আমি কতকটা পাইয়াছি। তিনি সর্বদা অনুভব করিতেন যে, যখন যাহা তিনি করেন তাহা তাঁহার ধর্মজীবনের অঙ্গ-স্বরূপ। বৈষ্ণব-ধর্মের সাহায্যে তিনি বাস্তবজীবন ও আদর্শের মধ্যে একটা মধুর সামঞ্জস্য (synthesis) স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সামঞ্জস্যবোধ ক্রমশঃ ওতপোতভাবে তাঁহার প্রাণ-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি এই অনুভূতির ফলে নিজেকে ভগবানের অনন্ত-লীলার যন্ত্রস্বরূপ মনে করিতেন। নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে মানুষের "অহং কর্তা" এই জ্ঞান লোপ পাইয়া আসে। অহংকার লোপ পাইলে মানুষ দিব্য শক্তির আধারে পরিণত হয়। তখন তাঁহার শক্তির নিকট সাধারণ মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। দেশ-বন্ধুর হইয়াছিল তাহাই; তাঁহার জীবনের শেষদিকে তাঁহার প্রবল শত্রু তাঁহার সম্মুখীন হইলে যেন ভগ্নপৃষ্ঠ হইয়া পড়িতেন। দেশবাসীর মনেও ক্রমশঃ এই ধারণা জন্মিতেছিল— যত্র দাশ মহাশয়, তত্র জয়।

তিনি কত রকম লোককে দিয়া কত দিকে কাজ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় দেশবাসী অবগত নহেন। তাঁহার অনুপ্রেরণার ফল যে দিন ফলিবে দেশবাসী সে দিন তাহা জানিবেন। আদর্শের নিত্য অনুপ্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত হইতেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাও উদ্দীপিত হইতেন। জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তাঁহার ছিল এক ধ্যান, এক চিন্তা—স্বদেশ-সেবা এবং সেই স্বদেশ-সেবা তাঁহার ধর্মজীবনের সোপান স্বরূপ।

দেশবন্ধুর জীবনের কথা উল্লেখ করিলে যদি আর একজনের কথা না বলা হয় তবে কিছুই বলা হইল না। যে দেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে মূর্তিমতী সেবা ও শান্তির মত ছায়ার ন্যায় সর্বদা দেশবন্ধুর পার্শ্বে থাকিতেন, তাঁহাকে বাদ দিলে দেশবন্ধুর জীবনে কতটুকু বাকী থাকে কে বলিতে পারে? ভোগের অত্যুচ্চ শিখরে যিনি হিন্দু রমণীর আদর্শ লজ্জা, নম্রতা ও সেবা কোনও দিন বিস্মৃত হন নাই—বিপদের ঘনান্ধকারে যিনি হিন্দু পতিব্রতার একমাত্র সম্বল—চিত্তস্থৈর্য ও ভগবদ্বিশ্বাস হারান নাই—সেই দেবীর কথা লিখিতে গেলে আমি ভাষা খুঁজিয়া পাই না। দেশবন্ধু ছিলেন তরুণদের রাজা। তাঁহার পতিব্রতা সাধ্বী পত্নী ছিলেন—তরুণদের মাতা। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর তিনি আজ শুধু চিররঞ্জনের মাতা নন্, শুধু তরুণদের মাতা নন্—তিনি আজ নিখিল বঙ্গের মাতা। বাঙ্গালীর হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আজ তাঁহার চরণে সমর্পিত।

আলিপুর মামলায় অরবিন্দবাবুর সমর্থনকালে দেশবন্ধু ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন—

He will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. His words will be echoed and re-echoed etc.

এই কথাগুলি কি আজ দেশবন্ধু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়?*

---

* শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'দেশবন্ধু স্মৃতি' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত।

উত্তর-কলিকাতা অধিবাসীগণের নিকট নিবেদন

মান্দালয় জেল
উত্তর ব্রহ্মদেশ
২৪। ৯। ২৬

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্বাচনসম্বন্ধে আমি জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস কমিটি) কর্তৃক উত্তর-কলিকাতার অ-মুসলমান বিভাগের জন্য সভ্যপদপ্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছি। জনমতের আনুকূল্যের সংবাদ পাইয়া স্বদেশসেবী ও শুভার্থিগণের উপদেশে এবং দেশের ও দশের সেবার অধিকতর সুযোগ পাইবার ভরসায় আমি জাতীয় মহাসমিতির আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছি। আমি কারাবাসী না হইলে সদস্য-পদপ্রার্থী হইবার পূর্বেই যে ভাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনাদের মতামত লইতাম, আমার বর্তমান অবস্থায় আমি তাহা করিয়া উঠিতে পারিলাম না; কিন্তু আমি আশা করি, আপনারা নিজগুণে আমার ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

কারারুদ্ধ অবস্থায় নির্বাচনপ্রার্থী হওয়া উচিত কি না এবং নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে কি না—সে বিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। জাতীয় মহাসমিতিও এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া এবং নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে স্থির করিয়া আমাকে দাঁড়াইতে আদেশ করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আজ জীবিত থাকিলে তিনিও আমাকে নির্বাচনপ্রার্থী হইতে আদেশ করিতেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুনঃ নির্বাচনের সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার এই ধারণা সমর্থন করে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ও বর্তমান অবস্থায় আমার নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে ভাবিয়া আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। জনমতের আনুকূল্যও যে আমার এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য অনেকটা দায়ী তাহা বলা বাহুল্য। সুযোগ থাকিলে ও সম্ভবপর হইলে আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার সকল মতামত আপনাদের নিকট নিবেদন করিতাম এবং আপনাদের উপদেশ ও পরামর্শ শুনিতে চাহিতাম। কিন্তু সে অধিকার হইতে আমি গভর্নমেন্ট কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি।

প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল আমি বিনা-বিচারে ও বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাকে গভর্নমেন্টের কোনও আদালতের সামনে উপস্থিত করা হয় নাই। এমন কি আমার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কি অভিযোগ ও সাক্ষ্য আছে তাহাও প্রকাশ্যে অথবা জনান্তিকে আমাকে বলা হয় নাই। আমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, অপরাধ যদি কিছু করিয়া থাকি তাহা এই যে, পরাধীন জাতির সনাতন গতানুগতিক জীবনপন্থা ছাড়িয়া কংগ্রেসের একজন দীন সেবক হিসাবে স্বদেশ-সেবায় মন-প্রাণ-শরীর সমর্পণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তারপর আমি যে শুধু কারারুদ্ধ হইয়াছি তাহা নয়, বিশ মাস হইল আমি দেশান্তরিত। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলের পবিত্র স্পর্শ হইতে কতকাল যাবৎ আমি বঞ্চিত!

তবে আমার সান্ত্বনা ও সৌভাগ্য এই যে, আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আজ "আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে, গোলাপ হয়ে" ফুটিয়াছে। এইখানে আসিবার পূর্বে আমি বাঙ্গলাকে, ভারতভূমিকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুন সোনার বাঙ্গলাকে, পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস— "স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" বাঙ্গলার মোহনীয় রূপ আজ আমার নিকট কত পবিত্র, কত সুন্দর হইয়াছে। যে আত্যন্তিক আত্মোৎসর্গের আদর্শ লইয়া আমি কর্ম-ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নির্বাসনের পরশমণি আমায় দিন দিন সে মহাদানের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। যে চিরন্তন সত্য বাঙ্গলার ভাগীরথী ও বাঙ্গলার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার যে প্রাণধর্মকে বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া

দেশবন্ধু পর্যন্ত প্রতিভাবান মনীষিগণ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যের মধ্যে প্রকট করিয়াছিলেন, বাঙলার যে বিচিত্র রূপ কত শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকের লেখনী ও তুলিকার বিষয় হইয়াছে, আজ তাহার আভাস পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। এই অনুভূতির পুণ্য প্রভাবে আমার দুই বৎসর কারাবাস সার্থক হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এহেন মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদ বরণ করা কত গৌরবের, কত সৌভাগ্যের কথা।

এইরূপ নিবেদনে নিজের পরিচয় দেওয়ার একটা রীতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমার এমন কোনও সম্বল বা সম্পদ নাই যাহার উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদের সহায়তা দাবি করিতে পারি।

পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন উচ্ছল জলধি তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত ভারতবাসীর প্রাণ দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য উতলা হইয়াছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া আমি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারত-মাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব—এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। স্বদেশসেবা বা রাজনীতির পর্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করি নাই। এই জন্য পরাধীন দেশে স্বদেশসেবকের জীবনে যে বিপদ ও পরীক্ষা, দুঃখ ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য কায়মনে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি কি না, অথবা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি—তার বিচার করিবেন আমার দেশবাসিগণ। আমার এই ক্ষুদ্র অথচ ঘটনাবহুল জীবনে যে সব ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিঘ্ন-বিপদের সেই কষ্টিপাথর দ্বারা আমি নিজেকে সূক্ষ্মভাবে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে যে কণ্টকময় পথে আমি জীবনের যাত্রা সুরু করিয়াছি, সেই পথের শেষ পর্যন্ত চলিতে পারিব; অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া বিরত হইব না। আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি—পরাধীন জাতির সব ব্যর্থ—শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম—সকলই ব্যর্থ যদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে,—"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?"

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন—স্বরাজলাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিরত থাকিতে পারি।

আত্মোৎসর্গের পবিত্র ও জীবন্ত বিগ্রহ প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চরণে দেশসেবায় আমার প্রথম শিক্ষা দীক্ষা। তাঁহার জীবদ্দশায় সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার পতাকা অনুসরণ করিয়াছি। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও তাঁহার মহিমময় জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া একনিষ্ঠভাবে জীবনের পথে চলিব, এই সংকল্প মনের মধ্যে পোষণ করি। সর্বমঙ্গলময় ভগবান আমার সহায় হউন।

আমার এই উপস্থিত সমস্যার সমাধান আপনাদের হাতেই ছাড়িয়া দিলাম, কারণ এ নির্বাচনদ্বন্দ্বে প্রবাসী রাজবন্দী পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের ব্যবধানে থাকিয়া কি করিতে পারে? দেশমাতৃকার অকিঞ্চন সেবক হইলেও আমি তো আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহি। আজ সকলের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও কি আপনাদের উপর আমার কোন দাবি নাই? আমি প্রার্থনা করি, আপনারা ভুলিবেন না যে, আমার জয়ের অর্থ জাতীয় মহাসভার জয়, জনমতের জয়, আপনাদের জয়। সম্মুখে যে ব্যয়সাপেক্ষ নির্বাচন সংগ্রাম তাহাতে আপনারাই আমার সহায় সম্পদ, বল ভরসা—সব কিছু। আপনাদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমার সন্দেহ নাই যে, আপনারা আমাকে সেবার সুযোগ ও অধিকার দিয়া ধন্য করিবেন। আর অধিক কি বলিব—দেশমাতৃকার মূর্ত বিগ্রহ আপনারা। সাগর-পারের বন্দীর সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি—*

*এই নিবেদন-পত্রটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আটক করেন। সুভাষচন্দ্রের মুক্তির পর এটি প্রকাশিত হয় এবং 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আমরা কি চাই?

আমরা চাই ভারতের গণতন্ত্র স্বাধীনতা

জনগত আইনভঙ্গ, খাজনাবন্ধ ও ভারতব্যাপী ধর্মঘটই স্বাধীনতা লাভের পরাধীন ভারতের অন্যতম ও নিরস্ত্র ভারতের একমাত্র অস্ত্র।

স্বাধীনতা মানুষের সবচেয়ে বড় সত্য। সুতরাং স্বাধীনতাকে এইভাবে কায়মনোবাক্যে জীবন ও মরণ দিয়ে স্বীকার করাই সত্যাগ্রহ। স্বাধীনতার জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বিদ্রোহের মতই সত্য।

মানুষের অন্তরের চিরদিনের সত্যাগ্রহ মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের সত্যাগ্রহ-সাধনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই নবযুগে মহাত্মা গান্ধীকেই এই মন্ত্রের দ্রষ্টা বলে সমস্ত জগত স্বীকার করেচে। কিন্তু মহাত্মা একটা ভুল করেছিলেন, সত্যাগ্রহের অধিকার তাঁরই নিজস্ব হয়ত—এ রকম ভেবেছিলেন, তাতে মানুষমাত্রেরই একান্ত দাবী রয়েচে তা তিনি ভুলে গেছলেন। এইজন্য তিনিই একা বার্দোলিতে সত্যাগ্রহ সুরু করতে চেয়েছিলেন এবং বন্দী ও কারারুদ্ধ হবার পর এই অভিযান চালাতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মানুষের এই দাবী একবার জাগলে আর দমবার নয়। তাই পাঞ্জাব বাংলা ও দাক্ষিণাত্যে জনগণ স্বেচ্ছায় এই সত্যাগ্রহ সুরু করেচে। মহাত্মা যাকে সমাজের মস্তকে ও মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত করে রাখতে চেয়েছিলেন তা আজ সমাজের হাতে পায়ে ছড়িয়ে পড়েচে ও কাজ করচে। তাতে করে সত্যেরই জয় হয়েচে।

আমরা বিশ্বাস করি, এই সত্যাগ্রহই ভারতকে স্বাধীন করবে। এই সত্যাগ্রহ প্রথমে ভারতকে স্বাধীন (independent) করবে, তারপরে ক্রমশঃ স্বরাজ (freedom) গড়ে তুলবে; এই সত্যাগ্রহই বিদেশীর আধিপত্য থেকে পরে আত্মরক্ষার অস্ত্র হতে পারবে। শুধু এই না, আমরা মনে করি ভারতের মুক্তির সংগে এই অস্ত্র জগত্‌কেও যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, মিথ্যা, পাপ ও স্বার্থের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবে। ভারতের স্বরাজের সংগে জগতের স্বরাজ, ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাষ্ট্রীয় মুক্তির মতো সমাজের মুক্তিও আমরা চাই।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমষ্টি-স্বাচ্ছন্দ্যই হচ্ছে সামাজিক স্বাধীনতার ভিত্তি। হিন্দু সমাজকে বলীয়ান ও মহীয়ান করে তুলতে হলে ব্রাহ্মণ-তন্ত্র সামাজিক শাসনের উচ্ছেদ করতেই হবে। ব্রাহ্মণ-তন্ত্র এতদিন কেবল মৃত্যুই দিয়েচে, এখন অমৃতের জন্য হিন্দু তন্ত্র চাই। সমাজেরও গণতন্ত্র দরকার। মনুর সত্ত্ব লোপ করে মনুষ্যত্ব স্বীকার করতে হবে।

আমাদের সমাজে নারীর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা চাই।

এক কথায় পুরুষ যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভোগ করচে নারীকেও আমরা সেই স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী দেখতে চাই। পুরুষেরা কোনোদিন তা' নারীকে দেবে এবং দিলেও নারীরা তা সত্যি পাবে, এ বিশ্বাস আমাদের নেই। নারীকেই বিদ্রোহ করে স্বাধিকার অর্জন করতে হবে, তাছাড়া আর কোনো পথ নেই। যুগযুগান্ত ধরে নারী ধীরে ধীরে তার অধিকার (যা আগে কোনোদিন কোথাও ছিল কিনা জানা নেই) ফিরে পাবে এ ভরসা আমাদের নেই। অকস্মাতের দাবীই পৃথিবীতে সবার চেয়ে বড় দাবী। নারী একদিনেই তার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে ও করবে। সনাতন অচলায়তন একদিনের ভূমিকম্পেই ধ্বসে যেতে পারে; যুগান্তকালের পুঞ্জীভূত আবর্জনা একদিনের দাবানলেই সাফ হতে পারে—দিনে দিনে তিলে তিলে তার ক্ষয় হবার সম্ভাবনা নেই।

তারপরে কৃষকের সত্ত্ব ও স্বার্থ—

যার প্রথম কথাই হচ্ছে জমির পরগাছার মতো জমিদারি-পরগাছা তুলে ফেলা। আমরা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অচিরস্থায়ী করার পক্ষপাতী। ঐ সঙ্গে যে সব মহাজন চাষীদের ঋণ দিয়ে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করেচে ও হয়ত-আইন-সঙ্গত অন্যায়ে তাদের উচ্ছেদ করে তাদের জমি ভোগ দখল করচে, তাদের কাছ থেকেও চাষীরা আপনার জমি ফিরে পায় এও আমরা চাই। দু'একজনের অনাবশ্যক উদরস্ফীতি বাড়িয়ে তোলবার জন্য লাখ লাখ লোক শুকিয়ে মরতে পারে না।

কৃষকদের organise করবার এক মাত্র উপায় তাদের ফসল organise করা। রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি নয়, কেবল অর্থনীতির ভিত্তির ওপরেই কৃষিসমাজের বিরাটবাহিনী সংঘবদ্ধ হতে পারে। এই সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা আজ আমরা না দিলে কালে তারা নিজেরাই আপনার মধ্যে তা' পাবে। এবং তখন এই কর্তব্যচ্যুতির ঋণ হয়ত আমাদের রক্ত দিয়ে শুধতে হবে।

হয়ত তাই ভারতের ভাগ্য। শতকরা নব্বইজনের দাবী যদি আমরা বুঝেও স্বীকার না করি, তাহলে আমরা চাই—তারা নিজেরা শক্ত হয়ে আমাদের তা' বুঝিয়ে দিক, আমাদের অন্ন, বস্ত্র ও শান্তি কেড়ে নিয়ে পথের মাঝে লাঞ্ছিত করে এতদিনকার বিনিময় শোধ দিক। তা' হলে তাদের ও আমাদের সত্যিকার পাওয়া হবে—এবং সত্য পেয়ে মানুষের অধিকারে সহজে আমরা উভয়েই উঁচু মাথায় দাঁড়াতে পারব।

শ্রমিকেরও তার সত্য পাওনা পাওয়া চাই।

কলকারখানার মজুরই কেবল শ্রমিক নয়, খবরের কাগজের সম্পাদক থেকে, সরকারী দপ্তরের কেরাণী থেকে, রাস্তার ঝাড়ুদার, কুলী পর্যন্ত সবাই শ্রমিক। চাষীদেরও অধিকাংশ জমিহীন ও কেবল-শ্রমিক। স্বত্ব নিয়ে মূলধনীর সঙ্গে এদের প্রতিদিনের বিরোধ। তার যা চাই এবং সে যা চায় দুইই তাকে পেতে হবে।

মূলধনী ও শ্রমিকের সমান স্বত্ব ও স্বার্থ হওয়া চাই। ভারতকেও আর্থিক মুক্তি-সাধনা করতে হবে। একদিন ভারতের সব ব্যবসা (Nationalised) জাতির সম্পত্তি হবে এবং অর্থে সকলের সমান অধিকার হবে। তখনই সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির মধ্যে বিরোধ থাকবে না।

কৃষক সাগরের মত সর্বদা ক্ষুব্ধ হলেও আপনার বিরাট গভীরতার জন্যে প্রশান্ত, শ্রমিক কিন্তু কালবোশেখীর মতো দুর্জয়—এই দুয়ের মিলন ঘটলে কি-অঘটন সংঘটন হতে পারে তা' বোধহয় আজ আর চিন্তার তত্ত্ব নয়, ঐতিহাসিক তথ্য হয়ে দাঁড়িয়েচে।

কোনো মানুষেরই শারীরিক বেঁচে থাকবার জন্য চার ঘন্টা—কি বড়-জোর ছ'ঘন্টার বেশী খাটা উচিত নয়। কেননা তাকে কেবল দেহেই নয়, তার মনে, চিন্তায়, আদর্শে, সাধনায়, সাহিত্য-কলা-কাব্যে, সৌন্দর্যে প্রেমে ও তার সৃষ্টিতে তাকে বেঁচে থাকতে হবে—প্রত্যহই বেঁচে থাকতে হবে আজীবন। তাকে আত্মায় বাঁচতে হবে, এজন্য তাকে অমৃতেরও সন্ধান করতে হবে। কেননা সে অমৃতের পুত্র আর তার অন্তরের অনাদি অমৃতের আকাঙ্ক্ষা তাকে অনুক্ষণ বলচে, "যেনাহং নামৃত স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ !" আমরা সবার ওপরে সেই অমৃতের অধিকার চাই।*

* ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র বসু 'আত্মশক্তি' পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। সেই সময় এই পত্রিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এটি তার মধ্যে অন্যতম। —সম্পাদক।

প্রেসিডেন্সি কলেজে সমস্যা—একটি সত্য বিবরণী

সুভাষচন্দ্র বসু

সোমবার, হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের আট-দশজন প্রাক্তন ছাত্র, যারা বর্তমানে তৃতীয় বর্ষ বি, এ ক্লাসে, তাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়। সোয়া বারোটা নগাদ, এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়, এবং ছাত্রেরা তখন ফিরে আসে। তাদের আগে থেকে বলা হয়েছিল যে অধ্যাপক আর. এন. ঘোষ, সেদিন বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত যে ইংরেজী ক্লাসটি হয় সেটি নেবেন না। ফিরবার পথে কলেজের এক কর্মচারীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। কর্মচারীটি জানায় যে অধ্যাপক ঘোষ কলেজে এসেছেন এবং সম্ভবত ক্লাসটিও নেবেন। মিঃ ওটেন, যে ঘরে ক্লাস নিচ্ছিলেন, ছাত্রেরা সেই ঘর-সংলগ্ন বারান্দা দিয়ে চলে আসছিল। মিঃ ওটেন ঘর থেকে বের হয়ে এসে তাদের পথরুদ্ধ করেন, এবং দু-একজনের হাত ধরে, অপমানজনক ভাবে তাদের চলে যেতে আদেশ দেন। ছাত্রেরা অতি ভদ্রভাবে, অধ্যক্ষের কাছে আবেদনের উদ্দেশ্যে নীচে নেমে এল। ইতিমধ্যে, ছাত্রেরা আগে থেকেই তৃতীয় বর্ষের শ্রেণীকক্ষে জমায়েত হয়েছিল। বারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়ে গেছে দেখে, তারা নীচে নেমে অধ্যাপককে তা জানাবে বলে মনে করল। নামবার পথে, ওটেন সাহেবের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল। তিনি ভয় দেখালেন এই বলে যে একটা বাজার আগে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করলে পাঁচ টাকা জরিমানা হবে। যদিও ছাত্রেরা তাঁকে, তাদের নীচে যাবার উদ্দেশ্যের কথা জানাল, এবং কোনও রকম গোলমাল না হবার আশ্বাস দিল, তবুও তিনি ঠিক একই রকম অপমানজনক ভাবে তাদের ফিরিয়ে দিলেন। বারোটা-পঁচিশের সামান্য আগে, অধ্যাপক ঘোষ এলেন এবং ক্লাস ছুটী ঘোষণা করলেন। মিঃ ওটেনের শাসানি সত্ত্বেও, অধ্যাপক ঘোষের অনুমতি নিয়ে ছাত্রেরা নামতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি সদর্থক উত্তর দিয়েছিলেন। চলে আসার পথে মিঃ ওটেনের সঙ্গে আবার তাদের দেখা হয়। তারা জানায় যে তাদের ক্লাস ছুটী হয়ে গেছে এবং কোনও রকম গোলমাল তারা করবে না। এতৎসত্ত্বেও ওটেন মহাশয়, তাদের ফিরে গিয়ে একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আদেশ দেন। মৌখিক ভর্ৎসনার সঙ্গে আঘাত মিশিয়ে, তিনি এমনকি ছাত্রদের অভদ্রভাবে ধাক্কা দেন। ছাত্রেরা ফিরে আসে। একটার সময় ওটেন সাহেব তাদের কাছে যান এবং আরও বেশী কিছু সাবধানবাণী মনে করিয়ে আসেন। তিনি বলেন, ছাত্রদের জরিমানা করার অধিকার একজন অধ্যাপকের আছে। এই ক্ষমতার এতকাল সদ্ব্যবহার করা হয় নি বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে এখন থেকে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। ছাত্রেরা অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করে। সেইদিনই কিছু সংখ্যক বিক্ষুব্ধ ছাত্রের সঙ্গে অধ্যক্ষের দীর্ঘ এক আলোচনা হয়। তিনি ছাত্রদের আবেদন প্রত্যাহার করে মিঃ ওটেনের সঙ্গে মিটমাট করে নিতে বলেন। ব্যক্তিগত ভাবে, কেবলমাত্র তিনজন, তাদের ব্যক্তিগত অভিযোগের বিষয়ে মিঃ ওটেনের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়। সমবেতভাবে ক্লাসটি কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হয় না। পরের দিন সেই ছাত্র-তিনজন অধ্যাপক ওটেনের জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ তিনি আসতে পারেন না। এই অন্যায়ের প্রতিকারের কোন আশা দেখতে না পেয়ে সমস্ত ক্লাস চূড়ান্ত অসন্তুষ্ট থাকে। এই তীব্র অসন্তোষ এত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে যে, সমস্ত ছাত্র এই অবিচারের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত ক্লাস করতে অস্বীকার করে। ধর্মঘট দু-দিন স্থায়ী হয়। তৃতীয় দিনে মিঃ ওটেন ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন। অপ্রীতিকর ঘটনাটির পরিসমাপ্তি ঘটান।

পরিশিষ্ট

'জানকীনাথ বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

সুভাষচন্দ্র বসু

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অনতিদূরে কোদালিয়া গ্রামে 'জানকীনাথ বসুর জন্ম হয়। যখন তাঁহার বয়স প্রায় ১৬ বৎসর, তখন তাঁহার মাতৃদেবী ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। কলিকাতার এলবার্ট স্কুল (Albert School) হইতে এন্ট্রান্স (Entrance) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি St. Xavier's ও General Assembly কলেজে কিছুকাল পড়িয়া, অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত কটকে যান। বৃত্তি পাইয়া, কৃতিত্বের সহিত তিনি কটক Ravenshaw কলেজ হইতে এফ্‌ এ ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন এবং কটক কলেজে তিনি অধ্যাপক গিরীশচন্দ্র বসু ও 'ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। বি, এ উপাধি লাভ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন—আইন পরীক্ষা দিবার জন্য—এবং সেই সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল উমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের সৌজন্যে তিনি এলবার্ট কলেজে কিছুকাল অধ্যাপকতা করেন এবং তাহার পর প্রায় ৯ মাস চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে হাই-স্কুলের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করেন। এই সময়ে তাঁহাকে প্রবল অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকটবর্তী বরানগরের অধিবাসী 'কাশীনাথ দত্তের পৌত্রী ও 'গঙ্গানারায়ণ দত্তের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মেট্রোপলিটান (Metropolitan) কলেজ হইতে বি, এল্‌ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তিনি পুনরায় কটকে যান এবং তদানীন্তন গভর্মেন্ট প্লীডার (Government Pleader) 'রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু মহাশয়ের সাহায্যে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে ওকালতীতে তাঁহার বিশেষ পসার ও প্রতিপত্তি হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার পিতা হরনাথ বসু মহাশয় পরলোকগমন করেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে—অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে—তিনি কটকের পাবলিক প্রসিকিউটর (Public Prosecutor) নিযুক্ত হন। রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসুর দেহত্যাগের পর—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে—তিনি গভর্মেন্ট প্লীডার নিযুক্ত হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি কটক মিউনিসিপ্যালিটির (Municipality) সর্বপ্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান (Chairman) নির্বাচিত হন। তারপর, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (Bengal Legislative Council) অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন এবং সেই বৎসরই রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি Circuit Court-এর 'গভর্ণমেন্ট প্লীডার' নিযুক্ত হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত মতান্তর উপস্থিত হওয়াতে তিনি গভর্ণমেন্ট প্লীডার পদ ত্যাগ করেন এবং প্রায় ১৩ বৎসর পরে—অর্থাৎ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সরকারের দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি রায়বাহাদুর উপাধি ত্যাগ করেন।

জানকীনাথের কর্মজীবন উড়িষ্যায় অতিবাহিত হয়। সেখানকার যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সহিত তিনি নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দরিদ্র স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা নিয়মিতভাবে মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। দরিদ্র প্রতিবেশী ও দুঃস্থ পরিবার মাত্র সবসময়ে তাঁহার সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়া থাকিত এবং কেহ কখনও নিরাশ হইত না। প্রতি রবিবার তাঁহার বসতবাটীতে কাঙ্গালী বিদায় হইত। উড়িষ্যা ও উড়িষ্যাবাসীর প্রতি কর্তব্য করিয়া তিনি ক্লান্ত হইতেন না। নিজের গ্রামের প্রতিও তাঁহার প্রবল টান ছিল। দরিদ্র আত্মীয় স্বজন, এমন কি দরিদ্র গ্রামবাসীমাত্রই, প্রয়োজন ও বিপদের সময়ে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইতেন। প্রতি বৎসর কোদালিয়া গ্রামে তিনি মহাসমারোহের সহিত দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন এবং সেই উপলক্ষে বৎসরান্তে সমস্ত গ্রামবাসীর সহিত মিলন সুখ উপভোগ করিতেন। গ্রামবাসীর উপকার ও সেবার জন্য তিনি তাঁহার মাতার ও পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে কামিনী দাতব্য ঔষধালয় ও হরনাথ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

জানকীনাথ চিরকাল কংগ্রেসের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। যে সময়ে তিনি 'গভর্ণমেন্ট প্লীডার' ছিলেন, সে সময়েও তিনি নিয়মিতরূপে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতেন এবং এই ব্যাপার লইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কর্তৃপক্ষদের অসন্তোষ সহিতে হইত। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজের সহায়তা সাধ্যমত করিতেন। তিনি খদ্দরের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং সর্বপ্রকার স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহার করিতেন ও সর্ববিষয়ে স্বদেশী সমর্থন করিতেন। উড়িষ্যার সর্বপ্রথম জাতীয় বিদ্যালয়—'গোপবন্ধু দাশ প্রতিষ্ঠিত 'সত্যবাদী' বিদ্যালয়ের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পুত্রেরা কংগ্রেসের কার্যে আত্মনিয়োগ করিলে তিনি সর্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিতেন।

জানকীনাথ চিরকাল ধার্মিকচিত্ত ছিলেন। বহুকাল যাবৎ তিনি কটকের Theosophical Lodge-

এর সভাপতি ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারের 'পণ্ডিত শ্যামনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট তিনি সস্ত্রীক প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথম গুরুর স্বর্গপ্রাপ্তির কয়েক বৎসর পর তিনি পুনরায় সস্ত্রীক হিমাইতপুরের ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের 'সৎ-সঙ্গে' যোগদান করেন এবং সেইখানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি আরও বলবতী হইয়াছিল। তাঁহার কর্মবহুল ও সংগ্রামরত জীবনে ধর্মের প্রেরণাই ছিল তাঁহার সবচেয়ে বড় সহায় ও শক্তির উৎস। যৌবনে তাঁহাকে সাংসারিক অভাবের সহিত যুঝিতে হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র স্বীয় কর্ম প্রচেষ্টা ও ভগবদ্ বিশ্বাসের বলেই তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে যখন আত্মীয় স্বজনের অকাল প্রয়াণে তিনি উপর্যুপরি আঘাত পাইয়াছিলেন তখন তাঁহার গভীর ভগবদ্ বিশ্বাসই তাঁহাকে অটল রাখিয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র ও শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র যখন সরকারী পদ পরিত্যাগ করেন তখন তিনি মোটেই বিচলিত হন নাই—বরং সারাজীবন পুত্রদের কল্যাণকর প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে যুগপৎ দুইপ্রকার বিপদ সহ্য করিতে হইয়াছিল—একদিকে জামাতা, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়ের অকাল প্রয়াণ এবং অপর দিকে তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমান শরৎচন্দ্র ও শ্রীমান সুভাষচন্দ্রের কারাযন্ত্রণা ভোগ। কিন্তু এ সব দুঃখ-শোকের মধ্যেও তিনি বীরের মত অটল ছিলেন এবং মুহূর্তের জন্যও অন্তরের ভগবদ্ বিশ্বাস হারান নাই।

জানকীনাথ স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন। নিজের সাধনার বলে তিনি সংসারে উন্নতি করিয়াছিলেন এবং তিনি চাইতেন যে তাঁহার পুত্রেরাও স্বাবলম্বী হউক। তিনি পুত্রদের জন্য সাধ্যমত সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কখনও তাহাদের স্বাধীনতা খর্ব করিতে চাইতেন না। তিনি বিশাল-হৃদয় ছিলেন। দীন দুঃখীর জন্য তাঁহার প্রাণ সর্বদা কাঁদিত। তাঁহার পরলোকগমনের পূর্বেই তিনি তাঁহার পুরাতন ভৃত্যদের জন্য এবং পরিচিত বহু দীনদুঃখীর জন্য নিয়মিত সাহায্য বা পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দানের বিষয়ে তিনি একদিকে যেরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ গোপনতা ভালবাসিতেন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন ও সত্যকে ভালবাসিতেন। তিনি অন্তরের সঙ্গে অসৎকর্ম, অসৎচিন্তা ও অসৎ উপায় ঘৃণা করিতেন। তিনি অপরের নিকট প্রাপ্ত উপকার সর্বদা স্মরণ রাখিতেন ও তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকিতেন—কিন্তু অপরের কৃত অপকার বা অনিষ্ট কখনও মনে রাখিতেন না। পরের নিন্দা তাঁহার মুখে কখনও শোনা যাইত না এবং পরশ্রীকাতরতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। এতদ্ব্যতীত তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভৃত্য পরিজন, ধনী দরিদ্র, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ—কেহ কখনও তাঁহার মুখে রূঢ় কথা শুনিতে পাইত না। তিনি পুত্ররূপে, স্বামীরূপে, পিতারূপে, বিশাল পরিবারের কর্তারূপে, মানুষরূপে—যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিরল। এবং পরিবারবর্গের প্রতি, গ্রামের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি—তিনি যে ভাবে নিজ কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন—এবং সত্য ও ধর্মকে ভিত্তি করিয়া যে ভাবে স্বীয় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই সকলের অনুকরণীয়।

পুরন্দর খাঁ ও মাহীনগর-সমাজ*

নগেন্দ্রনাথ বসু

মাহীনগরে পুরন্দরের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। তদুপলক্ষে পুরন্দরের প্রকৃত বাসস্থান লইয়া আলোচনা চলিতেছে। কিছুদিন হইল মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহাশয় "পুরন্দর খাঁ" নামক তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লিখিয়া গিয়াছেন,—'বর্তমান হুগলী জেলার চণ্ডিতলা থানার অন্তর্গত সেয়াখালা গ্রাম পুরন্দরের জন্মস্থান। পূর্বে এই সেয়াখালার নিম্নে কৌশিকী নদী প্রবাহিত ছিল। বর্তমান সময়ে নদীর গর্ভমাত্র বিদ্যমান। নদীর স্রোত লোপের সহিত এই স্থান ঘোর অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, তজ্জন্য পুরন্দরের বংশধরগণ অনেকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।'

মাননীয় মিত্র মহাশয়ের এই উক্তির বিরুদ্ধে পঞ্চদশ বর্ষ পূর্বে কায়স্থ পত্রিকায় 'পিতৃভূমি-দর্শন' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে দেখাইয়াছি, মাহীনগরই পুরন্দরের জন্মস্থান এবং মাহীনগরই পুরন্দরের সামাজিক কর্মস্থান। দুঃখের বিষয় আমি নিজে পুরন্দরের লীলাভূমি মাহীনগর দর্শন করিয়া সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিলেও অনেকের এখনও সন্দেহ ভঞ্জন হয় নাই; এই সন্দেহ ভঞ্জন জন্য অদ্যকার প্রবন্ধের অবতারণা।

দক্ষিণরাঢ়ীয় বসু বংশের বীজপুরুষ দশরথ বসুর দুই পুত্র—কৃষ্ণ ও পরম। পরম বঙ্গে গিয়া বাস করেন, তাঁহার বংশধরগণ বঙ্গজ নামে পরিচিত। কৃষ্ণ বসু রাঢ়ে বাস করেন। তৎপুত্র ভবনাথ, ভবনাথের পুত্র হংস, হংসের তিন পুত্র শুক্তি, মুক্তি ও অলঙ্কার। শুক্তি বাগণ্ডায়, মুক্তি মাহীনগরে এবং অলংকার বসু বঙ্গে গিয়া বাস করেন। মুক্তি মাহীনগর সমাজপতি হইয়াছিলেন। এ সময়ে রাঢ়ে, গৌড়ে মুসলমান প্রভাব। প্রথমতঃ কুলীন সন্তান মুসলমান সংস্রব ভয় ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, সদাচার ও বংশ-বিশুদ্ধিতা রক্ষার দিকে সকলের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মুক্তির পুত্র দামোদর, তৎপুত্র অনন্ত, অনন্তের পুত্র গুণাকর, তৎপুত্র লক্ষ্মণ, এই লক্ষ্মণের ঔরসে দশরথ হইতে ১১শ পর্যায়ে সুপ্রসিদ্ধ মহীপতি বসু জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রখর বুদ্ধি ও কার্যকুশলতার সম্বাদ পাইয়া গৌড়ের বাদশা তাঁহাকে গৌড় রাজধানীতে আহ্বান করেন। গৌড়েশ্বর তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রাজস্ব ও যুদ্ধ বিগ্রহের উচ্চ মন্ত্রিপদ প্রদান করেন।

সেই পদ হিন্দুরাজগণের অধিকারকালে মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদের অনুরূপ। মুসলমান আমলে যাঁহারা এইরূপ উচ্চ সচিবের কার্য করিতেন, তাঁহারা নিজ সমাজে রাজবৎ সম্মানিত হইতেন। মহীপতি প্রকৃত মুখ্য ছিলেন, তাঁহার সুবুদ্ধি খাঁ উপাধি লাভের সহিত নিজ সমাজে প্রকৃতরাজ বলিয়া সম্মানিত ও পূজিত হইলেন। বর্তমান মাহীনগরের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে, বর্তমান বারুইপুরের তিন পোয়া উত্তরে সুবুদ্ধিপুর নামে একটি প্রাচীন স্থান সুবুদ্ধি খাঁর নাম আজও জাগাইয়া রাখিয়াছে। সম্ভবত এই সুবুদ্ধিপুরই তাঁহার নামানুসারে বাদশাহদত্ত জায়গীর। সুবুদ্ধি খাঁ এখানে কিছুকাল বাস করিয়া থাকিবেন।

মহীপতি বসুর দশ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুরেশ্বর পিতৃভাবে যশস্বী হন, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গদাধর কার্যদোষে কুলহীন হন। তৃতীয় পুত্র বিষ্ণু ও চতুর্থ পুত্র ঈশান খাঁ উভয়ে সহজ মুখ্যপদ লাভ করেন। পঞ্চম দাশরথি ও ষষ্ঠ সর্বেশ্বর উভয়ে কনিষ্ঠ কুলীন এবং পরবর্তী বিশ্বেশ্বর, গঙ্গাধর, ভগীরথ ও পরমেশ্বর এই চারিজনে তেওজ কুলীন বলিয়া পরিচিত হন।

মহীপতির চতুর্থ পুত্র ঈশান খাঁ বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়ের দরবারে পিতৃপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—গোবিন্দ, গোপীনাথ ও বল্লভ। গৌড়ের সুলতানের নিকট গোবিন্দ গন্ধর্ব খাঁ, গোপীনাথ পুরন্দর খাঁ এবং বল্লভ সুন্দরবর খাঁ উপাধি লাভ করেন। মুসলমান আমলে উচ্চ উপাধি দানের সহিত কিছু কিছু জায়গীর দেওয়া হইত। গোবিন্দ বসু যে জায়গীর পান তাহা মাহীনগরের দেড় মাইল পূর্বে গোবিন্দপুর নামে পরিচিত। পুরন্দর খাঁর জায়গীর পুরন্দরপুর[১] মাহীনগর হইতে দুই মাইল পশ্চিম-উত্তর কোণে অবস্থিত। বল্লভবা বড়া মল্লিকের জায়গীর, অধুনা ই, বি, রেলওয়ের দক্ষিণ শাখায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ মল্লিকপুর স্টেশন।

পুরন্দর খাঁ সুলতান হোসেন শাহের রাজস্ব-মন্ত্রী (Finance Minister) ও নৌ-সেনাপতি (Naval-Commander) ছিলেন। সুলতান হোসেন শাহের অভ্যুদয়কালে তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি খাঁরের সময় হইতে মুসলমান দরবারে পুরুষানুক্রমে মন্ত্রিত্ব করায় এই বংশের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সমাজে মান-সম্ভ্রম বড় কম ছিল না। রাজস্ব ও নৌবিভাগ পুরন্দরের করায়ত্ত থাকায় পুরন্দর কতকটা সর্বময় কর্তা হইয়া ছিলেন। পুরন্দরের অধিষ্ঠান হেতু মাহীনগরে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের কেন্দ্র বা শ্রেষ্ঠ সমাজ স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। তৎকালে মাহীনগরের পার্শ্ব দিয়া স্রোতস্বতী গঙ্গা প্রবাহিত ছিল এবং এই গঙ্গাপথে গৌড় পর্যন্ত যাতায়াতের যথেষ্ট সুবিধা ছিল।

*কায়স্থ পত্রিকা, ২৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

১ কল্যাণপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুদের বাড়ীর নিকট আর একটি পুরন্দরপুর আছে।

এই জল পথেই পুরন্দর খাঁর তত্ত্বাবধানে গৌড়েশ্বরের নৌবহর বহিঃশত্রু হইতে সুলতানের রাজ্য ও রাজস্ব রক্ষা করিত। যে সময়ে পুরন্দর খাঁ সম্মানের সমুচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত সেই সময়ে তিনি দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমাজে কুলীন ও মৌলিকগণের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা ও আত্মীয়তা বিস্তারের জন্য বল্লালী কুলবিধি পরিবর্তনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি ১৩শ পর্যায়ে কুলীনদিগের একজাই বা সমীকরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই একজাই উপলক্ষে দক্ষিণ রাঢ়ের সমস্ত কুলীন সমাজ ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক সমাজ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। এই সামাজিক সম্মেলন উপলক্ষে মাহীনগরে লক্ষাধিক ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। এই সম্মেলনের পূর্বেই পুরন্দর আহূত ব্যক্তিগণের ব্যবহার্য উৎকৃষ্ট জল সরবরাহের জন্য বহু লোক লাগাইয়া অল্প দিনের মধ্যে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। বহু সংখ্যক খনকগণ যেখানে তাহাদের কোদালি ধুইয়া জড় করিয়া রাখিত সেই স্থান এক্ষণে মাহীনগরের উত্তর উপকণ্ঠে কোদালিয়া নামে বিখ্যাত। পুরন্দরপুরের সেই এক মাইল-ব্যাপী জলকীর্তি তাঁহারই নামানুসারে এখনও 'খাঁ পুকুর' নামে পরিচিত রহিয়াছে। ১৩শ পর্যায়ের সমীকরণকালে যে বিশাল সরোবরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে, দাম ও আগাছায় পূর্ণ হইয়াছে। পুরন্দরের উদ্যান-বাটিকা আজও মালঞ্চ নামে পরিচিত রহিয়াছে। যেখানে পুরন্দরের হাতীশালা ছিল, তাহাও কেহ কেহ দেখাইয়া থাকেন। বলিতে কি পুরন্দরের অধিষ্ঠান হেতু দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনগণের প্রধান ছয় সমাজের মধ্যে মাহীনগর সর্বপ্রধান সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

পুরন্দর খাঁর অভ্যুদয়ের পূর্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে বল্লালী কুল নিয়মে কন্যাগত কুলপ্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যাগত কুলপ্রথায় সকল কন্যাকেই কুলীনে দান করিবার ব্যবস্থা ছিল। তাহাতে কুলীন-কন্যা মৌলিকে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সুতরাং কুলীন মৌলিকে পরস্পর আত্মীয়তা স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় ছিল। পূর্বে প্রধান প্রধান কুলীনগণকে রীতিমত কুলশাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইত। পুরন্দর নিজে বড় কুলীন ও কুলশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন; তিনি জানিতেন রাজা বল্লাল সেনের কুলবিধির পূর্বে কুলীন ও মৌলিকের মধ্যে আদান প্রদানে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু বল্লালী কুলপদ্ধতি প্রচলিত হইবার পর কয়েক পুরুষ পরে কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন সমাজে ঘোরতর আর্তনাদ উপস্থিত হইয়াছিল। মৌলিকগণও যেন কুলীন সমাজের নিকট হইতে তফাৎ হইয়া পড়িতেছিলেন। পুরন্দর বুঝিয়াছিলেন যে সমাজকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে রাখিলে সমাজশক্তি লোপ পাইবে, সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। এ কারণ তিনি কুলজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ কুলীনদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া একজাই করিলেন। সেই একজাই বা সমীকরণ-সভায় পুরন্দর গোষ্ঠীপতিরূপে অভিনব কুলপ্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন বাঙ্গলার কায়স্থ রাজস্থানীয়, রাজবল্লভ ও রাজার জাতি। তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে রাজবিধিই চালাইলেন। এক রাজার বহু পুত্র হইলেও জ্যেষ্ঠ পুত্রই যেমন পিতার রাজ্যাধিকার ও সমস্ত পিতৃ-সম্মান উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন, সেইরূপ পুরন্দরের প্রবর্তিত কুলনিয়ম অনুসারে কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুলকার্যের অধিকারী হইলেন। অপরাপর পুত্রগণ কুলীন বা মৌলিক যে কোন ঘরে বিবাহ করিতে পারিবেন। কুলীন-পাত্রে কন্যাদান ও কুলীনকন্যা গ্রহণ, কুলীন মাত্রেরই গৌরবজনক কার্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। মৌলিকগণের পক্ষেও কুলীনকন্যা গ্রহণ ও কুলীনে কন্যাদান উভয় কার্যই সম্মানজনক বলিয়া আদৃত হইল। বলিতে কি শেষোক্ত নিয়ম দ্বারা কুলীনের সম্মান বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছিল।

পূর্বে কন্যাগত কুলপ্রথা থাকায় কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীনদিগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। মৌলিকেরাও কুলীনকে উপযুক্ত সম্মানদান করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন; এখন পুরন্দরের নিয়মানুসারে কুলীনের সহিত আদান-প্রদানের সুবিধা হইলে মৌলিক মাত্রেই পুরন্দরী কুলপ্রথা সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌলিকের নিকট কুলীনের সম্মান শতগুণে বর্ধিত হইয়াছিল। পূর্বে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ সর্বত্র প্রচলিত ছিল, এখনও সেই প্রথা বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু পুরন্দরের মত প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গাতীরবর্তী দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক সমাজ, কুলোজ্জ্বল হইবে ভাবিয়া একমাত্র কুলীনে আদান-প্রদান চালাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার ফলে মাহীনগর, বাগাণ্ডা, আকনা, বালী, টেকা ও বড়িসা এই ছয় কুলীন সমাজ ও তৎনিকটবর্তী স্থান সমূহ হইতে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহপ্রথা ক্রমশঃ লোপ হইয়াছিল। পুরন্দরী প্রথানুসারে কুলীন সমাজের কন্যাদায় একপ্রকার রহিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত মৌলিক মাত্রেই শ্রেষ্ঠ কুলীনের কন্যা ঘরে আনিবার নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কুলীনপাত্রে কন্যাদান অনেকে অবশ্য কর্তব্য কর্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালার দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ভূস্বামিগণের মধ্যে অধিকাংশই মৌলিক ছিলেন। বলা-বাহুল্য তাঁহারা সকলেই পুরন্দরের কুলপ্রথা সমর্থন করিয়াছিলেন। কুলীনে মৌলিকে আদানপ্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হইলে বহু মৌলিক জমিদার কুলীন পাত্রে কন্যাদান ও সেই সঙ্গে বহু ভূসম্পত্তি দিয়া কুলীন স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার শত শত প্রমাণ বিদ্যমান।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ, তেওজ, কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র, ছভায়া দ্বিতীয় পুত্র, মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র, তেওজ দ্বিতীয় পুত্র, এই ৯ প্রকার কুল। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচ কুলই প্রধান। মুখ্য কুলীনের প্রথম পুত্র জন্মদ্বারা মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাকে জন্মমুখ্য বা মুখ্য কুলীন বলে। ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট কুল, ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রকৃত, সহজ ও কোমল। এই তিন ভাগের মধ্যে যথাক্রমে প্রথমোক্ত দ্বিতীয় অপেক্ষা অধিক সম্মানিত। মুখ্য কুলীনের দ্বিতীয় পুত্রের কুলের নাম জন্মকনিষ্ঠ, কনিষ্ঠ কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছভায়া নামক কুলবিশিষ্ট। মুখ্য কুলীনের তৃতীয় পুত্রের কুলকে মধ্যাংশ এবং মুখ্য কুলীনের চতুর্থ পুত্রের কুলকে তেওজ বলে। মুখ্যকুলীনের পঞ্চম পুত্র হইতে অপর পুত্রেরা দ্বিতীয় পুত্র নামক কুলবিশিষ্ট। কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র, ছভায়া দ্বিতীয় পুত্র, তেওজ দ্বিতীয় পুত্র এই ত্রিবিধ কুল কনিষ্ঠ, ছভায়া ও তেওজ নামক কুল হইতে উৎপন্ন।

ঘোষবংশের আকনা ও বালি, বসুবংশের মাহীনগর ও বাগাণ্ডা এবং মিত্র বংশের টেকা ও বড়িসা, এই ছয় সমাজের স্থাপয়িতা প্রথম ৬ ব্যক্তি প্রকৃত মুখ্য বলিয়া সম্মানিত হন। পরে প্রকৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র

মাত্র প্রকৃত, ২য় পত্র সহজ, ৩য় ও ৪র্থ পত্র কোমল মধ্য, ৫ম পত্র কনিষ্ঠ, ৬ষ্ঠ পত্র ছভায়া, ৭ম পত্র তেওজ, ৮ম পত্র মধ্যাংশ এবং ৯ম পত্র মধ্যাংশের ২য় পো বলিয়া পরিচিত হইতেন। ১১শ পর্যায়ে প্রকৃতরাজ মহীপতি বসু সুবুদ্ধি খাঁর সময় পর্যন্ত ঐরূপ কুলের ভাব নির্ণীত হইত। পুরন্দর খাঁর সময়ে ইহারও কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ, তেওজ, কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পো, ছভায়া দ্বিতীয় পো, মধ্যাংশ দ্বিতীয় পো ও তেওজ দ্বিতীয় পো কুলীনগণের এই ৯ প্রকার ভাব হইল।

পুরন্দরের বিস্তৃত কুলপদ্ধতির ইতিহাস লিখিবার এখানে স্থান নাই। এখানে মোটামুটি বলিতে পারি; পুরন্দরের কৌশলে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন সমাজ ধ্বংসমুখ হইতে এক প্রকার রক্ষা পাইয়াছিল। কেবল পুরন্দর খাঁ বলিয়া নহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব খাঁ ১৪শ পর্যায়ে একজাই করিয়া এবং কেশবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস খাস ১৫শ পর্যায়ে একজাই করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ১৫শ পর্যায়ের গোষ্ঠীপতি শ্রীকৃষ্ণ বসু গৌড়ের সুলতানের নিকট বিশ্বাস খাস উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার নামে যে জায়গীর দেওয়া হয়, তাহা পুরন্দরপুরের দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণপুর নামে পরিচিত রহিয়াছে; এই কৃষ্ণপুরের পশ্চিমে ঘোষবংশের প্রধান সমাজ স্থান আকুনা গ্রাম। অধুনা এখানে ঘোষবংশের প্রভাবজ্ঞাপক বিশেষ কোন চিহ্ন না থাকিলেও তৎপার্শ্বে 'ঘোষপুর' ঘোষবংশের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

বিশ্বাসখাসের পুত্র অনন্ত রায়, তৎপুত্র চাঁদ মল্লিকের নামানুসারে চাঁদপুর, কোদালিয়ার পূর্বে মরা গঙ্গার নিকট অবস্থিত রহিয়াছে।

মাহীনগরে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের তিনবার একজাই হওয়ায় এক সময়ে সামাজিকগণের নিকট মাহীনগর তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

দুই শত বর্ষ পূর্বেও এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবলতরঙ্গা গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন, কবিরামের 'রায়মঙ্গল' গ্রন্থে সেই সময়ের কথা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"সাধুঘাটা পাছে করি, সূর্যপুর বাহে তরি
চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালাক্ষী দেবী পূজি
বাহে তরি সাধু গুণরাশি॥
মালঞ্চ রহিল দূর, বাহিয়া কল্যাণপুর
কল্যাণ-মাধব প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম, কি কাজ করিয়া নাম
বড়দহ ঘাটে উত্তরিল॥"
(রায়মঙ্গল। ৪৯।)

গঙ্গার স্রোত রুদ্ধ হইবার পর, এই স্থানে মহামারিরূপে জ্বররোগ আসিয়া দেখা দেয়, তাহাতে বসুবংশীয় অনেকেই স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্যকর নিরাপদ স্থানে আসিয়া বাস করেন। শ্রেষ্ঠ কুলীন কায়স্থগণ স্বস্থান ত্যাগ করিয়া গেলেও তাঁহাদের গুরুপুরোহিত-স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব শাসন বা ব্রহ্মত্র ত্যাগ করিয়া অপর স্থানে গিয়া বাস সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। মাহীনগরের উপকণ্ঠ কোদালিয়া ও তৎনিকটস্থ চিংড়িপোতা, রাজপুর, হরিণাভি, লাঙ্গলবেড়ে প্রভৃতি স্থানে বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত বংশধরগণের স্মৃতি আজও ঐ স্থানে উজ্জ্বল রহিয়াছে। ঐ সকল স্থানে শত শত খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন; ঐ সকল পণ্ডিতগণের সমাগমে দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজে কোদালিয়া কাশীপুরি সদৃশ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে এইরূপ একটি শ্লোক শুনা যায়—

"কোদালিয়া পুরী কাশী গোঘাটা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো রামনারায়ণঃ স্বয়ং॥"

বলিতে কি, যে বিদ্যাবাচস্পতির বংশে রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশেই সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থানীয় সকল খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের নামোল্লেখ অসম্ভব।[২]

স্থানীয় কায়স্থগণের মধ্যে কোদালিয়ার রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু (স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পিতা) ও ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁহারা সমাজস্থানে বাস করেন না, কিন্তু তাঁহাদের জন্মস্থান বলিয়া মধ্যে মধ্যে গিয়া থাকেন এবং জন্মভূমির উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ষোড়শ বর্ষ পূর্বে পুরন্দরের জলকীর্তি খাঁ-পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া এখানে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে কেহ কেহ সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোক পরিত্যাগ করায় সে সংকল্প অঙ্কুরেই বিলুপ্ত হইয়াছে। তৎপরে কিছুদিন হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ যুবকের চেষ্টায় এখানে পুরন্দর-পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই পুরন্দর-স্মৃতি উদ্বোধনকল্পে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ বসুমল্লিক যোগদান করিয়াছিলেন, বলাবাহুল্য এই দুইজনেই মাহীনগর সমাজের প্রধান কুলীন। মাহীনগরে পুরন্দর-স্মৃতি-রক্ষায় যে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের প্রধান কর্তব্য আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় স্মৃতিরক্ষাকল্পে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কলিকাতায় ক'একবার স্মৃতিসমিতি আহুত হইলেও সাধারণের কথা কি সমিতির সভ্যগণও অনেকেই যোগদান

[২] যাঁহারা এখানকার প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৩য় অংশ দাক্ষিণাত্য বৈদিক বিবরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

করিলেন না। কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। রায়বাহাদুরের ঐকান্তিক যত্নে জমি খরিদ হইয়াছে। কিছু কিছু ইটেরও জোগাড় হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে গৃহনির্মাণকার্য আরম্ভ হইতেছে না। তাই এই প্রবন্ধে পুরন্দরের অতীতকীর্তি বিবৃত করিয়া সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি সহৃদয় ও সমাজহিতৈষী মাত্রেই সমাজরক্ষক মহাপ্রাণ পুরন্দর খাঁর স্মৃতিরক্ষায় অগ্রসর হউন। যিনি যাহা ভাল মনে করেন সত্বর অর্থসাহায্য পাঠাইয়া উদ্যোক্তাগণের সাধু উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করুন।

বংশধারা

মাহীনগরের বসুদিগের বংশধারা

১—দশরথ বসু
|
২—কৃষ্ণরাম
|
৩—ভবনাথ
|
৪—হংসেশ্বর
|
৫—শক্তিরাম | ৫—মুক্তিরাম | ৫—অলঙ্কার

৫—মুক্তিরাম
|
৬—দামোদর
|
৭—অনন্ত
|
৮—গুণাকর
|
৯—মাধব
|
১০—লক্ষ্মণ
|
১১—মহীপতি (সুবুদ্ধি খাঁ) | ১১—পঞ্চানন | ১১—নারায়ণ

১১—মহীপতি
(সুবুদ্ধি খাঁ)
১২—ঈশান বসু খাঁ
(মহীপতির দশটি পুত্রের মধ্যে চতুর্থ পুত্র)
১৩—গোপীনাথ
(পুরন্দর বসু খাঁ)
(ঈশানের ২য় পুত্র)

১১—পঞ্চানন

১১—নারায়ণ
|
১২—স্থির
|
১৩—কোনার্ক
|
১৪—পরমানন্দ
|
১৫—বাসুদেব

১৭—রমানাথ

১৮—ভবানীদাস

১৯—রামভদ্র

- ২০—যাদবেন্দ্র
  - ২১—রামেশ্বর
  - ২১—খড়্গেশ্বর
  - ২১—রত্নেশ্বর
    - ২২—রামচরণ
      - ২৩—রামকান্ত
      - ২৩—রামহরি
        - ২৪—রামমোহন
        - ২৪—মদনমোহন
        - ২৪—প্রাণমোহন
          - ২৫—বৃন্দাবন
          - ২৫—দীননাথ
          - ২৫—হরনাথ
            - ২৬—যদুনাথ
            - ২৬—কেদারনাথ
            - ২৬—দেবেন্দ্রনাথ
            - ২৬—জানকীনাথ
        - ২৪—কৃষ্ণমোহন
        - ২৪—মথুরামোহন
        - ২৪—ভুবনমোহন
- ২০—সদাশিব

২৭—প্রমীলা বালা মিত্র
২৭—শরৎচন্দ্র
২৭—সুনীলচন্দ্র
২৭—মলিনা দত্ত
২৭—শৈলেশচন্দ্র

২৭—সরলাবালা দে
২৭—সুরেশচন্দ্র
২৭—তরুবালা রায়
২৭—প্রতিভা মিত্র
২৭—সন্তোষচন্দ্র

২৭—সতীশচন্দ্র
২৭—সুধীরচন্দ্র
২৭—সুভাষচন্দ্র
২৭—কনকলতা মিত্র

হাটখোলার দত্তদিগের বংশধারা

বরাহনগরের কাশীনাথ দত্ত

- **১মা কন্যা** (স্বর্গতঃ স্যার রমেশ মিত্রের পত্নী)
  - মন্মথ মিত্র
  - নিবারণ মিত্র
  - কন্যা (সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের পত্নী)
  - স্যার বিনোদ মিত্র
  - স্যার প্রভাস মিত্র
- **১ম পুত্র** গঙ্গানারায়ণ দত্ত (সুভাষচন্দ্রের মাতামহ)
  - সুরেন্দ্র
  - জ্যোতিন্দ্র
  - প্রভাবতী (জানকীনাথ বসুর পত্নী)
    - প্রমীলা (সুশীল কুমার মিত্রের পত্নী)
    - সরলা (বিশ্বেশ্বর দের পত্নী)
    - সতীশ
    - শরৎ
    - সুরেশ
    - সুধীর
    - সুনীল
    - তরুবালা (রাধাবিনোদ রায়ের পত্নী)
    - সুভাষ
    - মলিনা (সরোজ কুমার দত্তের পত্নী)
    - প্রতিভা (হেমন্ত কুমার মিত্রের পত্নী)
    - কনকলতা (নলিনীনাথ মিত্রের পত্নী)
    - শৈলেশ
    - সন্তোষ
  - সত্যবতী (বরোদাচন্দ্র মিত্র সি, এস-এর পত্নী)
  - রূপবতী (বারাণসীর উপেন্দ্রনাথ বসুর পত্নী)
  - গুণবতী (সাবজজ চন্দ্রনাথ ঘোষের পত্নী)
  - ভূপেন্দ্র
  - যোগীন্দ্র
  - গিরীন্দ্র
  - বীরেন্দ্র
  - ঊষাবতী
  - নিশাবতী (যতীন্দ্রনাথ বসুর পত্নী)
  - অরুণেন্দ্র
  - সত্যেন্দ্র
  - রণেন্দ্র
- **২য়া কন্যা** (সাবজজ অটল বিহারী বসুর (হুগলী) পত্নী ; স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের মাতামহ)
- **৩য়া কন্যা** (কটকের রায় বাহাদুর হরিবল্লভ বসুর পত্নী)
- **২য় পুত্র** জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত
  - সুরবালা
  - মণীন্দ্র
  - বিভাবতী
  - রবি দত্ত (ভাষাতত্ত্ববিদ, পণ্ডিত ও কবি)
- **৪র্থ কন্যা** (খিদিরপুরের ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বসুর পত্নী)

ব্যক্তি পরিচয়

নাম	পরিচয়
অ	
অনিলবাবু	অনিলবরণ রায়
অনিলবাবু	অনিলচন্দ্র বিশ্বাস
অপর্ণা দেবী	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠা কন্যা।
অমি	শরৎচন্দ্র বসুর মধ্যম পুত্র
অমৃত	অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়
অরুণা	সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয়ী
অশোক	শরৎচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র
অক্ষয়	ভাগিনেয়, অক্ষয়কুমার সরকার
আ	
আল রাজা	উড়িষ্যার একটি দেশীয় রাজ্যের প্রধান
আশুবাবু	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
উ	
ঊর্মিলা দেবী	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী
ক	
কনক	জানকীনাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা
কর্নেল কেলসল	রেঙ্গুন সেন্ট্রাল হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক
কর্নেল তারাপোরে	বর্মার বন্দীবিভাগের প্রধান
কণ্ঠু মামা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
কিরণবাবু	কিরণশঙ্কর রায়
কুমুদশঙ্করবাবু	ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়
ক্যাপ্টেন গ্রে	ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ফোর্সের ইউনিভার্সিটি ইউনিটের অধিনায়ক
গঙ্গোপাধ্যায়	বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
গিরীশদা	গিরীশ ব্যানার্জী
গীতা	শরৎচন্দ্র বসুর দ্বিতীয়া কন্যা
গোপালী	জানকীনাথ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র
গোরা	সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয়ী
গোস্বামী	তুলসীচন্দ্র গোস্বামী
ঘ	
ঘোষ	সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

নাম	পরিচয়
চ	
চক্রবর্তী	সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী
চন্ডীবাবু	চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চারু	চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী, নেতাজীর সহপাঠী
ছ	
ছোট দাদা	ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু
ছোট বৌদি	সুনীলচন্দ্র বসুর পত্নী
ছোট মামা	রণেন্দ্রনাথ দত্ত
ছোট মামীমা	রণেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী
জ	
জগদীশচন্দ্র	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
জগবন্ধু	কর্মচারী
জাস্টিস দাশ	প্রফুল্লরঞ্জন দাশ
জিতেন্দ্রিয় বসু	একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার
জেমস সাহেব	প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ
ড	
ডাঃ আনসারী	এম এ আনসারী, পরবর্তীকালে কংগ্রেস সভাপতি
ডাঃ বিপিন সেন	ময়মনসিংহের খ্যাতনামা চিকিৎসক
ডাঃ বেন্টলী	জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর
ডাঃ রায়	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
ত	
তিলক মহারাজ	বাল গঙ্গাধর তিলক
তুলসীবাবু	তুলসীচন্দ্র গোস্বামী
দ	
দত্তগুপ্ত	হেমচন্দ্র দত্তগুপ্ত
দাদা	সতীশচন্দ্র বসু
দিদি	প্রমীলা মিত্র, নেতাজীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী
ধ	
ধীরেন	ধীরেন্দ্রনাথ ধর
ন	
নগেন ঠাকুর	পুরোহিত

নাম	পরিচয়
ন দাদা	সুধীরচন্দ্র বসু
ননী	নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয়ী
ন বৌদিদি	সুধীরচন্দ্র বসুর পত্নী
নাদু	রণেন্দ্রনাথ দত্ত, ছোট মামা
নির্মলবাবু	নির্মলচন্দ্র চন্দ্র
নীলমণি	নীলমণি সেনাপতি, আই. সি. এস
নীলরতনবাবু	ডাঃ নীলরতন সরকার
নূতন মামাবাবু	গিরীন্দ্রনাথ দত্ত
নেড়া, নেড়ু	শরৎচন্দ্র বসুর তৃতীয় পুত্র
প	
পলি	জানকীনাথ বসুর পঞ্চমা কন্যা
পিসা মহাশয়	জানকীনাথ বসুর একমাত্র ভগিনীপতি
প্রফুল্ল	নেতাজীর সহপাঠী
প্রফুল্লদা	ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
প্রমথ	প্রমথনাথ সরকার, নেতাজীর সহপাঠী
প্রাণকৃষ্ণ পারিজা	পরবর্তীকালে রেভেনশ কলেজের অধ্যাপক
প্রিয়রঞ্জন	প্রিয়রঞ্জন সেন
ব	
বড় দাদা	সতীশচন্দ্র বসু
বড় দিদি	প্রমীলা মিত্র
বিজয় কাকা	বিজয়কৃষ্ণ বসু
বিধানবাবু	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
বিপিনবাবু	বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
বিমল	নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয়
বীর	ভৃত্য
বেণীবাবু	বেণীমাধব দাশ, নেতা[illegible] স্কুলের প্রধান শিক্ষক
বৌদিদি	সতীশচন্দ্র বসুর পত্নী
ব্রজবাবু	ব্রজগোপাল গোস্বামী
ব্রহ্মানন্দ	স্বামী ব্রহ্মানন্দ
ভ	
ভাস্করবাবু	ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কনিষ্ঠ জামাতা
ভোম্বল	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র চিররঞ্জন
ম	
মিঃ উইলকিনসন	কলিকাতা কর্পোরেশনের পয়ঃপ্রণালী বিশেষজ্ঞ
মিঃ কোটস্	কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার
মিঃ জে সি	জে সি মুখার্জি, একজিকিউটিভ অফিসার
মিনু	চিররঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠা কন্যা

নাম	পরিচয়
মিসেস দাশ	বাসন্তী দেবী
মিঃ পি পারিজা	প্রাণকৃষ্ণ পারিজা
মিঃ প্যাটেল	বিঠলভাই প্যাটেল
মিঃ মোবার্লী	ভারত গভর্নমেন্টের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব
মিঃ সলোমন	রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেলের মুখ্য জেলার
মিঃ সেনগুপ্ত	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
মিঃ হালদার	সুরেন্দ্রনাথ হালদার
মীরা	শরৎচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা
মেজ জামাইবাবু	বিশ্বেশ্বর দে
মেজদাদা	শরৎচন্দ্র বসু
মেজ বৌদিদি	শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী, বিভাবতী বসু
মেজর ফ্লাওয়ারডিউ	রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেন্ট
মেসো মহাশয়	উপেন্দ্রনাথ বসু

য

যতীন দাস	বিশ্রুত শহীদ
যুগলদা	যুগলকিশোর আঢ্য

র

রঘুয়া	কটকের বাসভবনের মালী
রণেন মাতুল	রণেন্দ্রনাথ দত্ত
রমাপ্রসাদবাবু	রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
রাঙ্গা মামা	বীরেন্দ্রনাথ দত্ত
রামিয়া	সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশন
রুদ্র	সুধীরকুমার রুদ্র

ল

লাল মামাবাবু	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
লাল মামীমা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী
লালমোহনবাবু	লালমোহন ঘোষ
লিলি	নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চতুর্থ ভগিনী

শ

শরৎবাবু (জামাইবাবুর ভ্রাতা)	শরৎচন্দ্র মিত্র
শ্যামাদাস কবিরাজ	কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি
শ্রীযুক্ত শাসমল	বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

স

সত্যেনবাবু	সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
সত্যেন মামা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সারদা	পরিচারিকা
সুস্থিরবাবু	সন্তোষকুমার বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা

নাম	পরিচয়
সুধীরবাবু	সুধীরচন্দ্র রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠ জামাতা
সুনীতিবাবু	ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সুন্দরীবাবু	ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস
সুরেনবাবু	সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
সুরেন্দ্রনাথ রায়	বেহালার জমিদার
সুরেশদা	ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সুহৃদ্	সুহৃদ্চন্দ্র মিত্র
সেজ দাদা	সুরেশচন্দ্র বসু
সেজ দিদি	তরুবালা রায়
সেজ জামাইবাবু	রাধাবিনোদ রায়
সেজ বৌদি	সুরেশচন্দ্র বসুর পত্নী
সেনগুপ্ত সাহেব	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
স্যার তার্মানি ব্যানার্জী	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান	ভারত গভর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্র সচিব

হ

হালদার সাহেব	সুরেন্দ্রনাথ হালদার
হরিপদ	হরিপদ বিষ্ণু
হেমেন্দু	হেমেন্দু সেন

ক্ষ

ক্ষিতীশ	ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
Big Five	তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, নলিনীরঞ্জন সরকার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, বিধানচন্দ্র রায় ও শরৎচন্দ্র বসু।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

॥ অ ॥
অক্সফোর্ড ৫৬
অনন্ত রায় ৩১৭
অনশন ধর্মঘট ১৯৪-১৯৮, ২০১, ২০৫, ২২৯
অনাথবন্ধু দত্ত ২৫৩
অনিলচন্দ্র বিশ্বাস ১৭৩
অনিলবরণ রায় ২২৬, ৩০৮
অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী ৩১৪
অভয় আশ্রম ২৬৮
অমূল্যচরণ উকিল ২১৮
অমৃতকৃষ্ণ বসুমল্লিক ৩১৭
অমৃতবাজার পত্রিকা ২৪৪
অমৃতসর ৫২
অরবিন্দ ঘোষ (ঋষি) ৯, ৩৩-৩৫, ৬১, ১২০-১২১, ১২৩, ৩০৭
অসহযোগ আন্দোলন ২৩০-২৩১, ৩১৩

॥ আ ॥
'আইন অমান্য আন্দোলন ৩৪
আইন ব্যবসায়ীদের জন্য "বাজাজ ফাণ্ড" ২৯৩
আইন ভঙ্গ ৩১১
আই সি এস ৫১-৫২, ৫৮, ৫৯, ৬১, ১০৪, ১১৩-১৩১
আত্মবিশ্লেষণের অভ্যাস ৪৭
'আত্মশক্তি' ৩১১
আদর্শবাদের ভিত্তি ২৮৭
আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চরিত্রগঠন সম্পর্কে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ২০-২২
আধ্যাত্মিক প্রেরণা ৩২
আর্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোল ৩০৩
আর্যসমাজ ৩৮
আলমোড়া ২৮২, ২৮৫, ২৮৮
আলি ভ্রাতৃদ্বয় ২১৩
আলিপুর মামলা ৩০৭
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ১৩১, ২৬৫, ২৯৬, ৩০১
আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান ২৭৪
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (স্যর) ৪৩, ৪৮, ১০০
আয়ারল্যাণ্ড ৫৫
আয়ুর্বেদ ২৬, ১৭১

॥ ই ॥
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ৪৮
ইংরাজ-আফগান যুদ্ধ ৫২
ইংরেজ বিরোধিতা প্রসঙ্গ ১০
ইংরেজ শাসনকাল
অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য ৯
ভূম্যধিকারীদের প্রাধান্য ৯
মুসলমান সম্প্রদায়ের ভূমিকা ৭-৮
'ইংরেজি'-শিক্ষা ১৫
ইংলণ্ড ৪১, ৫১-৫২, ৮১
ইংলিশম্যান ১৩১, ১৩৪, ১৩৬, ২৩১, ২৭০-২৭১
ইডেন হিন্দু হস্টেল ৩২
ইণ্ডিয়া অফিস ৫৬, ৬৩-৬৪, ১০৬, ১১৭, ১৩১, ২৩১
ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস ৪১
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস ৪১
ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল ২৭৫-২৮৮
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ২৯৫
ইসলাম ৩০২

॥ ঈ ॥
ঈশান খাঁ ৩, ৩১৫, ৩২১
ঈশানচন্দ্র ঘোষ ২৩৯-২৪০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৯-১০

॥ উ ॥
উইলিয়াম ডিউক ৬৩, ১৩১
উটকামণ্ড ২৮২, ২৮৫
উড়িষ্যা ৬, ১০, ১৪, ৪৫ ৩১৩
অর্থনৈতিক অবস্থা ২০০
একত্রীকরণ পরিকল্পনা ১৮২
ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের বিষয় ১৮৩
উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য ২০০
উপেন্দ্রনাথ বসু ৬, ২৪৪
উমেশচন্দ্র দত্ত ৫, ৩১৩

॥ এ ॥
এডওয়ার্ড মার্শাল হল ২৭৯
এডমণ্ড বার্ক ১২৯
এফ এন মুখার্জী ১০৬
এন সি কেলকার ১৬১-১৬৩
'এনসেণ্ট হিন্দু পলিটি' ১৪৪
এম এন রায় ৫
এলবার্ট স্কুল ৫, ৯, ৩১৩
এস. এন. ব্যানার্জী ১৪৪
এস. কে. মল্লিক (ডাক্তার) ৪৯
এস. কে. সেন ২৬২, ২৬৫

॥ ও ॥
ওটেন ১২৯, ৩১০
ও সি গাঙ্গুলী ১৯১

॥ ক ॥
কংগ্রেস ৬, ২৪, ১১৮-১২২, ২৪৪, ২৯৩-২৯৪, ২৯৯, ৩০৮, ৩১৩

বিভিন্ন ইতিকর্তব্য সম্পর্কে সুভাষ-
চন্দ্রের প্রস্তাবসমূহ ১১৮-১১৯, ১২১-
১২২
কটক ৫-৬, ১০, ১৫, ২৫, ৩২, ৩৬, ৪৪,
৬৫-৮১, ৩১১
কর্মযোগ ৩৪
কলকাতা ৩, ২৫, ২৮, ৩৯, ৪৪, ৫৪, ৮১, ২৭৯
কলকাতা কর্পোরেশন ২৭৯
গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা ২০৭
চীফ একজিকিউটিভ অফিসার ২৭৯
নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় ২৬৯
পয়ঃপ্রণালীর সমস্যা ২০৪, ২০৯
বহুতর সমস্যা ১৭৭-১৭৮
বাজারসমূহ নবীকরণ করা ২০৭-২০৮
বাজারে ঠাণ্ডাঘর নির্মাণের বিষয় ২০৭
কলকাতা কর্পোরেশন
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ২০৮
রাস্তার আলোর ব্যবস্থা ২০৭
শহর সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ১৪৯
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩১, ৪৫, ৫০, ২৩৮,
২৪১
বাংলাভাষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে
ঘোষণা ১৪
বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ২১২
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট ২৯৫
কলকাতা হাইকোর্ট ৬
কাজী নজরুল ইসলাম ১৪০
কার্ত্তিক বসু ২২২, ৩১৭
কাড্ডুরের পত্রাবলী ৫৭
কামিনী দাতব্য ঔষধালয় ৩১৩
কারমাইকেল কলেজ ২১৮
কারাব্যবস্থা ও কারাসংস্কারের বিষয় ১৩১-১৪৪,
১৭৬-১৮০, ১৯২, ২৫৬, ২৫৭-২৮৮
কালীপ্রসন্ন বসু ৫
কাশীনাথ দত্ত ৬, ৩১৩
কার্সিয়ং ৯৭, ২৩৫, ২৪৭
কায়স্থ জাতির ইতিহাস ৩
কুটির শিল্প ১৭৪-১৭৫, ১৭৬
কুমুদিনী বসু ১৮৭
কৃপাসিন্ধু মিত্র ১৮২
কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় ৩১০-
৩১১
কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার উপায় ৩১১
কৃষি উন্নয়নের বিষয় ২০৪
কৃষি সমস্যা ২১৯
কৃষ্ণ বসু ৩১৫
কৃষ্ণ বিহারী সেন ৫, ৩১৩
কেদারনাথ বসু ৫
কেম্ব্রিজ ৫২-৫৪, ৫৬-৫৮, ৬৩, ১০৪, ১০৬-
১৩১
সিভিল সার্ভিস বোর্ড ১৩১
কেশবচন্দ্র সেন (ব্রহ্মানন্দ) ৮, ১০, ১৮, ৩১৩
কোদালিয়া ৪-৫, ৬৬, ৩১৩, ৩১৬-৩১৭
কৌশিকী নদী ৩১৫
ক্যাথলিক হেরাল্ড ১৩১, ১৩৫-১৩৬, ২১০-
২১১
ক্যালকাটা রিভিউ ২৬২

॥ খ ॥
খানপুকুর ৩-৪
খানবাহাদুর আসহানউল্লা ২৪৪
খাঁ পুকুর ৩১৬-৩১৭
খৃষ্টান মিশনারী ও হিন্দুধর্ম ৯

॥ গ ॥
গঙ্গানারায়ণ দত্ত ৬, ৩১৩
গণতন্ত্র ৩১০
গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫ ১
'গম্ভীরা' গান ১৬৯
গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী ১৫৬
গিরীশচন্দ্র বসু ৩১৩
গুজরাট ২৯৩
গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩
গোপবন্ধু দাস ১৮২, ২০৩, ২২৪, ৩১৩
গোপাললাল স্যানাল ২৮০
গোপীনাথ বসু ৩
গোবিন্দ গন্ধর্ব খাঁ ৩১৫
গৌড় ৪, ৩১৫
গ্রেট ব্রিটেন ১২
গ্রেট ব্রিটেনে বসবাসকারী ভারতীয় ছাত্র ৫৭
গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যানেল স্কীম ১৩৫

॥ চ ॥
চন্দ্রনাথ ঘোষ ৬
চরমপন্থী ৩০৭
চরিত্রগঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে
পরমহংসদেব ২০-২২
চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী ১১২
চাষীদের অবস্থার পরিবর্তন ৩১০
চিংড়িপোতা ৩-৪, ৩১৭
চিত্তরঞ্জন দাশ ৬১, ৬৩, ১১৬-১১৭, ১২১,
১৩০, ১৪৫-১৫০, ১৫২-১৫৮, ১৬৬-১৬৭,
১৭০, ১৭২, ২১৪, ২১৬, ২২২, ২২৭,
২৩১, ২৩৫, ২৬৫, ২৯১, ২৯৬-৩০৭
চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ২১৫-২১৬, ২৩৬
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ৩১০
চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সম্প্রদায়সমূহের
বিবাদের নিষ্পত্তি ৩০২
চুনীলাল বসু ৬

॥ ছ ॥
ছাত্র ধর্মঘট ৪১-৪২

॥ জ ॥
জগদীশচন্দ্র বসু ৯৮-৯৯, ১১০
জন সাইমন (স্যর) ৫৫, ২৭৯
জনশিক্ষা বিষয়ক কমিটি ৮
জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা ১৪২

জমিদারী পরগাছা ৩০৯
প্রথার উচ্ছেদ ৩১০-৩১১
জলধর সেন ১৩৩
জয়নগর ৩১৩
জাতির সম্পত্তি ৩১১
জাতীয় আন্দোলন ৫, ২৯৬-২৯৭
জাতীয় কলেজ ১১৭-১১৮
পুনর্গঠন ৩২, ৩৯
স্বাধীনতা ১২৯
জাতীয়তা ৩০২
, ১৯৪-১৯৫,
২৮৫, ৩১৩-৩১৪, ৩১৭
জনসেবামূলক কার্যাবলী ৫-৬
জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ৬
'রায়বাহাদুর' উপাধি ত্যাগ ৫, ৩১৩
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ৫২
'জায়গীর' ৩
জীবনে সাফল্যলাভের উপায় ২
জে আর দাস ২৬১, ২৮৬
জেনারেল এসেমব্লি ৫, ৩১৩
জেনারেল ডাযার ৫৫
জ্ঞানযোগ ৩৯

॥ ড ॥
ডি এন মল্লিক (ডাক্তার) ৪২
ডি এল রায় ১০, ১৮৭

॥ ত ॥
'তত্ত্ববোধিনী' ৪
তন্ত্র ৩০৫
তমানি বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যার) ১৫৪
তরুণ সম্প্রদায় ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ২৯৭
"তরুণের রাজা" ৩০৭
"তরুণের স্বপ্ন" ৩০৯
তাজমহল ১১৩
তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ২৯৯
তীর্থযাত্রা ৩৭-৩৯

॥ দ ॥
দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ ৩৪
দক্ষিণ আমেরিকা ২৫
দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম ২২৮, ২৫৫
দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ ৩১৬
দত্তদের বংশধারা ৩২৪
দশরথ বসু ৩, ৫, ৩২১
দয়ানন্দ সরস্বতী ৩৮
দার্জিলিঙ্ ২৩৫
দিলীপকুমার রায় ১৩৯-১৪৬, ১৬৬, ১৬৯
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৯
দেউলি বন্দী শিবির ৫
দেবপ্রসাদ ঘোষ ২৪০-২৪২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি) ৮
দেবেন্দ্রনাথ বসু ৫, ১০, ৩১৩
দেশবন্ধু, দেখুন চিত্তরঞ্জন দাশ
দেশবন্ধু পল্লী পুনর্গঠন কমিটি ২৩৬
"দেশবন্ধু স্মৃতি" ৩০৭
দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ ৩১৭
দ্রাবিড়, মঙ্গোল, আর্য ৩০৩

॥ ধ ॥
ধর্মঘট ৩১০
ধীরেন্দ্রনাথ কর ২৭

॥ ন ॥
নগেন্দ্রনাথ বসু ৩, ৩১৫
নরেন্দ্রনাথ লাহা ১৪৪
নব জাগরণ ৮, ২৯৬
নবীন সেন ১৮৭
নব্য ন্যায় ৩০৪
নব্য বিবেকানন্দ গোষ্ঠী ৩২
নলিনীমোহন চ্যাটার্জী ২৪৫
নলিনীরঞ্জন সরকার ২৪০
নদী ও সমবায় উন্নয়নের সমস্যা ২০৪
'নারায়ণ' পত্রিকা ১৫৬, ২১৪
নারী স্বাধীনতা ৩১০
নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার,
সম্প্রদায়ভিত্তিক ২০৭
নির্বাচনপ্রার্থী হিসেবে সুভাষচন্দ্রের
আবেদন ৩০৮-৩০৯
নিবেদিতা দেখুন ভগিনী নিবেদিতা
নির্মলচন্দ্র ২৪৪
'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' ৩৪
নীতিবোধ ও রাজনীতি ১০-১১
নীলরতন সরকার (স্যার) ২৪১, ২৪৮
নৃত্য ও লোকসংগীতের মাধ্যমে
জাতীয়তাবোধ ১৬৯
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ৩০৭
"নেশান ইন মেকিং" ১৪৪

॥ প ॥
পঞ্চম জর্জ ২৫
পণ্ডিচেরী ৩৩
পত্রাবলী ৫৯-৬৪, ৬৫-৭৭, ৭৭-৮১, ১০২-২৮৮
পরিবর্তনবিরোধী ২৯৩-২৯৪
'পলাশীর যুদ্ধ' ৮, ১৮৭
পয়ঃপ্রণালী সংস্কার ১৭৮
পি. ই. স্কুল ১২, ১৪, ১৭, ২৪
পি. সি. রায় (স্যার) ৯, ৩২, ৩৫, ৩৯, ৪২, ২০৩, ২৪২, ৩১৩
পুরন্দর খাঁ ৩-৫, ৩১৫-৩১৭
পুরন্দর পাঠাগার ৩১৭
পৌরবাজারে ঠাণ্ডাঘর করার বিষয় ১৭৭
প্রকৃতরাজ ৩১৫
প্রকৃতি পূজা ১৮-১৯
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ২৯৪
'প্রবাসী' ২৫৫
প্রভাবতী দেবী ১, ৬৫, ৩১৩

প্রভাস মিত্র ৬
প্রমথনাথ সরকার ১১৮
প্রাণকৃষ্ণ পারিজা ১১২
প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় ১৭৭-১৭৮, ১৮৮-১৮৯, ২০৮
প্রেসিডেন্সি কলেজ ২৮, ৩১-৩২, ৪২-৪৩, ৪৯, ৫২, ১০০-১০২, ১০৮, ৩১২
প্রেসিডেন্সি জেল ২৬৫, ৩০১

॥ ফ ॥
ফণীন্দ্রনাথ দে ২৪৪
"ফরোয়ার্ড" ১৫৫, ১৯৬, ২২১, ২৩৬, ২৬১-২৬২, ৩০৭
ফিট্‌জ উইলিয়াম হাউস ২১৭
ফোর্ট উইলিয়াম ৩৪, ৪৯, ৫০-৫১

॥ ব ॥
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০, ১৮৭
"বঙ্গবাণী" ১৪৬
বঙ্গভঙ্গ ১০, ২৪, ৩৩
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯৯, ২৩০, ২৬২, ৩০৮, ৩১৩
সুভাষচন্দ্রের মুক্তিপ্রসঙ্গে মোবার্লির বক্তৃতাসংক্রান্ত বিষয় ২৭৪, ২৭৬-২৮০
"বর্তমান ভারত" ১১২
'বন্দে মাতরম্' ১০
বরদাকান্ত মজুমদার ২২১
বল্লভভাই প্যাটেল ২৯৪
বল্লাল সেন ৩১৬
বল্লালী কুলবিধি ৪, ৩১৬
বসুবংশের ইতিহাস ৩, ৩১৮-৩১৯
বহরমপুর জেল ১৩১-১৩৪, ১৩৬
বাঙ্গালা দেশে নবজাগরণ ৮
বাঙ্গালা ভাষা
আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ঘোষিত ১৪
শিক্ষার মাধ্যম ২১২
বাঙ্গালী ও উৎকলবাসীর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ১৬-১৭
বাঙ্গালী জাতি ও স্বরাজ আন্দোলন ৩০৬
স্বাধীনতা সংগ্রাম ২৯৬-২৯৭
বাঙ্গালী জাতির অধঃপতনের বিষয় ২৯৩-২৯৪
উৎপত্তি ৩০৩-৩০৪
সাহিত্যসৃষ্টি ৩০৫-৩০৬
শিক্ষা ৩০৪
'বাজাজ ফান্ড' ২৯৩-২৯৪
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৩৩
বালকৃষ্ণ মিত্র ১৪২
বাসন্তী দেবী ১৫২-১৫৪, ১৬৮, ১৮৫, ২০৬, ২১৪, ২১৬, ২২৩, ২৫৭, ৩০৭
বাহাদুর শাহ ৮
বিদ্যাধরী নদীর গতিপথ নির্ধারণ ১৭৮, ২০৪, ২০৯
বিধবা বিবাহ ৯
বিধানচন্দ্র রায় (ডঃ) ২১৮, ২৪১, ২৬২
বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (রাজা) ৯
বিনাবিচারে আটক আদেশ ১৯৭, ২৭৯, ২৮৩, ৩০৮
বিনোদ মিত্র ৬
বিবেকানন্দ (স্বামী) ৯, ১৯-২২, ২৪-২৫, ২৯, ৩২, ৩৪, ৩৮, ৯৮, ১১২-১১৩, ১২৩, ১৮৩, ১৮৭, ২২৭
বিভাবতী বসু ১৫৬, ১৭৯, ১৯১, ২০৪, ২২৫, ২৬৮
বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৩০-২৩১
'বুক কোম্পানী' ২০১-২০২, ২১০, ২১৫
বেঙ্গল
অর্ডিনান্স ২৮৩
ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ২৮৩
রিলিফ কমিটি ২০০
'বেঙ্গলী' পত্রিকা ১৩৫, ২০১
বেণীমাধব দাস ১৭-১৮, ২৫
বেত্রাঘাতের রীতি ১৩
বৈদ্যশাস্ত্র পাঠ ১৭১-১৭২, ২১৭-২৩৩, ২৩৭, ২৪৭, ২৫৫, ২৬২, ২৬৫, ২৬৭
বৈষ্ণবধর্ম ৬৮, ৩০৩, ৩০৭
বোস ইনস্টিটিউট ২৫৫
বৌদ্ধধর্ম ৩০৪
ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থসম্পর্কিত বিষয় ৩১১
ব্রহ্মানন্দ (স্বামী) ৩৮
ব্রজেন্দ্র শীল ২২৯
ব্রাহ্মধর্ম ১০
ব্রাহ্মসমাজ ৪, ৮, ১০
ব্রাহ্মণতন্ত্র ৩১০
ব্রিটিশ
ব্যবহার ৩৯-৪০, ৪৩
রাজনীতি ৫৬
সাম্রাজ্যবাদের মিত্রশ্রেণী ৯

॥ ভ ॥
ভগিনী নিবেদিতা ২০
ভারতচন্দ্র শিরোমণি ৪
ভারতীয়
আঞ্চলিক বাহিনী ৪৯
মজলিস ৫৬-৫৭, ১১০
'ভারতে বিবেকানন্দ' ১৮৭
ভিক্টোরিয়া স্কুল ৬
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৬
ভূম্যধিকারী শ্রেণী ৯
ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী ২৩৭
ভোলানাথ রায় ১০২-১০৪

॥ ম ॥
মঙ্গোল, দ্রাবিড়, আর্য ৩০৩
মর্ণিং পোস্ট ৫৮
মতিলাল নেহরু ১৮৪, ২৭৪-২৭৫
মধুসূদন দত্ত ৯
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্নসমস্যা ২১৯
"মনসা মেলা" ২৬৭

মন্মথনাথ মিত্র ৬, ২৪৪
ময়্যাল সায়েন্স ট্রাইপোস ১১৩
মল্লিকপুর ১১৫
মহাত্মা গান্ধী ৯, ৩৪, ৩৯, ১৩০, ২১১, ২৯৬, ৩১০
‘মহাবোধি জার্নাল’ ২১৪
মহাযুদ্ধ ৩৯-৪০
মহীপতি বসু ৩, ৩২১
মাদকবর্জন ১৩২, ১৩৬
মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের বিষয় ১৮৭-১৮৮
মান্দালয় জেল ১৩৬-২৬৯, ৩০৮
মাসিক বসুমতী ১৫৫, ১৫৮
মাহীনগর ৩-৪, ১০, ৩১৫, ৩১৭
বসুদের বংশধারা ৩, ৩২২-৩২৩
মিউনিসিপ্যাল গেজেট ১৩১-১৩২, ১৩৫-১৩৬, ১৩৮
মুক্তি বসু ৩
মুসলমান সম্প্রদায়
ইংরেজ শাসনকালে ৭
জনসংখ্যা ৭
হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক ৭-৮, ৩০০
মেট্রোপলিটান কলেজ ৩১৩
মেডিকেল কলেজ ৩২, ২৪১
মেমিও ২৩২-২৩৭, ২৪০-২৪৪
মোবার্লি ২৭৪, ২৭৬-২৮০
মৌলানা
আবুল কালাম আজাদ ২৬৫
শৌকত আলি ১৯৬, ১৯৮

॥ য ॥
যতীন্দ্রনাথ বসু ২৩৯, ৩১৭
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৯
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ২৭৫
যদুনাথ বসু ৫, ৩২২
যদুনাথ সরকার ২৩৬
যমুনালাল বাজাজ ২৯৩-২৯৪
যামিনীভূষণ রায় ১৭১
যোগ ২২, ৩২, ৩৪, ২৮৬, ২৮৮
কর্মযোগ ৩৪
জ্ঞান ৩৪
ভক্তি ৩৪
রাজ ৩৪
হঠ ৩৪
যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ১০৫-১০৭
যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪২
যোগেশচন্দ্র সেন ২৩৯
যৌন জীবন সম্পর্কিত বিষয় ৩০-৩১, ৪৮

॥ র ॥
রঘুনন্দন ৩০৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮, ৩৩, ৫৯, ৭৮, ১৪৬, ১৫৬, ২২৮
রমেশচন্দ্র গাঙ্গুলী ২০১
রমেশচন্দ্র মজুমদার (ডঃ) ২২১
রমেশচন্দ্র মিত্র (স্যার) ৬
রমেশ দত্ত ৫৯-৬০, ১১৫, ১৮৭
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ১৫৫, ২১৬
রাজনীতি ২৪-২৫, ১৮৬
রাজনীতি ও নীতিবোধ ১০-১১
রাজনৈতিক স্বাধীনতা ৪০
রাজপুর ৪, ৩১৫
রাজযোগ ২২
রাজাগোপালাচারী ২৯৪
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ৯, ২০-২২, ২৯-৩০, ৩২, ৩৪, ৩৮, ৯৮, ৩০৪
রামকৃষ্ণ মিশন ৩২, ৩৭-৩৮, ৪৬
রামমোহন রায় (রাজা) ৮
‘রায়মঙ্গল’ ৪, ৩১৭
রাসবিহারী ঘোষ ফেলোশিপ ১৪২
রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর প্রসঙ্গ ১৭৭
রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেল ২৫৭, ২৬৯-২৭৫
র‍্যাভেনশ কলেজ ৫, ৩১৩

॥ ল ॥
লর্ড কার্জন ৫৮
বেণ্টিঙ্ক ৮
রোনাল্ডস্‌ ১৪৪
লিটন ৫৭
লণ্ডন ৫৩, ৫৬, ৫৮, ৭৮-৮০, ১০৪, ১০৬
লবণহ্রদ এলাকা ২০৯
লালা লাজপত রায় ১৯৬, ২৭৮
লোকমান্য তিলক ৯, ৫৮, ১৪০, ১৬১-১৬৩
লোকসংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ ১৬৯

॥ শ ॥
শক্তিপূজা ৩০৫
শংকরাচার্য ৩৪, ৩৭-৩৮, ৪০, ৪৩, ৬৬
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৩, ১৫৬, ১৫৮-১৬০
শরৎচন্দ্র বসু ৪৯, ৫৯, ৭৭, ১১৭, ১৮৩, ১৯০, ১৯৩, ১৯৫, ২০৫, ২১০, ২২০, ২২৯, ২৫৫, ২৫৮, ২৬৯, ২৭৩, ২৭৫, ২৮১, ২৮৪-২৮৫, ৩১৪, ৩২২
শ্যামাদাস কবিরাজ ২৫৬, ২৬১-২৬২
‘শিখের বলিদান’ ১৮৭
শিবনাথ শাস্ত্রী ৪
শ্রীকৃষ্ণ বসু ৩১৭
‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ ১৮৭
শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় ৩১০-৩১১
শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে কর্তব্য ৩০৫

॥ স ॥
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ২০৩
সতীশচন্দ্র বসু ৬৩, ৩২২
সতীশ চৌধুরী ২৪৪
“সত্যবাদী” ৩১৩
সত্যেন্দ্র মিত্র ২৬৫, ৩০৮

সত্যাগ্রহ আন্দোলন ৩৪, ৩০৬, ৩১০
সন্তোষকুমার বসু ১৭১-১৭৩, ১৭৬, ২০৬, ২৬৬
সন্ত্রাসবাদমূলক বৈপ্লবিক আন্দোলন ৩৩, ৩৯-৪০
সমবায় ও নদী উন্নয়নের সমস্যা ২০৪
সম্প্রদায়ভিত্তিক ভোটাধিকার ও নির্বাচক-মণ্ডলী ২৩৭
সরোজিনী নাইডু ২৯৪
'সৎসঙ্গ' ৩১৪
'সাধু সন্ধান' ৩৬
সাধু-সন্ন্যাসী ২৩-২৪, ৩৭
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২৫০, ২৬২
সামাজিক স্বাধীনতার ভিত্তি ৩০৮-৩০৯
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ২০৯, ২১২-২১৩, ২৩৬-২৩৭
সারদাচরণ মিত্র ৩১৫
সিপাহী বিদ্রোহ ৮-৯
সিরাজউদ্দৌলা ৮
সুইটজারল্যাণ্ড ২৭৭-২৭৮, ২৮৭
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১১১
সুনীলচন্দ্র বসু ২৭৭, ২৮২, ২৮৪, ৩২২
সুবুদ্ধি খাঁ ৩, ৩১৫, ৩২১
সুবুদ্ধিপুর ৩১৫

সুভাষচন্দ্র
অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে ৩৩-৩৫, ১২০-১২১, ১৭০
আই সি এস চাকুরিতে প্রবেশ ও পদত্যাগ সম্পর্কে ১১৩-১৩১
আদর্শবাদের ভিত্তি প্রসঙ্গে ২৮৭
ইস্কুলজীবন ১১-২৮
ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে ১৫
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে ৯-১০
উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ২০৩
কলকাতা কর্পোরেশন
নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে ২৬৯
বহুতর সমস্যা সম্পর্কে ১৭৭-১৭৮
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট সম্পর্কে ২৯৫
শহর সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্পর্কে ১৪৯
কলেজজীবন ২৮-৪৩, ৪৯
কারাজীবনের অভিজ্ঞতা ১৩১-২৮৮
কারাসংস্কার সম্পর্কে ১৪০
কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবন ৫৩, ৬২-৬৪
কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে ১০
কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় ৩১০-৩১১
জনশিক্ষা ও শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে ১১২-১১৩
তরুণদের প্রতি আহ্বান ২৯৫
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে ১৪৫-১৪৮, ২৯৮-৩০৭
নির্বাচনপ্রার্থী হিসাবে আবেদন ৩০৮-৩০৯

পত্রাবলী:
অনাথবন্ধু দত্তকে লিখিত ২৫৩
অনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে ১৭৩-১৭৬
অমূল্যচরণ উকিল ২১৮
ই এস মণ্টেগু ১২৫-১২৬
এন সি কেলকার ১৬১-১৬৩
গোপবন্ধু দাস ১৮২-১৮৩, ২০৩, ২০৪, ২২৪
গোপাললাল সান্যাল ২৮২-২৮৩
চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী ১১২-১১৩, ১২৬
জানকীনাথ বসু ১১৪-১১৫, ২৮৫
দিলীপকুমার রায় ১৩৯-১৪২, ১৪৬-১৪৮, ১৬৬-১৬৮, ১৬৯-১৭১
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১১৭-১১৯, ১২১-১২২
প্রভাবতী বসু ৬৫-৭৭
বর্মার তৎকালীন গভর্নরকে ২৭০-২৭৩
বাসন্তী দেবী ১৫২-১৫৪, ১৬৮, ১৮৫, ২০৬, ২২৩-২২৪, ২৫৭-২৫৮
বিভাবতী বসু ১৫৬-১৫৮, ১৬৩-১৬৬, ১৭৯-১৮২, ১৯১-১৯২, ২০৪-২০৫, ২২৫-২২৬, ২৬৮
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৬-২২৮
ভোলানাথ রায় ১০২-১০৪
মতিলাল নেহরু ২৭৪-২৭৫
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ২৭৫
যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ১০৫-১০৭
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৫৮-১৬০
শরৎচন্দ্র বসু ৫৯-৬৪, ৭৭-৮১, ১১৩-১১৭, ১১৯-১২১, ২২২-২২৫, ২২৬, ১৪২-১৪৬, ১৪৮-১৫০, ১৫৪-১৫৬, ১৬০-১৬১, ১৮৩-১৮৪, ১৯০-১৯১, ১৯৩-১৯৪, ১৯৫-২০৩, ২০৫, ২১০-২১৮, ২২০-২২৩, ২২৯-২৫৩, ২৫৫-২৫৬, ২৫৮-২৬৬, ২৬৯-২৭০, ২৭৩-২৮১, ২৮৪-২৮৮
সন্তোষকুমার বসু ১৭১-১৭৩, ১৭৬, ২০৬-২০৮, ২০৯, ২৬৬-২৬৭
সুনীলচন্দ্র বসু ২৮২
হরিচরণ বাগচী ১৫০-১৫১, ১৮৬-১৯০
হেমন্তকুমার সরকার ৮১-১০২, ১০৫-১১২

প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে ১৮-১৯
প্রথমবার গ্রেপ্তার ও বন্দীদশা ১৪৩
প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান ২৭
প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ১৮৮-১৮৯, ২০৮
প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা ৪১-৪৩, ১০০-১০১
বাঙ্গালীর অধঃপতনের বিষয় ২৯৩-২৯৪
'বাজাজ' ফাণ্ড সম্পর্কে ২৯৩-২৯৪
বিবেকানন্দের প্রভাব ১৯-২০, ২৪-২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৪, ৩৮
বিলেত যাত্রা ৫২, ১০৪

ব্রিটিশজাতি সম্পর্কে অভিমত ৩৯-৪০, ৪৩, ৫৪, ১০৭
ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন প্রসঙ্গে ২৪১-২৫৩
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পর্কে ২১৯
মোবার্লি'র বক্তৃতায় মন্তিপ্রসঙ্গ ২৭৪, ২৭৬-২৮০
মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে ৭, ২৭
যোগাভ্যাস সম্পর্কে ২৮৬, ২৮৮
যৌনজীবন সম্পর্কে ৩০-৩১, ৪৮
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ৭৮
রাজনীতি প্রসঙ্গে ২৪-২৫, ৩৯-৪১, ১৮৬
রাজা রামমোহন সম্পর্কে ৮
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ২০-২২, ২৪-২৫, ২৯, ৩২, ৩৪, ৩৮
রুশবিপ্লব প্রসঙ্গে ১১২
লোকসঙ্গীত ও নৃত্য ১৬৯
শ্রমিক আন্দোলন ও জনশিক্ষা ১১২-১১৩
শ্রমিক কৃষকের স্বার্থসম্পর্কিত বিষয় ৩১০-৩১১
সিভিল সার্ভিসে পদত্যাগ ৬২-৬৩
পরীক্ষায় চতুর্থস্থান অধিকার ৫৮
স্বাধীনতালাভের পথ ২৯২, ৩১০-৩১১
বংশ পরিচয় ১-৩
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪, ৬৩, ১২৮
সুরেশচন্দ্র বসু ৩১৪, ৩২২
সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারী (ডাঃ) ৪৯
সুশীল দে ১১১
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ৫, ৩১৩
সোমপ্রকাশ ৪, ৩১৭
স্কটিশচার্চ কলেজ ৫, ৪৮-৪৯, ১০১
স্বরাজ আন্দোলন ২৯৬, ৩০২, ৩০৬, ৩১০
"স্বরাজ" পত্রিকা ১১৭-১১৮
স্বাধীনতা সংগ্রাম ২৯২, ২৯৬-২৯৭, ৩১০-৩১১
স্বায়ত্তশাসন ৬১-১২৩
স্টেটসম্যান ১৩১-১৩২, ১৩৪, ১৯৮, ২০২, ২১০-২১১, ২১৫-২১৭, ২২০, ২২২-২২৩, ২২৯, ২৩১, ২৩৯, ২৪৫, ২৪৭, ২৫১-২৫৩, ২৫৬, ২৬১

॥ হ ॥

হরনাথ বসু ৩১৩, ৩২২
হরিচরণ বাগচী ১৫০, ১৮৬
হরিভল্লভ বসু (রায়বাহাদুর) ৬, ৩১৩
হাওড়া ব্রিজ বিল ১৩৫, ১৪২
হাটখোলার দত্ত পরিবার ১, ৬, ৩২৪
'হার্ট অফ আর্য ভারত' ১৪৪
হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ৭-৮, ২১৩, ৩০৪
হিন্দু স্কুল ৩১, ৩১২
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৪২
হেমন্তকুমার সরকার ২৫, ৩৬, ৮১
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২২২, ২৯৮, ৩০৭
হেয়ার স্কুল ৩১, ২৩৯, ৩১২